প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মূল্য : ষোল টাকা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৯

মুদ্রক : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

বিমল কর

অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে
দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার
পিপাসা
সাদা জ্যোৎস্না
পুতুল
বিদেশিনী
নগ্ন ঈশ্বর
শেষ দৃশ্য
সমুদ্রে পাখির কান্না
সমুদ্র মানুষ

ওরা উভয়ে দেখল, একদল পাখি উড়ে উড়ে সামনের দুর্গ অতিক্রম করে গেল। শহরের এত বড় মাঠ এবং লোকজন—ওরা কিছুই দেখছিল না; ওরা সামনের দুর্গ অতিক্রম করে শুধু পাখি উড়ে যেতে দেখল। বড় শহর—বড় মাঠ এবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে লোকের ভীড়। ওরা এতক্ষণে ধরতে পারল—শনিবার ছুটোর সময় অফিস ছুটি হয়ে গেছে সুতরাং মাঠে অথবা স্মৃতিস্তম্ভের পাশে, কত সব যুবক যুবতী। আকাশ নীল এবং স্বচ্ছ আর এই মাঠের ভিতর থেকে মনে হচ্ছিল সব শ্বেত পাথরে নির্মিত বাড়ি—মাথায় নিশান উড়ছে, এবং এক সোনার ঈগল এই শহরের সর্বত্র উড়ে বেড়াচ্ছে যেন। ওরা সোনার ঈগলের ডাক শোনার জন্য পরস্পর হাত ধরল এবং মাঠের নির্মল ঘাস মাড়িয়ে উত্তর দক্ষিণের অথবা কোন পূব পশ্চিমের পথ ধরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বেড়াবার অছিলায় ঘুরে বেড়াতে থাকল।

ওরা পরস্পর কোন কথাই বলতে পারছে না। সব বলা শেষ, অন্তরের গোপন আবেগটুকু আজ এই মনোরম বিকেলে মাঠের সাদা ঘাসের ভিতর কিছুক্ষণ আগে সহজভাবে ধরা পড়েছে। ওরা উভয়ে জানত না ঘটনাটা এমনভাবে ঘটে যাবে। এতদিনের সংগোপনে লালন করা প্রেম, 'প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মত' সুলতা প্রায়ই কথাটা বলত, সেই রজ্জুর মত প্রেম ওদের বড় বেশি সযত্নে কাছাকাছি রেখেছিল, ওরা দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অমনোযোগী ছাত্রের মত কথা বলেছে এবং ওরা এই ঘাসের ভিতর কতদিন অকারণ শস্যকণা খুঁজে গেছে অথচ পরস্পর সহজ আবেগটুকু ঢেলে বলতে পারে নি, কাছে বোস এবং হাতের উপর হাত রাখ।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ এখন বন্ধ। ওরা পুরীর সমুদ্রতীর ঘুরে এসেছে। ওরা দীঘা ভ্রমণে ক্লান্ত। ওদের সঙ্গে সুলতা ছিল, অবিনাশ ছিল। ওদের সঙ্গে পরিচিত বন্ধু বান্ধবী ছিল। পূজোর ছুটিতে হৈচৈ করেছে। গ্রীষ্মের ছুটি শেষে ওরা উভয়ে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে—কোথাও কোন দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল না -বস্তুত ওরা পাখির মত একসঙ্গে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস থেকে আরম্ভ করে, নাটকের প্রতিযোগিতায়, সর্বত্র উড়ে বেড়িয়েছে।

সে একদিন বলেছিল, তোমার চেয়ে সুলতার গলা ভাল।

অনিমা উত্তরে বলেছিল, হবে হয়তো। অনিমার মুখে অভিমানের চিহ্ন ধরা পড়েছিল। ওদের ভেতর দিল্লীর নাটকের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। অনিমা দৃঢ়ভাবে বলেছিল, নাটকের সেরা প্রাইজটা আমিই পেয়েছি।

—সেটা তোমার মুখের জন্য।

—ইঙ্গিতটা একটু অশ্লীল হল মনে হচ্ছে।

—তোমার প্রশংসা করেছি অনিমা। যদি অশ্লীলতা ভাব তবে ক্ষমা করবে এবারের মত।

তারপর উভয়ে নীরব ছিল। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছে সুভাষ অনিমা সম্পর্কে নিস্পৃহ। কতকাল থেকে ওদের পরিচয়—সুভাষ তখন ছোট, অনিমা আরও ছোট। সুভাষ কাকীমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে—গ্রাম্য এক জায়গা, আনারসের বিরাট মাঠ এবং বোধহয় তখন বর্ষাকাল ছিল। অনিমা এখন এইসব কোলাহলের ভিতর স্মৃতিতে ডুব দিতে চাইল। এই প্রথম অনিমা সুভাষকে ভয়ানকভাবে আঘাত করেছে মনে হল। 'প্রেম দীর্ঘ এক রজ্জুর মত, সুলতার কথা—'জীবন যাপনের অধিকারে আমরা সকলে প্রেমের রজ্জুতে অসি খেলা দেখাচ্ছি'। সুলতা ভয়ানক সব কথা বলে এতদিনের ভালবাসার ঘরকে ভেঙে দিতে চেয়েছিল। অনিমা

আর পারছে না—এতদিনের পরিচয়—অথচ কি ঘটনা ঘটবে ওরা যেন দুজনের একজনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। এবং এই দূর সম্পর্কে পুরুষটি, বাড়িতে মা বাবার কাছে সদালাপী, সোনার টুকরো ছেলে—ঠিক যেন আনারসের বাগানে একটিমাত্র সুমিষ্ট আনারস। রস সঞ্চিত ভিতরে—উপরের চেহারা কদাকার এবং নিম্নমানের। অনিমা বলল, তুমি রাগ করলে সুভ?

সুভ এখনও যেন দূরের মাঠ দেখছে। এখনও যেন আকাশের স্বচ্ছ নীলের ভিতর সাদা পাখি উড়তে দেখছে। ওর গ্রামের কথা মনে আসছিল। হেমন্তের এক বিকেলের কথা মনে আসছিল। সে ফের কাকীমাকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। নদীতে নৌকা চলছে না বলে ওরা অনেকটা পথ পাল্কিতে; কাকীমা পাল্কি থেকে নামলে, সেও নেমে গেল—তখন এই ফুটফুটে ফ্রকপরা মেয়েটি মফঃস্বল শহর থেকে পরীক্ষার পর ফিরে এসে উঠোনে কোলাহল করছিল—তখন উঠোনে পাল্কি নামল, চার বেহারা কাঁধে পাল্কি। কাকীমার সঙ্গে সেই গ্রাম্য বালক; কালো রোগা এবং বড় বড় চোখে অনিমাকে দেখতে গিয়ে লজ্জায় কাতর। অনিমা ফিক করে হেসে দিয়েছিল। সে একদিন গেছে ওদের। শীতের মাঠে ওরা ঘুরে বেড়াত, কখনও অনিমাদের বৃদ্ধ চাকর নিশিনাথ রাতে লণ্ঠন জ্বেলে ওদের শঙ্খকুমারের গল্প বলত। রূপকথার গল্প সেই কৈশোর জীবনে মহিমময় পুরুষের মত বিচরণ করত অনিমার চোখের উপর। গ্রাম্য এক নদী ছিল···শীতের শেষে 'পার হয় গরু পার হয় গাড়ি'—ওরা উভয়ে নিশিনাথের সঙ্গে সেই নদী মাঠ অতিক্রম করে স্নেহলতা পিসির ঘরে তেঁতুলের আচারের জন্য পালিয়ে পালিয়ে উঠে যেত।

কিছুদিন থেকে এই নগরীর কোলাহল সুভর ভাল লাগছিল না। কারণ অনিমাকে দূরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অনিমার এখন অনেক উৎসাহদাতা—অনিমা সম্পর্কে সবাই আজকাল খুব সচেতন, সকলে এক বাক্যে ওর জটিল অভিনয়ের জন্য মুগ্ধ।

অনিমার এত কাছে থেকেও সুভ মৃত মানুষের মত যেন ক্রমশঃ সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ছিল। সুভ বলল, না। রাগ করব কেন। রাগ করবার অধিকার কতটুকু! বলে ছেলেমানুষের মত অভিমানে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।

—এই! অনিমা সুভর ছেলেমানুষের মত মুখে হাসি ফোটাবার জন্য হাতের উপর হাত রাখল।

সুভ তাকাল না। অনিমা ফের বলল, আজ নাট্য সংসদ থেকে মহী এসেছিল।

সুভ কোন উৎসাহ প্রকাশ করল না।

অনিমা নিজেকেই যেন শোনাল, ওরা অচলার ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে বলছে।

সুভ এবার বলল, ভাল।

অনিমা দেখল নগরীর লোকজন সব মাঠময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখন বিকেল। সূর্য দুর্গের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে। নদীর অন্য পারে চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। এবং পাটকলের সাইরেন বাজছিল। সে, সব উপেক্ষা করে সুভর সামনে বসে বলল, এত রাগ কেন! আমি কি করেছি!

সুভ এবার যেন ফেটে পড়ল।—তুমি অনেক কিছু করেছ অনু। তুমি অনেক অপমান করেছ আমাকে!

সহসা অনিমা থ বনে গেল। অপমান! কখন! কার!

সুভ দিল্লীর ঘটনা বলল। বলল, ওটা অপমান নয় বলছ?

অনিমা বুঝল, ধীরে ধীরে অনিমা যত অভিনয়ে পটু হচ্ছে, যত গানের জন্য সময় দিচ্ছে তত এই সোনার মানুষটি তাকে ছেড়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। এবং এক অপার বেদনা সর্ব সময় চোখে মুখে ঝুলে থাকে। দিল্লীতে ওর সঙ্গে সব বিকেলে বের হতে পারে নি। সুভ অভিনয়ে অংশ নিয়েছে, ছোট ভূমিকা—অল্প সময়ের জন্য রিহার্সেল—কিন্তু অনিমা জানত এই সংসারে তাকে বড়

এবং মহৎ হতে হবে—সে পাগলিনী সদৃশ অভিনয়ের জন্য রিহার্সেলের পরেও হোস্টেলে দরজা বন্ধ করে বড় আয়নার সামনে মুখের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে অভিনয় মুখস্থ করেছে। তবে বিকেলে সুভ এসেছিল। আনিমার সঙ্গ চেয়েছিল—অনিমা যেতে পারে নি, বলেছে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না সুভ—আমি যেতে পারছি না। সুভর ভয়ে অনিমা মিথ্যা কথা বলেছিল। অনিমা যেন বুঝতে পারছে—সংসারে এক ধরনের পুরুষ আছে—যারা স্বার্থপর এবং সদালাপী। সুভকে তেমন মনে হচ্ছিল কিছুদিন থেকে। ওরা এতদিন পরস্পর পরস্পারের জন্য প্রতীক্ষা করে বুঝেছে—উভয়ে সংযমী এবং রমনের জন্য উভয়ে যতই কাতর হোক উভয়ের অমঙ্গল ভেবে পরস্পর ওরা দূরে থেকেছে। সুযোগ এবং সময়ের কোন দুর্ব্যবহার করে নি। এবং এই জন্যই অনু যেন এই মহিমময় পুরুষের সব স্বার্থপরতা সহ্য করতে পারে। সেই কৈশোর জীবন থেকে এক কিশোর ক্রমশঃ যুবক হয়েছে এবং এই মহানগরীতে ফের ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দেখা। অনু এবার আরও ঘনিষ্ঠ হল। বলল, সুভ আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি সুলতার প্রশংসা আর করো না। সে সুভর পায়ে হাত রাখতে চাইল।

সুভ বলল, এই কি হচ্ছে!

অনু বলল, সব সময় তুমি আমাকে ছোট করতে চাও কেন সুভ!

সুভ বলল, ভালবাসি বলে। অথবা যেন বলতে চাইল সুভ, *এত সহজে এত দিনের ইচ্ছা নরম পালকের মত খুলে ধরলে অনু! এবার আকাশে সাদা পায়রা উড়োক, গম্বুজে শরতের শিশির পড়ুক, তারপর ইচ্ছা করলে আরও দূরে হেঁটে যেতে পারি আমরা,* এই ভেবে সুভ দুহাতে অনুর হাত দুটো অঞ্জলির মত তুলে নিল। তারপর সেই অঞ্জলির ভিতর মুখ ঢেকে কেমন এক অসহায় যুবকের মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। অনেক গ্লানি জমা

ছিল যেন, যেন যে কোন দিন এই যুবতী তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে—সব ভালবাসার দরজা সব সময় সকলের জন্য খোলা থাকে না—সুতরাং আজ এই মনোরম বিকেলে নরম ঘাসের ভিতর সূর্যের শেষ আলো ওদের পরস্পরকে খুব কাছে টেনে নিল।

সুভ বলল, চল কোথাও একটু হাঁটি।

অনু বলল, আজ আমার অন্য কিছুই ভাল লাগছে না সুভ। শুধু তোমার পাশে বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সুভ বললে, তুমি খুশী।

অনু বলল, আমার কপাল ছুঁয়ে দেখ সুভ।

সুভ অনুর কপাল ছুঁয়ে দেখল। বলল, খুব গরম, জ্বর!

—না সুভ।

—বাড়ি চল অনু। তোমার শরীর খারাপ। শরীর খারাপ জানলে তোমাকে মাঠে আসতে বারণ করতাম।

—না সুভ, আমি ভাল আছি। শরীরে কোন গ্লানি নেই। এবার তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছামত যেখানে খুশি নিয়ে চল। যেন বলার ইচ্ছা দীর্ঘদিন আমরা সংযম শিক্ষা করে চরিত্রহীনতার দায় থেকে মুক্ত থেকেছি—আমরা জানতাম সে দায় আমার তোমার মুখোশ মাত্র। আমার উত্তাপ শরীরের সব গ্রন্থিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে—সুভ এবার শুধু হাত ধরে আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে চল—শরীর আর বইতে পারছি না।

ওরা নগরীর কোলাহল শুনতে পাচ্ছিল না। ওরা দেখল কেবল দুর্গের অন্য প্রান্তে সূর্য সেই থেকে অস্ত যাচ্ছে। সুখের সময় দুঃখের চেয়েও বড়। গাছগুলোতে সূর্যের শেষ আলো। এবং দূরে যাদুঘরের জানালাগুলো যেন বন্ধ। সুভ উঠে দাঁড়াল। ওরা পরস্পর হাত ধরে পুব পশ্চিমে অথবা উত্তর দক্ষিণে হাঁটতে চাইল এবার।

সুভ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সামনে ট্রাম রাস্তা, পরে ফাঁকা মাঠ এবং অন্য পারে মিশনারি স্কুল। কিছু সন্ন্যাসিনী সেই বিদ্যালয়ে পাঠ দিচ্ছে। সুভ ভাবল, এই সব সন্ন্যাসিনীদের সোনার ঈগলের ডাক শুনতে কখনও ইচ্ছা হয় না? সুভ এইটুকু ভেবে পিছনে তাকাতেই দেখল অনু আসছে। টেবিলে চায়ের কাপ রাখল অনু এবং বলল, বাবা গতকাল এসেছেন। বাগানের তাজা চা। ফ্লেবারটা একবার দেখ। বলে চায়ের কাপটা সুভর নাকের কাছে নিয়ে গেল।

সুভ বলল, গ্রীণ লিফ?

—তোমার কি মনে হয়!

সুভ বলল, আমার কাছে সব লিফই গ্রীন। খেতে সুস্বাদু হলেই হল।

অনু বলল, সুস্বাদু হলে সবই বুঝি খাওয়া যায়? অনু সুভকে রহস্যজনকভাবে কথাটা বলল।

—সুস্বাদু খাবার সবারই পছন্দ অণু।

ইঙ্গিতটুকু ধরতে পেরে অনু অন্য কথা পাড়ল। —বাবা বললেন তোমার জন্য একটা চিঠি লিখে রেখেছেন।

—কার কাছে! কথাটা শুনতে পায় নি এমন এক স্বরে সুভ প্রশ্ন করল।

—প্রিয় জ্যাঠামশায়কে।

—কেন, বলত!

—একেবারে হাবা দেখছি।

—ছেলেবেলা মা আমাকে খুব হাবা জানতেন। মার কথা মনে হলে ভীষণ খারাপ লাগে আমার। তখন সবই বিস্বাদ—অথবা এও

হতে পারে মায়ের মৃত্যু এবং বাবার নিরুদ্দিষ্ট হওয়া কোন এক ষড়যন্ত্রের মূল। সুভ একটু থেমে বলল, বাবাকে আমাদের কথা বললে?

—বলেছি।

—কি বললেন!

—চিঠিটা পড়লে ধরতে পারবে।

সুভকে বড় বিষন্ন দেখাল। সে বলল, চিঠিতে তিনি কি লিখেছেন!

অনু চা খাচ্ছিল—যেন শুনতে পাচ্ছে না সুভর কথা এমনভাবে হাসছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, বাবার খুব অপছন্দ তোমাকে। বলে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

অণু বড় বেশি চঞ্চল। শুধু প্রাণভরে হাসতে শিখেছে। কোথাও কোন দুঃখের ছাপ লেগে নেই। ঘরের দেওয়ালে বিচিত্র সব ছবি। নীল রঙের দেওয়াল। পাখা সাদা রঙের এবং অনবরত ঘুরছে। বারান্দায় কুকুরটা বাঁধা। চাকরটা বাড়িতে নেই, বাজারে গেছে। মা হয়ত এখন রান্নাঘরে এবং ঠাকুরকে তিনি নিশ্চয়ই এখন নির্দেশ দিচ্ছেন। অনু হাসতে হাসতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ট্রাম বাসের শব্দ এবং একটা কাক বিদ্যুতের তারে বসে অনবরত ডেকে চলেছে। অনুর চলে যাওয়াটুকু মোহময়, ওকে সেই বর্ষামঙ্গল নৃত্যনাট্যের দিনের মত লাগছে যেন আজ। সে সাজঘরে ঢোকার আগে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল সেদিন। গলায় রজনীগন্ধার মালা, খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা এবং রজনীগন্ধার সাদা রঙের সঙ্গে ওর গানও কেমন আশ্চর্য স্নিগ্ধ ছিল। যেন চঞ্চল এক ময়ূরী নৃত্যনাট্যের ভিতর তার নিরুদ্দিষ্ট ময়ূরের সন্ধানে কাতর। আর একবার কি করে যেন অনুর চোখ পড়ে গিয়েছিল অডিটরিয়ামে এবং চোখে চোখ পড়তেই অল্প হেসে দিয়েছিল—বিষন্ন সন্ধ্যার মত সেই হাসি সমস্ত অডিটরিয়ামে বিস্তৃত এক মায়াজালের মত।

নৃত্যনাট্যের শেষে পরিচিত বন্ধু বান্ধব অনিমাকে ছেঁকে ধরেছিল। সেই সব ঘটনা সুভ মনে করতে পারছে। কি অভিনয়ে, কি নাচে এবং গানে এই অনুকে বড় বেশী দূরের নক্ষত্র বলে মনে হয়। সুতরাং সে চুপচাপ বসে টেবিল থেকে একটা সাপ্তাহিক কাগজ তুলে নিল এবং ডিভানে শরীর এলিয়ে দিয়ে কাগজে নিজের কুৎসিৎ মুখ ঢেকে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল।

মা এসে একসময় বললেন, কি ব্যাপার তুমি একা একা বসে!

সুভাষ কিছু উত্তর করতে পারল না। অন্যমনস্কভাবেই হাসল।

—এই অনু, অনু!

সুভাষ বলল, অনু আমাকে চা দিয়ে গেছে।

মা বললেন, চা দিয়েই চলে গেছে ত! ঐ মেয়ে। এক মুহূর্ত এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না।

সুভাষ বলল, আমি এবার উঠব।

মা বললেন, উঠলে যে চলবে না বাবা। তিনি বোধ হয় তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।

—তিনি বাড়িতে নেই?

—বাজারে গেছেন চাকরের সঙ্গে। এক্ষুণি আসবেন। তুমি বস। বলে তিনি কুকুরের শেকলটা গলা থেকে খুলে দিলেন। খাঁচায় পাখি পোষার সখ। একজাতীয় দুর্লভ টিয়া তিনি খাঁচায় পুষেছেন। তিনি পাখিদের এখন খাবার দিচ্ছেন। সুভ বসে বসে সব লক্ষ্য করল। আর এ সময় মনে হল কেউ পাশের ঘরে বীণ বাজাচ্ছে। অনু বীণ বাজাচ্ছে! কথাটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকল। বীণের যাদুকরী সুর সুভকে, এই ঘরকে এমনকি সব দেয়ালের চিত্রশিল্পকে আবেগে মথিত করছিল। সুভর একবার ইচ্ছা হল উঠে যেতে, একবার ইচ্ছা হল—ওর পাশে বসে ওর সব কঠিন কঠিন রাগগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে—কিন্তু মিষ্টি হাত যেখানে যা স্পর্শ করছে সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুভ উঠে দাঁড়াতে পারল

না, অন্য ঘরে ঢুকে ওর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হল না বরং এই ঘর ভাল এবং নিঃসঙ্গতা ভাল আর এই নির্জনতার ভিতর অন্যঘর থেকে যখন বীণের রাগ লয় সব ঠিক ধরা যাচ্ছে তখন উঠে এ-সময় অনুকে সজাগ করে আহত না করাই ভাল। সে চোখ বুজে আছে হয়ত এখন—ওর হাত বথু চঞ্চল— সে চোখ বুজে সব ধরতে পারে। সুভ ডিভানে যে-ভাবে শুয়ে ছিল ঠিক সেভাবেই শুয়ে থাকল। শুয়ে শুয়ে স্মৃতির ভিতর ডুবে গেল। অথবা এক ধরণের আবেগ যা সুভকে ক্রমশঃ অলস করে দিচ্ছিল।

এবং এক সময় মনে হল দরজায় কে উঁকি দিচ্ছে। সুভ দেখল, অনিমার মুখ। চোখে লজ্জা এবং এক ধরণের লুকোচুরি খেলার সখ যেন—আমি এখানে আছি--আমি এখানে নেই, কোথাও আমাকে তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না, আমি মাঠ অতিক্রম করে সহর অমিক্রম করে অথবা নদী নালা এবং তরমুজের মাঠ অতিক্রম করে এক নদীর চরে কাশফুলের ভিতরে হারিয়ে যাব—তুমি সব নগর খুঁজে মাঠ নদী নালা খুঁজে আমাকে ধরে আনবে, অনিমা এমন এক ভঙ্গী টেনে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সুভ বলল—কি রাগ?

অনিমা বলল, পুরিয়া কল্যাণ।

—বড় ভাল লাগল। ইচ্ছা হয় সারাদিন শুনি।

—খুব ভনিতা হচ্ছে।

—আমি অনু মিথ্যা অভিনয় করি না।

—সত্যি অভিনয় তো আরও ভয়ঙ্কর।

—তোমার কি মনে হয় অনু এ কথা আমি মন থেকে বলছি না?

—কি জানি বাপু পুরুষদের বোঝা ভার। বলে ঠোঁট উল্টে দিতেই সুভ পত্রিকাটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল।

—কি মারবে নাকি।

—তাই।

—তবে বাবাকে ডাকছি। তারপর পরস্পর হেসে দিল এবং উভয়ে ফের ডিভানে বসে পড়ল।—আর নাচ গান ভাল লাগছে না।

সুভ ঠাট্টা করে বলল, সুখী গৃহ কোণ বাজে গ্রামোফোন। পত্রিকা থেকে বিজ্ঞাপনের একটা অংশ তুলে উচ্চস্বরে হেসে দিল।

—হ্যারে তোরা এত হাসছিস কেন? অনু দেখল, বাবা ঢুকছেন ঘরে। ওরা দুজনই সহসা চুপ করে গেল।

বাবা পাশে বসে বললেন, তোমাদের হাসতে আমি বারণ করিনি অনু। বলে তিনি একটা চকোলেট মুখে পুরে দিলেন। এবং ওদের দুজনকে দুটো চকোলেট খেতে দিয়ে বললেন, যতদিন পারবে হেসে নেবে। বলে একটি পত্র সুভাষের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, প্রিয়দাকে লেখা। তুমি চিঠিটা দেবে এবং তিনি যা বলবেন করবে।

অনিমা সুভাষের পায়ে চিমটি কাটল। সুভাষ ঠিক ধরতে পারছে না অনুর ইঙ্গিতটা। সে বোকার মত অনুর দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, আরে না না আমাকে প্রণাম করতে হবে না। দুষ্টু মেয়ে তোমাকে কি বলছে বুঝতে পারছ না সুভাষ! মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী চালাক হয়। বলে, তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, যখন যথার্থই বের হয়ে যাচ্ছেন তখন সুভাষ মনে করতে পারছে অন্যান্যবারের মত সে অনুর বাবার সামনে সহজ হতে পারছে না। কারণ এত দিনে এই পরিবারে অনুর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জানা হয়ে গেছে। সে তবু কোনরকমে উঠে দাঁড়াল এবং অন্যান্যবারের মত কুশল প্রশ্ন করার স্পৃহাতে বলল, আপনার শরীর ভাল যাচ্ছে তো? ওখানে এখন গরম কেমন? তিনি তখন অন্য কথা বললেন, সুভাষ তোমাদের গোত্রটা যেন কি?

সুভাষ এবার প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের মত মুখ করে ফেলল। সুভাষ মাথা নীচু করে বলল, বোধ হয়···

—এ সব কথা বোধহয় দিয়ে হয় না।

সুভাষ যেন দেখল প্রৌঢ় ব্যক্তিটি ক্রমশঃ রক্ষণশীল হয়ে পড়ছেন। বাড়িতে সব ব্যাপারেই তিনি আন্তর্জাতিক নিয়মের ধারক—কোন সংকীর্ণতা নেই অথবা সংস্কৃতির ব্যাপারে কোন গোঁড়ামী বিশেষ করে এই পরিবারের মুসলমান বন্ধুদের সে স্মরণ করতে পারল। সুভাষ যেন বলতে চাইল আমার মা নেই, বাবা নেই, মামারা হোস্টেলে রেখে মানুষ করেছেন। সুতরাং সেও দৃঢ় হতে চাইল। বলল, বড় মামাকে লিখলে তিনি সব খবর আপনাকে দিতে পারবেন।

অনুর বাবা কৈফিয়তের মত জবাব দিলেন যেন, ভুলটা আমারই। সুভাষ এ সব ব্যাপারে কর্তা ব্যক্তিদেরই হাত। তুমি বরং যাবার আগে অনুর কাছে তোমার মামার ঠিকানাটা রেখে যাবে।

এই সব কথা বড় মামুলী মনে হচ্ছিল সুভাষের। বিবাহিত জীবনে এক ধরনের সুখ নিশ্চয়ই আছে এবং নেশার মত সব কিছু। সে অনুর দিকে তাকাল। অনু নোখ দিয়ে খুঁটে কার্পেটের ভিতর কি যেন দেখছে। অনু মাথা নীচু করে রেখেছে বলে মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু নাকের ডগা এবং কপালের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। অনুকে কাঠের পুতুলের মত মনে হচ্ছে এখন। সব কিছু স্থির—কোথাও কোন ঢেউ নেই এবং নতুন বাতিঘর সমুদ্রের অদূরবর্তী কোন দ্বীপে রয়েছে 'এমন এক ভাব।

অনুকে সুভর হাত ধরে সেই বাতি ঘরের দিকে যেতে হবে। সুতরাং অনু লজ্জায় হোক অথবা অক্ষমতার কথা ভেবে এবং এও হতে পারে জীবনে এক নতুন স্বাদ কে যেন বহন করে আনছে—বাবা এবং মার কথা খুব মনে আসছে এ সময়ে, সামনে সুভ দাঁড়িয়ে এখনও দেখছে ওকে। এবং সহসা মনে হল সামনে এক মাঠ আর সেখানে এক বৃদ্ধ চাষী ফসলের জন্য মুখ ভার করে বসে আছে, আবহমানকাল ধরে পুরুষেরা, চাষাবাদের জন্য উদ্বিগ্ন সুতরাং অনু মুখ তুলে সুভাষের দিকে তাকাতে পারল না।

সুভাষ বলল, অনু এবার আমি যাব।

অনু বলল, মা তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছেন। সে মুখ তুলল না। সে এখনও কার্পেটের ভিতর নোখ খুঁটছে।

—অনু। সুভ কাছে এসে ডাকল।

—বল।

—তুমি কি এতে দুঃখ পাচ্ছ।

অনুকে বড় বিষণ্ণ দেখাল এ সময়! সে বলল, না। মুখ তুললে মনে হল মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

সুভ বলল, তোমার অমত থাকলে আরও কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অনু বলল, সুভ বিবাহিত জীবনে আমরা সুখী হব! অনু বালিকা সুলভ ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

—অনু, এ কথা কেন!

—আমার সব ভাল মন্দ তোমার একদা একঘেয়েমি মনে হবে না!

সুভ বলল, এ সব কথা বলছ কেন?

—আজ একটা সুলতার চিঠি পেয়েছি।

—কি লিখেছে?

—লিখেছে সেই এক কথা—'প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মত'। আমার খুব ভয় করছে। ও লিখেছে, অভিনয় আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। সংসারের ছোট বড় অনেক ঝামেলা। সাংসারে বাস করে সব সময় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

—চিঠিটা একবার আমাকে দেখাবে।

—না থাক। ওটা দেখলে তুমি আরও কষ্ট পাবে।

—না কষ্ট পাব না অনু।

—তোমার পুরানো স্মৃতি মনে আসবে। আবার মনে হবে হয়তো ওর গলা আমার চেয়ে ভাল।

রেখে বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বাবা এত বড় সমুদ্র আমি অতিক্রম করতে পারব? এত দীর্ঘ রজ্জুতে আমি খেলা দেখাতে পারব তো! বস্তুত সে ভিতর থেকে খুব অসহায় বোধ করছিল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সেই সব পাখিরা হয়তো ফের আজ দুর্গের উপরে উড়ে যাচ্ছে। আবার এখন হয়তো সেই মাঠ পার হলে ফের কোন যুবক যুবতীর সন্ধান পাওয়া যাবে—ওরা গম্বুজের অন্য পাশের কোন পাখি দেখার ইচ্ছাতে পরস্পর হাত ধরে ঘাস মাড়িয়ে যাবার সময় বলবে, কাছে বোস, হাতের ওপর হাত রাখ।

এই উৎসবের দিনে অনুকে খুব ছোট ছোট ঘটনা সংসারের সংগোপনে বেদনার জন্ম দিচ্ছে। একবার ওর হাতে কি হয়েছিল, ব্যথায় সারারাত ঘুমোতে পারে নি, বাবা মা সারারাত শিয়রে বসেছিলেন, একবার সে মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল, বাবা তাকে খুঁজে পেলেন এক আপেলওয়ালার দোকানে। দোকানীকে তিনি অযথা হাজার টাকা বখসিস দিয়েছিলেন। একবার অনু বলেছিল, বাবা আমি তোমাকে কাশ্মীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব, বাবা তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তখন ডালহ্রদে বরফ পড়ছে, আপেলের বাগান শূন্য এবং ভ্রমণার্থীরা সব ঘরে ফিরে গেছে। বাবা বললেন, চল। তারপর বড় রাস্তার ধারে, অথবা পাহাড়ের উপর একা একা ভ্রমণ এবং সুভ সঙ্গে ছিল---সুভকে কোনদিন বাবা কোন দুঃখের কথা বলে নি। কোন অসম্মানের কথা বলেন নি—যদিও সুভ একবার ভয়ঙ্কর অসম্মানের কাজ করে ফেলেছিল, শুভ তুমি যখন বাবা হবে, আমার দুঃখটা তখন বুঝতে পারবে। লজ্জায় সুভ অনেকদিন এ-বাড়িমুখো হয় নি, বাবাই শেষে ওকে নিমন্ত্রণ করে চা খাইয়েছিলেন, এবং চা বাগানের কুলির সর্দারের এক হাস্যকর গল্প করে গোটা অসম্মানের বোঝাটাকে হাল্কা করে দিয়েছিলেন।

আজ বাবা শান্ত। বাবা এখন কি করছে অথবা বাবা কি

ভাবছেন, অনু ওর ঘরে বসে যেন ধরতে পারছে। বাবার ঘরে যাবার পথে আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে পুরুষ আত্মীয়রা গিজ গিজ করছে। ওর এত লজ্জা কোথায় ছিল এতদিন! নাচের আসরে, অভিনয়ে এবং কোন কোন উৎসবে বীণের ঝংকার ওর সব লজ্জা বিনয়ের আকারে ধরা দিত। কেবল আজ একটি পুরুষের মুখ ভাবতে পারছে এবং শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাঝে মাঝে কেমন ঝিম ঝিম করছে। যত ঝিম ঝিম করছে তত অনু লজ্জায় নিজের ভিতর নিজে গুটিয়ে আসছে।

ক্রিসমাসের দিনের মত বাড়ির সব ছোট ছোট ফুলের গাছগুলোতে আলোর ফুলকি আগুনের মত জ্বলছিল। বরকে আনতে কারা যেন সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। একটা মোটা রজনীগন্ধার মালা বরের গলার জন্য কার হাতে যেন সে ঝুলতে দেখেছিল। যারা বারান্দার দিকে যাচ্ছে তারা সবাই একবার করে এই ঘরের দিকে তাকাচ্ছে এবং যে মেয়েটি এই ঘর ছেড়ে চলে যাবে, অথবা নূতন এক জীবনের গন্ধ—লজ্জা এবং সংকোচ—কি একটা অশ্লীল ঘটনা ঘটবে দু এক রাতের ভিতর—যেন সবাই এ সবই ভাবছে অনুকে দেখে। অনু খাটের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে ছিল। ওকে যারা ঘিরে আছে তারা ওর সমবয়সী—এক বৃদ্ধা কেবল দরজার উপর চোখ টান টান করে কথা বলছে। দিদিমা সম্পর্কে এই বৃদ্ধা চোখের ইসারায় এমন সব অশ্লীল কথা বলছিল যে—অনু সহ্য করতে পারছে না। ঘটনাটা সবারই জানা এবং এই অশ্লীলতার জন্য প্রেম এবং ভালবাসা। সে সুভকে কোন ফাঁকা মাঠের ভিতর একাকী শুয়ে থাকতে দেখল সহসা এবং যেন এই বৃদ্ধা এখন সেই সুভর খোঁজে আছে। অথবা সব মেয়ে পুরুষেরা আজ হোক কাল হোক প্রেমে আবদ্ধ হবে, সব প্রেমই সংগোপনে পটু হাতে নগ্ন ছবি আঁকার মত। অনু সেই ছবি আঁকার জন্য কাল সুভর ফ্ল্যাটে চলে যাবে। বাবা দেখে শুনে সুভকে ভাল চাকরি করে

দিয়েছেন, বাবা ফ্ল্যাট ভাড়া করার আগে অন্তত আরও দশটা ফ্ল্যাট নিজে দেখে তারপর লেকের ধারে গাছ গাছালির ভিতর ছোট একটা ফ্ল্যাট আবিষ্কার করেছেন—এবং সেখানে সুভ অনিমা থাকবে। যেন বাবা নিজের হাতে মেয়ের সব পরবর্তী যৌন জীবনে কোন অসুবিধা না ঘটে—ছেলেমানুষ সুভ ঠিক বিবেচক পুরুষের মত হবেনা নিশ্চয়ই—নিজে তিনি ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়েছেন— সামনে গাছ গাছালী, জ্যোৎস্না উঠলে আরামদায়ক দুজনের পাশাপাশি শুয়ে থাকা—রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজবে। অনিমা নিজেও একদিন সেই ফ্ল্যাট সুভর সঙ্গে দেখে এসেছে। এইসব ছবি ভাবলে পুলকিত হওয়া চলে। ভিতরে ভিতরে যতই অসহায় বোধ হোক—যতই কষ্ট হোক—অনিমা সেই জ্যোৎস্নায় গাছ গাছালির অন্ধকারে প্রেমের জন্য অথবা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভব করছিল। বাবা সবই ঠিক করে দিয়েছেন অর্থাৎ বাবা শেষে ফের আর একবার যেন অনুকে কোলে করে নদী পার করে দিলেন।

ছেলেবেলাতে বাবা নদী পার করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাঠ অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বাবা তাকে নদীর পারে রেখে ফের নদী ভেঙে অন্য পারে উঠে যাচ্ছেন। ক্রমশ একটা ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। সে এই বিয়ে বাড়ির উৎসবের ভিতর, কোলাহলের ভিতর এবং নহবতের সুরের ভিতর যেন দেখল—অন্য পারে বাবার ছবিটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাবা এবং মা সুভ নামক এক মাঠে ওকে ফেলে রেখে পরস্পর হাত ধরে চলে যাচ্ছেন। ওঁরা যেন অনুকে বারবার ফিরে দেখছিলেন। অনু এই সময় খাটের উপর অসহায় শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠল।

বান্ধবীরা ওকে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিচ্ছিল তখন। ওরা বলল যাঃ শুভ দিনে বুঝি কাঁদতে আছে। ওরা কপালে চন্দনের টিপটা খুব বড় করে এঁকে দিল।

মুখ তুলতেই অনিমা সামনের বড় আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। নিজের রূপে অনিমা অবাক হয়ে যাচ্ছে। হাতে এবং গলায় মোটা রজনীগন্ধার মালা।. ওর আজ আবার বর্ষামঙ্গল নৃত্যনাট্যের কথা মনে হল। ওর মনে হল এভাবে ঈশ্বর তাকে যশস্বী করে রেখেছেন। প্রতিমার মত মুখ এবং বড় বড় চোখের পাতাগুলো এখন কাঁপছে। ভিতর থেকে এক ধরনের আবেগ উঠে আসছে—যা পুলকের এবং দুঃখেরও।

অনিমা নিজের রূপ সবার সামনে বেশীক্ষণ দেখতে পারল না। চোখ তুলেই, চোখ বন্ধ করে নিল। সে লজ্জায় এবং সংকোচে কোন হাসি ঠাট্টায় যোগ দিতে পারছিল না। হাতে মেত্তি ফুলের ছবি এঁকে দেওয়া হয়েছে। নোখে লাল রঙ এবং কোমল ত্বকে বেল ফুলের গন্ধ। লাল বেনারসী-শাড়ি, চন্দনের টিপ রজনী গন্ধার মালা এবং চুলে রাংতা জড়ানো অনিমার। ক্রিসমাসের দিনের মত আলোয় আলোয় ভরা কোন গাছের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। অনিমা জড়বৎ বসে থাকল, সদর দরজায় যখন বর এসেছে, শঙ্খ বাজবে, মা মাসীরা উলু দেবে--এক মনোরম ঘটনা ঘটবে সে সময় অনিমা যেন খাটের এক পাশে বসে সেই শুভ নামক মাঠের প্রত্যাশাতে সময় গুনছিল। বাড়িময় কোলাহল—শিশুদের কলরব শোনা যাচ্ছে, মাসীদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, পণ্ডিত মশাই বিয়ের শ্লোক উচ্চারণ করে কোন আধুনিক যুবককে মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করছেন—অমু এ-সবও এই খাটে বসে শুনতে পাচ্ছে। ওর জন্য এই উৎসব, এত কোলাহল এবং কলরব! অনিমা এ-সময় নিজের হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। ওর বুক গলা শুকিয়ে উঠছে ক্রমশ।

বান্ধবীরা বলল, এই করছিস কি! বলে ওর মুখটা দু হাঁটুর ভিতর থেকে তুলে ধরল। দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে দিলে সব

প্রসাধন উঠে যাবে। সুতরাং সবাই ওকে মাথা খাড়া করে বসে থাকতে বলল।

অনু এক সময় বলল, এই মাকে একটু ডেকে দিবি।

মা এলে অনু বলল, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মা বললেন, আর একটু সবুর কর মা। একটা ত দিন।

পণ্ডিত মশাই বললেন, আরে না না, কনে জল খেতে চায় জল দাও। জলের সঙ্গে কোন দোষ নেই। জল নারায়ণ।

উৎসব শেষে নিঃসঙ্গ মাঠের মত মনে হচ্ছে বাড়িটাকে এখন।

পথের উপর কিছু কুকুরের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ছাদে বাসন কোসনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—বাড়ির ঝি মনিমাসী এখনও কাজ করছে। সুভর মনে হল রাত বিশেষ আর বাকী নেই। দরজাটা ভেজান। ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। এবং বিয়ের কড়ি খেলা অথবা সাদা পাথরের জলের ওপর সোনার লুকুচুরি সবই হাসির উদ্রেক করছিল। বার বার অনু যেন সুভকে তাড়া করেছে, অথবা কড়ি খেলার সময় সুভ বার বার হেরে যাচ্ছিল। সুভ ফের ঘাড় তুলে দেখল অনু ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের উত্তেজনা এবং ক্ষুধার জন্য অনু বিয়ের পিঁড়িতে বড় কাতর—এবং মুখচন্দ্রিকার সময় মনে হচ্ছিল অনু সুভকে এই প্রথম দেখছে, সুভর দিকে সে কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। সুভর ঘুম আসছিল না। সুভ বিস্মিত হচ্ছিল—এই দিনে অনু ওর পাশে এমন নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে কি করে! অনুর এই প্রথম কোন পুরুষের সঙ্গে রাত যাপন—এই রাত্রি উত্তেজনাময় এবং গভীর রোমাঞ্চ বিদ্যমান অথচ অনু ঘুমোচ্ছে।

সুভ বসে অনুর কপাল থেকে কিছু চুল সরিয়ে দিল। চন্দনের ফোঁটা সব ঘামে মুছে গেছে, নিরীহ শিশুর মত অনিমা ওর পাশে ঘুমোচ্ছে। ঘরের আলো এবং দরজা বন্ধ করার পর ইতস্তত দুটো একটা কথা—অনু বলেছিল, অমন করে তাকাচ্ছিলে কেন?

সুভ বলেছিল, কৈ! কি আর তাকালাম।

অনু হাই তুলে বলল, কটা দিন যা গেছে!

সুভ বলল, কেন খুব সুখের গেছে। বিয়ে হবে…

—চেনা লোকের সঙ্গে বিয়েতে আর সুখ কি! চোখ টান করে অনিমা সুভকে ঠাট্টা করল।

—বাবাকে বললেই পারতে একটা অচেনা লোক ধরে আনতে।

—হয়েছে! মন্দ কথা বেশী বলতে নেই বলে অনু জলের গ্লাস টিপয় থেকে তুলে এনে সামনে রাখল।

সুভ বলল, তোমার ভাবে মনে হচ্ছে আমাদের যেন কত দিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে।

অনু হাই তুলল একটা। বলল, জল থাকল। আমাকে শুতে দাও। বলে, অনু নরম বড় বড় যৌতুকের বালিশ তোষকে গা এলিয়ে দিল। নূতন খাট সুতরাং অনিমা বানিসের গন্ধ পাচ্ছিল। সুভ বলল, পাশ ফিরে শোও। কেমন লাগছিল, বলে অনুকে টেনে পাশ ফেরার জন্য অনুরোধ করল।

—বড় উত্তেজনা হয়।

—ঠিক বলেছ। আমি একদিন খেলার মাঠে গেছিলাম। অনেক-দিন পর ফের যেন আর একটা খেলার মাঠে এসেছি। ভারী উত্তেজনা। রাতে আমার সহজে ঘুম আসতে চাইত না।

—কেন সুন্দরী বউ হাত ছাড়া হবার ভয় ছিল!

—তোমার হত!

—খুব।

—গা ছুঁয়ে বলছ!

সুভকে ঐ-সময় খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। বলল, সব কথায় গা ছুঁতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়।

—খুব নিয়ম মানা হচ্ছে দেখছি।

—নিলু মাসী বলেছে আজ কিছু করতে নেই। গা ছুঁতে নেই।

—যা ! সুভ অনুর একটা হাত নিজের হাতে তুলে এনেছিল।

অনু যেন ধীরে ধীরে সুভকে বুঝতে পারছে। সুতরাং অনু সুভর কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। বলল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে। অনু নিজের হাতটা ওর হাতে রাখল—শরীরে সেই উত্তেজনা ফের এসে জমা হচ্ছে। ভিতর থেকে ফের জ্বরের মত লাগছিল—অনু তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, জান জানালাগুলোতে সব ফাঁক আছে। সবাই উঁকি দিয়ে কিন্তু দেখছে। শেষে ভোর বেলায় সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে।

সুভ বলল, দরজাটা খুলে একবার দেখে নেব।

—তুমি নামলেই ওরা পালিয়ে যাবে, টের পাবে না।

—এগুলো ভারী অসভ্যতা !

—রাতের বাসর সবাই জাগে। তোমার মত তো সবার চেনা বউ থাকে না। অনেকের রাত না ঘুমিয়েই কাটে অথচ আলাপ হয় না, ঘনিষ্ঠ হতে সময় লেগে যায়।

সুভ বলল, ঘনিষ্ঠ না হলেও এ-সব ব্যাপারে আটকায় না। আমি আমার এক বন্ধুকে জানি—আরে সেই আমাদের পাগলা হরিশ··· —বেটা বিয়ের রাতেই, বউটা ভারি বদজাত, বউটা নাকি মরার মত পড়েছিল। যেন ঘুমিয়ে আছে।

—পাগল লোকের কথা দিয়ে কি সব কথা হয় ?

—এ সব ব্যাপারে পাগলেরও যা গোপালেরও তাই।

—কেষ্ট ঠাকুরের কথা বলছ ! অনিমা হাই তুলতে তুলতে কথাটা বলল, ওর চোখ জড়িয়ে আসছে। সে যেন ঘুমে আচ্ছন্ন এবং চোখ খুব লাল দেখাচ্ছে।

সুভ বলল, তোমার চোখ দেখলে কিন্তু মনে হয় বড্ড আবেশে ভুগছ।

—ভুগছি তো ভুগছি। তুমি ভাল ছেলের মত যদি না ঘুমোও

আমি নীচে গিয়ে শোব। প্রথম রাতে দুষ্টুমি করতে নেই। চেনা বউ হলেও করতে নেই।

সুভ বুঝল দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা আর এ-রাতে কলুষিত না করাই ভাল। সে বালিসে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এবং অল্প সময়ের ভিতরই মনে হল অনু ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ওর ঘুম আসছে না। সে অনুর পাশে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকল। অথবা এই সুখী অনু এবং যুবতী অনুর শরীর সুভকে উত্তেজনায় ভয়ঙ্কর অসাড় করে দিচ্ছে। সুভ সব ভুলে যাবার জন্য গম্বুজের উপর উল্লম্ফনের মত নিজেকে বিছানাতে লম্বা করে দিল।

বিবাহিত জীবনের পরবর্তী দিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছিল। দিন মাস বছর কেটে যাচ্ছে এবং দু বছর কেটে যাবার মুখে একদিন সুভ ভোর বেলায় দেখল—অনু একটু অগোছালো ভাবে ঘুমোচ্ছে। এটা শরৎকাল সুভ ভাবল। আকাশ নীল স্বচ্ছ—সুভ জানালা দিয়ে আকাশ দেখল। সামনে মাঠ এবং একটা বড় দেবদারু গাছ। গাছে কুয়াশার মত এখনও যেন কিছু অস্পষ্ট লেগে আছে। সুভ তার পড়ার টেবিলে বসে আছে। ভোর বেলায় সুভর নাটক সম্পর্কীত কোন গূঢ় প্রবন্ধের বই পড়ার অভ্যাস। সুভ খুব ভোরে ভোরে উঠে নিজের হাতেই দরজাটা খুলে দেয় তারপর বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে সামনের মাঠ দেখবার সময় অন্যমনস্ক ভাবে সেই দেবদারু গাছটার দিকে চেয়ে জীবন সম্পর্কে কিছু জটিল চিন্তা—যেমন অনু বিবাহিত জীবনের পরই সে তার যৌবন সম্পর্কে ক্রমশ বেশী সচেতন হয়ে পড়েছে। অনু আগের মতই নাচের জন্য এবং নাটকের জন্য পাগল। কাল অনু ফিরতে রাত করেছে। কোথাও ওর সংসদের নাটক অভিনয় হয়েছে। সুভ আজকাল আর অনুর জন্য রাত জেগে বসে থাকতে পারে না। অফিসের খাটুনী অথবা দায়িত্বের জন্য দিন দিন সুভ

এই নাচ গান অথবা নাটক সম্পর্কে উৎসাহশূন্য। তবু ভোর বেলায় পথ ধরে সব মানুষেরা যখন জীবন সংগ্রামের জন্য বের হয়ে যায়, গাছে যখন নগরীর পাখিরা আহার সন্ধানে রত তখন সুভ ধীরে ধীরে ইজিচেয়ার থেকে উঠে প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে টেবিলে বসে। তখন রামচরণ চা নিয়ে আসবে, একটি হাফ বয়েল ডিম নিয়ে আসবে এবং দুটো টোস্ট। অনু এই সময়টা প্রায় দিনই ঘুমে কাতর থাকে।

সুভ তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে উঠে মশারির নীচে ঢুকে ওর কাপড় টেনে দিল। কারণ রামচরণ এখন এই ঘরে ওর ঐ ভোরের জল খাবার নিয়ে আসবে—কিংবা রামচরণ যদি কোন কাজের জন্য ভোরের দিকে এসে থাকে তবে ছবিটা ভয়ঙ্কর এবং বিকৃত দেখাবে। সুভ আজ এই অনুর উপর প্রথম সামান্য কারণের জন্য বিরক্ত হয়ে উঠল। ওর ভাল লাগছিল না এবং দৈনিক পত্রিকা জানলা দিয়ে গড়িয়ে দিলে—সে অন্যান্য দিনের মত পত্রিকাটা উঠে গিয়ে আজ তুলে আনল না। সে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকল।

রামচরণ চা এবং টেবিলে টোস্ট রাখলে বলল, তোর দিদিমণি কখন ফিরেছিল রে!

—রাত অনেক বাবু তখন।

—ওর খাবার গরম করে রেখেছিলি তো!

—বসে বসে খাবার পাহারা দিয়েছি। এলে গরম করে দিয়েছি। রামচরণ চলে গেলে সুভ ফের মশারির পাশে চলে গেল। সুভ এই ঘরের অবস্থান দেখল। সে ভোরে উঠেই দরজা খুলে দিয়েছে। জানলা এবং দরজা দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ করছিল তখন। তখন সূর্য ওঠে নি, এবং মনে হল পিছনে অন্ধকার রয়েছে বলে সহসা ঘরে ঢুকে রামচরণ মশারির ভিতরটা দেখতে পাবে না। সে ভাবল, ঘুম থেকে উঠলে অনুকে কিছু দুঃখজনক কথা আজ সে বলবে। আর এত রাত করে ফেরাটাও খুব ভাল নয়, সুভ

সারাদিন পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে অনুকে দেখতে না পেলে কাতর হয়, অনুর জন্য বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকে, অনু ফিরলে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সুভ চায়ে মুখ দিয়েই চীৎকার করে উঠল, রামচরণ! রামচরণ!

রামচরণ ছুটে এসেছিল। বলল, বাবু।

-- তোদের আজকাল কিচ্ছু মনে থাকে না নারে?

– বাবু।

—চায়ে চিনি দিস নি! আর এত ঘন করেছিস কেন, আমি এত ঘন চা খাই কোন দিন?

— ফের করে দিচ্ছি!

—না করতে হবে না। আমি এ-চাই খাব। বলে চক চক করে সমস্ত চাটা সুভ গিলে ফেলল।

চীৎকারে অনুর ঘুম ভেঙে গেল। সে সুভর চীৎকার শুনে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে ভয়ে ভয়ে বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে বলল, চায়ে চিনি দিসনি রামচরণ! বলে সে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, কি ঘুম হয়েছে না! কিছুতেই ভাঙতে চায় না—কৈ চায়ের কাপটা কৈ!

সুভ বলল, চা খেয়ে ফেলেছি।

অনু বলল, কাল অনেক রাত হয়েছে ফিরতে।

—রামচরণ বলেছে।

—আরো বেশী রাত হত। নাটক ভেঙে গেল—ওরা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। আমি বললাম, না ফিরতে হবে। ওদের অনুরোধ রাখতে গেলে আরও রাত হত।

—বেশ করেছ।

—আমাকে খুব ভোরে ডেকে দিতে পার না?

সুভ মনে মনে হাসল। সুভ একদিন ভোরে ওকে ডেকে দিয়েছিল। সেদিন রোববার ছিল। ওদের শুতে দেরি হয়েছে।

সুভ অনুকে নিয়ে কিছু মার্কেটিঙ করেছিল। রাতে সুভ এবং অনু বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নায় মাঠ দেখেছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন দেবদারু গাছের ভিতর জ্যোৎস্নার আলো কোথাও কোথাও লুকোচুরি খেলছে।

সুভর একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা হচ্ছিল তখন। সে অনুকে পাশে এনে বলেছিল, খুব মিষ্টি লাগছে রাতটা। বলে সুভ অনুকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চাইলে—বলল, এই কি হচ্ছে।

সুভ বলেছিল, কিছু হচ্ছে না।

অনু বলেছিল, দুষ্টুমি হচ্ছে।

সুভ বলেছিল, কেন দুষ্টুমি ভাল লাগে না?

অনু বলল, সময়ে অসময়ে শুধু ঐ এক কাজ তোমার। ওতে শরীর খারাপ হয়।

—ছাই। কিচ্ছু হয় না। বিয়ের পর আমাদের শরীর ভাল হয়েছে।

---ভাল হয় নি। চর্বি হয়েছে বল। ওতে শরীরের কমনীয়তা নষ্ট হয়। তারপর অনু টেনে টেনে বলেছিল, আজকাল অনেকক্ষণ ধরে নাচতে পার্রি না।

—যা ঘুম তোমার! শরীরে চর্বি তো জমবেই।

তখন অনু বলেছিল, কাল তুমি আমাকে খুব ভোরে ডেকে দেবে।

সুভ কথামত খুব ভোরে ডেকে দিয়েছিল। এবং কি কারণে সুভর সেদিন অফিস বন্ধ। সেদিন ভোরে ওঠার জন্য অনুর মুখে ক্লান্ত এক ভাব। সারাদিন সে বিছানায় গড়িয়েছে এবং বোধহয় রিহার্সেলের ডেট ছিল অনুর, বিকেলে রিহার্সেল দিতে পর্যন্ত যেতে পারে নি। একদিন ভোরে ওঠার জন্য অনু সারাটাদিন ক্লান্তিতে ডুবেছিল।

অনু বলল, বিয়ের আগে আমি খুব ভোরে উঠতাম।

সুভ বলল, বিয়ের পরে সবারই ঘুম গাঢ় হয়।

অনু বলল, বিয়ের আগে খুব নিয়মের ভিতর থেকেছি।

সুভ বলল, এখন বিয়ে হয়ে গেছে—যত অনিয়মের ভিতর থাকছ। তাছাড়া আগে রাত জাগার কোন প্রশ্ন ছিল না। এখন তো তোমাকে নাটক বাদেও অনেক কারণে কোন কোন দিন রাত জাগতে হয়।

অনু দেখল রামচরণ রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নুয়ে সুভকে পিছন থেকে জোর করে চুমু খেল। তারপর বলল, ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে একবার ভাবলাম—বাবুর বিছানাতে উঁকি দিই, কিন্তু ভয়ে উঁকি দিলাম না।

—উঁকি দিলেও কিছু দেখতে পেতে না।

অনু কথাটা ধরতে না পেরে বলল, স্পষ্ট করে বল। অনু মুখ গম্ভীর করে ফেলল।

জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সামনের মাঠ এবং পার্কে দেবদারু অথবা অন্যান্য গাছের নীচে শিশিরের ফোঁটার টুপটাপ শব্দ। কোথাও একটা ইষ্টিকুটুম পাখির ডাক শোনা গেল যেন। এবং দূরে কোথাও ট্রেন হুইসেল দিয়ে দিয়ে নির্জন মাঠের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। আর বড় রাস্তায় থেকে থেকে ট্রামের শব্দ হচ্ছিল।

সুভ লক্ষ্য করল, অনু ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলছে না। অনু সামান্য কারণে আহত। সে খুলে বলল, তোমার শোওয়া ভারী বিশ্রী হয়ে গেছে।

অনু তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলল, যাঃ!

—আমাকে তোমায় ঘুমের ভিতর সব ঠিক করে দিতে হয়।

অনু আর কথা বলতে পারল না। সে ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। বিবাহিত জীবনের পর সে নানা দিক থেকে অশালীন

হয়ে উঠেছে অথবা যার জন্য যৌবনের এত গোপনীয়তা এবং যৌবন যেখানে ক্রিয়াশীল, আর স্থলপদ্মের মত যৌবন যেখানে সংগোপনে সব সময় শিশিরে ভিজতে চায় সেখানে প্রকাশ্যে যেন সব কিছুই বেশ্যা রমণীর মত। সুতরাং অনু চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকল। সে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিল না। সুভর কাছে সে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে।

দোতালার বারান্দা থেকে অনু সামনের ছোট লনে পড়শীর একটি ছোট শিশুকে হেঁটে যেতে দেখল। সঙ্গে পরিচারিকা! ওরা এই ভোরের রোদে পার্কে অথবা অন্য কোন উদ্যানে হেঁটে বেড়াবে। দরজা অতিক্রম করলে সুভর খাট, সুভ তখনও কি যেন ভাবছে। ভিতরে ভিতরে অনু সুভর কিছু কিছু ঘটনার জন্য কষ্ট পাচ্ছিল। সুভ প্রায়ই বিষণ্ণ থাকে। কখনও রোববার সুভকে অনু সঙ্গ দিলে, সুভ উজ্জ্বল হয় এবং আনন্দিত হয়—ছুটির দিন সুখের পায়রার মত বড় সহজে উড়ে যায়।

অনু ভাবল কোথাও যেন জীবন যাপনে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। সে গানের জন্য সময় দিচ্ছে না, ভোরে উঠে, আর গলার সুরের জন্য ভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করছে না—কেবল বাহবা এবং গৌরব পাবার লোভে সে অভিনয় করে চলেছে। অনু ভাবল, জীবন যাপনে ওকে মহৎ হওয়া প্রয়োজন। সংসারের সব কাজ, বিশেষ করে সুভর সুবিধা অসুবিধা—সুভকে সুখী সুভ এবং ফুল ফোটার মত সংসারকে সুন্দর করা—শুধু অভিনয় শেষে অথবা নাচের শেষে দর্শকদের উল্লাসই জীবনের নীলকণ্ঠ পাখি নয় এবং হতে পারে নীলকণ্ঠ পাখিরা উড়ছে—অনু মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে কিন্তু ঠিক কোথায় কখন গেলে আকাশের সেই সব নীলকণ্ঠ পাখিকে ধরঁতে পারবে—সে যেন ঠিক পথ অনুসরণ করে যেতে পারছে না এবং ধরতে পারছে না। সুভ আজকাল প্রায়ই জনক হতে চাইছে, অনুকে জননী করার স্পৃহাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভন দেখাচ্ছে সুভ।

সুভ বলেছিল, এ ভাবে ভাল লাগছে না। অন্যান্য সব কৌশলের কথাও সুভ অণিমাকে বলেছে।

অনু সেই সব কৌশলের কথা বিশ্বাস করতে পারে নি। সে বলেছিল, সেণ্ট পারসেণ্ট গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারে নি।

—সুতরাং জীবনটা এভাবে আমাদের কেটে যাবে। সুভ ওদের যৌনজীবন সম্পর্কে কথা বলছিল, এভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না।

—অধিকতর সুখের জন্য কিছু আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়। অনু দৃঢ়ভাবে বলেছিল। সন্তান হলে আমরা সহজে বুড়ো হয়ে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা আমরা আবদ্ধ হয়ে যাব। পাখির মত ফুরফুর করে সারাদিন উড়তে পারব না। যৌবন উপভোগের জন্য। সন্তান-সম্ভবা নারীদের কথা সে মনে করতে পারল—বিশ্রী রকমের যেন ঘটনাটা। সেই ওক তোলার কথা মনে এলে অনু গুটিয়ে যায়। ভয়াবহ এক দৃশ্য এবং পরিবারে সব সময় এক বিষণ্নতা ঝুলে থাকে। অনু নিজের চেহারাটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে একবার গর্ভবতী জননীর দৃশ্য মুখে আঁকতে চাইল—চোখ বসে গেছে, হাত পা শীর্ণ এবং পেট ভয়ঙ্করভাবে উঁচু দেখাচ্ছে—তারপর দিনগত পাপক্ষয়ের মত জীবনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে। একটা অদ্ভুত জীব এসে ওকে সারাদিনের জন্যে সারা মাসের জন্য এবং সারা জীবনের জন্য বেষ্টন করে থাকবে। যত সেই শিশু বড় হবে—সে তত বুড়ো বলে প্রমাণিত হবে।

অনু বারান্দায় মুখ গুঁজে বসে থাকল। শরৎকালের নানা-রকমের ছবি এখন দিকে দিকে। এখন আকাশ প্রায়ই পরিচ্ছন্ন যাচ্ছে। লনে অপরাজিতা ফুল ফুটছে। এবং শেফালী গাছে সাদা সাদা মুক্তোর মত ফুলের পরিচ্ছন্ন দাগ। লনে অথবা অদূরে এক দেবদারু গাছ, গাছে নানা রকমের পাখি—পাখিরা এই সকালের পরিচ্ছন্ন রোদের ভিতর উড়ে যেতে থাকল।

সুভ ডাকল, অনু।

অনু জবাব দিল না।

সুভ বুঝল অনু অভিমান করে বারান্দায় বসে আছে। সুভ নিজের টেবিল থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। সুভর দিকে অনু তাকাল না। অনু আগের মতই বসে থাকল।

অপ্রশস্ত বারান্দা। সামনের ছোট পথ অতিক্রম করলে পার্ক, অনু পার্কের দিকে চোখ তুলে কি যেন দেখছে এখন।

সুভ ওর পাশে বসে বলল, আজ অফিস যাব না ভাবছি।

অনু সুচতুর বালিকার মত গলা করতে চাইল, সব জানা আছে। অথবা এও বলার ইচ্ছা অফিসই সুভর সব। সারাদিন একা নিঃসঙ্গ এক জীবন। অফিস ফেরত সুভ ক্লান্ত। সুতরাং কোন নাটকের অভিনয়, কোন নৃত্য-নাট্যে যোগদান, কিছু হৈ হুল্লোড়ের জন্য অনু বিকেলের দিকে প্রায়ই বের হয়ে যায়। এই হৈ হুল্লোড়ই জীবনের জন্য প্রাপ্য সুদ। অনু সুভর জন্য সারাদিন একা একা থেকে বিকেলে আর প্রতীক্ষা করতে পারে না। যেন কোথাও এক বড় জীবন অনুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

সুভ বলল, আজ তোমার নাটক আছে রেডিওতে।

অনু উঠে দাঁড়াল।—মনে আছে।

—ভেবেছি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসব।

—এই যে বললে অফিসে যাচ্ছ না।

—কিছু জরুরী কাজ আছে। কাজগুলো সেরেই চলে আসব।

অনু হেঁটে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

—কৈ কিছু বললে না। সুভ পিছনে পিছনে ঘরের ভিতর ঢুকে কথাটা বলল।

—কি বলব? অনু ঘাড় কাৎ করে তাকাল!

সুভ ভেবে পেল না অনুকে এখন কি বলা দরকার। সে অনুর হাত নিজের হাতের উপর রাখতে চাইল। অনু তখন ব্রাশে পেষ্ট লাগাচ্ছে। অনুর মুখে বাসি ঘুমের দাগ। সাত-সকালে অনুকে

অপমান করা যেন উচিত হয় নি। সে সুতরাং বলল, আজ একসঙ্গে বসে তোমার নাটক শুনব।

—আমার ভাগ্য ভাল। অনু পাশ কাটিয়ে বাইরে যেতে চাইল।

—আজ তোমার রিহার্সেল নেই তো।

—আছে। বলে দেব—শরীর ভাল নেই, যেতে পারছি না।

—বেশ হবে না!

অনু এবার কোন উত্তর করল না। দরজার বাইরে ছোট করিডোর এবং পরে বাথরুম। সে বাথরুমের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল এবং ভিতরের অন্যান্য সব শব্দকে নিঃশেষ করে দেবার স্পৃহাতে সে কলের জল ছেড়ে দিল। বেশ জোরে জল পড়ছিল বলে অন্য কোন শব্দ সে ভিতর থেকে শুনতে পেল না। সে করিডোরে অনুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল—অনুকে কোন কারণে ব্যথা দিলে ভিতরে ভিতরে যে নিজেই খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। সে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে। সুতরাং যতক্ষণ অনু হেসে কথা না বলছে, যতক্ষণ অনু স্বাভাবিক না হচ্ছে ঠিক ততক্ষণ সে অনুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুর ঘুর করবে। অনুকে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে, অফিসের বেয়ারাদের গল্প করে অথবা কোন পরিচিত বন্ধুর সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করে এই দুঃখজনক পরিবেশ হাল্কা করতে চাইবে।

অনু চোখে মুখে জল দেওয়ায় মুখ খুব সতেজ দেখাচ্ছে। কিছু জল ওর পায়ে লেগে আছে। ও আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল—ওই যে ভোরে উঠে চীৎকার করলে—রাম কি ভাবে বলত?

—আমার মাথা ঠিক থাকে না অনু। তোমাকে বাড়িতে এসে না দেখলে মাথা আমার আরও খারাপ হয়ে যায়। সুভাষ বিষণ্ন মুখে কথাগুলো বলল। এখন দেখলে মনে হবে না—এই সুভাষ অফিসের বড় বাবু, অথবা মনে হবে না, কিছুক্ষণ আগেও এই সুভাষ ঢক ঢক করে সব গরম চা গিলে ফেলতে পারে। অনু বলল, রামচরণ বাজারে যাক, বলে অনু তোরঙ্গ খুলে রামচরণকে টাকা দিল এবং বাজারের

থলে হাতে করে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল অনিমা। তারপর সুভাষকে লক্ষ্য করে বলল, বড় চিংড়ি মাছ নিয়ে আসুক এক কেজি। আজ আবার অসীম আসতে পারে? বিকেলে চিংড়ি মাছের কাটলেট করব।

—অসীম! সুভাষ অপরিচিত গলায় কথাটা বলল।

—অসীমকে চেননা? নাটকে যে অমিতাভর পাঠ করল।

—সহসা! সুভাষ ভারী গলায় কথাটা বলল।

—সে তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছে।

—আমার সঙ্গে! সুভাষ এবার বিব্রত বোধ করতে থাকল।

—ও ইউনিভার্সিটিতে তোমার জুনিয়র ছিল। নাটক সম্পর্কে তোমার কিছু কিছু প্রবন্ধ সে পড়েছে।

—তা হলে আমারও দু একজন অনুরাগী আছে।

—অনেক আছে, তুমি খোঁজ রাখ না বলে। অনেকে আমাকে প্রায়ই দোষারোপ করছে, বলছে, লোকটাকে বিয়ে করে তুই ওর ট্যালেণ্ট নষ্ট করে দিলি।

সুভাষ বলল, মানে?

—আজকাল তুমি আর নব নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে সিরিয়স প্রবন্ধ লিখছ না।

সুভাষ ভাবল অন্য কথা! আজকাল নাটক সম্পর্কে কিছু জটিল চিন্তা ওকে মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ করে তুলছে। অনু নাটকের রিহার্সেলে চলে গেলে, প্রথম প্রথম সে সঙ্গে যেত। কিন্তু সেখানে ওর সম্পর্কে সবাই কেমন উদাসীন। এবং অপরিচিত ব্যক্তির মত সর্বদা বসে থাকতে হয়। ওর ভাল লাগে না। সুতরাং অফিস ফেরত অনুকে না দেখলে এক ভয়ঙ্কর দুঃখ ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে—যা অপমানকর, যার জন্য সে মনের সলতে আর জ্বালাতে পারছে না। সুভাষ বলল, তেমন সময় পাই কই এখন।

রামচরণ বাজারে চলে গেলে অনু নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সুভাষ

পেছনে পেছনে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। বাইরের রোদ ভিতরে এসে ঢুকছে। ঘরটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনুর মুখে এখন ফের সেই লাবণ্য, অনু নিজের মুখে সামান্য প্রসাধন সেরে নিজেই এক কাপ চা করে নিল, এক কাপ চা সুভাষকে দিল— তারপর দুজনে পাশাপাশি বসে চা খাবার সময় মনে হল সহরের কোথাও এখন আর নির্জনতা নেই, সর্বত্র এক কোলাহল—সকলে জীবনের গাঢ় অন্ধকার মুছে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কারণ এই অসীম এক তরুণ যুবক—বয়সে অনুর ছোট হবে, অনুকে দিদি বলে ডাকে—ওর জন্য এক ধরনের স্নেহ গড়ে তুলেছিল অনিমা। যখন অমিতাভর অভিনয় করছিল এবং যখন ভালবাসার কথা বলছিল পরস্পর তখন মনে হয় না প্রেম কোথাও অভিনয়ের মত —বরং এই ভোরে সুভাষের ঘরে যতটুকু ঘটনা ঘটে গেল— সবটাই যেন অভিনয়ের মত—ভোরের অভিনয়। আর সুভাষ তাড়াতাড়ি জানালার সব পর্দা ফেলে দিয়ে অনুর কাছে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে অনুকে জড়িয়ে ধরতেই—অনু কেমন এক আর্ত চীৎকারে বলে উঠল, এই কি হচ্ছে, এক্ষুনি রাম বাজার থেকে ফিরে এ-সব দেখতে পাবে। তারপর থিতিয়ে থিতিয়ে বলল, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না সুভ।

সুভাষের সমস্ত শরীরে এক তিক্ত বিস্বাদ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুভাষ মরিয়া হয়ে বলল, লক্ষ্মী সোনা।

—লক্ষ্মী সোনা, অনু সুভাষের কথা পুনরাবৃত্তি করল।

সুভাষ বলল, ওর বাজার করে আসতে দেরি হবে।

—দেরি হবে না, এক্ষুনি চলে আসবে।

—এলে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যাবে।

—না সুভ, আমার এ-ভাবে ভাল লাগে না। বলে অনু রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাল নিয়ে দরজার মুখে বসে কাঁকর বাছতে থাকল।

এমন একটি জায়গায় অনু বসে আছে—যেখানে সব খোলা মেলা, যেখানে রোদ এবং পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাটের মানুষেরা উঁকি দিলে সহজেই দেখতে পাবে—বিরক্তিতে সুভাষ উঠে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। সে আর অনুর পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করল না। বড় নির্দয় এবং নিষ্ঠুর মনে হল অনিমাকে। ঠিক এইসব কারণে অনিমাকে মাঝে মাঝে খুব দূরের মনে হয়, মনে হয় অনুর এসব ইচ্ছা আশ্বিনের বৃষ্টির মত—ঠিক ধরা ছোঁয়া যায় না, ঠিক কখন অনু এসব সুখে মত্ত হবে, কখন অনু কাছে এসে ফিস ফিস করে নিজের ইচ্ছাটুকু খুলে ধরবে আকারে ইঙ্গিতে ঠিক বোঝা যায় না। এই ভিন্ন ফ্ল্যাটে ভিন্ন সব কিছু, সব কিছু অদৃশ্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত—কোন কাক পক্ষীতে টের পাবার জো নেই অথচ অনু সাবধানী ডাক্তারের মত সময় এবং বই পড়ে ঋতুর সব দিনক্ষণ বাঁচিয়ে কাছে আসবে—কত রকমারী সব যন্ত্র আমদানি করেছে সুভাষ অনুর জন্য, কত রকমারী সব সহবাসের নমুনা—সন্তান সম্ভাবনার ভয়ে অনু যেন দীর্ঘদিন ধরে এই সব করে যাবে, দীর্ঘদিন ধরে অনু নিজেকে যুবতী রাখার জন্য প্রাণপণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে।

সুভাষ একটা হাই তুলল। সামনের লনে শেফালী গাছ, গাছে সেই মুক্তোর মত শেফালী ফুল···এসময় ওর গ্রাম মাঠের কথা মনে হল। কোন কৃষকের গোলা ঘরের কথা মনে হল। মোরগ ডাকছে অথবা কোন চাষী মানুষ গাভী নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে—এবং সেই সব মাঠ পার হলেই যেন এই অনু, অনু কোন নদী তীরে কাশ বনের ভিতর কেবল সুভাষকে নিয়ে আজীবন লুকোচুরি খেলতে চাইছে। কিছুতেই অনু জননী হতে চাইছে না। অনু, যুবতী অনু, অনু ভালবাসার অনু, অনু এমন এক অনু চিরদিন যার সৌরভ সৌন্দর্যের, গানের, এবং নাটকের। ফুলের মত অনু সকলকে ভালবাসা দিতে চায় অথচ নিজে ঝরে যাবে না, নিজে মাথা উঁচু করে

সকলের ভিতর বেঁচে থাকবে। সুভাষ ভিতরে ভিতরে এই প্রথম যেন অনু সম্পর্কে ক্লান্ত বোধ করল। এই প্রথম অনুর সঙ্গে ওর কথা বলার স্পৃহা অথবা প্রেম ·ভালবাসার স্পৃহা মুহূর্তের জন্য উবে গেল।

কিছু জরুরী কাজ—সে তার চেম্বারে ঢুকে বুঝল, কাজ শুধু জরুরী নয়—কাজের কিছু কিছু উপাদান অত্যন্ত গোপনীয় এবং টেবিলের উপর নোট দেখেই বুঝল মালিক খোদ আজ সাক্ষাৎপ্রার্থী। সুভাষ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। তারপর ভাল করে শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করে দেখল। শরীরের কোথাও আলস্য অথবা বুদ্ধু গোছের ভাব লেগে নেই। সুভাষ এখন চালাক চতুর এক যুবক। সংসারের যাবতীয় কাজ সুভাষ অনায়াসে করে ফেলতে পারে—সুতরাং দুঃসময়ে, মালিক যেন সুভাষেরই শরণাপন্ন।

সুভাষ সেলস্ ডিপার্টমেণ্ট অতিক্রমে করে গটগট করে চলে গেল। সে কোন দিকে লক্ষ্য করল না। সে সহজ ভাবে বি, এস, মাগুদি এই নামের ঘরটার পাশে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল, তারপর ভিতরে ঢুকে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছিলেন?

—শোন চ্যাটার্জী, বলে তিনি বেল টিপতেই বয় এসে হাজির হল। তিনি বয়কে বললেন, মিস্টার সুখদেবকে বোলাও।

এই ঘরে ওরা তিনজন। সুখদেও এবং মাগুদি আর সুভাষ নিজে। মাগুদি একটা বড় পান মুখে পুরে বলল, একটা কাজ করতে হবে চ্যাটার্জী!

—কি কাজ স্যার?

—আমাদের নতুন শেয়ার ফ্লোট করতে হবে।

—এই-ত সেদিন ফিক্‌টিসাস শেয়ার ফ্লোট করা হল।

—এবার ফিক্‌টিসাস নয়।

—কিন্তু স্যার···

—ও আর কিন্তু নয়।

—কোম্পানির জমি আমার। মিষ্টার চৌধুরীদের ঠিকা টেনেন্সি। তোমার কোম্পানি আবার ওদের সাবটেনেন্ট। চৌধুরীদের ঘর ভাড়া নিয়ে ও রাইট তোমাদের হয়েছে।

সুভাষ একটা ঢোক গিলল।

—কোম্পানির কাছে আমার পাওনা চার লাখের মত। টাকাটা আমি এখন ফেরত চাই।

—কিন্তু কোম্পানির এত টাকা ফেরত দিতে গেলে—

—কোন অসুবিধা হবে না। টাকাটা ফেরত চাইছি না মিস্টার কেবল কাগজ কলমে সব দেখানো হবে!

—আমার মাথায় আসছে না স্যার।

—তুমি শেয়ার ফ্লোট কর। ভিন্ন ভিন্ন নামে শেয়ার সব কিনে ফেলতে হবে। নামগুলো তোমার অথবা আমার পরিচিত হবে। আমার জমি কোম্পানিকে তের লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেব। সতের লাখ টাকার শেয়ার, শেয়ার ট্রেন্‌সফার এর জায়গায় সই করিয়ে নিতে হবে। এবং সেই টাকায় রিপেমেণ্ট অফ লোন দেখাবে আমার। এক ঢিলে দুই পাখি—জমি কোম্পানির রয়ে গেল, টাকা ফেরত দিতে হল না। আমার কিছু ব্ল্যাক মানী হোয়াইট হয়ে গেল। কি বুঝলে চ্যাটার্জী, সব বুঝতে পেরেছ! মাগুদি সাহেব এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন।

সুভাষ বলল, ছ্যান অল পেপার ট্রেনজাকসান্স।

মাগুদি সাহেব জোরে হেসে উঠলেন।—এতক্ষণে বুঝতে পারলে! তোমার কোম্পানির ক্যাপিটল ভি বেড়ে গেল।

সুখদেব বলল, মিঃ চ্যাটার্জি যে জমিতে আমরা সাব-টেনেণ্ট ছিলাম—সে জমি এখন আমাদের হয়ে যাবে। আমরা গভর্মেণ্ট

থেকে এখন বড় লোন নিতে পারব। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বড় রকমের ক্যাস-ক্রেডিট টার্মে কাজ করা যাবে।

সুভাষ মুখ ভার করে বলল, কিছু আইনগত সমস্যা থেকে যাচ্ছে না?

মাগুদি সাহেব বললেন, তা তোমরা এখন সে-সব দেখবে। কারণ কোম্পানির দায় দায়িত্ব সব তোমাদের, আমি শুধু রিটার্ণ দেখব।

সুভাষ বলল, আচ্ছা দেখছি। বলে, উঠে চলে গেল।

পাশেই ডেসপাচ সেকসান এবং বিল সেকসান। টাইপের শব্দ ভেসে আসছিল। ওর ঘর কাচে মোড়া। সে বাইরে থেকে দেখল কেউ যেন ভিতরে বসে আছে। ওর ভাল লাগছিল না, কোম্পানি সংক্রান্ত আইন নিয়ে ওকে দিন রাত পড়ে থাকতে হবে এবং এই সব আইনের ফাঁকে মাগুদি সাহেবের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। এবং এ-সময়ই ওর মনে হল মুখে সহসা এক ধরণের বিস্বাদ, সে নিজের ঘরে ঢুকে যাবার আগে ফের মাগুদি সাহেবের চেম্বারের দিকে এগোতে থাকল।

সে দরজার ভিতর ঢুকে দেখল সুখদেও তখনও বসে বসে পান চিবুচ্ছে। সে ঢুকে বলল, আচ্ছা স্যার জমিটাতো আপনার। ওটা কোম্পানিকে বিক্রি করে দিচ্ছেন—

—আরে বাবা ঠিকা-টেনেনসিতে জমিটা চৌধুরীদের হাতে। সরকার যা সব আইন করছে তাতে আজ হোক কাল হোক জমি সব চৌধুরীদের হয়ে যাবে। ওরা সেখানে কনস্ট্রাকসান করেছে এবং তার ভাড়া তোমার কোম্পানী মাসে মাসে গোনছে। কোম্পানি জমির মালিক হলে চৌধুরীকে আমরা বলব কনস্ট্রাকসান মেরামত করে দাও। বিরাট ফর্দ করবে এবং সে না করলে আমরা রেণ্ট কণ্ট্রোলে কেস করব। বুঝলে চ্যাটার্জি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। পরে দেখ কনস্ট্রাকসানটাও আমাদের হয়ে যাবে।

সুভাষ বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাণ্ডদি সাহেবের সব কথাগুলো নোট করে নিল। বলল, জমিটা তবে আজ হোক কাল হোক আপনার হাতছাড়া হয়ে যেত।

—জরুর। সরকার এখন আর একজনের কাছে বেশি জমি দেখতে নারাজ। বিশেষ করে এই সব শহরের দামী জমি। এবার জমিটা কোম্পানির হয়ে গেল।

সুভাষ মনে মনে বলল, জমিটা অন্য ভাবে আপনার হয়ে গেল।…কোম্পানির মালিকের হয়ে গেল। সে তারপর দেখল ঠিক মাণ্ডদি সাহেবের মাথার ওপরে দেয়ালে গান্ধীর বড় ফটো এবং জৈনদের কোন ধর্মগুরুর ছবি। মাণ্ডদি সাহেব এসব কথার পরও ক্লান্ত হচ্ছিলেন না যেন। তিনি হেসে হেসে মিষ্টি মিষ্টি করে বলছিলেন, বুঝলে চ্যাটার্জি, দিস্ ইজ বিজিনেস্।

সুভাষ ফিরে আসার সময় কথাটার পুনরাবৃত্তি করল মনে মনে। দুঃখজনক শোকের মত এই সব কথাগুলি ভিতর থেকে বার বার উঠে আসছে। আজ সকাল সকাল ফিরতে হবে—মাণ্ডদিকে কথাটা বললে হত, কিন্তু এখন যেন কিছুই ভাল লাগছে না—ওর বাড়ি যেতে ইচ্ছা হল না, সে বরং নিজের চেম্বারে ঢুকে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে বসে বলল, কিছু বলবেন!

—আপনাদের একটা এজেন্সির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাই নি।

—এখনও এলট হয় নি, হলেই পাবেন।

—আপনার হাত আছে শুনেছি।

সুভাষ বিরক্ত গলায় বলল, আমার হাত আছে, মাথাও আছে।

—আপনি রাগ করছেন স্যার।

—আপনার আর কোন কাজ আছে?

—আজ্ঞে না।

সুভাষ ফাইল নিয়ে বসে পড়ল। ফাইলের ভিতর মুখ গুঁজে

রাখল, যেন অন্য কোন চিন্তা এখন করতে নেই, যেন এখন শুধু এক চিন্তা—অফিস সংক্রান্ত চিন্তা। সে মুখ তুলে সেই অপরিচিত লোককে ফের দেখল, লোকটি উঠে যাচ্ছে না এখনও। বেহায়ার মত বসে রয়েছে। লোকটির এখন কি ইচ্ছা অথবা কি বলতে চায়, কি বলা দরকার—সুভাষ চীৎকার করে বলতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সুভাষ পাগলের মত বলে ফেলল, আমি আপনার আর কি উপকারে আসতে পারি ?

—আপনি আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন।

সুভাষ বলল, যান হবে। সে যেন লোকটির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই কথাটা বলল।

তারপর সুভাষ কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, কতক্ষণ ইমপোর্ট সংক্রান্ত কাগজপত্র বার বার পড়েও একটা লাইন উদ্ধার করতে পারেনি মনে করতে পারছে না—তখন অনুর ফোন, অনু বলছে, আমি বাজারে যাব, কিছু ফুল আনতে হবে! তুমি কখন আসছ, তুমি এলে একসঙ্গে যাব।

—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি অনু। বলে সুভাষ হন হন করে মাশুদির ঘরে ঢুকে বলল, স্যার আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। বিশেষ কাজ আছে বাড়িতে।

—কেন কোথাও ম্যাডামের সঙ্গে বের হতে হবে ?

সুভাষ এবার হাসল। তারপর সুভাষ ঠিক আগের মত হন হন করে বের হতেই দেখল দরজার মুখে দারোয়ানের সঙ্গে সেই অপরিচিত লোকটি গল্প করছে। এবং জোরে জোরে হাসছিল।

গাড়ি থেকে নেমে ঠিক সিঁড়ির মুখে সুভাষ অনুর হাসির শব্দ শুনতে পেল। অনু খুব জোরে জোরে হাসছে। সেই অপরিচিত মানুষটির মত যেন হাসছে। সুভাষ খুব বিরক্ত বোধ করল। সে সিঁড়ি ধরে উঠে ছোট করিডোর ধরে উপরে উঠে দেখল অনু কোনে কার সঙ্গে কথা বলছে এবং হাসছে। সুভাষ এইসব ব্যক্তিগত প্রশ্নে

কোন কৌতূহল দেখাল না। সুভাষ নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক ছাড়ল তারপর রামকে ডেকে বলল, একটু জল দে। জল এলে ঠিক ভোরের মত সব জলটুকু চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। অনুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, অনু এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। তারপর নিজেই হাসির ব্যাপারটা খুলে বলল, মানুষটা বড্ড হাসাতে পারে।

সুভাষ বলল, তুমি এখনও রেডি হওনি। সুভাষ মানুষটি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে চাইল।

—এই হব।

—ভাবছি কোন শোতে যাব। ফেরবার পথে ফুল কিনে আনব।

—কি করে শোতে যাবে? অনিমা প্রশ্ন করে জানতে চাইল।

—কেন গাড়ি করে।

—তুমি সব তাতেই বাঁকা বাঁকা উত্তর দাও।

—তবে কিসে যাব বল?

—তোমার আজকাল কি হয়েছে না—সব তাতেই মেজাজ নিয়ে কথা বল।

—অফিস করলে তুমিও করতে। অফিসের অনেক ফল্স্ স্টেট্‌মেণ্ট সই করতে গেলে তোমারও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকত।

অনু কোন কথা বলল না। ঘরে ঢুকে প্রসাধন করল। নানা রকমের প্রসাধনের কৌটো। নানা রকমের গন্ধদ্রব্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের পাথরের মালা। সব সারি সারি রকমারী জুতো। আর সামনে বড় আয়না; আয়নার বড় ডালাটা খুললে হরেক রকমের দামী সিল্ক। সিল্কের ভিতর অনু বুঝতে পারে শরীরের সুন্দর গঠন ভোরের শেফালী ফুলের মত—খুব তাজা এবং তীক্ষ্ণ, যেন ছুঁয়ে দিলেই রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

চুলে স্যাম্পু বলে খোঁপাটা অনুর প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল, সে পেছন থেকে খোঁপাটা ঠেলে উপরে তুলে দিল। বড় বড় ক্লিপ এঁটে ভাল করে বার বার এই সতেজ এবং সুন্দর মুখ দেখে হাল্কা লিপস্টিক

মেখে মনে মনে নিজের প্রতি নিজের এই দামী ভালবাসার জন্য খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। ওর আজ আর মনে পড়ছে না—কবে থেকে সে এই সুন্দর মুখ দেখে দেখে নিজের প্রতিবিম্বকে একদা ভালবেসে ফেলেছে। যেন এই মুখ বড় দামী এবং অহঙ্কারের জৌলুস শরীরে সব সময় ঝুলে থাকে—সে ফুলের মত সারা মাস, বৎসর এবং শত বর্ষের জন্য ফুটে থাকতে চায়—তার এই শরীরের সব পুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল এবং মাখনের মত রঙ—সুভাষ অন্য ঘর থেকে সব লক্ষ্য করে দেখছিল—সামান্য অসভ্যতা জাগছে ভিতরে ভিতরে। সে তাড়াতাড়ি রামকে দূরের কোন দোকানে ভাল সিগারেট আনতে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল এবং রাম চলে গেলে সেই আয়নায় অনিমা আর একটা মুখ ভেসে উঠতে দেখেই বলল, চল, আমার হয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে দুজনেই ফুল কিনতে বের হল। অফিসের গাড়ির জন্য সুভাষ ফোন করেছিল, মাশুদি সাহেব বলেছিলেন, একটাও গ্যারেজে নেই, তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর মিঃ চ্যাটার্জী—গাড়ি পাঠাচ্ছি। সুতরাং ফুল কেনার জন্য বিকেল হয়ে গেল। অনুর শরীরে তেমনি নরম সিল্ক এবং খোঁপা তেমনি উঁচু করে বাঁধা। প্রসাধন উগ্র নয়, সামান্য পাউডার, সামান্য লিপষ্টিক এবং আজকাল এক ধরনের ভেজলিন অনু ব্যবহার করছে যার জন্য মুখটা সব সময় নীলাভ এবং তেল-তেলে মনে হয়। ওর সরু লম্বা আঙুলে দামী আংটি এবং মনিবন্ধের ঘড়ি চক চক করছিল। হাত মসৃণ বলে, ত্বকে কোমল গন্ধ বলে মকরমুখী বালা খুব উজ্জ্বল এবং অসামান্য সুন্দরী যুবতীর মত অনু চুপচাপ বসে দুটো একটা কথা ইতস্ততঃ বলছিল। কিছুক্ষণের আগের চেহারা অনুর নেই। অনু এখন স্নিগ্ধ এক বালিকা যেন, এই গাড়িতে বসে অনু সহরের বাস ট্রাম এবং বড় বড় চিত্র-তারকার ছবি দেখল, এইসব চিত্র-তারকাদের অনেককেই সে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে—পোস্টারে বড় বড় মুখ

এবং যৌবনের ছবি অন্নুকে এই মুহূর্তে প্রাচীন দুর্গের মত অথর্ব করে দিচ্ছে—হায় জীবনে তার কিছুই হল না, হায় সব দেশে দেশে, মাঠে মাঠে এবং সব জনপদে তার ছবি কবে ঝুলবে, হায় এই শরীর আত্মার চেয়েও দামী—এবং সকল মানুষেরা এই শরীরের জন্য ওর সুন্দর মুখের জন্য কবে জলপানের মত এক চিত্রকরের ছবি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পোস্টারের নীচে দাঁড়িয়ে পড়বে—অন্নু এই সব ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অন্নু বলল, কতদিন আমরা এই মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি না।

সুভাষ বলল, অনেকদিন, চল না আজই যাই। গাড়ি ছেড়ে দি।

—অসীম যদি এসে আমাদের জন্যে বসে থাকে।

—অসীমের জন্য আজকাল বেশী চিন্তা করছ।

—খুব ভাল ছেলে। ওর মামা খুব সম্ভবত বই করবেন। অসীম এবং আমি ছবির জুটি হতে পারি।

—তাহলে বল খাইয়ে দাইয়ে ওকে হাতে রাখছ।

—প্রায় তাই বলতে পার।

—তবে তো খুব শীগগীর পৌঁছানো দরকার। বিদ্রূপ করে কথাটা বলতে গিয়ে সুভাষকে এমন তোতলামিতে পেয়ে বসল যে সে সহসা চুপ করে গেল।

অনিমা বলল, একবার নামতে দাও। দেখবে, অভিনয় কাকে বলে!

সুভাষ এবার খুব আস্তে আস্তে বলল, ক্রমশ কি তুমি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ছ না!

—সুভ! অন্নু অনেকদিন পর গাঢ় স্বরে ডাকল।

—বল।

অন্নু শুধু চেয়ে থাকল সুভাষের দিকে। কিছু বলল না। সুভাষ

এই মুখ দেখে বুঝল অনু শিল্পের জন্য, জীবন এবং যৌবনকে মহিমময় করতে চাইছে।

ওরা তাজা ফুল কিনল নিউ মার্কেট থেকে। ওরা ঘুরে ঘুরে সতেজ এবং স্নিগ্ধ ফুলের সৌরভ নিল। তারপর গাড়িতে ফিরে আসার সময় সেই ফুলের গন্ধ সুভাষকে কিছুক্ষণের জন্য উদ্বিগ্ন করে রাখল। এক তরুণ যুবকের সম্মানের জন্য অনু ঘরদোর সাজাবে। অথবা যেন অনুর ড্রইংরুম সর্বদা দামী দামী ফুলে ভরে থাকে, দামী দামী সব ছবি এবং দুর্লভ চিত্রকরের হাতে আঁকা। অনু সুভাষকে আড়চোখে লক্ষ্য করছিল। সুভাষের ভিতর কিছু কিছু অস্বস্তি এখন কাজ করছে। সুতরাং অনু ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক আলাপের দ্বারা অথবা বিদেশী কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলে সুভাষকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করছে। অনু ধরতে পারছে, সুভাষ তার স্ত্রীর এই সব অভিনয়, নাটক অভিনয়, অন্যান্য যুবকের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় খেলোয়াড় সুলভ পুরুষের মত আর ভাবতে পারছে না। মাঝে মাঝে সেজন্য সুভাষের মুখ বড় করুণ, কখনও সুভাষ নিজের ছোট ইজি-চেয়ারটাতে বই নিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে—দেখলে মনে হবে মনোযোগী ছাত্র—অথচ অনুর বুঝতে বাকি থাকে না, ভিতরে ভিতরে সুভাষ এক দাহ জ্বেলে রাখছে, এবং এই দাহ যে কোনদিন প্রজ্জ্বলিত হলে এই সংসারকে মুহূর্তে ভেঙ্গে দিতে পারে।

অনু গাড়ির ভিতরই সহসা বলে ফেলল, তুমি অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ!

সুভাষ বলল, কিসের কষ্ট! সুভাষ খুব বিস্ময়ের ভান করল।

—এই যে তুমি চুপচাপ বসে আছ—কথা বলছ না।

—কি কথা বলব!

—কেন সব কথা আমাদের কি শেষ হয়ে গেছে!

সুভাষ বলল, অনু ছেলেমানুষি কর না। ড্রাইভার আছে। সে ইংরেজীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল।

সুভাষের মুখ দেখে অনু কোন কথা বলতে সাহস পেল না। সুভাষের কুৎসিত মুখ রাগলে গণ্ডারের মত মনে হয়। ওর ভয়ঙ্কর শক্ত শরীর রাগলে শুয়োরের মত শক্ত হতে থাকে। অথচ কোমল ওর মন এবং সব সময় শিল্পীর মত ভিতরে ভিতরে সংসারের এক সুন্দর ছবি আঁকার চেষ্টা।

সুভাষ সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার সময় শুধু বলল, তোমার মা হওয়া দরকার অনু।

—মা! আমি কী বুড়ি হয়ে গেছি! তিক্ত বিরক্ত হয়ে অনু পাগলের মত বলে ফেলল। এত শীগগীর, এই অল্প বয়সে আমাকে তুমি মা হতে বলছ!

—বলছি। মা না হলে তুমি তোমার এই দামী ভালবাসাটুকু সবার জন্য বইতে পারবে না। মা হলে দামী ভালবাসাটুকু তোমার সন্তানের জন্য এবং এই সংসারের জন্য বইতে পারবে।

—তুমি হীন সুভ!

—বলতে পার।

—তুমি…তুমি। অনু অন্য কিছু উচ্চারণ করল না। উচ্চারণ করতে পারল না। নীচে অসীমের গাড়ির শব্দ। অনু তাড়াতাড়ি সুভাষের হাত ধরে বলল, লক্ষ্মী ছেলে, পাগলের মত কিছু করে ফেল না!

কিন্তু কেউ উঠে আসছে না সিঁড়ি ধরে। অনিমা খুব তাড়াতাড়ি ড্রইংরুম সাজাচ্ছিল—কিন্তু সিঁড়িতে কোন শব্দ না পেয়ে বারান্দায় এসে উঁকি দিতেই দেখল, গাড়ি পাশের বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের। একটু সময় পেল অনু, সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রামকে নিয়ে ঘর গোছাতে বসে গেল। কারণ, অসীমের আসতে দেরী হচ্ছে। সুভাষ বারান্দায়। শরৎকালীন আকাশ বলে খুব ক্লান্ত সূর্য বাড়ির অন্যপাশে নেমে যাচ্ছে। পার্কে সব ফুটফুটে শিশুরা ছুটোছুটি করছিল—ক্রমশ আমাদের এইসব অবাঞ্ছিত

সন্তানেরা সকলে বড় হচ্ছে। আমরা যুবক যুবতীরা এখন আর জনকজননী হতে চাইছি না, আমরা যুবক যুবতীরা জনক জননীর ব্যাপারে ক্রমশ খুব সচেতন। আমরা যুবক যুবতীরা ধীরে ধীরে সংসারের বাইরে, পার্কে অথবা কোন অপেরাতে এবং ভ্রমণের জন্য সুদূর নৈনিতাল—আমাদের সঙ্গে সব কৃত্রিম···আমরা হাটে মাঠে মাতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।

ভিতরে অনুর আনুষঙ্গিক সব কাজের খুটখুট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সে এখন নিশ্চয়ই কোন শিল্পীর ছবি পরিষ্কার করছে, সে এখন নিশ্চয়ই সব দামী দামী ফুল ঘরের চার কোনায় ফুল-দানিতে সাজিয়ে দিচ্ছে অথবা ওর মনে হল দামী সব ধূপবাতি জ্বলছে ঘরের সর্বত্র। অসীমের জন্যে দুপুরে কাটলেট ভাজার গন্ধ, বিকেলে তাজা ফুলের গন্ধ এবং সন্ধ্যায় হাসি মসকরা। ওরা এ ভাবে বুঝি সারামাস সারা বৎসর অভিনয় সম্পর্কে গল্প করে যাবে।

অনু ভিতর থেকে ডাকল, সুভ।

সুভাষ বারান্দা থেকে উঠে ভিতরে ঢুকলে অনু বলল, তুমি একটা কাটলেট খেয়ে দেখ না, কেমন হয়েছে!

সুভাষ বলল, রামকে বল না, সে কেমন হয়েছে বলতে পারবে।

অনু কেন জানি আজ সবই সহ্য করছিল। সে তাই অপমানটুকু গায়ে মাখল না। এবং সুভাষ ক্রমশ ইতর হয়ে যাচ্ছে, সুভাষ নিজেই যেন বুঝতে পারছিল। তাই অনুরোধটুকু উপেক্ষা করে সে যেন অনুর কাছে যথার্থই খুব ছোট হয়ে গেছে। সুতরাং সে খুব আপসোসের ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, দাও দেখি।

অনু রামকে কাটলেট হিটারে গরম করে দিতে বলল। অসীম এখনও আসছে না। সে ঘড়ি দেখল। সে অসীমের আসার ফাঁকটুকুতে বাথরুমে ঢুকে শরীরে ভাল দামী সাবান মেখে শরীর ধুয়ে মুছে, চুলে ক্রীম মেখে এবং চেহারার ভিতর

প্রফুল্ল ভাব এনে, যেন বিজয়িনী, যেন গৌরব করে বলার মত তার সৌন্দর্য, যেন ইচ্ছা, দেখ দেখ আমার রূপ দেখ, আমি যুবতী, আমি শীতের সন্ধ্যায় তাজা গোলাপের মত—শুধু রেখে ঢেকে ভোগ করা—জননী হতে গেলে রূপের অপযশ। সে ধীরে ধীরে সুভাষের পাশে একটা মোড়া টেনে বসে পড়ল।

অনু সংক্ষিপ্ত সব কথা বলছিল। অনু সুভকে সংসার সম্পর্কে দুটো একটা কথা বলল, ওর মা এবং বাবা এখন বেনারসে আছেন, ওরা ইচ্ছা করলে এই ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে দিতে পারে, এইসবও বলছিল।

সুভাষ কিছুই শুনছে না অথবা সবই শুনছে এমন একটা মুখভঙ্গী নিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সুভ একসময় বলল, অনু আমি আমার এই মধ্যবিত্ত জীবনে সুখী থাকতে চাই।

অনু বলল, সুভ তুমি আমায় বিশ্বাস কর।

সুভ বলল, প্রশ্নটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের নয় অনু, আমার যা ভাল লাগে না তুমি তা কর না।

অনু বলল, সুলতা ঠিক আমাকে এ কথাই বলেছিল। জীবনে বড় হতে গেলে বিয়ে করতে নেই মেয়েদের। পুরুষেরা বড় সন্দেহ প্রবণ।

সুভ বলল, মেয়েরাও। তারপর হেসে হেসে বলল সুভাষ, কথা সেখানেও নয় অনু, তুমি বড় হতে চাইছ, তোমার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছ—সব মানি, সব জেনে বুঝেও যখন দেখি সারাদিন খাটুনির পর অফিস ফেরত, তুমি বাড়ি নেই, তুমি কোথাও নিজেকে গানের ভিতর, অথবা ভিন্ন ভিন্ন নাচের ভিতর প্রতিষ্ঠা করছ—তখন আমার এই একক মানুষটির ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট, সুভাষ কিছুটা বক্তৃতার মত কথাগুলো বলে গেল এক নাগাড়ে। সে স্থানে স্থানে সাধুভাষা ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এবং এইসব

ভাষার ভিতরেই মনে হয় সুভাষ যতই কোমল হোক ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর কঠিন। সে ভয়ঙ্কর ভাবে বলছিল, আমরা পরস্পর ক্রমশ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।

'অথবা অনু এক দুর্লভ বস্তু' সুভাষ এই উক্তির জন্য খুব দুর্বল এবং সুভাষ, তার কুৎসিত অবয়ব সম্পর্কে খুব সচেতন। সে এবার বলল, আমার এই একক জীবন সম্পর্কে তোমাকে শুধু সচেতন থাকতে বলছি। কারণ আমারও ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে বসে একটু সময় কাটাই। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক—পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালবাসার আবেগ—সব যেন আস্তে আস্তে আমাদের মরে যাচ্ছে। সুভাষ বলতে পারত, তুমি মরে যাচ্ছো, কিন্তু বলল না। সে আমাদের মরে যাচ্ছে, বলল।

অনু ওর পায়ের কাছে সন্ন্যাসিনীর মত মুখ নিয়ে বসেছিল। কিছু কাক ডাকছিল দেবদারু গাছটাতে। কিছু শরৎকালীন ফুলের কুঁড়ি দেখা যাচ্ছে কোন ফ্ল্যাট-বাড়ির ব্যালকনিতে, আর সব যুবক যুবতীরা পার্কে ময়দানে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অনু এইসব দেখতে দেখতে বলল, ছেলেবেলা থেকে আমার স্বপ্ন সুভাষ, সুভাষ তোমাকে এসব কথা আগেও অনেকবার বলেছি, আমি বড় হব, মহৎ হব, আমি গানে অথবা অভিনয় শিল্পে বড় হব। অভিনয় অথবা গান সম্পর্কে তুমি জানতে—আমার এই সব স্বপ্নের কথা জানতে—এখন তুমি···।

সুভাষ বলল, আমার দূরদৃষ্টির খুব অভাব অনু। তুমি দশটা যুবকের বাহবা পাও, ভালবাসা পেতে পার, সুভ অসংকোচে কথাটা বলে ফেলল। কিন্তু আমি ভালবাসা পেতে পারি না। আমি সুদে আসলে কোন রমণীকে শুধু উপভোগ করতে পারি। জীবনে আমার কোন সুখ নেই অনু। তারপর ফের থেমে থেমে অনেকদূর থেকে যেন বলে যাচ্ছিল সুভ, আমি জানতাম না অফিস ফেরত তোমাকে কাছে না পেলে আমার এত কষ্ট হবে। তোমার সামান্য অবহেলা আমাকে এত দুঃখ দেবে।

—আমি তোমাকে কখনও অবহেলা করিনি সুভ।

—তুমি হয়তো যথার্থই কর না, হয়তো তুমি নিজের শক্তিতে বাঁচতে চাইছ এবং এও হতে পারে আমাদের পূর্বপুরুষদের মত অথবা মা-ঠাকুমার মত জীবন আর ফিরে পেতে পারি না। কারণ আমাদের মা-ঠাকুমাদের আকাঙ্ক্ষা বড় সামান্য ছিল। তাদের অস্তিত্ব আমার বাবা এবং ঠাকুর্দার উপর নির্ভর ছিল।

তারপর ওরা পরস্পর কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ সুভাষ সেই নিঃসঙ্গ দেবদারু গাছটাকে শুধু দেখল, কিছুক্ষণ অনু কি ভাবল, ভাবল যেন সব কিছুই ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে। এই সুভাষকে সুখী-সুভাষ অথবা সংসারকে মায়ের মত স্নেহ দিয়ে বড় করে তোলার ইচ্ছা এবং কখনও যেন সুখকে, আকাঙ্ক্ষাকে পরিমিত করে নতুন ভাবে বাঁচার ইচ্ছা···কিন্তু কি যেন এক আবেগ, কি যেন এক অজ্ঞাত প্রলোভন তাকে কেবল সুভাষ নামক জগতের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যার জন্যে নিজেকে সে কিছুতেই দায়ী করতে পারছে না।

সন্ধ্যার আগেই অসীম এল। সে নীচ থেকে ডাকছিল, অনুদি, ও অনুদি। বাবা কারো শব্দ নেই দেখছি।

অনু শেষবারের মত প্রসাধন করছিল। ওর কমনীয়তার উপর সকলের দৃষ্টি। সে খোঁপাটা একটু উপরে ঠেলে বারান্দায় এল এবং বলল, এই যে অসীম এস। বলে, সে ড্রইং রুমের দরজা খুলে পাখা খুলে দিল। এবং পর্দা টেনে বারান্দায় এসে বলল, তুমি যাও। অসীম একা একা বসে থাকবে ভাল দেখাচ্ছে না।

—তুমি কি করবে?

—আমি রামকে দেখছি।

—ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার অতিথির কোন ত্রুটি হবে না—কথা দিচ্ছি।

—যাঃ কি যে বল না! অনুকে যথার্থই খুব হাল্কা লাগছিল দেখতে। সুভাষের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, যাও না!

অনু পাশে এসে চুমু খেল সুভাষকে। সুভাষ শক্ত হয়ে ছিল, এবার চিত হয়ে শুল। তারপর পাশ ফিরে কাছে টেনে নিতেই অনু বলল, লক্ষ্মী, এ ভাবে আমাকে টেনো না।

—ভয় নেই অনু।

শীতের প্রথম দিকে—তখন গাছের পাতা ঝরতে আরম্ভ করছে। তখন নদী নালাতে জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভোরবেলা। অনুর এখন সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। ভোরে উঠে অনুর অবসাদ লাগছিল। অনু চাদর গায়ে একটা মোড়া এনে সেই ব্যালকনির বারান্দায় এসে পার্কের গাছগুলো দেখল। গাছের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে।

অনুর সহসা মনে হল আজই ওর গোপন ক্যালেণ্ডারের পাতায় নির্দিষ্ট দিনটি বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে ক্যালেণ্ডারের পাতা দেখল- সেই লাল ক্রস চিহ্ন, ধরে হিসাব করতে গিয়ে বুঝল দু দিন আগে—নির্দিষ্ট দিনটি চলে গেছে। সে ফের বারান্দায় বসে পার্কের গাছ দেখল, এখনও সুভাষ ঘুম থেকে ওঠে নি। রাম এখনও ওর টালীগঞ্জের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে চলে আসে নি। ওর এ-সময় বাবা মার কথা মনে পড়ছে। ওঁদের চিঠি সে গতকাল পেয়েছিল। ওঁরা শিগগীরই কলকাতায় চলে আসছেন। মনিমাসি ঘরদোর সব হয়তো পরিষ্কার করে রাখছে। অনু বসে বসে গাছের পাতা ঝরতে দেখল, মানুষেরা সব বেরিয়ে পড়েছে—কাক শালিক ডাকছে বাড়ির ছাদে, কার্নিসে এবং সাতভাই চম্পা পাখির কথা ওর কানে আসতেই—গ্রাম বিল মাঠ, নদী-নালার কথা মনে পড়ল। ঠাকুমা কার্তিক পুজোর দিন ধানের ছড়া আনতে অনুকে মাঠে পাঠাতেন, অনু মাঠে মাঠে ধানের খেতের ভিতর সবার চেয়ে

বড়, সকলের চেয়ে পুষ্ট ধানের ছড়াটির জন্য ঘুরে বেড়াতে। বৃদ্ধ ওসমান বলত, মা এই ছড়াটা লন।

অনু বলত, জ্যাঠা আর একটু হাঁইটা যাই। আমাদের পূবের খেতে চলেন।

সেই অনু দেশবাড়ির ছবি প্রায় ভুলতে বসেছে। সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। সেই গ্রাম্য বাংলা ভাষা এখন অনু ভাল ভাবে বলতে পারে না—অনুর কষ্ট হয়। অনু দিন দিন ছবির অনু হয়ে যাচ্ছে। এই নিরিবিলি ব্যালকনিতে বসে সুভাষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা ভাবল। সুভাষের সঙ্গে প্রথম কি কথা হয়েছিল—তাও অনু স্পষ্ট মনে করতে পারে অথচ কাল কি কারণে বচসা হয়ে গেল, মুল গলদটুকু কোথায় ছিল···কি কি সূত্র ধরে এসে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কথা বলতে সুরু করেছিল ভেবে পাচ্ছে না। আজ হয়তো সুভ সারাদিন অনুর সঙ্গে কথা বলবে না, আফিসে ফোন করলে—অনুর গলা পেলেই ফোনটা নামিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে অনুর মনে হয় সুভ সেই পাড়াগেঁয়ে সুভই আছে। দুঃখ এবং অভিমান খুব বেশী। চণ্ডালের মত রাগ সুভর। অনু তখন হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। অনুর আশা আকাঙ্ক্ষার জন্য সুভ প্রায়ই দুঃখে ভেঙ্গে পড়ছে। অনুর ছবি করা নিয়ে সুভ শেষ পর্যন্ত বলেছে, এতে আমার সায় নেই অথচ ওদের ছবি আরম্ভ করার দিনক্ষণ প্রায় ঠিক। অনু এখনও সুভর মত আদায় করতে পারে নি। অনু এই সব গাছের পাতা ঝরা দেখে ভাবল, আজ হোক কাল হোক নতুন পাতা গজাবে, অনু ভাবল, আজ হোক কাল হোক সুভর শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। সেই কারণে সেই পুষ্ট ধানের ছড়ার সন্ধান আজীবন বাসনা অনুর। সে দেশে দেশে সেই ধানের ছড়াটির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

অনু একদিন বলল, সুভ সতের দিন হয়ে গেল!

সুভাষ বলল, তুমিত রমেনকে চেন।

অনু বলল, চিনি।

—রমেনের স্ত্রীর আজকাল প্রায়ই দিনক্ষণ ঠিক থাকছে না।

—তুমি কি বলতে চাইছ আমি দিনক্ষণ ভুল করেছি।

—নিশ্চয়ই।

—না সুভ, দিনক্ষণ আমার ঠিক আছে। বলে সে ক্যালেণ্ডার খুলে এনে দেখাল—গত মাসের একটি তারিখের নীচে ছোট লাল ক্রস। সুভ নুয়ে ক্রসের চিহ্নটা দেখল।

সুভ বলল, পেটের গণ্ডগোলে ভুগছ না তো? সুভ ডাক্তারের মত কথা বলতে চাইল।

অনু বলল, না।

—কনষ্টিপেসন!

—সেত আমার চিরদিনের।

সুভ তারপর হেসে বলল, তবে তুমি জননী হতে চলছ।

অনিমা তিক্ত গলায় বলল, ঠাট্টা রাখ সুভাষ।

—এই মহৎ সত্য কথাটাকে তুমি ঠাট্টা বলছ।

—সুভ তুমি কি সব বাজে বকছ? বলে অনু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুভাষ অনুর পিছনে পিছনে ছুটে গেল। সে দিন রোববার ছিল। বিকেলের দিকে রাম বাড়ি গেছে। সুভাষ অনুর পাশে বসে বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?

—না সুভ আমার খুব ভয় করছে।

—সত্যি সত্যি জননী হলে তার সব চিহ্ন মুখে ফুটে উঠবে। দু একদিন আরও দ্যাখো না।

সুভাষ পরদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল, অসময়ে অনু খাটে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। সুভ জামা কাপড় না ছেড়ে পাশে গিয়ে বসল। মনে হল অনুর মুখ দেখে, সে কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেছে। মুখে ভয়ঙ্কর অবসাদের চিহ্ন। সুভ ধীরে

ধীরে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, শরীর খুব খারাপ লাগছে? ডাক্তার ডাকব?

অনু কোন কথা না বলে বালিশে মুখ গুঁজে দিল।

সুভাষ কপালে হাত রেখে বলল, মাকে খবর দেব।

—না।

—তোমার বন্ধু প্রীতি জোয়ার্দারকে একটা কল দেব।

সহসা যেন আলো ফুটে উঠল অনুর মুখে। বলল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। প্রীতিকে বরং আমি কাল নেমন্তন্ন করি।

—ভাল। তারপর সুভাষ কি ভেবে বলল, নেমন্তন্নটা পরে করলে হত না!

পরদিন প্রীতি এল। দেখে বলল, কিছু বলা যাচ্ছে নারে! বলে কয়েকটা ট্যাবলেট লিখে দিল। বলল, এটা খেয়ে দেখ হপ্তা খানেক—যদি কিছু না হয় আমাকে খবর দিস।

প্রীতি বড় বড় মিষ্টি গবগব করে গিলে ফেলল। প্রীতি ঠিক পুরুষের মত কথা বলছিল। যেন সে পুরুষ মানুষ, বাচ্চা, মেয়ে মানুষের হবে—তাতে আশ্চর্য হবার মত কি আছে। সুতরাং প্রীতি উঠে যাবার সময় বলল, কি খাওয়াবি বল।

—আমাকে রক্ষা কর প্রীতি। অনু প্রীতির গলা জড়িয়ে ধরল।

প্রীতি বলল, আমাকে তুই পাপের ভাগী করতে চাস। গলায় ঠাট্টার সুর ভেসে উঠেছিল প্রীতির।

—প্রীতি তুই আমাকে আর ঠাট্টা করিস না। বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। যেন তারই সেই পুষ্ট ধানের ছড়াটি এবার যথার্থই হারিয়ে যাচ্ছে।

—একটু সাবধানে চললেই এ-সব ঝামেলা আজকাল আর পোহাতে হয় না।

—আমি সব রকমের করতে চেষ্টা করেছি প্রীতি। বাকিটুকু অনু বলতে পারত প্রীতিকে। প্রীতি ডাক্তার। সুতরাং সব বলা

সুভাষ ভিতরে ভিতরে ঘৃণার চোখে দেখছিল সব। অথচ সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করার অভ্যাস। এ নিয়ে সে কোন তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাইল না। সে শুধু বলল, অতিথিকে বল না, এই বারান্দায় এসে বসতে। তাছাড়া তুমি তো বলেছিলে সে আমার লেখার ভক্ত।

অনিমা যেন কথাটা বেমালুম ভুলেই গেছিল। সে অসীমকে ডেকে বলল, অসীম এদিকে এস। বলে দরজায় উঁকি দিল।

অসীম এলে বলল, কি চিনতে পারছ লোকটি কে?

—খুব। আপনি তো আজকাল লেখা ছেড়েই দিয়েছেন দেখছি।

সুভাষ খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, যাকে মুগ্ধ করবার জন্য লেখা ধরেছিলাম তাকে যখন পেয়ে গেছি—তখন আর লিখে কি হবে!

—ঠিক বলছেন না? অসীম প্রতিবাদ করল।

সুভাষ অসীমকে দেখল। যতটা ছেলেমানুষ ভেবেছিল অসীমকে এই শরৎকালীন সন্ধ্যায় অসীমকে ততটা ছেলেমানুষ মনে হল না। সুভাষ আর শত চেষ্টা করেও জোরে হাসতে পারল না।

সুভাষ ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে বলল, নয় কেন?

—আপনার লেখা তার সাক্ষ্য দেবে, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না। প্রাণের টান ছিল বলতে পারেন আবেগ এবং মননধর্মীতা দুই কাজ করেছে।

সুভাষ ভাবল তবে কি অনুর প্রতি ঈর্ষার জন্য সে সামান্য হয়ে যাচ্ছে। সে কি অনুর গৌরবে ঈর্ষান্বিত? সে মনে মনে বলল, না। অনুর গৌরবে আমি ঈর্ষান্বিত নই। শুধু বার বার মনে হচ্ছে অনু এবং আমার ঘরে হাজার লোক শুধু অনুর পাশপোর্ট নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। ওরা কোলাহল করছে অনুকে নিয়ে, অনুর ভালবাসাকে নিয়ে। তার মনে হল যেন অনু নামক এক যুবতীর শরীর স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। অভিনয়ে, নাচে এবং গানে

সেই স্বাদ অসামান্য। সে অনেক বার দর্শকদের গ্যালারীতে বসে ইতর জনোচিত কথা শুনেছে অনু সম্পর্কে। সে উঠে যেতে পারত তখন, সে, সেই সব অসভ্য যুবকদের রসিকতা করে বলতে পারত, 'যুবকের মঙ্গল হোক'। বলতে পারত সব যুবকেরাই যুবতীর জন্য এক ইচ্ছা লালন করছে, শিল্পে, অভিনয়ে নাচে অনু যেন আগুন জ্বেলে বসে থাকত আর সুভাষ সেখানে এক সামান্য পতঙ্গ। আর বিরাট পতঙ্গেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, সব পতঙ্গের ভিড়ে অনু একদিন যে যথার্থই সুভাষকে হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং এমন কি একদিন সে না চেনারও ভান করতে পারে। কারণ মানুষের একটা ধর্ম আছে। সুভাষ দেখল তার মুঠোর ভিতর তার সেই ধর্ম আটকা পড়েছে। অনুর হাসির ভেতর অনুর ধর্ম বেঁচে আছে। অসীমের রসিকতা করে কথা বলার ভিতর তার ধর্ম বেঁচে আছে। এইসব ফেলে যে যত এগোয় সে তত মহৎ হয়, সে তত হীন হতেও পারে। সুভাষ তার মুঠো খোলার চেষ্টা করল। শত চেষ্টাতেও সে তার মুঠো যেন খুলতে পারছে না। সে সামনে পিছনে শুধু হাহাকারের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। সে সুতরাং চুপচাপ ফের দেবদারু গাছের পাতা উড়তে দেখল। আকাশ তেমনি স্বচ্ছ, নীল এবং রাতের নক্ষত্রেরাও সব একে একে উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সুভাষের কণ্ঠ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

এক সময় অনু এসে দাঁড়াল পাশে। তারপর পাশে বসে খুব অনুরোধের কণ্ঠে বলল, একবার যাব অসীমের সঙ্গে।

— কোথায়? সুভাষ ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল।

—ওর মামার কাছে।

—নাটক শুনবে না এক সঙ্গে।

—তিনি সাতটা থেকে আটটার ভিতর সময় দিয়েছেন।

—যাও। সুভাষ অনুমতি দিল।

—আমরা এসে শুনব। তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করব।

সুভাষ বলল, আচ্ছা। ওর আর কোন কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না এখন। সে চুপচাপ বসে থাকল। সে রামকে ডেকে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। সে অন্ধকারেই দেখল অসীম এবং অনিমা গাড়িতে বের হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনকেই খুব দূরবর্তী নক্ষত্রের মত মনে হচ্ছিল। আর সুভাষ বার বার নিজেকে ধিক্কার দিল, শত চেষ্টাতেও বলতে পারল না, অনু তুমি যাবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না। সে এখন এক পরাজিত কাপুরুষ। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল, গ্লানিতে সে কিছুক্ষণ ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকল। ঘর অন্ধকার, এই বারান্দা অন্ধকার, আর রাস্তার স্তিমিত আলোতে মনে হচ্ছে সুভাষ বড় অসহায়। সে অনুর কাছে, অফিসের কাছে এমন কি সবার কাছে সে ভালমানুষ। সব মাথা পেতে সহ্য করার ক্ষমতা তার অসীম। এখন ভিতরে ভিতরে এক ভয়ঙ্কর মানুষ বার বার ফুঁসে ফুঁসে উঠছে আর বার বার তার এই সাধারণ মানুষটিকে আঘাত করছে।

অনু বেশী রাত করেনি ফিরতে। প্রায় নাটক আরম্ভ হবার আগেই সে এসে পৌঁছেছে। অসীম অনুকে রেখে গেছে, সে ওপর পর্যন্ত উঠে আসে নি। অনিমা ঢুকেই বলল, স্ক্রিপটার কিছু অংশ পড়ালেন। তিনি আমার গলার স্বর জানেন। অনু আলো না জ্বেলে সোজা বারান্দায় এসে সুভাষের পাশে বসে কথাগুলো বলল, আজ রেডিওতে যে আমার অভিনীত নাটক আছে তাও তিনি জানেন। অনু বলতে বলতে সুভাষের সামনে পা মুড়ে বসল।

—কিছু বলছ না যে!

—কি বলব বল?

—অসীমের মামা আমাকে আর কি কি বললেন।

—আমি না জিজ্ঞেস করলেও সব বলবে।

—যদি গোপন করে যাই।

—করবে।

—তুমিত্ত আমাকে আজকাল ভালবাস না।

অনুর কিছু কিছু বালিকাসুলভ কথা আছে, কিছু কিছু সোহাগের অনুরোধ আছে যা সুভাষ অবহেলা করতে পারে না। সুভাষ সব উপেক্ষা করে বলল, আমি এবার শোব। শরীরটা ভাল লাগছে না।

—এত তাড়াতাড়ি। নাটক শুনবে না?

—না।

—আমি একা একা শুনব!

—তোমার ইচ্ছা, রাম আছে।

— সুভাষ তুমি ইতরের মত কথা বলছ।

—না, আমি ইতরের মত কথা বলছি না। সুভাষ উঠে দাঁড়াল। সোজা ঢুকে ডাকল রাম, রাম। আমাকে খেতে দে।

সুভাষ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। অনু কাপড় ছাড়ল না, শুধু মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়ল। অনু কোন খাবার খেল না। রাম কিছুক্ষণ দরজায় বসেছিল—এই সচ্ছল সংসারে দুঃখ কোথায় রাম বুঝতে পারে না—কেবল অশান্তি। ওর খুব খারাপ লাগছিল খেতে। রাম খেয়ে টালীগঞ্জের দিকে ছোট এক বস্তি অঞ্চলে চলে যাবে—সেখানে দুটি ছেলের জননী ওর জন্য কেরোসিনের কুপি জ্বেলে অপেক্ষা করে থাকে। সে হেঁটে হেঁটে যাবার সময়, সেই দেবদারু গাছটার নীচে দুজন যুবক যুবতীকে চুমু খেতে দেখল।

ঠিক রাত দুপুরেই মনে হল বিছানায় শুয়ে অনু কাঁদছে। কোথাও কোন অনুশোচনা, সুভাষ ঠিক ধরতে পারছিল না—সে ডাকল, এই কি হচ্ছে এ-সব!

—সুভ তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

সুভাষ উত্তর করল না।

—আমি তোমাকে অনর্থক অসম্মান করেছি।

সুভাষ পাশ ফিরল।

অনু তবু জোর গলায় বলতে চাইল, আমি খেতে পারছি না, আমাকে জোর করে অত্যাচার করার কি অর্থ!

—কোন অর্থ নেই। তবে বেঁচে থাকতে হলে কিছু খেতে হয়।

—আমার বেঁচে কি হবে।

—সে এক ঈশ্বর বলতে পারেন। বলে সুভ এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সে বারান্দা পার হয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপর জলের কল ছেড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। সে যেন মনে মনে কিছু ভাবছিল। ভাবছিল প্রীতির ট্যাবলেট তবে কাজ দিচ্ছে না। সন্তানের জন্ম হবেই। এবং অনু শেষ. চেষ্টা করে যাবে—ওকে উৎখাত করার। অথচ এ ব্যাপারে একবারও অনু সুভর কোন পরামর্শ চাইছে না, এবং সুভ নিজেও জোর গলার বলতে পারছে না—আমার প্রথম সন্তান, ওকে হত্যা করা মহাপাপ হবে অনু। আমরা আমাদের সন্তানের প্রতি অবিচার করছি।

সুভকে এখন খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সে মুখ ধুতে ভুলে গেল। সে কল বন্ধ না করেই ফের বাথরুম থেকে বের হয়ে সোজা অনুর পাশে এসে দাঁড়াল। অনুর পাশে বসতে ওর সাহস হচ্ছিল না। হয়তো অনু অন্য কিছু ভেবে খ্যাক করে উঠবে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, ওসব ছাই পাঁশগুলো আর নাই গিললে।

অনু ধরতে পারল না, সুভ কি বলতে চাইছে। সুভ মাথার কাছে এবং অনু সামনে পাশ ফিরে শুয়ে—সুভ মাথার কাছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, অনু মাথা না তুলেই চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে সুভকে দেখার চেষ্টা করল। এত বড় মানুষটাকে খুব ছোট দেখাচ্ছে। অনু বলল, কি বললে?

—ট্যাবলেটগুলো আর খাবার দরকার নেই।

—তার মানে!

—মানে, যে এসে গেছে তাকে আসতে দাও।

অনু খুব তিক্ত গলায় বলল, তাকে তুমি দশ মাস বহন করবে!

—ক্ষমতা থাকলে করতাম।

পুরুষ মানুষরা ওরকমই বলে! বলেই মনে হলো ভিতর থেকে সেই ওক প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসছে। যেন পারলে অনু সুভর উপরই বমি করে দেয়, যেন এই ঘৃণ্য ওক এইসব পুরুষ মানুষের জন্য। অনু ছুটে বের হয়ে গেল। অনুকে এখন পাগলিনী সদৃশ মনে হচ্ছে।

সুভর খুব কষ্ট হচ্ছিল অনুর চেহারা দেখে। সে ওর জন্য, ওর ভালোর জন্য এবং সন্তানের জন্য ডাক্তারের এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের পরামর্শ চাইছে।

সে বলল, বরং শ্বশুর মশাইকে চিঠি দেওয়া যাক। বলে, টেবিলের উপর থেকে চিঠির প্যাড তুলে নিল।

নীল রঙের প্যাড। খচ খচ করে লিখল প্রথম—পরম পূজনীয়, পরে কি বলে আরম্ভ করা যায় ভাবল। এই ঘটনার কথা খুলে লিখতে সুভর লজ্জা করছিল। মা থাকলে মা আনন্দের সঙ্গে জানাতেন। শুভ বার্তা পাঠানোর জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকত না। কিন্তু এখন এই নিঃসঙ্গ পরিবারে এই শুভ সংবাদ দুঃখকর এবং গ্লানিকর। সুভ লিখতে বসে ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করতে থাকল, অথবা যেন লেখা চলে অনু সন্তানের জননী হতে যাচ্ছে। লেখা চলে কিছুদিন থেকে অনুর শরীর খারাপ যাচ্ছে—আপনাদের কাছে থাকা দরকার, অথচ লিখতে গিয়ে খুব সংকোচ বোধ করছিল।

সুভ বলল, মাকে লিখে দি চলে আসতে।

—কেন?

—তোমার শরীর খারাপ যাচ্ছে।

—এ সময় মা আসবেন কেন?

—মেয়েদের এ সময়ে মায়েরাই কাছে থাকে অনু।

—মাকে চিঠি লিখলে সুভ আমি অনর্থ ঘটাব।

—তার মানে!

—মানে সোজা সুভ, বলে অনু জোর করে উঠে বসল খাটে। তারপর মুখে আঁচল দিয়ে বলল, প্রীতি আমার কাছে আরও সাতদিন সময় চেয়েছে।

—যা খুশী করবে! বলে সুভ প্যাডের কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর উঠে সেই যে বাথরুমে ঢুকে গেল—অফিসের সময় না হলে সুভ আর বের হবে না, এবং অফিস একমাত্র স্থান যেখানে মনটা অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত থাকে এবং মনের ভিতর এত সংঘাত থাকে না অথবা কোথায় যেন অনু ক্রমশ নিজের ইচ্ছার জন্য আত্মহত্যার সামিল হচ্ছে। আত্মহত্যার মত অনু একগুঁয়ে এবং ভয়ঙ্কর প্রলোভনে অনু সন্তানের মা হতে অস্বীকার করতে চাইছে।

বাথরুমেই সুভর মনে হলো একবার প্রীতিকে রিঙ করবে, একবার সন্তান সম্পর্কে পিতৃইচ্ছার দায়িত্ব কতটুকু প্রীতির সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করে নেবে। অথবা ওর পিতৃইচ্ছার দায়িত্বকে প্রীতি কোন দাম দেবে কি না—অর্থাৎ সুভ ইচ্ছা করলেই এটা রোধ করতে পারে। সুতরাং সুভ ভাবল, সে আর দেরী না করে প্রীতিকে সোজা বলে দেবে---আমার প্রথম সন্তানটিকে হত্যা করার কোন অধিকার আপনার অথবা অনুর কারো নেই। সে এখন যেন মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল অথবা ওর এই বাথরুম এখন সহজ এবং সরল ত্রিভুজের মত ছবি এঁকে দাঁড়িয়ে আছে—সে বাবা, অনু মা এবং তার সন্তান--আহা সন্তানের জননী সম্পর্কে সে যত ভাবল তত অনু ওর কাছে কাছে থাকছে, অভিনয়, নাচ, গান অথবা অন্য কোন কারণে অসীম নামক যুবকদের বেশী সময় দিতে পারছে না অনু, অনু ফের সেই আগের অনু হয়ে যাবে।

সুভ অন্যমনস্কভাবে দু'বার কল বন্ধ করে, দু'বার ফের খুলে দিল। সে ব্রাস দিয়ে অনর্থক দাঁত ঘসছিল। কারণ এতক্ষণ সময় সাধারণত অন্য দিন সুভ দাঁত মাজার জন্য দেয় না—অথচ সে আজ অনবরত দাঁত মাজছে। অনবরত কিসের শব্দ সে যেন শুনতে পাচ্ছে চারধারে।

মনে হচ্ছিল কারা যেন বিরাট শোভাযাত্রা করে মরুভূমির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে মৃতদেহ, নানা রকমের ফুল সেই মৃতদেহকে ঢেকে রেখেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি উঠছিল—যেন সেই এক শব্দ 'অমর রহে' যেন সেই এক শব্দ, 'গান্ধীজী অমর রহে', এই 'অমর রহের' জন্য অন্য এক জীব পৃথিবীতে জন্মলাভ করছে। সেও সেই 'অমর রহের' জন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, এবং যদি ঐ সব মহৎ পুরুষদের মত ঘটনাচক্রে যদি মহৎ হয়ে যায়—তবে সেও অমর রহে···আজো পৃথিবীতে আমরা সকলে, আমরা মানুষেরা এই 'অমর রহের' জন্য কত কিনা করছি। অমু 'অমর রহের' জন্য সন্তানকে অস্বীকার করতে চাইছে। সুভ 'অমর রহের' জন্য জনক হতে চাইছে এবং সুভ এক সময় সেই মরুভূমির উপর মিছিলটাকে একটা মরুদ্যানের ভিতর ঢুকে যেতে দেখল। মনে হলো সুভর প্রীতি নামক মরুদ্যানের কাছে সে সংসারের শান্তি রক্ষা করে গোপনে জল ভিক্ষা করতে পারে। সে ভাবল আজ অতি অবশ্যই একবার ডাক্তার জোয়ার্দ্দারকে রিঙ করবে।

সুভাষ তাড়াতাড়ি বের হবার জন্য প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করছিল। ওর আজ ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি, বাথরুমে দেরী এবং খেতে বসার সময়ই দেখল অমু ওর দিকে ওর খাট থেকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। সুভ তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল কিছু বলবে?

—না কিছু বলব না।

সুভ ফিরে যাচ্ছিল, ফের মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার কি খেতে ইচ্ছে হয় বল।

—কিছু না।

—বড় মাগুর মাছের জুস খেতে বলছে ডাক্তার।

—আমি কিচ্ছু খাব না।

—শরীরটা কি হয়েছে দেখেছ!

চলে। তবু সুভাষের অপমান হবে ভেবে সে শুধু বলল, আমার কপাল প্রীতি, আমি কি জানতাম এমনটা হবে। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, আমি কি জানতাম সুভ আমার প্রতি ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করবে।

প্রীতি গট গট করে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। বিজয়িনীর মত, গরবিনীর মত নেমে গেল। অনু জানালা দিয়ে সব দেখল। অন্য ঘরে অপরাধীর মত সুভাষ বসে বসে সিগারেট টানছিল। প্রীতির সব কথা সে এ ঘর থেকে শুনেছে। প্রীতি হপ্তাখানেকের জন্য ট্যাবলেট দিয়েছে—অথচ এ ব্যাপারে প্রীতির উচিত ছিল একবার সুভাষের সঙ্গে আলোচনা করা। সুভাষ কিছুটা অনুযোগের গলায় বলল, তা হলে তোমার ডাক্তার বন্ধুটি তোমার উপকার করে গেল বলতে হয়।

অনিমা বিছানা থেকে উঠে বসেছিল, এখন এই ট্যাবলেটের জন্য পায়চারি করছে। সে ভরসা পাচ্ছিল মনে মনে। সে বলল, মনে হয় এতেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

--গেলে ভাল। বলে, সুভাষ একা একা এই শীতের বিকেলে মাঠের ভিতর নেমে গেল। সব বালক বালিকারা ছুটোছুটি করছে। স্ত্রী পুরুষেরা লেকের জলে প্রতিবিম্ব দেখছিল যেন। এবং বাদামওয়ালা হাঁকছে, বাদাম, ঝাল নোনতা বাদাম। সুভাষ একা একা এই পার্কের ভিতর ঘুরে বেড়াল। ওর কিছুই ভাল লাগছিল না।

পরদিন ভোরে সুভাষ বিছানায় শুয়েই শুনতে পেল, অনিমা বাথরুমে ওক দিচ্ছে। সুভাষের এই সব বিশ্রী রকমের ওক তোলার শব্দে বুক কাঁপছিল। অনু বোধ হয় দরজা বন্ধ করে বসেছে এবং ওক দিচ্ছে আর সুভাষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যেন ধরতে পারছিল অনুর সমস্ত অহঙ্কার ওই ওকের সঙ্গে উঠে আসছে। এই ওক ওকে গরবিনী হতে দিচ্ছে না যেন।

সুভাষ অধিক সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না। সে

ধীরে ধীরে গিয়ে বাথরুমের পাশে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে সে বলল আমি তোমাকে ধরব অনু!

ওকের শব্দে অনু হয়ত শুনতে পায়নি। অনু নিজেই, কিছুটা জল নিয়ে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। কিছুটা জল গলার ভিতর রেখে গল গল করে জলটা ফেলে দিল। কারো সাহায্য চাইল না। দরজার খিল খোলার শব্দ শুনে সুভাষ তাড়াতাড়ি ড্রইংরুমে বসে বইএর ভিতর হাতি ঘোড়ার ছবি দেখতে বসে গেল। অনুকে সে লজ্জায় হোক, সংকোচে হোক অথবা কোন এক অবিশ্বাসের অকপট ছবি—অনু, জননী অনুকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। জীবনধারণে কোন উৎসাহ পাচ্ছে না অনু। সুতরাং সে অনুর দিকে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। টেবিলের ওপর এবং দেয়ালে দেয়ালে সব হাতি ঘোড়া বাঘ এবং এক অরণ্য। অরণ্যের ভিতর গেরস্থ লোকের সোনার মুরগি হারিয়ে গেছে। সুভাষ পত্রিকা দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে হত্যাকারী যুবকের ছবি মুখ থেকে মুছে দিতে চাইল। টেবিলের উপর সোনার মুরগিটা পা তুলে এখন হাঁটছে আর ঠুকরে ঠুকরে পত্রিকাটা ফুটো করে দিতে চাইছে। সুভাষ ভয়ে পত্রিকাটি কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না।

অনু বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে মাঠ দেখল। এই ঘরে কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। যেন কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর এক ভয়ঙ্কর নির্জনতা—অনু ফের ওক তুলতে ছুটে গেল, কেউ আর যেন সাহায্যের জন্য আসছে না—হায় অনু, জননী অনু এবার ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ চোখ বসে যাবে। হায় অনু জননী অনু, পেটের নীচে হাত রেখে মানুষের অথবা ডিম্বকোষের হত্যার জন্য ছটফট করতে থাকল—দূরে কারা যেন কেবল হাসছিল, বিজয়িনী অনু, গরবিনী অনুর চেহারা দেখে হাসছিল। ঠিক সুলতার হাসি যেন। প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মত, সুলতা এই সব বলে হাসছিল। অনু ফের তলপেটে হাত রেখে সেই নির্দিষ্ট ডিম্বকোষটিকে

টিপে ধরতে চাইল, হায় অনু—জননী অনুর অকপট ভালবাসা সন্তানের জন্ম দিতে পারল না। হায় অনু জননী অনুর সন্তান ইচ্ছার বিরুদ্ধে জন্ম নিচ্ছে। সুতরাং হায় অনু, জননী অনু এখন কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছে। হায়-ওর সোনার ঈগল পাখিটা মাঠ পার হয়ে এখন যথার্থই শেষ পর্যন্ত উড়ে চলে গেল।

ভোর থেকে অনু সব লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল—সুভাষ ভোর বেলায় অন্য দিনের মত সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেনি। অন্যদিনের মত উঠেই বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে নি, অথবা বাথরুমের কাজটুকু সেরে টেবিলে বসে দৈনিক কাগজ পড়তে পড়তে বাজার সম্পর্কে হিসাব এবং অন্য সব দৈনিক খুঁটিনাটি প্রশ্ন—সুভাষ আজ কিছুই করছে না—বস্তুত, সুভাষ যেন এখনও বিছানায় শুয়ে আছে, এবং বিছানায় শুয়ে যথার্থই ঘুমোচ্ছে।

অনু বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারছে না। মাথা তুললেই, শরীর মনে হয় পাক দিচ্ছে এবং ভিতর থেকে সেই ওক অনবরত উঠছে। কিছু কমলার খোসা যা অনু সব সময় নাকের কাছে রাখতে চাইছে, অথচ সেই ওক- কিছু খেতে রুচি নেই—সারাদিন ধরে সারা মাস ধরে এই এক অসহ্য কষ্ট চলছে। যত এই অসহ্য কষ্ট তত সুভাষের উপর নিদারুণ ঘৃণা, এবং ক্রমশ যেন অনু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল সুভাষ কুৎসিত এবং এই দুঃখকর জীবনে অনুকে ফেলে দিয়ে সুভাষ ভিতরে ভিতরে পরিহাস করছে।

অনু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ডাকল, রাম, রামচরণ।

রাম এলে বলল, বাবু অফিস যাবে না আজ?

—মা জানি না তো। বাবুতো এত বেলা ঘুমোন না।

—আস্তে আস্তে আরও কত কিছু দেখবি।

—আমি ডেকে তুলব বাবুকে।

—ডেকে তুলতে হবে না। বলে অমু বিছানার নীচ থেকে চাবি বের করে দিল। বলল, ডালা খুলে টাকা নিয়ে যা। বাজার নিয়ে আয়। তোর রান্না তুই করে রাখ।

—আপনার জন্য কিছু আনব?

—কি আনবি বল, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—ছুটো শুকনো মুড়ি খাবেন? এ সময় মুড়ি খেলে মুখে স্বাদ আসে।

—না আমার কিছু লাগবে না।

—শরীর আপনার ভেঙে যাচ্ছে।

—আর আমার শরীর! এই বলে অমু পাশ ফিরে শুল।

রাম দেখল বারান্দা দিয়ে তেমনি আলো আসছে ঘরে, তেমনি পার্কে পার্কে কোলাহল। তেমনি মানুষেরা সব পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোথাও চলে যাচ্ছে—রাম এ সংসারের দুঃখটা কোথায় ধরতে পারছে না। সে কিছু টাকা বের করল আলমারি থেকে, বাজারের থলে নিয়ে নামার সময় সিঁড়ির মুখে শুনল, বাবু ডাকছেন, রাম, রামচরণ!

—যাই বাবু। রামচরণ ফের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলে বলল, ভাল আপেল আনবি। ভাল মুগের ডাল আনবি, আর মাংসের হাড় আনবি। সব এক সঙ্গে সিদ্ধ করে জুস দিবি দিদিমণিকে খেতে। না খেলে আমাকে সব বলবি। বলে, প্রায় জোর করে যেন একবার পাশের বিছানার দিকে তাকাল।

তাহলে লোকটা মশারির নীচে শুয়ে শুয়ে সব শুনছে। অমু ভাবল, এখন মানুষটা ওর দিকে তীক্ষ্ণ এক ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে। ওর ভয় ভয় করছিল। সুতরাং ও বাধা দিতে পারল না। সুতরাং রামচরণ বাজারে চলে যাচ্ছে। ওর শেষ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

—ওটা তো তুমি চাইছিলে।

তিক্ততা বাড়বে দেখে সুভ আর কথা বলল না। কিছুতেই সুভকে সহ্য করতে পারছে না অনু। ভিতরে ভিতরে সেই ঘৃণার তাপ এত প্রকট অথবা সব সময় এক অস্বস্তিকর পরিবেশ—যেন সুভ হত্যাকারী যুবক, যেন সুভ অনুকে কেবল নরকে নেমে যেতে বলছে।

যতক্ষণ সুভ বাড়ির ভিতরে ছিল ঠিক ততক্ষণই অনু বিছানাতে শুয়ে ছটফট করছিল। এবং যেই সুভ অফিসে বের হয়ে গেল, যেই রামচরণ একটু ফাঁক পেয়ে রাস্তায় নেমে অন্য ফ্ল্যাটের একজন পরিচারকের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল—অনু সেই মুহূর্তে ডায়াল করল, ওর প্রায় হাত এবং শরীর কাঁপছিল। সে কোন রকমে কাপড় এবং চুলের বিন্যাস হাতে ঠিক করে বলল, হ্যালো, কে অসীম, কোন খবর হলো?

অসীম বলল, না অনুদি।

—কবেতক মনে হয় হবে?

—সব খুলে বলতে হবে। ফোনে একটু অসুবিধা আছে।

—তবে তুপুরের পর এখানে চলে এস না?

—যাব। বলে সে ফোন ছেড়ে দিল।

তারপর অনু একটু শ্বাস নিল। শরীর তুর্বল বলে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারছিল না। পাশের একটা মোড়া টেনে বসে পড়ল এবং পরে ধীরে ধীরে ফের ডায়াল করল—হ্যালো, হ্যালো।

অন্য প্রান্ত থেকে কথা ভেসে আসছে। সুতরাং অনু ক্রস্ কানেকসান বুঝে রিসিভার রেখে পুনরায় ওক উঠে আসছে বলে কমলার খোসা নাকে-মুখে দিয়ে বসে থাকল এবং দেখল আয়নায় ওর সেই প্রতিবিম্ব আর ভাসছে না। শীর্ণ চোখ-মুখ মনে হচ্ছে। মুখে স্বাদ নেই। একটু ঘোলের সরবৎ খেলে হতো। রামচরণকে ডাকতেই একটা কাক এসে কার্ণিসে বসল, এবং কা-কা করে ডাকছে। বড় বিশ্রী এবং নির্জন মনে হচ্ছিল এই কাকের ডাকের

শব্দ। আর দূরে কোথাও হয়তো উৎসবের বাজনা বাজছে। মাইকে কে যেন অনবরত কি ঘোষণা করে চলছে। অনু ফের ডাকল, রামচরণ। সিঁড়ি ধরে কে উঠে আসছে—সম্ভবত রামচরণ। অনু ফের ডাকল, রামচরণ। কিন্তু দেখল, বাবা উঠে আসছেন। সে বাবার মুখ দেখে তাড়াতাড়ি বলল, তুমি! তোমরা কবে এলে!

বাবা ভিতরে ঢুকে প্রথমে লাঠি রাখলেন। তারপর বললেন, সুভ অফিসে বের হয়ে গেছে!

—এইমাত্র বের হয়ে গেল।

—তোর শরীর খুব খারাপ লাগছে, কোন অসুখ করে নি তো!

—না, এমনি।

—ডাক্তার দেখিয়েছিস?

—কি হয়েছে যে ডাক্তার দেখাব!

—হুঁ। বলে তিনি চারদিকে একবার তাকালেন। তারপর বুঝলি অনু হঠাৎ চলে এলাম তোর মাকে নিয়ে। কাউকে কিছু জানালাম না। বুঝলি এখন আর কোথাও গিয়ে ভাল লাগে না। বুঝলি অনু ষ্টেশনে নেমে সোজা চলে এলাম তোর কাছে। তোর মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বলে তিনি আর একবার ভাল করে যেন অনুকে দেখলেন। এবং চোখের নীচে কালো বিশাল এক দাগ—তিনি আরও কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁরে অনু, তোকে দেখে তো আমার ভাল লাগছে না।

অনু কিঞ্চিৎ ম্লান হাসল, ও এমনি।

—না, এটা তো ভাল নয় মা! সুভকে ধমকে দিতে হবে। বলে কিছু অসংলগ্ন কথা বলে ফেললেন। বুঝলি মা, মনে হচ্ছিল কতদিন তোকে দেখিনি। খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। অথচ এসে তোর এই মুখ দেখব—প্রৌঢ় হতাশ গলায় কথাটা বলে ফেললেন।

অনু তারপর অন্য কথায় আসতে চাইল, তুমি বোস, একটু চা করে আনছি।

—আমি আর এখন বসব নারে, বলে প্রৌঢ় মানুষটি লাঠি হাতে করে বললেন, বিকেলে তুই চলে যাস সুভকে নিয়ে। তোরা আজ ওখানেই খাবি।

অনু কিছু বলল না। শুধু বাবাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। এবং সে কোন রকমে দরজা ধরে রেখেছিল। বাবা নেমে যাচ্ছেন, বাবা ওর চেহারা দেখে কিছু আঁচ করে চলে গেল না তো! সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে, ফের রিঙ করল, হ্যালো, হ্যালো, কে, প্রীতি, আমি ডাক্তার প্রীতি জোয়াদ্দারকে চাইছি।

—ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।

—কে, প্রীতি!

—হ্যাঁ।

—আমি অনিমা বলছি।

—অঃ, তুই অনু! কি খবর?

—আর খবর কি! তুই কিছু কর?

—কিছু কাজ হলো না?

—না প্রীতি। তুই তেজী ওষুধ দে।

—আমি চেষ্টার ক্রুটি করছি না। তুই রামচরণকে বিকেলে পাঠিয়ে দিস। এটাই শেষ। যদি কিছু না হয়···বলে প্রীতি ঢোক গিলল যেন।

—তুই যা বলবি আমি তাই করব প্রীতি।

—কিন্তু এতে তোর কর্তার অনুমতির প্রয়োজন হবে।

—সে হবেখন। এটা তাড়াতাড়ি করলে হয় না।

—সব কিছু তাড়াতাড়ি হয় না অনু। কিছু কিছু ঘটনা দেরী করে ঘটাতে হয়।

—এদিকে যে বাবা মা বেনারাস থেকে চলে এসেছেন। মা দেখলেই টের পাবে। কি করি বল। ওকটা কিছুতেই থামছে না। ভাতের গন্ধ সহ্য করতে পারছি না। রান্না ঘরের দিকে গেলেই বমি আসে

প্রীতি। আমি আর কত কষ্ট করব। যখন ওক্ উঠে আসে তখন মনে হয় প্রীতি এই বুঝি শেষ। দম বন্ধ হয়ে আসে। কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে অনু সামান্য সময় হাঁফাচ্ছিল তারপর ধরা গলায় বলল, সব তোর উপর নির্ভর করছে।

—খালি পেটে থাকবি না। কিছু ফলটল খাবার চেষ্টা কর।

—মাথার কাছে ফল এক গাদা পড়ে আছে। লোকটাতো আমাকে কিছু খাওয়াতে পারলেই বাঁচে।

—মানুষটার বাপ হবার সখ ভয়ঙ্কর। প্রীতি রসিকতা করতে চাইল।

সুভ সম্পর্কে অনু অন্য কোন কথা বলল না। এত তিক্ততা সত্ত্বেও সুভকে ছোট করার ইচ্ছা অনুর কখনও হয় না অথবা যেন সুভ সম্পর্কে রসিকতা করা অপমানকর—সুতরাং অনু মানুষটা সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে সোজা বলে দিল, তবে বিকেলে রামচরণ যাচ্ছে।

—তা পাঠিয়ে দে, বলে প্রীতি ফোন ছেড়ে দিল।

ফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ফের দেখল কে যেন রিঙ করছে। সে রিসিভার কানে রেখে ডাক্তারের মত বলল, বলুন।

—প্রীতি জোয়াদ্দারকে চাইছি, ডাক্তার প্রীতি জোয়াদ্দার।

—আমি ডক্টর প্রীতি জোয়াদ্দার বলছি।

—আমি শ্রীসুভাষ চ্যাটার্জী।

—অঃ, বলুন! কি ব্যাপার!

খুব কাঠ কাঠ গলায় সুভাষ যেন বলছে, আপনি আর দয়া করে অনুকে ট্যাবলেটগুলো খেতে দেবেন না।

প্রীতি প্রথম কোন কথা বলতে পারল না, বিশেষ করে ভীষণ তোতলামিতে ওকে পেয়ে বসল। সে কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে সুভাষ ফের বলল, এ ব্যাপারে অনুকে অন্তত আপনার বলা দরকার ছিল, আমার একটা মতের প্রয়োজন আছে।

প্রীতিও এবার খুব কঠিন করে ফেলল মুখ এবং খুব শক্ত হতে চাইল।

—ও কথা আমাকে না বলে আপনার স্ত্রীকে কি বলা উচিত নয়? এটা তো আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাকে আর টানছেন কেন? কারণ এ-সব ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে আমরা বুঝি এতে উভয়ের সায় আছে।

—আমার সায় নেই। সুভাষ আর কোন কথা না বলে রিসিভার রেখে দিল।

প্রীতি ফোনের ভিতরই শব্দ করল, হুঁ! প্রীতির সমস্ত রাগ অনুর উপর গিয়ে পড়ল। ভাবল এখনই ফোন করে অনুকে ভাল মন্দ কিছু বলে, অথবা অনু যেন কচি খুকি! তুই জানিস না কিসে কি হয়। প্রীতি রাগে দুঃখে পাশের একটা চেয়ারে মাথা গুঁজে বসে পড়ল এবং এক ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি—অনু ওর বন্ধুর মত—অনুর জন্য সে সব করেছিল এবং নিজের দুঃখ নিজে গিলে বসে থাকার মত চোখ মুখ এখন প্রীতির।

আর অনু সেই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখছিল। একটু সরবৎ খাওয়ায় শরীরটা কিঞ্চিৎ হাল্কা লাগছে। এবং যেহেতু রামচরণ নেই—যেহেতু নির্জন মনে হচ্ছিল এই ঘর-দোর এবং চারধারে দেখে যখন বুঝল—সে যদি জানালা বন্ধ না করেও বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখে তবে কিছুই বিসদৃশ মনে হবে না। সে প্রথম চুল টেনে দেখল, মনে হল, চুল হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। সে দাঁত দেখল এবং চিবুক দেখল—সেই লাবণ্য শরীরে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওর এত সোহাগের শরীর ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে দেখে এবং সব অভিনয়, নাচ অথবা গান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে ওর চোখে জল এসে গেল।

বিছানার পাশে কিছু হাল্কা উপন্যাস রয়েছে। সে অনেকবার পড়ার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পারেনি। কিছুই ভাল লাগছে না।

রাত্তে বাবা খেতে বলে গেছেন—যেন সুভ ষড়যন্ত্রটা চারিদিকে পরিকল্পনা মত করে যাচ্ছে। নতুবা বাবা অসময়ে চলে আসবেন কেন, এবং এসেই রাত্রে খেতে বলবেন কেন। সুতরাং অনু ভাবল, পেটের সামান্য গোলমাল দেখিয়ে সে রেহাই পাবে আর অসীম আসবে দুপুরে, অসীমের সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে। অসীম এ-সব ঝামেলার আগে এসেছিল। আর এখন এসে অনুর এই শরীর দেখলে সে আঁৎকে উঠবে, বলবে আপনি অসুস্থ অনুদি, আপনি এ-সময় কাজ করবেন কি করে—আপনি প্রথম অভিনয় করবেন পর্দায়। প্রথমে আপনার অনেক সাধনার প্রয়োজন হবে। শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার কঠিন দায়িত্ব আপনার, আপনি এ-শরীরে কিছুতেই পেরে উঠবেন না। অথবা বলবে, কি হয়েছে আপনার, ভাল ডাক্তার দেখিয়েছেন তো, অথবা বলতে পারে, তবে আপাতত ছবির পরিচালককে বলা যাবে সব কথা, তিনি তার এই বইয়ের জন্য অন্য নায়িকা নিযুক্ত করুন। অনু আর ভাবতে পারছিল না। সব যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাতের এত কাছে সোনার আপেল, এত কাছে সব যশ—হায় অনুর সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। সে মনে মনে প্রীতির নাম উচ্চারণ করল—প্রীতি ওর কাছে এখন ঈশ্বরের মত।

সে সারা দুপুর অসীম আসবে ভেবে সাজতে বসে গেল, যেন অসীম কিছুতেই টের না পায়—সে জননী হতে যাচ্ছে, যেন কিছুতেই ধরতে না পারে, অনু ভাত খেতে পারে না, কোন খাবারের গন্ধ নাকে গেলে ওক ওঠে আসে—হায় কত দুঃখ এই সন্তান ধারণে আর জননী হতে গিয়ে এক অপরিসীম নৈরাশ্য। অনু বারবার মুখে প্রসাধন মাখার সময় দেখল চোয়ালের সামান্য উঁচু হাড় এই প্রসাধনে কিছুতেই ঢাকা পড়ছে না। চোখ বসে গেছে এবং ব্লাউজের হাতা ঢিলে দেখাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি সূচ-সুতো নিয়ে হাতা ছোট করে নিল, ভাল ফুলের জন্য রামচরণকে বাজারে পাঠাল এবং

সোফা অথবা দেয়ালের কোথায় কি রাখলে ভাল দেখায় সে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তা ঘুরে ঘুরে নির্বাচন করল।

শরীর অসুস্থ বলে সময় কাটছিল না। বাথরুমে শরীরের ভিতর সামান্য এক জীব বাসা বেঁধেছে ভাবতেই সে বসে পড়েছিল। তারপর সময় নিয়ে দাঁত মুখ ঘসে স্নান করেছে। মুখের দুর্গন্ধ যেন কিছুতেই যাচ্ছিল না। সে কতবার দাঁত মাজল, কতবার হাঁ করে স্নানের ঘরে বড় আয়না দেখল, কিন্তু দুর্গন্ধ মরে যাচ্ছে না। শরীরের সর্বত্র দুর্গন্ধ লেগে আছে—এক অদ্ভুত শুচিবাই তাকে পেয়ে বসেছে। মুখে থুথু উঠছে কেবল। সেই থুথু গিলে ফেলতে ঘেন্না হচ্ছে। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল, কতক্ষণ এই থুথু মুখে রেখে সে কথা বলতে পারবে অসীমের সঙ্গে, বারবার থুথু ফেলার জন্য উঠে গেলে সব ধরা পড়ে যাবার ভয়—হায় অনু কিছুই আর এখন ভাবতে পারছে না।

সময় কাটছিল না—দরজার নীচে সিঁড়ির মুখে জুতোর শব্দ পাবে আশা করছে অনু। গাড়ি পার্ক করার শব্দ হবে নিশ্চয়ই। সে সেজেগুজে বসে থাকল। সে নীল হাল্কা প্রজাপতির মত ফুর ফুর করে উড়তে চাইল। যত সে উড়তে চাইল তত এক ভারী বস্তু ওর পায়ে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। সে উড়তে পারছে না। সে এবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠোঁটের এত চড়া রঙ যেন ঠিক হয় নি। ঠোঁটের রঙটা আরও মার্জিত হওয়া উচিত ছিল—এমন এক রঙ যা তরমুজের মত, এমন এক রঙ যা গোলাপের মত, সে সারা ঘরে, পর্দায়, ফুলে এমন কি ছবির ফ্রেমে গোলাপী রঙের আভা চাইল।

এমন সময় শুনল দ্রুত সিঁড়ি ধরে কে যেন উঠে আসছে। ঘোড়ার কদমের মত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সেই ঠক ঠক দ্রুত জুতোর শব্দ সিঁড়ির মুখে সহসা থেমে গেল। তারপর সেই বেল টেপার শব্দ। অনু ধীরে ধীরে দরজা খুলে দিল। অসীম কালো রঙের স্যুট পরেছিল

বলে শরীরের রঙ অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সহসা অন্নু ভাল ভাবে তাকাতে পারছিল না। শরীরের গ্লানির জন্য হোক অথবা থুথু ওঠার জন্য এক ধরণের হীনমন্যতা—অন্নু দরজা খুলে প্রায় পাথরের মত মুখ করে হাসার চেষ্টা করল।

অসীম ঠিক অন্নুর মুখের সামনে নুয়ে বলল, প্রায় সব ঠিক। তারপর দরজা পার হতে গিয়ে দেখল ঘরের রঙ আজ অন্য রকম—গোলাপী রঙের পর্দা, টেবিলে দামী মখমলের চাদর, গোলাপী রঙ সর্বত্র দেয়ালে এবং ছবির ফ্রেমে পর্যন্ত, হলুদ রঙের গোলাপ টেবিলের ওপর শোভা পাচ্ছে। অসীম বসেই কোন কথা না বলে একটা পত্রিকা হাতে তুলে পাতা ওল্টাতে থাকল। দরজায় যেভাবে দাঁড়িয়েছিল অন্নু ঠিক তখনও সে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অন্নু কাছে যেতে যেন সাহস পাচ্ছে না। সে নিজেকে তবু সপ্রতিভ রাখার ইচ্ছাতে জোর করে গিয়ে ওর সামনের চেয়ারে বসল। তারপর বলল, কি খাবে বল?

—এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অফিস পালিয়ে এসেছি। এক কাপ কফি হলে মন্দ হয় না।

—সঙ্গে কিছু?

—না। স্রেফ কফি।

—আমাকে স্ক্রিপটা একবার সব দেখাবে বলেছিলে।

—সব দেখাব। মামাবাবু লোকেসান ঠিক করতে দলবল নিয়ে বের হয়ে গেছেন।

—আমাদের নিলেন না।

—তিনি লোকেসান ঠিক না করে আমাদের কিছু বলবেন না।

—কোন কন্ট্রাক্ট হল না তো!

—সে তো একটা সইয়ের ব্যাপার।

মুখে থুথু জমছিল অন্নুর, ফলে শেষের দিকের কথাগুলো ভারি শোনাচ্ছিল।

অসীম বলল, আজ বিকেলের ট্রেনে আমিও বের হয়ে পড়ছি। লোকেসানের জন্য কিছু সট আমিও নেব। মামাবাবুর পছন্দ হলে তিনি সেখানে চলে যাবেন।

—খুব খরচ-পত্র হবে মনে হয়।

—শাঁসালো পার্টি। খরচপত্র না করলে চলবে কেন।

—কেমন লোকেসান নির্বাচন করতে চান?

অসীম কথা বলতে বলতে কি যেন লক্ষ্য করছিল গোপনে।

অনু বলল, বোস, আমি একটু ভিতর থেকে আসছি। সে নিজের প্রশ্নের জবাব শোনার সময়টুকু পর্যন্ত দিতে পারল না। মুখ এত ভারী হয়ে উঠেছে থুথুতে এবং ভিতর থেকে শরীর এত বেশী গা গুলোচ্ছে যে অনু প্রায় ছুটে যাওয়ার মত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অসীম দেয়ালের সব ছবি দেখছিল বসে বসে। সে বিপরীত দিকের দেয়ালে এক রজ্জুর মত ছায়া দেখতে পেল সহসা। আর মনে হচ্ছিল বাথরুমের ভিতরে কে যেন বসে বসে কাঁদছে। মনে হচ্ছে অনুদি গলাতে আঙুল দিয়ে বমি করছেন। বাথরুমের দরজা জানালা এবং সব ঘুলঘুলি ভাল করে বন্ধ করা ছিল বলে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছিল। অনুদি ভাল করে দরজা জানালা বন্ধ করে নিয়েছেন। ওর বারবার উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল অনুদির কাছে এবং কি এক কারণে সে কিছু গোলাপের পাপড়ি অন্যমনস্কভাবে গিলে ফেলল। তারপর দেওয়ালের সব ছবি দেখার অছিলায় উঠে দাঁড়াল এবং ঘুরে ঘুরে বারবার দরজা অতিক্রম করার বাসনা তার এবং তখনই সিঁড়ির মুখে কার পায়ের শব্দ। রামচরণ সম্ভবত উঠে আসছে। সে প্রায় চুরি করেই সামনের একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে একটা বড় লম্বা মাদ্রাজী চুরুট মুখে পুরে দিল।

রামচরণ বলল, বাবু আপনি! যেন বলার ওর ইচ্ছা ছিল, এই অসময়ে আপনি!

—একবার যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, অনুদির সঙ্গে একটা জরুরী দরকার ছিল।

রামচরণ এতটা জবাব আশা করে নি। এবং রামচরণ এই ধরণের প্রশ্ন করে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল, কিন্তু বাবুর কথায় সে মনে মনে নিজের গুরুত্বটুকু ধরে ফেলে উৎসাহিত বোধ করল। সে বলল, মামণি!

—তিনি কোথায় গেলেন যেন। সে, বাথরুমে গেছে বলতে পারত। কিন্তু 'বাথরুম' কথাটা বলতে সংকোচ বোধ করছিল। সে ভাল করে তখন রামচরণের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলতে পারছিল না। ভিতরে ভিতরে এক ভয়ঙ্কর অপরাধবোধ কাজ করছে। এই অসময়ে আসা ওর যথার্থ উচিত হয় নি। সে নিজের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট পেতে থাকল। অথবা এও হতে পারে ভিতরে ভিতরে অনুদিকে খুব একা পাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, সে রামচরণের অবস্থান সম্পর্কে বেমালুম ভুলে গেছিল। অনুদির কাছাকাছি থাকার নিরন্তর এক বাসনা অসীমের, সে সময়ে সময়ে এটা বুঝতে পারে। এবং যত কাছাকাছি থাকার বাসনা জন্মায় তত অসীম দূরে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে সে খুব অসহায়। কারণ সময়ে সময়ে কোন নির্জন নদী অথবা কোন ঝরণার উৎস মুখে সে শুধু এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ দেখতে পায়, সেই চোখ অনুদির এবং সেই সহাস্য মুখে কোন দুঃখের ছবি ফুটে থাকে না।

অসীম এভাবে চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর ভেবে বলল, তুমি কেমন আছো রামচরণ?

—ভাল আছি বাবু। বারান্দা থেকে রামচরণ কথা বলছিল।

বাথরুমে সেই ক্ষীণ ওকের শব্দ কমে গেছে। তখন বাথরুমে দরজা খোলার শব্দ এবং অনু সোজা বসার ঘরে না ঢুকে শোবার ঘরে সেই বড় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ ধোবার জন্য সব রঙ মুখের উঠে গেছে। আর সেই চোখ, চোখের নীচে কালো দাগ

স্পষ্ট—চোখ ক্রমশ ভেতরে ঢুকে বসে যাচ্ছে। অনু তাড়াতাড়ি প্রসাধন করে বসার ঘরে ঢুকে খুব কুশলী নায়িকার মত বলল, আমি তো তোমার দিনরাত স্ক্রিপ্টের নায়িকার মত মুড্ নিতে চেষ্টা করছি। তারপর অনু থেমে থেমে বলল, এটা আমার প্রথম বই, আমি খুবই সিনসিয়ারলি অভিনয় করার চেষ্টা করব।

—চরিত্রটা যে খুব আপনার কঠিন! আমি তো একজন আপস্টার্ট পুরুষের অভিনয় করব। আমার পক্ষে চরিত্রকে রূপ দেওয়া খুব কঠিন হবে না। কিন্তু আপনার চরিত্র বাপ্স, ভাবতেই ভয় লাগে।

—আমার কিন্তু অসীম এতটুকু ভয় লাগছে না। যে জায়গাটুকু ভয়ের ছিল, সেটাও ভেবে দেখলাম খুব ভয়ের নয়। অথবা বলার ইচ্ছা যেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বৈধব্যের সহিষ্ণুতা এবং নতুন ভালবাসার জন্য, অথবা সংসার এবং সমাজের প্রতি অকপট ভালবাসা—আমার চরিত্রে যে সবই আছে অসীম। এখানে অনু কিছুক্ষণের জন্য থামল।

অসীম বলল, কৈ কফি কি হলো।

অনু বলল, হচ্ছে। তারপর নিজের হাতের তালুতে কি দেখে বলল, বুঝলে অসীম, আমি মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই চরিত্রকে মনে করে অভিনয় করে দেখেছি—মারাত্মক—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বিরহকাতর মুখ আমার মুখে খুব আন্তরিক দেখায়, যা হবে না! অনু ভিতরের সবটুকু খুলে বলতে পারছে না। অসীম ধরতে পেরে বলল, খুব আন্তরিক মনে হয়?

—খুব।

—একবার সাদা কাপড় পরে দেখেছেন?

—না।

—এগুলো অনুদি দেখা দরকার। আপনার সেই সাদা কাপড়ের ভিতর মুখ কেমন দেখায় একবার দেখবেন।

—আজকাল তো বিধবা বৌরা সাদা কাপড় পরে না।

—কিন্তু তোমার শ্বশুর শাশুড়ী যে ভয়ঙ্কর ধর্মভীরু।

—শ্বশুর শাশুড়ীকে বুঝিয়ে নেওয়া যাবে। বলে অনু হো হো করে হেসে উঠতে গিয়ে দেখল তলপেটে কেমন খিল ধরে গেছে। সে উপোসী শরীরে ভালভাবে কথা বলতে পারছিল না। অথচ সে কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা রাখে নি। এবং ধীরে ধীরে মনে হচ্ছিল সে অস্থির হয়ে এখানেই গড়িয়ে পড়বে।

অসীম সে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল না। কারণ সে আজকাল অনুদির মুখের দিকে বারবার তাকাতে পারে না। বেশী সময় তাকিয়ে থাকলে মনে হয় চোখে এক ধরণের আবেগের জন্ম হচ্ছে যা অনুদিকে ভালবাসার কথা বলে দেবে, এবং অনুদি ভাববেন, অসীম আর সেই অসীম নেই—অসীম ক্রমশ চরিত্রহীন অসীম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে বলল, সেখানে তো আপনার আমার শ্বশুর বলেন, শাশুড়ী বলেন সব সেই এক পরিচালক। তার ইচ্ছাতেই কাজ হবে।

—যদি সাদা থান পরতেই হয় ক্ষতি কি ?

রামচরণ কফি এনে মাত্র এক কাপ রাখল। অসীম ভেবেছিল অনু আর এক কাপ আসবে এবং দু'জন এক সঙ্গে কফি খাবে।

অনু অসীমকে বসে থাকতে দেখে বলল, কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে।

—আপনার কফি ?

—আমি এখন ডাইট কণ্ট্রোল করছি।

—কফির সঙ্গে ডাইট কণ্ট্রোলের কি সম্পর্ক !

এবার অনু সরল বালিকার মত বলে ফেলল, অসীম আজকাল আমার কফি সহ্য হচ্ছে না। আর বলে ফেলেছিল, আজকাল আমি আর কিছু মুখে দিতে পারি না, ক্রমশ আমি না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছি।

অসীম বলল, আপনাকে কিন্তু সামান্য রোগা দেখাচ্ছে।

'সামান্য নয়, খুব' কথাটা বলতে পারত অনু। কিন্তু না বলে, সে বলল, সামান্য রোগা দেখাচ্ছে—তা দেখাবে অসীম, আমাকে প্রীতি বলছিল, শরীরে চর্বি জমা হচ্ছে। প্রীতি আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছে না।

অসীম বলল, প্রীতি!

—হ্যাঁ প্রীতি আমার ডাক্তার বন্ধু। আগের মত নাচতে পারি না বলে একদিন ওকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল, চর্বি জমছে। অনু ফের কি ভেবে বলল, আচ্ছা অসীম, আমাকে কুৎসিত দেখাচ্ছে না তো!

—না না কি বলছেন অনুদি। বরং সামান্য শুকনো ভাব আপনার মুখকে ফরাসী দেশের মেয়েদের মত করে দিচ্ছে।

এমন সময় রামচরণ দুধ নিয়ে এল। আর এমন সময় দেয়ালের গোলাপ ফুল খসে পড়ে গেল নীচে আর মনে হল সকলের, ঘরে এক ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। অনু চীৎকার করে বলল, রামচরণ পশ্চিমের সব জানালা বন্ধ করে দাও। বলে সে প্রায় টলতে টলতে বাইরে বের হয়ে মুখের থুথু ফেলে এল।

অসীম বলল, বুঝলেন অনুদি মামাবাবু বলছিলেন···।

অনু হাবা হাবা মুখ করে বলল, কি বলছিলেন অসীম?

—বলছিলেন সামান্য আলিঙ্গন আছে।

—সে তো সাধারণ ব্যাপার।

—বলছিলেন তিনি নতুন কিছু করবেন।

—যেমন?

—তিনি ভাবছেন আমাদের সাধারণ বাংলা বইকে ভালবাসার ক্ষেত্রে সামান্য বাঙালী করে রাখতে চান না!

—কি করতে চান?

—একটু ফরাসী ফরাসী ভাব থাকবে।

—কোন অশ্লীলতা না থাকলেই হল।

—অশ্লীলতা অনুদি রিলেটিভ ব্যাপার।

—পরিচালক যখন বাঙ্গালী…।

—তিনি কিন্তু অনেকদিন ফরাসী দেশে ছিলেন।

—অনেকদিন!

—তা প্রায় অনেকদিন। বিশে গিয়েছেন প্যারিসে—চল্লিশে ফিরেছেন।

—বিশ বছর তিনি সেখানে! এ-সব কথা তো তুমি আগে কখনও বলনি অসীম।

—ও-আর তেমন বলার কি অনুদি। তিনি ভাল ছবি আঁকেন। তাঁর ছবির ক্ষেত্রে বাইরের জগতে নাম আছে—একথা আপনাকে বলেছি।

—প্যারিসে তিনি ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন?

—অবশ্য শেষ দিকে আর ছবি আঁকা হয়ে ওঠেনি। তিনি সুভেলবাগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

—বল কি অসীম!

যেন স্বপ্নের ভিতর অনু চলে যাচ্ছিল। যেন সেই ছবি—কোন এক পরিচালক যাচ্ছেন বিদেশে—ওর ছবি সেখানে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছে—সঙ্গে নায়িকা আহা, সেই বিমান বন্দরে কত জনতা, কত ভালবাসার মুখ। অনু চোখ বুজে ফেলল সহসা। তারপর নিজের ভিতরে প্রবেশ করে কোথায় তার সেই সব ডিম্বকোষ লুক্কায়িত আছে অথবা সেই সব জাতকের ছবি—অনু শিউরে উঠল। কারণ তার ভিতরে সুভ নামক কোন জন্তুর ছানা সমুদ্রের মত আঁধারে এখন কেবল সাঁতার কাটছে। ওর শরীরের ভিতর অথবা বলা যেতে পারে সেই আঁধারের ভিতর ছানা পোকাটি এখন কেবল সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে ঘৃণায় দুঃখে বসে থাকতে পর্যন্ত পারছিল না। সে সোফার উপর গা এলিয়ে ঘুমিয়ে যাবার মত শুয়ে পড়ল।

অসীম বলল, আপনার অভিনয়ে কোন অসুবিধা হবে না তো!

চোখ বুজেই অনু বলল, না। তুমি মামাবাবুকে বলো কিছুতেই কোন অসুবিধা হবে না।

—এখন উঠি তবে।

—আচ্ছা।

অনু চোখ বুজেই টের পেল অসীম সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে। ওর চোখ খুলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ওর সোফা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছিল কেবল সেই স্বপ্নের ভিতরে এক মঞ্জিল আছে, মঞ্জিলে এক ভ্রমর আছে আর সেই ভ্রমরের ঠ্যাং ধরে বসে আছে সুভ নামক এক যুবক। যেন কোন বাড়াবাড়ি ঘটলেই সেই যুবক ঠ্যাংটা ছিঁড়ে অনুকে খোঁড়া করে দেবে।

বিকেল ক্রমশ মরে যাচ্ছিল। অনু বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে এবং ব্যালকনি পার হলে ফ্ল্যাট বাড়ির ছোট লন। লনে ছিন্নভিন্ন সব ডালিয়া ফুল এবং পরে পথ, আর পথ অতিক্রম করলেই সেই মনোরম পার্ক। সুভ আসবে সন্ধ্যা হলে। রামচরণ প্রীতির কাছে চলে গেছে ওষুধের জন্যে। খুব একা একা মনে হচ্ছে। অন্য ফ্ল্যাট বাড়ির যুবক যুবতীরা বের হয়ে যাচ্ছে। কোন ফ্ল্যাটে ঝন ঝন করে কাঁসার বাসন পড়ার শব্দ শোনা গেল। অনু বসে বসে এখনও যেন সেই অসীমের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে স্বামীর মৃত্যুর পর ছবিতে নায়িকার মুখ যেমন হওয়া দরকার বসে বসে ছোট একটা আয়না নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রিহার্সেল দিচ্ছিল। সুতরাং কিছু শব্দ শুনলেই সে আতঙ্কে উঠছে।

অনুর এই ভালবাসার মুখ আয়নায় ধরা পড়ছে না, সে বারবার আঁচল দিয়ে আয়নাটা মুছে ফের মুখ দেখল। কিন্তু চোখ যত ভারি করে ফেলছে, চোখে যত করুণ এক শোকের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছে তত আয়নাটা যেন ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করছে, তত আয়নায় মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অনু রাগে দুঃখে ইজিচেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। আর ঠিক বড় আয়নার সামনে

ইজিচেয়ারটা রেখে সে তার ওপর ভাল করে বসে সব শরীর দেখল তারপর ফের মুখে চোখে সেই শোকসন্তপ্ত ছবি—কপালে সিঁদুর নেই এবং সাদা থান পরনে অনুর কোমল অঙ্গ আগুনের মত জ্বলছিল। আর ঠিক দরজার মুখে সুভাষ সব লক্ষ্য করে লজ্জায়, দুঃখে মরে যাচ্ছিল। সুভাষ পর্দা সরাল না, ঘুরে সে ঘরে ঢুকে গেল এবং পা টিপে টিপে ঠিক টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে ঘুরে দাঁড়াল। এক পাশ থেকে সুভ সব দেখছে। অনু চেহারায় নটীর মত হাতে মুখে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ফুটিয়ে তুলছে। সাদা থানের ভিতর অনুর কোমল শরীর আগুনের মত জ্বলছিল। সুভাষ খুব সন্তর্পণে—যাতে আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব ফুটে না ওঠে অথবা যাতে কোন শব্দ অনুর এই নির্লজ্জ ইচ্ছাকে ব্যাহত না করে—সুভ ঘুরে ঘুরে দেখছিল অনু পাগলিনী প্রায় রিহার্সেল দিচ্ছে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। সোনালী আভা এই নগরীর কোলাহলের ভিতর নেমে আসছিল আকাশ থেকে। পথ ঘাট এবং পাখ পাখালি অথবা পার্কের সব গাছে এখন এই সোনালী আভাটুকু বড় মায়াময়। জানালার কোন প্রান্ত থেকে অনুর মুখে কিঞ্চিৎ সোনালী রঙ লেগে গেছে। ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং বসার ঘরের সব পর্দা গোলাপী রঙের দেখে সুভ বুঝতে পারছিল আজ আবার সেই সিনেমার ছোকরা এসে এই সংসারের সর্বত্র আগুনের স্পর্শ দিয়ে গেছে। সুভ ভিতরে ভিতরে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে অসহায় মানুষের মত টেবিলের উপর ব্যাগটা সজোরে রেখে দিল শুধু।

অনু তাড়াতাড়ি মুখটা ভেংচে দিল আয়নায় যেন সে এতক্ষণ দাঁত-মুখ দেখছিল—দাঁতের কোন্ স্থানে কোথায় পোকা ধরেছে হাঁ করে যেন তাই দেখছিল—অথচ অভিনয়টুকু এত সহজ সরল যে সুভ না হেসে পারল না। বলল, থাক এই সব মিথ্যা অভিনয় না করে লক্ষ্মীর মত আমার ধুতিটা ছেড়ে ফেল।

অনু ধরা পড়ে গেছে ভেবে মুখ নীচু করে সামান্য সময় বসে থাকল। সুভ আয়নার ভিতরে এবার ওর মাথার লম্বা সিঁথিটা দেখতে পেল। যেন এক সমতল ভূমি এবং বড় এক রেল লাইন সেই সমতলভূমি ভেঙে দূরে কোথাও চলে গেছে। সুভ এ সময় কেন জানি সহসা নিজেকে একজন ট্রেনের যাত্রী বলে ভাবল।

সুভ ডাকল, কি হল, মাথা গুঁজে বসে থাকলে কেন?

অনু ধীরে ধীরে বলল, অফিস থেকে এত তাড়াতাড়ি!

—একটা ভাল ইংরিজী বই হচ্ছে। তোমাকে নিয়ে যাব ভাবছি।

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা কেন করব বল? বিকেলের দিকে তোমার বমি ভাবটা থাকে না বলছিলে।

অনু তখনও মাথা তুলল না। এই পোষাকে সুভর সামনে উঠে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিল না, হয়ত উঠে দাঁড়ালেই সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। অথবা সুভ বলবে, বা বেশ মানিয়েছে তো তোমাকে। আমি বেঁচে থাকতেই এটা তবে দেখতে হল। অথবা অন্য অনেক কিছু—অনুর মাথার ভিতর যেন কেমন করছে। ওর ভিতরের সেই দৃঢ়তা যেন একেবারে মরে গেছে। সে তো বলতে পারত আমি অভিনয়ের জন্য স্টেজ রিহার্সেল দিচ্ছি সুভ—তুমি আমাকে বিদ্রূপ কর না। করলে আমাকে অপমান করা হবে।

এটা আমার অপমান নয়। কে যেন শক্ত গলায় এমন একটা শব্দ করে হেঁকে যাচ্ছে। কে যেন শহরময় নগরময় বলে চলে যাচ্ছে এটা আমার অপমান নয়—আমার মনুষ্যত্বের অপমান নয়—আমি যা চাইছি না, যা ভালবাসি না তার বিরুদ্ধে সব তুমি করে যাচ্ছ। অনু পায়ে এবার যথার্থই শক্তি পাচ্ছিল না। সে ক্লান্ত গলায় বলল, সুভ, তুমি একটু বসার ঘরে যাও, আমি কাপড় ছাড়ব। বলেই উঠতে গিয়ে দেখল জীবনের এক বড় সংস্কার ওকে মুহূর্তে অসাড় করে দিচ্ছে। অনু নিজের ভিতরেই নিজে কেঁদে ফেলল।

সুভ বিদ্রূপ করে বলল, তোমার এই পোষাক আমার নিজের হাতে খুলে দেওয়া উচিত নয় অনু ?

—আমাকে আর অপমান করো না সুভ। তুমি যাও।

—আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, তোমার এই সাজ আমার বড় ভাল লাগছে।

—সুভ !

সুভ বলল, অসীম ছেলেটা কিন্তু ভাল নয় অনু।

—তোমাকে কে বললে ?

—আমি নিজেই বলছি। কেউ বলে নি।

—তুমি যা জান না, তা বল না।

—আমি তোমাকে দিয়ে বুঝতে পারছি অসীম ছেলেটি ভাল না। সুভ খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বলছিল। সে টেবিলের পাশ থেকে এতটুকু নড়ছিল না। মাঝে মাঝে টাইয়ের গিঁটে সে অন্যমনস্কভাবে হাত রাখছিল কথা বলতে বলতে। এবং এক তীর্যক ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছে।

—তার মানে !

—মানে সংসারে দুঃখ ডেকে আনছে।

—ওর কি দোষ বল। সে তো আমাকে বড় দেখতে চায়।

সুভ বলল, সে তোমার নগ্ন ছবি হাটে মাঠে ঘাটে দেখাতে চায়।

—সুভ, ফের তুমি ইতরের মত কথা বলছ।

—আমি সাধারণ মানুষ অনু। আমি এর চেয়ে ভাল কথা বলতে জানি না।

সুভ এইটুকু বলে বসার ঘরে চলে গেল। অনু অসুস্থ। এই সময় অনুকে আর আঘাত দিতে চাইল না বরং অনু একটু স্বাভাবিক হোক মনে মনে সে তাই চাইছে। এমন কি বসার ঘরে যাবার মুখে পর্দা টেনে দিল। সে যেন অপরিচিত পুরুষ এই লজ্জার হাত থেকে

অনুকে উদ্ধার করা তারই একমাত্র কর্তব্য। সুভ বসে বসেই বলল, তোমার বাবা ফোন করেছিলেন অফিসে।

সুভ নিজেকেই যেন শোনাল, আজ রাত্তে নিমন্ত্রণ। কিছু ভাল মন্দ খাওয়া যাবে।

অন্য ঘরে কোন শব্দ নেই। এমন কি শাড়ির খস খস শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সুভ কান খাড়া করে রাখল। তারপর পর্দার ফাঁকে নজর করতেই দেখল অনু খাটের পাশে ঠিক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। সুভাষ তাড়াতাড়ি উঠে এল তার পাশে, এসে ডাকল, এই অনু, অনু !

অনু সম্বিত ফিরে পাবার মত বলল, আমাকে কিছু বলছ ?

এ ভাবে নুয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কাপড় ছাড়লে না ? রামচরণ কোথায় ? সে ফেরে নি এখনও ?

—না।

—আচ্ছা সুভ—বলে থেমে গেল অনু। ফ্যাল ফ্যাল করে কি দেখতে থাকল।

—কিছু বলবে ?

—এখনও রামচরণ ফিরছে না কেন ?

—কোথায় পাঠিয়েছ ?

—ওকে প্রীতির কাছে পাঠিয়েছি।

—প্রীতি মানে ডাঃ প্রীতি জোয়াদ্দার ?

—তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে !

সুভ সবটুকু বলতে সাহস করল না। অনুর চোখ ভয়ঙ্কর ঘোলা দেখাচ্ছে। এ সময়ে অনুকে কিছু বলে উত্তেজিত করতে চাইল না। অথবা কিছু না বলে বসে থাকা—এখুনি রামচরণ আসবে নিশ্চয়ই প্রীতি চিঠিতে সব খুলে লিখে দেবে আর আশ্চর্য এখনও প্রীতি ওর অনিচ্ছার কথা না জানিয়ে বসে আছে। এবং কেন জানি এই

সন্ধ্যায় ডাক্তার প্রীতি জোয়াদ্দারকে বড় বেশী অসতী বলে মনে হতে থাকল সুভর।

সুভ বলল, প্রীতি, তোমাকে কোন কিছু বলেনি?

—না তো! এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল অনু। বলল, প্রীতি রামচরণকে ওষুধের জন্য পাঠাতে বলেছে।

—কখন!

—এই দুপুরের দিকে। বলে অনু খাটের পাশে এগিয়ে গেল। সুভাষ ভাবল প্রীতি তবে ওর বিরুদ্ধে লড়ছে। সুভাষ কিছুক্ষণ দাঁত শক্ত করে রাখল। কিছুক্ষণ মেঝেতে পায়চারী করল। সে এই ঘর এবং অনু সম্পর্কে ভেতর থেকে উদাসীন থাকতে চাইল। খস খস শব্দ হচ্ছে শাড়ির। অনু শাড়ির পাট ভেঙ্গে ঠিক করছে। এবং সেজে গুজে বসবার জন্য আলো জ্বেলে নখ খুঁটতে বসে গেল।

সুভ বলল, তা হলে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম থাকল না।

—তোমার আবার কিসের ইচ্ছা অনিচ্ছা।. নখ খোঁটা বন্ধ করে অনু একবার বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল।

—আমি প্রীতিকে আমার অনিচ্ছার কথা জানিয়েছিলাম।

—মানে?

—মানে ট্যাবলেট দিতে বারণ করেছিলাম।

—মানে তুমি আমার নাচ গান অভিনয় সব বন্ধ করে দিতে চাও?

—জননী হলেই নাচ গান অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় তোমাকে এ কথা কে বলেছে?

—সুলতা বলেছে।

—সুলতা তার কথা বলেছে, বলেছে, সে মা হয়েছে বলে, নাচ গানে আর সময় দিতে পারছে না। সেটা তো ইচ্ছার কথা।

ওর সন্তান ওর কাছে এখন নাচ গানের চেয়ে বড়। ওর সন্তানকে বড় এবং সুখী করার ইচ্ছা ওর নাচ গানের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল। সুতরাং সে দুঃখ করে লিখেছে।

—আমারও তাই হবে।

—হলে তো মঙ্গল। সুভ মনের কথাটা বলে ফেলল।

—না আমার তা হবে না। অসময়ে মা হয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ মাটি করব না সুভ। তুমি মাথা খুঁড়লেও পারব না।

সুভ এবার খুব দৃঢ় গলায় বলল, প্রীতিকে আমি বারণ করেছি। যদি না শোনে…বলে থেমে গেল সুভ।

অনু যেন এই মুহূর্তে অনর্থ ঘটাবে অথবা অনু যেন এই মুহূর্তে সুভাষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। অনু বলল, তুমি কি ভেবেছ সুভ? ভেবেছ আমাকে জননী করে আমার সব সাধ আহ্লাদ মাটি করে দেবে।

—আমি তা ভাবিনি অনু। সুভ কোমল গলায় বলল, আমার মা নেই বাবা নেই। আমার শুধু তুমি আছ। আমি তোমাকে সহজে ছেড়ে দিতে পারব না। বলে বালকের মত সুভাষ অনেকক্ষণ অনুর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল।

সুভ ঘর থেকেই সব রাস্তার আলো জ্বলতে দেখল। অনু ওর দিকে আর চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। অনুর এমন এক বসার ঢং যা সুভকে বিব্রত করছে—যা সুভ কোন দিন সহ্য করতে পারে না—যার জন্য ভেতরের রক্ত সব জল হতে থাকে অথবা নীল হতে থাকে অথবা জ্বর আসার মতো ভাব হয়। সুভ সুতরাং টাই খুলে ফেলল গলা থেকে, আর কাপড় ছেড়ে হতাশ ভঙ্গীতে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

অনু এবার বলল, কি ব্যাপার! হাতমুখ না ধুয়ে বসে পড়লে?

—রামচরণ এলে হাত মুখ ধোব।

—রামচরণ এসে কি করবে?

—সেটা আমি বুঝব। বলে সুভ জানালার দিকে মুখ করে বসল। এবং মনে হচ্ছিল সে সত্যি হেরে যাচ্ছে। অনুর জিদ বজায় থাকছে, অনু নিজের জিদ রক্ষার জন্য প্রীতিকে হাত করেছে। ওর ভেতর থেকে বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। তারপর কি ভেবে মুখ জানালার দিকে রেখেই বলল, আজ অসীম এসেছিল?

—দুপুরে ওকে আসতে বলেছিলাম।

—বিধবার অভিনয় সম্পর্কে সে-ই পরিচালকের মতো বলে গেল বোধ হয়?

—অভিনয়ে আবার বিধবা সধবা কি! অভিনয়, অভিনয়!

—আর কি বলল?

—বলল, মনে রাখবেন এটা আপনার প্রথম বই···খুব প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে হবে।

—আর কিছু বলেনি?

—বলেছে, এইটুকু বলে অনু ঘাড় তুলে সুভর মুখের রেখা দেখতে চাইল। কিন্তু সুভ পিছন ফিরে বসে আছে। সুতরাং ওর মুখে কোন্ কোন্ রেখা তখন কাজ করছে বোঝা যাচ্ছিল না। তবু আন্দাজে কিছু কিছু ধারণা যেমন সুভর মুখ এখন হিংস্র বাঘের মত—চোখে মুখে হাজার রকমের কীট নিশ্চয়ই দংশন করছে—অনু প্রতিশোধের ভঙ্গীতে বলল, তিনি এমন বই করছেন যা চিত্র শিল্পে অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে।

সকলেই তাই ভাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামগড়ুরের ছানা—এ ধরণের উক্তি ওর ভিতর থেকে উঠে আসছিল। কিন্তু নিজেকে দমন করে পথের কিছু সাধারণ মানুষ দেখল, পার্কের ভিতর কিছু বালক বালিকার কলরব শুনল এবং অন্ধ বৃদ্ধাকে দেখল পুরুষ বৃদ্ধটি পথ পার করে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সুভকে কোন জবাব দিতে না দেখে অনু বলল, তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাও। বাবা হয়ত এক্ষুনি আবার ফোন করবেন।

—ফোন করলে বলে দেবে আমি যেতে পারছি না।

লক্ষ্মী সুভ। সেই কোমল গলা অনুর। তুমি যাও। আমার কথা বললে বলবে, শরীরটা যে ভাল নেই।

—আমি কিছু বলতে পারছি না লক্ষ্মী অনু। বলে সুভ উঠে দাঁড়াল। এবং ভয়ঙ্কর এক চোখ মুখ সুভর। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, অসীম তোমাকে আর কিছু বলেনি ? তুমি লক্ষ্মী সোনা সেজে সোফায় শুধু পরীর মত বসেছিলে, সে তোমাকে কিছু বলেনি ? কিছু ! কিছু ! সে প্রায় পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ কি করছ তুমি ! সুভ, সুভ !

—আমি কিছু করছি না। আমি প্রীতিকে এক্ষুনি ফোন করব। আমি প্রীতিকে শেষ ওয়ার্নিং দেব।

—সুভ ! সুভ !! লক্ষ্মী। তুমি চীৎকার করো না। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। আশে পাশের ফ্ল্যাটের লোক দেখ উঁকি দিচ্ছে।

সুভ বসে পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, অনু অসীম তোমাকে আর কি বলেছে ?

আর তখন রামচরণ ঢুকে গেল ঘরে, সে প্রীতির একটা চিঠি দিল অনুকে।

অনু বলল, ওষুধ কোথায় ?

রামচরণ কোন উত্তর করল না।

অনু চিঠিটা পড়ে চীৎকার করে উঠল না, এমন কি সুভাষকে কোন কথা বলল না চিঠি সম্পর্কে। শুধু সে রামচরণকে ডেকে বলল, আমাকে জল দে রামচরণ।

রামচরণ বড় গ্লাসে এক গ্লাস জল দিল। সুভাষ ঘটনাটা কি ঘটেছে, অনুর ট্যাবলেট খাওয়া এবং অনু আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে বুঝতে পারছে না। অনুর গলা টিপে দিলে কেমন হয়। আর অনু ভালবাসার অনু এখন যদি সত্যি ট্যাবলেটটা ওর সামনে

গিলে ফেলতে থাকে—কাঁচের মতো ওর গলার ভিতর দিয়ে কোন অলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যাঙাচির মতো সেই ভ্রূণকে সে যথার্থই উগরে দেবার চেষ্টা করে—সুভ অনুর কাছে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে থাকল যেন সে এই মুহূর্তে অনুর মুখ বন্ধ করে দেবে—অনু পেটের সেই ব্যাঙাচি উগরে দিতে চাইলে গলার কাছে আটকে থাকবে—সে ক্রমশ ফুঁ দিয়ে সেই ব্যাঙাচির মতো ভ্রূণকে বড় করে তুলবে।

সুভ কাছে গেলে অনু চিঠিটা ওর হাতে নিঃশব্দে তুলে দিয়ে একটা চাদর টেনে শুয়ে পড়ার আগে ঠাণ্ডা জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। অনু আজ যথার্থই কোন ট্যাবলেট খেয়ে কোন শালিক ছানার মত হাঁ করে থাকল না।

সুভ দীর্ঘদিন পর এই কাপুরুষের মত চিঠির ভাঁজ খুলে প্রীতির হস্তাক্ষর দেখল, বিশাল এক অরণ্যের কথা লেখা আছে হস্তাক্ষরে, যেন সব দেয়ালের হাতি ঘোড়া এখন সেই অরণ্যে নেমে যাচ্ছে! সুভ চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখ বুজে ফেলল এবং লজ্জায় অপমানে সে দুঃখিত মুখ করে বারান্দায় নেমে গেল।

প্রীতি শেষ লাইনে লিখেছে—সুতরাং ট্যাবলেট দিতে পারলাম না, এত ব্যবধান। জনক জননীর উভয়ের মতের মিল থাকা দরকার। সুভাষবাবুকে বলবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন; তোমার জাতকের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিনীত—
প্রীতি

চিঠিটা সুভাষ ফের অনুকে দিয়ে বলল, যে এসে গেছে তাকে আসতে দেওয়াই শুভ।

অনু চিঠিটা বালিশের নীচে রাখতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুভ এই কান্নার জন্য বিব্রত বোধ করতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের পাশ থেকে ব্যাগ তুলে বসার ঘরে ঢুকে গেল। এবং টেবিলের একপাশে বসে ব্যাগ থেকে টিকিট দুটো বের করে ছিঁড়ে

ফেলল। এ সময় অনু একটু একা থাকুক, সে রামচরণকে বলল, আমাকে একটু চা দে রামচরণ। সে জিতে গেছে, এমন এক মুখ নিয়ে সে বসে থাকল। সে একাকী, ঘরে এখনও সব গোলাপ ফুলের তাজা গন্ধ, এখনও সুগন্ধ ধূপের গন্ধ আর গোলাপী ফ্রেমে সব ভিন্ন ভিন্ন ছবি যা অনু খুব যত্ন করে নির্বাচন করেছিল।

কতক্ষণ সুভ এভাবে বসেছিল, কখন রামচরণ চা রেখে গেছে আর কখন অনুর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসে বসে আছে ওদের নিতে —সুভ খেয়াল করতে পারে নি। যেন ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর নদী অতিক্রম করার মত—শান্ত এক ভাব এই ঘরে—সুভ নিজের ভিতরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুভ জেগে উঠে দেখল যেন অনু নীচে নেমে যাচ্ছে, বাপের বাড়ির লোক অনুকে নিয়ে যাচ্ছে। রামচরণ সব বাক্স পেঁটরা নামাচ্ছে—অনু ওকে কিছু বলছে না, শুধু সিঁড়িতে অনুর ক্লান্ত পায়ের শব্দ এবং সে ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে শেষে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

সুভ ডেকে উঠল, রামচরণ।

—যাই বাবু।

—রামচরণ উঠে এলে সুভ বলল, তোর মামনি!

—তিনি বাপের বাড়ি চলে গেলেন বাবু। আমি বললাম, বাবু টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডেকে দেব?

—কি বলল?

—বললেন, না—ডাকতে হবে না। তুই আমাকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দে।

সুভ বুঝল দীর্ঘ দিনের সংঘাত সে বয়ে বেড়াচ্ছিল। সে বুঝল, প্রীতির চিঠি ওকে নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিল। সে বুঝল এই শান্তিটুকু ওকে সহসা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—অনু দুঃখে এবং অভিমানে তাকে ছেড়ে চলে গেল। সে উঠে দাঁড়াল এবং

মনটাকে শক্ত করার সময় দেখল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

সুভ হাসতে পারল না। সুভর মুখ খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে প্রৌঢ় ব্যক্তিটিকে প্রণাম করে বলল, অনু এইমাত্র চলে গেল।

—আমি জানি।

সুভ যেন সহসা বালকের মত হয়ে গেল। বলল, আমাকে না বলে অনু চলে গেল?

—ও কিছু ভেব না। তিনি ভিতরে ঢুকে তাঁর হাতের লাঠি রাখলেন এ সময়। তিনি সামান্য পায়চারী করলেন। তারপর বড় বড় ছবির দিকে চোখ রেখে বললেন, আমি বসলাম, তুমি তৈরী হয়ে নাও।

সুভ পাশে বসল। বলল, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। কিছু যা হয় সামান্য খেয়ে ভাবছি এখন শুয়ে পড়ব।

তিনি বললেন, সুভ সংসার যখন করেছ, তখন সংঘর্ষ এড়াতে পারবে না। এ জন্যে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? তিনি খুব ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, দুপুরে এসে দেখলাম, অনুর চোখ মুখ কি রকম বসে গেছে। মনে হল অনু ভিতরে ভিতরে কোন মানসিক রোগে ভুগছে। তিনি বলতে চাইলেন অন্য অনেক কিছু। কিন্তু থেমে গেলেন।

সুভ বলল, অনুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—কেন খারাপ হচ্ছে! কোন ডাক্তার দেখিয়েছ!

—ওর বন্ধু প্রীতি দেখছিল।

—প্রীতি, প্রীতি মানে অশোক বাবুর ছোট মেয়ে। অঃ। সে তো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, সে কি দেখবে!

—সুভ এবার দাঁত মুখ শক্ত করে বলে ফেলল, অনু মা হতে যাচ্ছে।

—অনু মা, মা হতে যাচ্ছে! প্রৌঢ় ব্যক্তিটি লাফিয়ে উঠলেন

যেন বয়েস কত কমে গেছে, যেন প্রৌঢ় ব্যক্তিটি এখুনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবেন উন্মুক্ত মাঠে এবং বালকের মত ছুটোছুটি করতে থাকবেন! তিনি তাঁর আবেগ কিছু দমন করে বললেন, আর দেরী নয় সুভ। ওরা সকলে বসে রয়েছে। সকলে আমরা একসঙ্গে খাব। বলে তিনি বড় রকমের শ্বাস টানলেন—কিছু দিনই মনে হচ্ছিল তোমাদের কতদিন দেখি না। অন্নু মা আমার। সন্তান হতে গেলে একটু আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় বৈকি। তা না হলে মা, 'মা' কথাটা সহজ নয় সুভ। হুঁ কি বল! মা কত বড় কথা, তিনি এই সব উচ্চারণের ভিতর অনেকক্ষণ ধরে মুখ হাঁ করে রাখলেন। মা—মা—মা! দেখবে কথাটা একেবারে নাভিমূল থেকে উঠে আসছে। একেবারে প্রাণের কাছাকাছি জায়গা থেকে। মা—মা—মা আমার মা, জানো সুভ, তোমার মত শিশু বয়সে আমার মা মারা যান। অন্নুর মত মুখ—আমার মা—মা—মা, মা কত বড় কথা, মা—র মত কথা হয় না সুভ। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা এখন সকলে মা—র কাছেই যাচ্ছি।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি নাটকের কুশীলবের মত কথাবার্তা বলছিলেন। আবেগে প্রৌঢ়ের চোখে জল এসে গেছে। তিনি বললেন, এই গাড়ি ডাক। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

ওরা উভয়ে গাড়িতে বসে পথের দু' পাশে হরেক রকমের সব পরিচিত গাছ-গাছালী এবং আলো ঘর বাড়ি দেখল। পথ দেখে মনে হল সংসারের কোথাও কোন দুঃখ জেগে নেই।

সুভ বলল, শীত এবার তেমন পড়লই না।

সেই শিমুল গাছটার কথা মনে হল সুভর, সেই গ্রাম্য নদীর কথা মনে হল। কত পলাশ ফুল মাঠে মাঠে—ঠিক আগুনের মত—অন্নু বৃদ্ধ শিমুল গাছটার নীচে বসে থাকত। বিকেলের ছায়াঘন ঘাসের ভিতর ওরা দু'জন বসে শিমুল ফুলের ভিতর থেকে মঠের মত শীষ সংগ্রহ করত। নদীতে তখন নৌকা থাকত, জল কম থাকত, নদীতে

সব নৌকায় বাদাম উড়ত না। বাঁশের নৌকো, ধানের নৌকো, পাটের নৌকো হরেক-রকম নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে অনু ভিন্ন ভিন্ন শৈশবকালীন গল্প করত। সুভ ওর পিছনে পিছনে শুধু ঘুরে বেড়াত। মাতৃহীন সেই বালকের মুখ অনুর বুঝি আর এখন একেবারেই মনে পড়ছে না! সুভ গাড়িতে বসে শৈশবের স্মৃতি, অনুর শৈশবকালীন ভালবাসার, সেই ফ্রকপরা অনু, সাদা জুতো পরত অনু আর চুলে সব সময় শেফালী ফুলের গন্ধ থাকত—কতদিন সুভ পিছনে পিছনে শুধু সেই মনোরম গন্ধের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে। একদিন অনু নির্জন সেই শিমুলের ছায়ায় সুভকে সহসা চুমু খেয়েছিল—সুভ লজ্জায় এবং সংকোচে অনেকদিন অনুর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। সে, সব ফেলে সেই সব দিনে অনুকে মনে পড়লেই বৃদ্ধ শিমুলগাছটার নীচে এসে বসে থাকত—তখন অনু থাকত না, অনু তখন সহরে, অনুর মিষ্টি এবং সরল কথা সুভকে প্রায় কিছুদিন আবেগে পাগল করে রাখত। সেই অনুর স্মৃতি বারবার স্মরণ করতে গিয়ে সুভ দেখল সব কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসছে···সে সব স্পষ্ট মনে করতে পারছে না এখন। সেই মিষ্টি অনু এখন অনিমা চ্যাটার্জী, নটি অনিমা চ্যাটার্জী এবং মৃত সন্তানের জননী হবার ইচ্ছা নেই নটির। সুভর মুখে থুথু জমছিল ঘৃণায়। শৈশবের অনুকে বারবার চেষ্টা করেও স্পষ্ট দেখতে পেল না।

সুভ ভেবেছিল খাবার টেবিলে অন্তত অনু এসে বসবে।

কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে দেখল অনুর কোন চিহ্ন নেই। সুভ কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু গলায় বলল, অনুকে দেখছি না।

অনুর মমতাময়ী মা বললেন, তোমরা খেয়ে নাও সুভ। অনু পরে খাবে।

প্রৌঢ় ফিস ফিস করে সকলকে তখন কি বলে বেড়াচ্ছিলেন, বাড়ির ভিতরের দিকে বেশ কলরব শোনা যাচ্ছে। সকলে অতীব খুশী এবং আহ্লাদে আস্ত একটা পাঁঠা সকলে গিলে ফেলতে পারে

এমন এক ভাব। সুভ বুঝল, এখন অনু সকলের কাছে জননী অনু হয়ে গেছে।

যাবার সময় খুব সন্তর্পণে অনুর ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, অনু।

অনু উত্তর না করলে বলল, আমি যাচ্ছি।

অনু এবার পাশ না ফিরেই বলল, তুমি আর এখানে না এলে খুশী হব সুভ। খুব শক্ত গলায় বেমানানভাবে কথাগুলি বলে অনু চোখ বুজে ফেলল।

—আর আসব না। সুভ এইটুকু বলে পথে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুভাষ সেই রাতে হেঁটে বাসায় চলে এসেছিল। পথে ভূতে পাওয়া রুগীর মত সে হাঁটছিল। ভিতরে ভিতরে এক ভয়ঙ্কর অপমানের জ্বালা ওকে দগ্ধ করছিল। ওর দুঃখ, নিদারুণ দুঃখ এবং সামনের এত প্রশস্ত পথ, আলো ঘর বাতি সব উদ্দেশ্যবিহীন, সব যেন অপমানের জন্য। ভিতরে ভিতরে সে এত কষ্ট পাচ্ছিল, ভিতরে ভিতরে এত বেশী গ্লানি জমা হচ্ছে যে সুভ প্রায় পাগলের মত ছুটে যাচ্ছিল—কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে সুভ তার কিছুই বুঝতে পারছে না, অথচ এক সময়ে সে দেখল সামনে সেই ফ্ল্যাট বাড়ী, দরজায় রামচরণ অপেক্ষা করছে।

ভিতরে ঢুকে দেখল, রামচরণ অন্য দিনের মত সব কিছুই ঠিক করে রেখেছে। সুতরাং সে রামচরণকে চলে যেতে বলে দরজা জানালা বন্ধ করে দিল, ঘর অন্ধকার করে দিল এবং খাটের এক পাশে সে ছবিতে আত্মহত্যাকারী যুবকের মত শরীর মুখ সটান করে অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকার, সুতরাং কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোথাও একটা ঘুলঘুলি ছিল, বাইরের আলো সেই ঘুলঘুলি ভেদ

করে ভিতরে এসে ঢুকছে। সুভ সেই আলো কণিকার অংশ থেকে অন্য অংশে···সুভ সেই আলো কণিকার অন্য অংশের নানা বিভাজনে চোখের উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে দিল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সে নিজেকে দেখল, অনুকে দেখল, আর সেই প্রীতি, ডাক্তার প্রীতির শুভ ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, সে এবার নিজের বালিস চেপে ধরল। অপমান এবং অবহেলা অনুর সুভকে ভিতর থেকে পাগল করে দিচ্ছিল। ভিতর থেকে অসহ্য যন্ত্রনা উঠে আসছে। অনুর সেই শক্ত কঠিন ইচ্ছার কাছে সুভ যেন বড় ছোট হয়ে গেছে। সে সুতরাং বেশী সময় শুয়ে থাকতে পারল না। সে কিছুক্ষণ অন্ধকারের ভিতরই পায়চারী করল। সে কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। অথবা ওপরে হাত তুলে অন্ধকারের সীমানা নাগাল পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, ওর হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে, সে কাপুরুষের মত আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছিল।

সেই রাত্রের ভয়ঙ্কর ছবি সুভকে মাতালের মত করে রেখেছিল। সে বারবার দরজা খুলছিল, বারবার বারান্দায় পায়চারী করার জন্য বের হয়েছে এবং রেলিঙে ভর দিয়ে পার্কের সেই একান্ত পরিচিত গাছ গাছালী দেখতে দেখতে নিদারুণ দুঃখে রেলিঙের ওপরেই মাথা এলিয়ে দিয়ে কাকে যেন বলতে চেয়েছে, একটু সুখ আমার কাম্য ছিল। আমার মা ছিল না, বাবা ছিল না, আমার আত্মার কাছাকাছি কেউ ছিল না, আমি পাগলের মত ভালোবাসার জন্য হন্যে হয়ে সারা মাস সারা বছর ধরে অনু নামক এক যুবতীকে অনুসরণ করে চলেছি।

সুভ সারা রাত খাটে মেঝেতে এবং বারান্দায় শুয়ে বসে অথবা ঘুরে ফিরে ছটফট করছিল, জীবনে আর কি করণীয় আছে সে ভাবতে পারছিল না। স্ত্রীর জন্য অনেক অপমানকর কাজ তাকে অফিসে করতে হচ্ছে, এখন আর সেই কাজের প্রতি ওর কোন মোহ থাকল না, বরং এক স্বাধীনতাপ্রিয় জন্তুর মতো সব ছেড়ে

ছুড়ে যে দিকে দু চোখ যায় চলে যেতে ইচ্ছে হলো। ভিতরে ভিতরে তাই গভীর রাত ওকে নিরুদ্দিষ্ট করার জন্য প্রবল চাপ দিচ্ছিল, মনে হচ্ছে কোথাও কোন পশু পাখী জেগে নেই, কোন কাক পাখির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু দূরে অথবা অনেক দূরে ট্রেনের হুইসেল এবং শেষ বাস হয়ত এখন চলে যাচ্ছে অথবা শেষ ট্রাম এবং এও হতে পারে রাত গভীর, পাশের ফ্ল্যাট বাড়ির সব দরজা জানালা বন্ধ, কোথাও কোন কুকুরের সহসা আর্তনাদ এবং মনে হলো বড় লোহার উপর কে যেন অনবরত কোথায় কেবল ঘা দিয়ে যাচ্ছে। এই সব নির্জনতা অথবা শব্দের ভিতরই সুভ আর একবার শোবার চেষ্টা করল, আর একবার সব আত্মগ্লানি ঝেড়ে নিজে নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইল, কিন্তু হায় যুবক সুভ, হায় মানুষ সুভ নিজের এই আত্মগ্লানির নিকট থেকে কিছুতেই রেহাই পেল না। সে দুঃখে রাতের এই গভীর নির্জনতার ভিতর হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

ভোর বেলা রামচরণ এসে দেখল, দরজা জানালা বন্ধ। ওর আসতে দেরী হয়ে গেছে ভেবে সে সারা পথ ভয়ে ভয়ে হাঁটছিল, কিন্তু এখন যেই দেখল দরজা বন্ধ এবং বাবুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ভিতরে, সে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলো। সে প্রথমে দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। পরের দরজায় পর্দা আছে সুতরাং অন্য ঘরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে দরজার কড়া নাড়তে থাকল। কোন শব্দ আসছে না ভিতর থেকে, সে জোরে এবার কড়া নাড়ল। কোন শব্দ নেই! সে এবার ডাকল, দাদাবাবু, সে ফের ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দেখল গত রাতে ঘরের আসবাবপত্র যে ভাবে ছিল ঠিক তেমনি আছে। সে এবার জোরে এক সঙ্গে কড়া নাড়ল এবং চিৎকার করে ডাকতেই সুভ জেগে গেল। রামচরণ চীৎকার করে ডাকছে, জানালা দিয়ে রোদ ঘরে ঢুকে গেছে। সুতরাং রোদের উত্তাপ চোখে লাগছিল, এত বেলা পর্যন্ত সে

ঘুমিয়েছে! ভোরের পাখিরা ঠিক আগের মত কলরব করছে, ঠিক প্রতিদিনের মত সকাল বেলাতে নির্দিষ্ট শালিখ পাখি, ঘাঁড় উঁচু করে চারিদিক দেখছে।

সুভ উঠে ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলে দিল। একটা সিগারেট মুখে পুরে চাদরটা আলতোভাবে গায়ে রেখে বারান্দায় দাঁড়াল। গত রাতের ঘটনার কথা এক এক করে মনে পড়ছিল। এই ভোরেই সে প্রৌঢ় ব্যক্তিটির ফোন পাবে আশা করছিল। সুতরাং ঘরে থাকলে ফোন ধরতে হবে ভেবে সে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে বের হবার মুখে রামচরণকে বলল, যদি অফিস থেকে ফোন আসে, বলবি বাবু কোথায় চলে গেলেন। যদি অনুর বাবা ফোন করেন বলবি, বাবু বাড়ি নেই। সুভ রামচরণকে সামান্য টাকা দিয়ে বলল, তোর মতো রান্না-বান্না করে নিবি। আমি আজ বাড়িতে খাচ্ছি না। বলে সুভ তর তর করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকল। সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। যেন এ সময় ওর কিছু আর করণীয় নেই, শুধু দূরে কোথাও হেঁটে চলে যাওয়া। যদি কোথাও কোন সবুজ মাঠ থাকে সেখানে বসে থাকা। সারাদিন মাঠে মাঠে গান গাইবে সুভর ইচ্ছা সেই এক মাঠ যেখানে নীল আকাশ এবং গাছগাছালি আর রাখাল বালক আছে। সুভ তেমনি কোন এক মাঠে চলে যেতে চাইল।

আর সোনার ঈগলেরা উড়ে উড়ে শহরময় নগরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোনার ঈগলের ছায়ায় সকলের মুখ ঢেকে যাচ্ছিল। সকল মানুষ কেবল ছুটছে, কোথাও দুঃখের জন্য, কোথাও সুখের জন্য এবং প্রেম প্রীতি স্নেহ এই শহরের কোথাও যেন বেঁচে নেই, সুভর মনে হলো এই ট্রামে চড়ে খুব দূর শ্যামবাজার যাওয়া যাবে, সুতরাং ট্যাক্সিতে উঠে সুভ নিজেকে অদৃশ্য করে দিতে চাইল।

অনু তখন শুয়ে বসে শুধু ওকের ওপর বেঁচে আছে। আত্মীয়-

স্বজন সু-খবর পেয়ে বাড়িতে ভিড় করছিল। আর রাতে অন্নুকে বাবা বলেছিলেন সুভ না বলে কয়ে চলে গেল!

অন্নু বলেছিল, আমাকে বলে গেছে।

সুতরাং ভিতরে ভিতরে এমন একটা কাণ্ড এবং দুর্যোগ ঘটে গেছে এই সংসারের ভিতর মা, বাবা কেউ টের পেলেন না।

অন্নু আগের মত আর নেই। সারাদিন ঘর থেকে বের হচ্ছে না। মা মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে তিরস্কার করে যান। এ সময় কেবল শুয়ে বসে থাকতে নেই। মা জোর করে ভিন্ন ভিন্ন রুচিকর খাবার তৈরী করে খাওয়াবার চেষ্টা করছেন। বাবা প্রীতিকে বিকেলেই একবার ফোন করে অন্নুর শরীর সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশ চেয়েছিলেন। এবং এ সময়ে ডাক্তার প্রীতি জোয়াদ্দারই ভরসাস্থল। বাবা প্রীতিকে ফোনে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। অন্নু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাবার কথা শুনছিল এবং রাগে দুঃখে মরে যাচ্ছিল, যেন প্রীতি কত বয়স্ক ডাক্তার, প্রীতি সব বোঝে এবং প্রীতি ব্যতীত এত বড় দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া যায় না, বাবা প্রীতির সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত কথা বলছিলেন।

বাবা বললেন, কে প্রীতি! আরে সু-খবর শুনেছ? আমার অন্নু মা হতে যাচ্ছে। তুমি একবার এস, ওকে একটু দেখে শুনে যাবে।

—যাব মেসোমশাই।

—যাব নয়, আজই বিকেলে আসবে।

—মিষ্টি?

—এলেই মিষ্টি, পেট ভরে। কিন্তু সুভ, সুভ পেট ভরে মিষ্টি মুখ করায়নি?

—মিষ্টি মুখ! কি যে বলেন মেসোমশাই। গেলেই দেখছি মুখ গোমরা করে বসে আছে।

—বাপ হলেই চিন্তা! ওটা আমাদেরও হয়েছে। অন্নু যখন তোমার মাসিমার পেটে এল, সে কত রকমের আমাদের প্ল্যান এণ্ড

প্রোগ্রাম। ছেলে না মেয়ে, সেই নিয়ে তো আমরা রোজ একবার করে বাজী রেখেছি। অবশ্য বাজীতে তোমার মাসিমাই জিতেছিল।

অনু নিজেকে আর সামলাতে পারল না। সে ধীরে ধীরে বাবার ঘকে ঢুকে আস্তে আস্তে বলল, বাবা এটা কি হচ্ছে?

—কেন কি হল!

—কি হবে আবার! অনু গজ গজ করতে থাকল।

—অঃ আচ্ছা—এই যে প্রীতি, হ্যাঁ আমি মেসোমশাই। শোন, তাহলে আমাকে যেন আর বলতে না হয়। ছেড়ে দিচ্ছি।

অনু বলল, প্রীতির সঙ্গে তুমি সমবয়সী বন্ধুর মত কথা বলছিলে।

—ডাক্তার মানুষ প্রীতি। ওকে সবই বলা চলে।

—না চলে না বাবা। আর ওকে না ডাকলে ভাল করতে বাবা।

—একজন ডাক্তারের আণ্ডারে তো রাখতেই হবে।

—শহরে বাবা ডাক্তারের অভাব নেই। তুমি অখিল কাকাকে বলতে পারতে।

—এ সব ব্যাপারে মেয়েরা যতটা বোঝে—বুঝলি। বলে তিনি ঢোক গিলে সুভকে রিঙ করার জন্য ডায়াল করলে অনু বলল, আবার কাকে ফোন করছ?

—সেই দুষ্টু বালককে।

—বালকটি বাবা দুষ্টু নয় মোটেই। সে মনে মনে বলল, খুব সেয়ানা।

—তা মায়ের কাছে বাবা সকলেরা শান্ত শিষ্ট বালকের মতই থাকে। আমার কথা সুতরাং উইড্র করলাম।

এই কথায় অনু হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। সে তার বাবার মুখ দেখল। মা, বাবাকে কতদিন অনর্থক বকেছে এবং বাবা ভালমানুষের মত মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন, ওদের জীবন যেন ঠিক আজকের মত ছিল না। মার সীমিত ইচ্ছা, বাবার স্বচ্ছন্দ

উপার্জন, বাবা দুহাতে খরচ করতেন এবং মা এই খরচ নিয়ে কতদিন কত অনর্থ ঘটাতে চেয়েছে—বাবা শুধু বলেছেন, ঠিক আছে আর হবে না। অনু ভাবল, এখন আর সে-দিন নেই, সেই সব কাল কবে শেষ হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। ওর সুভর মুখ মনে হলে—সেই এক ইচ্ছার কথা মনে হয়—সুভ সারাদিন ওর পাশে পাশে ঘুরঘুর করেছে এবং অবসর বুঝে নানাভাবে তাতিয়ে সুখ মিটিয়েছে যেন সে সব ষড়যন্ত্রের সামিল—সুতরাং সুভর মুখ মনে এলেই ভিতরে বমি ভাবটা বেশী হয়; সুভর উপস্থিতি ওকে পাগল করে দিচ্ছিল।

বাবা বললেন, কে ?

—আমি রামচরণ বাবু।

—সুভকে দে।

—তিনি তো বাড়ি নেই বাবু, সেই সকাল সকাল কোথায় গেছে।

—কোথায় গেছে বলে যায়নি ?

—না বাবু ?

—সন্ধ্যা হয়ে গেল !

—হ্যাঁ বাবু।

—আজ তো ওর অফিস আছে ?

—আফিসে যায়নি। আফিস থেকে দুবার রিঙ করেছিল।

—বাড়ি ফিরলেই আমার কথা বলবি। আর আমাকে রিঙ করে খবরটা দিবি।

অনু দরজায় দাঁড়িয়ে প্রায় সব কথাই শুনে ফেলল। প্রথমে সে ঠোঁট ওল্টাল। ওর হাতে কিছু তেঁতুলের আচার। কাঁচা লঙ্কা এবং লেবু পাতা, একটু সরষের তেল দিয়ে মা সামান্য আচারের মত করে দিয়েছেন। আঙুলের ডগায় অনু চেখে চেখে খাচ্ছিল। বাবা একবার ফোনে কথা বলার সময়ই চোখ ঘুরিয়ে অনুকে দেখার

চেষ্টা করছিলেন,—অনুর মুখের ভেতর কি কি রেখা কাজ করছে ভেবে দেখার চেষ্টা করছিলেন।

বাবা ফোন রেখে দিলে অনু মণি মাসিকে ডেকে একটা চেয়ার বাইরের বারান্দায় দিতে বলে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সামান্য প্রসাধন করে বারান্দায় বসল। ছোট ছোট বাঁশের ভিতর সব লতাতে পাতা বাহারের গাছ এবং বড় পেতলের ভাসে সব সাদা রজনীগন্ধা। বৃষ্টি হয়েছিল বলে ফুলে সৌরভ অনেক। অনু এই সব ফুলের সৌরভের ভিতর কিছুক্ষণ চোখ বুজে সুভর স্বার্থপরতার কথা ভাবতে ভাবতে অসীম নামক এক যুবকের মুখ সহসা মনে করতে পারল। ওকে একটা রিঙ করা দরকার। সে যদি আসে তবে সব খুলে বলাই ভাল। সে কিছুদিনের জন্য না হয় ফের প্রতীক্ষা করবে। সে গুণ গুণ করে গীতবিতানের কোন বিষণ্ণ কলি গলায় ভাঁজতে থাকল। তারপর হাত ঘড়ির সময় দেখে বুঝল, এই সময় রেডিওতে কোন বিখ্যাত বেহালা বাদকের প্রোগ্রাম আছে। সে রেডিও খুলে দিল। বাইরের মিষ্টি হাওয়ায় অনুর চুল উড়ছিল। অনু সেই নরম গদীয়ালা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে কাপড়ের ভাঁজ পায়ের নীচ পর্যন্ত টেনে তলপেটের উষ্ণতা দেখার জন্য সন্তর্পণে হাত রাখল। কি যেন সেখানে টিপ টিপ করছে—এক নতুন প্রাণ, এক নতুন জীবন—সে দিনে দিনে বড় হচ্ছে। প্রীতির সব ট্যাবলেট হজম করে সেই জীব দানবের মত সব সৌন্দর্যকে গ্রাস করছে।

অসীম ফোন পেয়ে সেই রাতেই এসেছিল এবং অনেকক্ষণ অনুকে সঙ্গ দিয়ে গেছে। বাবা লক্ষ্য করে বললেন, ছেলেটিকে তো চিনলাম না অনু।

—ইউনিভার্সিটিতে সে এক বছরের আমার জুনিয়র ছিল। নাট্য সংসদে আমরা একসঙ্গে অভিনয় করি। ওর মামা ছবি করবেন মনস্থ করেছিলেন। সবই প্রায় অনু ছাড়া ছাড়া ভাবে বলছিল।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি শুধু কি বুঝে, হুঁ করেছিলেন। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে একাকী কিছুক্ষণ পায়চারী করতে করতে ফোন তুলে রিঙ করলেন, হ্যালো···কে? রামচরণ!

—হ্যাঁ বাবু?

—সুভ ফিরেছে?

—না। তিনি তো ফেরেননি। তিনি তো এত রাত করে কোনদিন ফেরেন না।

—কোথায় গেল হতভাগা? গলাতে ওঁর সামান্য ঝড়ের আভাস ফুটে উঠল।

রামচরণ ভয় পেয়ে বলল, আমি সত্যিই জানি না কোথায় গেছে!

তিনি ফোন ছেড়ে অন্নুর ঘরে ঢুকে বললেন, সুভ এত রাত হয়েছে, এখনও ফেরেনি।

অন্নু উঠে বসল এবং বলল, ফেরেনি—ফিরবে।

অন্নুকে দেখে মনে হল সে প্রায় একটা নির্দিষ্ট পালার কথা যেন ভেবে রেখেছে। সুতরাং তিনি ক্ষেপে গেলেন প্রায়—বললেন, তোমাদের কি হয়েছে অন্নু?

—কি হবে বাবা! কিচ্ছু হয়নি। সে তো নাবালক ছেলে নয়, যে বাড়িতে রাত দশটায় না ফিরলে থানা পুলিশ করতে হবে।

তিনি আর কিছু না বলে চলে গেলেন। বিবাহিত জীবন অন্নুকে আরও অভিজ্ঞ করেছে। বিবাহিত জীবন অন্নুকে আরও দৃঢ় করেছে। ভালমন্দ বিবেচনার ব্যাপারে অন্নুর প্রত্যয় যেন তাঁর চেয়েও গভীর। অথবা অন্নু তার এই উক্তিতে প্রৌঢ় ব্যক্তিটিকে অলক্ষ্যে যেন বলতে চাইল, এ-সব ব্যাপারে বাবা আপনার নাক গলান ঠিক না। আমরা আমাদের ভাল-মন্দ কারও চেয়ে কম বুঝি না। সুতরাং তিনি যেন বুঝলেন, নদী তার আপন খাতে প্রবাহিত হবে, সেখানে যে কোন বিড়ম্বনা সহ্যের অতীত। তিনি পাড়ের মানুষ সুতরাং পাড়ে থাকাই স্থির করলেন। নদীতে খড় কুটো ভেসে

যাবে এবং অন্য কোন দিনে হয়তো ফের নদীর জল নির্মল হবে—শুধু এক মনোরম বর্ষার জন্য অপেক্ষা। তিনি সুভ সম্পর্কে অনুকে অন্য কোন প্রশ্ন করতে আর সাহস পেলেন না।

সুভ যা ভেবেছিল ঘরে ফিরে এসে শুনল, তা নয়। রামচরণকে সে চলে যাবার আগে একবার প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁরে অনুর বাবা তোকে আর কিছু বলেননি?

রামচরণ বলল, না বাবু।

সুভ ভেবেছিল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি অন্তত ওর খোঁজে এখানে ছুটে আসবেন। এবং ভেবেছিল অনুর অন্ততঃ সামান্য অনুশোচনা জাগবে। কিন্তু সুভ বুঝল প্রৌঢ় ব্যক্তিটি সামান্য খোঁজ-খবর নিয়েই সন্তুষ্ট। ভিতরে ভিতরে সে যে পাগলের মত এক অতীব অন্তর্দাহে ভুগছে এবং সারাদিন পার্কে অথবা মাঠের ভিতর এবং চোখ-মুখ লাল করে ঘরে ফিরছে, অথবা সে খেল কি খেল না, তার দুঃখের উৎস কোথায়, তার দৈনন্দিন নিয়ম মাফিক কাজ কাম অর্থাৎ সময় মত স্নান করা, অফিস করা এবং সময় মত বাড়ি ফেরা সব উল্টে-পাল্টে চরম অত্যাচার শরীরে উপর চলছে—তার সম্পর্কে সকলে উদাসীন—সুভর চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। যেন কতকালের অভিমান, এবং কতকাল থেকে অনুকে দেখছে না।

পরদিনও সুভ অফিস গেল না। সারাদিন বাড়িতে শুয়ে বসে কাটাল। সে সারাক্ষণ সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির ফোন আশা করেছিল। কিন্তু তিন চারবার ফোন এসেছে, সে ফোন অফিস সংক্রান্ত। সে বাড়িতে বসেই নির্দেশ দিয়েছে।

মাণ্ডদি সাহেব এক সময় বললেন, হঠাৎ কি হল তোমার চ্যাটার্জী?

সে বিরক্ত গলায় অথচ অনুনয়ের সঙ্গে বলল, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—শরীর এখনই খারাপ করলে বাকি জীবন এনজয় করবে কি করে?

—এই সামান্য সর্দি জ্বর।

—মিঃ উষারাম এসেছিলেন কাল।

—তাই বুঝি?

—সে সারাক্ষণ তোমার প্রশংসাই করল।

—অঃ।

উষারাম তোমাকে লোন চাইছে।

—আমাকে।

—হ্যাঁ। বলছে ওদের নতুন অফিস হচ্ছে কলম্বোতে, সেখানে কিছু দিনের জন্য তোমাকে চাইছে।

—অঃ।

—আমি বললাম, সে মিঃ চ্যাটার্জীর ইচ্ছা। সে যদি কিছুদিনের জন্য যেতে চায় তবে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

সুভ বিরক্ত হচ্ছিল ক্রমশ। এবং মাগুদি সাব মিঃ চ্যাটার্জীকে অল্প সময়ের জন্য লোন দিয়ে নিশ্চয়ই বড় কোন কাজ হাঁসিলের চেষ্টায় আছেন। উষারাম বর্তমানে ডায়েরী ফার্ম করছে সেকেন্দ্রাবাদে। সেখানে নিশ্চয়ই ওর পার্টনারসিপ খোলার ইচ্ছে। সুভর মুখে কৌতুকের আভাস দেখা গেল। অথবা মুখে সারাক্ষণ রক্ত ক্ষরণের যন্ত্রণার ছবি যেন। সুভর মুখ দেখে এখন সুখ কি দুঃখ কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। সুভ যেন টেবিলের ওপর ক্রমশ ঝুলে পড়ছিল।

সুভ এক সময় বলল, সে আপনাদের ইচ্ছা।

আর বিকেলের দিকে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতেই প্রীতির কথা মনে পড়ে গেল। সে প্রীতির প্রতি কিছু অসম্মানকর উক্তি

করেছে। যখন কোথাও কেউ নেই, রামচরণ ঘরে চলে গেছে, এই ছোট ফ্ল্যাট বাড়ি বড় এবং প্রশস্ত মনে হচ্ছিল এবং গাছে গাছে সব কাক চিল উড়ে বেড়াচ্ছে তখন প্রীতির কাছে গিয়ে খারাপ ব্যবহারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করা যায়। এই ভেবে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল এবং অনেক সময় ধরে আয়নায় নিজেকে দেখল। প্রায় অনেকদিন আয়নায় সে এভাবে নিজেকে দেখেনি। বয়সের চিহ্ন ধরা পড়ছে, এবং গতকাল শরীরের ওপর অত্যাচারের জন্য চোখের নিচে কালো দাগ। অনেকদিন পর সুভ নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর দামী পোষাক পরে মাগুদি সাবকে একটা গাড়ি পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে বারান্দায় বসে পথ এবং গাছ-গাছালি দেখতে দেখতে একটা সিগারেট নিঃশেষ করে ফেলল।

শীত কম বলে সহরের পথে কিছু শুকনো পাতা উড়ছে। গাছগুলো দুপাশের নেড়া নেড়া মনে হচ্ছিল। সহরের পথে ট্রাম-বাসের ভীড়, মানুষের মিছিল যাচ্ছে। পার্কে সভা হচ্ছিল—মাইকে বক্তৃতার অংশবিশেষ শোনা যাচ্ছে। দেশের মানুষের কাছে তিনি পৌরুষ ভিক্ষা করছেন। গাড়িতে বসে এই পৌরুষ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে মনে হলো, অনুর কাছে ওর ব্যক্তিত্বটুকু কবে হয়তো মরে গেছে। এই ব্যক্তিত্বহীনতার দায় সে নিজের ওপর রেখে ভাবল সারাদিন, সারা মাস অথবা সারা বেলা অহেতুক অছিলায় অনুর উত্তাপে হাত পা না সেঁকলেই যেন ভাল হতো— অদ্ভুত এক জীবনের ইচ্ছা— কোন খোলা আকাশের নীচে ট্রেনের কামরায় এবং হ্রদের ধারে সংগোপনে সে হাত প্রসারিত করে দিত আর অনু সেই হাত বারবার তুলে নেবার সময় বলত, তুমি ভারি অসভ্য সুভ। দূরে ঐ গ্যাখ লোক যাচ্ছে, অথবা বলত আমার আর মান সম্মান থাকবে না। অনু সংগোপনে সুভর এই প্রসারিত হাতকে যত অসম্মান জানিয়েছে অনুর কাছে সুভ তত দিন দিন ভেতরে ভেতরে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ হয়ে গেছে—যার জন্য সুভর কোন ভয়ই ভয় নয়। সুভর কোন তিরস্কার,

তিরস্কার নয়—সুভর সব কিছু একটি বিশেষ বস্তুর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। যেন অমূ এক গুপ্তধন নিজের কাছে সব সময় লুকিয়ে রাখছে। খুলে ধরলেই সুভ সরল বালকের মত ফের ব্যবহার করতে শুরু করবে। সেই মাণিক্যের কৌটার জন্য সব যুবকেরাই যুবতীদের পাশে ঘুর ঘুর করছে—এইটুকু ভাববার সময়ই দেখল গাড়ি প্রীতিদের বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। সুভ ড্রাইভারকে কিছু না বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে বেল টিপতেই দেখল একজন মধ্যবয়সী মহিলা বেরিয়ে আসছেন। সুভ বলল, ডাক্তার প্রীতি আছেন?

—আছেন। আপনি বসুন। বলে সেই মহিলা জানালার পর্দা সরিয়ে ঘরের পাখা চালিয়ে দিলেন।

সুভ ঘরের দেওয়াল দেখছিল। ডিসটেম্পার করা দেওয়ালে চকচকে রঙ এবং কোণায় কোণায় কৃত্রিম সবুজ ঘাসের গুচ্ছ। কিছু বই এবং বড় বড় নর-কঙ্কাল যা প্রীতি মানুষের শিক্ষণীয় ব্যাপার হিসাবে রেখে দিয়েছে। বেশ সুতো দিয়ে গাঁথা এবং সুন্দর এক দামী মখমলের চাদরের ওপর বিছানো আর অন্য পাশে সব বড় বড় আলমারি, নানা রকমের বই, কিছু ধর্মীয় পুস্তক। নিচে ছোট কার্পেটে এক ভয়ঙ্কর বাঁদরের ছবি। সুভ দেখল, বেশ সেজেগুজে তিনি আসছেন। তার পা দেখা যাচ্ছে—পর্দার নিচ দিয়ে। সুভ সোজা হয়ে বসল।

পর্দা উঠে গেলে সে উঠে দাঁড়াল।

—আপনি! প্রীতি হাওয়ায় পাখী উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে কথাটা বলল। অথবা এও হতে পারে আশ্চর্য এবং দ্বিধা দুই ওর কণ্ঠে জড়িয়েছিল। সে কি আর বলবে ভেবে পেল না।

সুভ বলল, আপনার কাছে চলে এলাম মার্জনা চাইতে।

প্রীতি বিব্রত বোধ করল। সে বলল, কি যে বলছেন? বলে সে পাশের টেবিলে ঠিক কঙ্কালটার পাশে হাত রেখে দাঁড়াল।

সুভ বলল, আপনার চেষ্টাটুকু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য

ছিল। অথচ কেন যে ক্ষেপে গেলাম এবং আপনাকে গালাগাল করে ফেললাম বলে সুভ সহসা হেসে দেখল প্রীতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, একি আপনি বসুন! দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন?

প্রীতি বসার সময় আশ্চর্য এক ভঙ্গী করল এবং পুষ্ট বাহু প্রীতির, ঘাসের মত গায়ের রঙ আর চশমার নীচে হাল্কা কাজল—প্রীতিকে ডাক্তার মানুষ বলে এখন যেন মনে হচ্ছে না। শাড়ির মিহি সুতোর ফাঁকে অন্তর্বাস স্পষ্ট আর পুষ্ট শরীর বলে সব কিছুই যেন ফেটে পড়ছিল। সব আঁট করে পরা এমন কি চুলের খোঁপা পেছন থেকে এত আঁট করে বাঁধা যে কপালটা বড় বেশি চওড়া মনে হচ্ছিল। সুভ কথা বলার ফাঁকে প্রীতিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে—প্রীতি, ভ্রূণ হত্যাকারিণী প্রীতির চওড়া কব্জিতে উজ্জ্বল ঘড়ি টিক টিক করে চলছিল। আর তখন সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের মুখে পা রেখে প্রীতি বলে চলেছিল, কাল একবার মেসোমশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন অনুকে দেখার জন্য। তারপর কথায় কথায় প্রীতি এক যুবকের কথা বলল, কথায় কথায় যুবকের সেবা ধর্মের কথা বলল, তারপর প্রীতি উঠে গেল চায়ের জন্য এবং মিষ্টির জন্য।

সুভ দেখল সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের মুখের ওপর প্রীতির জুতোর ছাপ—এবং বাঁদরের মুখটা এখন চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে মানুষের মত দেখাচ্ছে। সুভ তাড়াতাড়ি জুতো দিয়ে কার্পেটের ওপর ঘসে ঘসে বাঁদরের মুখটা বাঁদরের মত করে দেবার চেষ্টা করল। অসীম নামক যুবককে নিয়ে তবে অনু মোটামুটি ভালই আছে। এ সময় সুভর মুখ খুব শক্ত হয়ে গেল। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি, সেই প্রৌঢ়া এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সামনে অনু এমন বেহায়া হতে পারল ভেবে সুভ প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবকের মত উঠে দাঁড়াল। প্রীতি এখনও আসছে না দেখে সামান্য সময় উদ্বিগ্নচিত্তে আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সব ধর্মীয় পুস্তকের নাম মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে থাকলো—

পর্দা উঠে গেলে সেই প্রীতি— হাসতে হাসতে বলল, আমার বাবার কালেকসান।

—করেছেন কি ! এত খাবার আমি এখন খেতেই পারব না।

—সামান্য। প্রীতি বসে ডিসের ওপর হাত নাড়তে থাকল। মাছি বসতে পারে খাবারে। সেই ভয়ে প্রীতি উঠতে পারছে না— জল আনতে যেতে পারছে না।

সুভ সামনে বসে বলল, আর একটা প্লেট আনুন।

প্রীতি বলল, খেয়ে নিন তো মশাই। এক'টা খেতে পারবেন।

—সত্যি বলছি পারব না।

—পারবেন বলছি। আপনি কতটুকু খেতে পারবেন আমি জানি।

—আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনার পক্ষে সবই জানা সম্ভব। বলে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেন সুভ একটা মিষ্টি মুখে তুলে কপ করে গিলে ফেলল।

প্রীতি হাসতে হাসতে বলছিল, আপনি খুব খেতে পারেন।

সুভ অল্প হাসল।

অনু বলেছে, আপনি সময় অসময় নেই, খেতে পারলে খুশী।

—তাই বুঝি। সুভ কিঞ্চিৎ ঠেস দিয়ে কথাটা বলে ফেলল।

—কিন্তু যাচ্ছেন কোথায় ? বলে প্রীতি উঠে দাঁড়াল এবং জল এনে রেখে বলল, কফি না চা ?

—কিছু হলেই হলো। যখন ছাড়ছেন না, তখন আপনার খুশী মতোই হোক।

প্রীতি এবার সহজভাবে তাকাল না, একটু ঘাড় কাত করে তাকাল। এই প্রীতি এখন অন্য দিনের প্রীতি নয়, অথবা গরবিণীর মত দেখাচ্ছে না। এই প্রীতি এখন আর ডাক্তার প্রীতি নয়। সেও যেন সন্তানের জননী হতে গেলে যে সুখের আবেশ দরকার, সুখ ঈশ্বরের মত অস্থিমজ্জায় আগুন জ্বালিয়ে রাখে—তেমনি কোন সুখ,

তেমনি কোন আস্বাদ চাইছে। ডাক্তার প্রীতি দেওয়ালের দিকে মুখ তুলে রেখেছে। সেই মধ্যবয়সী মহিলা কফি রেখে গেল। প্রীতি দেওয়ালের দিকে মুখ করে কফি গিলছে। সুভ কফি খেতে খেতে অনুর কথা ভাবছিল এবং অসীমের কথা ভাবছিল।

প্রীতি বলল, অনুর মেজাজ এখন খিটখিটে।

প্রীতির সহসা এই কথায় সুভ খুশী হতে পারল যেন। সে কোন উত্তর না করে সোজা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল।

এবং ঠিক সন্ধ্যার পরই সুভ দূরের একটা গাছের নীচে পলাতক পুরুষের মত কার অপেক্ষায় যেন বসেছিল। সামনে ছোট একটা রেষ্টুরেণ্ট এবং তার ঠিক ডান পাশে ছোট এক বকুল গাছ। সুভ বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। ও কিসের প্রতীক্ষায় একের পর এক সিগারেট নিঃশেষ করছিল। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। কিছু বকুল ফুল মাথায় এবং গাছের নীচে ফুটপাথের উপর অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে যেন ঝরে পড়ছিল। সুভ উত্তেজনার জন্য এ সব কিছুই লক্ষ্য করছে না। সে আজ অসীম নামক কোন যুবকের সন্ধানে আছে। এবং যুবতী অনুর জন্য সে পাগলের মত গাছের নীচে পায়চারী করছে। মাথার ভেতরে সুভর এ সময় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছিল। অনু যথার্থই দূরে সরে যাচ্ছে ভেবে সে অস্থির বোধ করছিল ভিতরে ভিতরে।

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বুঝল ডান পাশের দুটো বাড়ি অতিক্রম করলে অনুদের বাড়ি। সদর দরজায় অসীমের গাড়ি লেগে আছে। ক্রমশ রাত বাড়ছিল। পথ জনহীন হয়ে পড়ছিল। সুভ ধীরে ধীরে সদর দরজার পাশে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল এবং পায়ের শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করে বুঝল দোতলায় অনুর ঘরে অসীম প্রাণ খুলে হাসছে এবং অনু প্রাণ খুলে হাসছে। সুভ স্থির থাকতে পারছিল না। ওর মুখ এখন প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠছে। সে দাঁত-মুখ শক্ত করে সিঁড়ি ধরে উপরে ছুটে যেতে

চাইল। এবং তখনই মনে হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সিঁড়ি ধরে অসীম নামছে। সুভ এবার ধীরে ধীরে শক্ত পা ফেলে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, অসীমবাবু।

—কে!

—আমি সুভাষ বলছি।

—অঃ আপনি! আরে কি খবর! অনুদি এইমাত্র খেতে গেল। চলুন, চলুন ওপরে।

সুভ বলল, অসীমবাবু। গলার শব্দ খুব ভারি শোনাল।

অসীম একটু এবার বিব্রত বোধ করল। সব কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে ভেবে হাই তুলল একটা। বলল, আপনার কথা গতকালও আমরা বলাবলি করেছি।

সুভ খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, অসীমবাবু আপনি আর এখানে আসবেন না।

—কেন?

—না আসবেন না। আপনার সামান্য ভদ্রতাবোধটুকু নেই।

-সেটা আমার, না আপনার!

—বেশী কথার আমি মানুষ নই অসীমবাবু। আমি ছোট মানুষ, আমি সাধারণ কথা বুঝি। এলে অনর্থ ঘটবে।

অসীম ঠাট্টা করে বলল, সেটা আমাকে না বলে আপনার স্ত্রীকে বলুন সুভাষবাবু।

—আপনি ওর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছেন।

—না নিচ্ছি না।

—আলবৎ নিচ্ছেন। সুভাষ এবার চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ধরে সেই প্রৌঢ় নেমে এলেন, অনু এল এবং আশেপাশের বাড়ির জানালা খুলে গেল।

অনু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল। বাবাকে আসতে দেখে অলক্ষ্যে সেও নেমে এল। তারপর অসীমের পাশে দাঁড়িয়ে

বলল, অসীম তুমি ওপরে যাও, বাবা চলে যান। বলে, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবার আগে গলা বাড়িয়ে বলল, তুমি এত নীচ!

—অনু! সুভাষের গলা কে-যেন চেপে ধরছিল। কিন্তু ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সুভাষ অপমানে লজ্জায় এবং নিজের আত্মসম্মানবোধের জন্য সামনের সব কিছু অন্ধকার দেখল। সে হেঁটে যেতে পারছিল না। ওর শরীর উত্তেজনায় টলছে। সে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তার আপন বৃত্তে এবার ঘুরপাক খেতে থাকল।

এবং অনু ওপরে উঠে হাঁপাচ্ছিল। সেও প্রায় দিকবিদিকজ্ঞান-শূন্য প্রায় উত্তেজনাবশে এবং আত্মসম্মানবোধের জন্য এ করা ব্যতীত অন্য কিছু করার যেন উপায় ছিল না। নতুবা সুভাষ চীৎকার করে সকল প্রতিবেশীকে আরও সজাগ করে দিত, একটা প্রলয় ঘটে যেতে পারত, কারণ অনুর মনে হচ্ছিল অসীম অথবা এ বাড়ির সম্মান বিশেষ করে নিজের চরিত্রগত আকস্মিক ত্রুটি থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ সুভকে ধিক্কার দেওয়া। কিন্তু সব যখন শান্ত হয়ে এল, যখন বাবা, আপন মনে কি বিড় বিড় করে বকছিলেন ঘরে বসে, মা তার সামনে বসে এবং অসীম কাপুরুষের মত নিজেকে অদৃশ্য করে রেখেছে তখন নিজের ওপরই এক ভয়ঙ্কর ধিক্কার এসে গেল অনুর। আর মনে হল মানুষটা ভালবাসার জন্য হয়ত এখন অন্ধকার পথে হেঁটে চলেছে। অনু আর পারছিল না, সে বিছানায় শরীর তলিয়ে দিয়ে মণি মাসিকে ডেকে বলল, অসীমকে এবার চলে যেতে বল মাসি। সে হয়তো এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য বুক টেনে সামনের দিকে হাত বাড়ালে বুকের ভেতর এক আশ্চর্য কান্না ভেসে এল অনুর। বুকে হাত রেখে সে একা অন্ধকার ঘরের ভিতর নিঃসঙ্গ মাঠের মত পড়ে থাকল।

সুভ একটা পার্কে বসে থাকল সামান্য সময়। বসন্তের হাওয়া হ্রদের জলে সামান্য ঢেউ তুলছে। দূরে মনে হচ্ছিল কোন গাছের ছায়া থেকে সন্তর্পণে কেউ উঠে চলে যাচ্ছে। পথে গাড়ি এবং মানুষ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। এই পার্কের বেঞ্চে সুভ পা ছড়িয়ে বসে আকাশের অগণিত নক্ষত্র দেখতে দেখতে কেমন পুলক বোধ করল। দূরের জানালায় নীল লাল আলো, কাঁচের ভিতরে সব অস্পষ্ট মানুষের ছায়া—সকল নক্ষত্রলোকের মত যেন মাস বৎসর কাল ধরে নিজের কেন্দ্রে শুধু ঘুরে মরা। সে কি ভেবে চারপাশ হাতড়াতে থাকল পাগলের মত। এমন কেন হয়, কেন অনুর জন্য এই দুঃখবোধ, কেন সে প্রতিহিংসাপরায়ণ আর কেনই বা সহসা থেকে থেকে ডাক্তার প্রীতির সরল মুখ চোখ ভেসে উঠছে ভাবতে ভাবতে সুভাষের মনে হলো সে রজ্জুর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে সেই অসি, আর নীচে অগণিত প্রীতির মুখ অথবা অনুর মুখ এবং ভালবাসার অসি খেলা চলছে। সেই সুলতার কথা—প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মতো, বড় সন্তর্পণে হেঁটে যেতে হয়। অথবা রজ্জুর ওপর অসি খেলা—পা ফসকালেই মৃত্যু। হয়তো ভালবাসার রজ্জুতে সুভর দাম অনুর কাছে শূন্যে এসে ঠেকেছে। সুতরাং সুভ হাত পা ঝেড়ে উঠে পড়ল। ভালবাসার জন্য ভ্রমরের কৌটার সন্ধানে সুভ প্রীতির ঘরে যেতে চাইল। কারণ প্রীতি প্রতীক্ষা করছে। জলের নীচে সেই মঞ্জিল, মঞ্জিলে সাদা পাথরের ঘর, ঘরে ভ্রমরের কৌটা—সুভ গেলেই প্রীতি সব খুলে দেখাবে—সুভ ঘরের দিকে এবার প্রীতির জন্য হাঁটতে থাকল।

অনু সারারাত ঘুমাতে পারল না।

প্রথম সে অন্ধকার ঘরে শুয়ে অন্য ঘরে বাবা এবং মার কোন কথা হয় কিনা শোনার চেষ্টা করল। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে মণিমাসির ঘরের দিকে গিয়ে যখন বুঝল প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে আছে অথবা ঘুমের ভাণ করে পড়ে আছে তখন বসার ঘরে সন্তর্পণে ঢুকে

ফোন তুলে ডায়াল করল। এবং অপর প্রান্তে সে শুনল রিঙ ক্রমশ বেজে চলেছে। কেউ ফোন তুলছে না। সে প্রায় মিনিটকাল কানের কাছে রেখে যখন বুঝল মানুষটা এখনও ঘরে ফেরেনি, রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছে—ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল যদি অন্য কিছু হয়, যদি মানুষটা দুঃখে…অনু আর ভাবতে পারল না। সে সেখানেই বসে পড়ল। এবং ঘড়ির কাঁটাতে টিক্‌টিক্‌ শব্দ হচ্ছে। পথে হর্ণের শব্দ। সে ফের রিঙ করল এবং পূর্ববৎ রিঙ বেজে চলেছে। অনু এবার যেন চীৎকার করে সকলকে ডেকে তুলবে আর ঠিক তখুনি ফোন কে তুলে নিল। বলল, কে! হ্যালো আপনি কাকে চাইছেন? হ্যালো! হ্যালো! অনু চুপ করে থাকল। মানুষটার গলার স্বর খুব স্বাভাবিক লাগছিল। অনু কথার জবাব না দিয়ে ফোনটা কানের কাছে ঠেসে ধরল। মানুষটা বিরক্ত হয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

অনু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনু নিজের ঘরে ঢুকে একটু জল খেল গ্লাস থেকে। তারপর শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করার সময় মনে হলো—ঘরে ফিরে যদি মানুষটা…অনু ভেবে ভেবে কিছুই কিনারা করতে পারল না। ঘড়ির সেই টিকটিক শব্দ অনু এ ঘর থেকেও যেন শুনতে পাচ্ছে। পাশের বাড়ির বাথরুমে কলের জলের শব্দ। অনু বালিশে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকল…যদি মানুষটা এ সময়ে কোন…অনু উঠে বসল, ফের জল খেল, একবার বাবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একবার মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর কি ভেবে বসার ঘরে ঢুকে ফের রিঙ করল। অন্য প্রান্তে রিঙ ক্রমশ বাজছে, বাজছে…বাজছে। অনু ক্রমশ নিজের ভেতরে গুটিয়ে আসছে, অনু প্রায় চীৎকার করবে—ঠিক তখুনি অন্যপ্রান্তে রিঙের শব্দ থেমে গেল, হ্যালো কে! হ্যালো? এতো আচ্ছা জ্বালা হলো দেখছি। রাতে ঘুমোতে দেবে না পর্যন্ত। হ্যালো কথা বলছেন না কেন। যত্ত সব ননসেন্স! বলে ফোন কেটে দিল।

অনু এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনু নিজের ঘরে ঢুকে চোখে মুখে জল দিয়ে শোবার সময় দেখল ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে চারটা বাজছে। অনুর এই সব দৌড় ঝাঁপ অথবা ধকল সহ্য হলো না। সে ভাবল ভেতরে ভেতরে সেই দানবের হয়তো মৃত্যু ঘটছে। সেই দানবের মুখ ক্রমে শিশুর মত মুখ তুলে এখন যেন অনুর দিকে তাকিয়ে কি প্রার্থনা করছে। অনু সুভর কৈশোরের মুখ দেখতে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের সব গ্লানি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পেটের কোমল মাংসের ভিতর সংগোপনে লুক্কায়িত প্রাণের জন্য এক অপরিসীম বেদনা, অনু তাড়াতাড়ি সব চাদর একসঙ্গে করে বুকের কাছে তুলে আনল এবং চীৎকার করে ডাকল—মণিমাসি, মা, মা—আ।

সবাই ছুটে এলে অনু সেই চাদর বুকের কাছে পাগলের মত টেনে রেখে শুধু উচ্চারণ করল, মা—আ—মা—আ! রক্ত!

মণিমাসি অনুকে তাড়াতাড়ি চাদর পাল্টে শুইয়ে দিল। বলল, এখন আর নড়বে না। বাবা সামান্য হোমিওপ্যাথ ওষুধ দিলেন।

প্রীতি না আসা পর্যন্ত সকলে ভীষণ উদ্বিগ্ন। ওরা পরস্পর কোন কথা বলতে পারছিল না।

প্রীতি এসে দেখে বলল, কিরে খুব ঘাবড়ে গেছিস?

অনু প্রীতির হাত ধরল, বলল, আমি কি করব প্রীতি।

প্রীতি, মা এবং মণিমাসির জন্য অন্য কিছু না বলে বলল, কোন ভয় নেই। আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি।

—মা এবং মণিমাসি বাইরে গেলে বলল, তোর তো ভালই হলো।

অনু এবার হাত জড়িয়ে ধরল, প্রীতি আমাকে রক্ষা কর।

—রক্ষা তো পেয়ে যাচ্ছিস।

—প্রীতি আমার সন্তানকে তুই বাঁচা। প্রীতি প্রীতি, কান্নায় অনু ভেঙে পড়ল।

প্রীতি কিছু ওষুধ এবং ইন্‌জেক্সানের ব্যবস্থা করে বের হয়ে যাবার সময় বলল, এবারেও আমি ওকে রক্ষা করতে যথাসাধ্য করব অনু। আমার ওপর তুই বিশ্বাস রাখ! বলে প্রীতি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে ফের ফিরে এসে বলল, একেবারে বিছানা থেকে উঠবি না।

প্রীতি চলে গেলে এই প্রথম অনু সকলের অলক্ষ্যে সন্তানের জন্য পেটের নীচে ভালবাসার হাত রাখল। ধীরে ধীরে নরম মাংসের উপর ভালবাসার হাত রেখে সুভর জন্য ফের মঙ্গল কামনা করে পাশ ফিরে শুলো। জানালা খোলা। হাওয়া ঢুকছে বসন্তের। সে অজ্ঞান্তে হাত বাড়িয়ে পাশে কাকে যেন খুঁজল। সাহায্যের জন্য, সেবার জন্য, এবং ভালবাসার জন্য সুভকে বড় কাছে পেতে ইচ্ছা হলো আজ।

শীতের বিকেল। প্রীতি বসে উল বুনছিল। বারান্দায় কুকুরটা শুয়ে লেজ নাড়ছে। প্রীতি উল বুনতে বুনতে দেখল—জানালা অতিক্রম করে বারান্দা, নীচে ফুলের বাগান—কিছু গোলাপর পাপড়ি শীতের জন্য হোক অথবা জলের অভাবে হোক অসময়ে ঝরে পড়ছিল। গত রাতের ঘটনার কিছু কিছু দৃশ্য পীড়াদায়ক– প্রীতি গত রাতের ঘটনার কথা ভেবেই বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং কম্পাউণ্ডার বিনয়বাবুকে বলে দিয়েছে কোন কল এলে যেন জানানো হয় ডাক্তার প্রীতি জোয়াদ্দার অসুস্থ। তিনি আজ আর চেম্বারে আসবেন না। প্রীতি উল বোনবার সময় ফের লক্ষ্য করল—ক্যালেণ্ডারের পাতাই ওল্টানো হয় নি। সে উঠে এল জানালার কাছে, ক্যালেণ্ডারের পাতাটি ছিঁড়ে বাইরের আবর্জনার উপর ফেলে দিল। শীতের জন্য হোক অথবা কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতার জন্য হোক বিকেলের রোদ সোনার মত উজ্জ্বল ছিল,

পথের কোথাও কোন মালিন্য ধরা পড়ছে না। বড় তকতকে এই শহর। বাড়িগুলোর সামনে দামী ফুলের সমারোহ। ফুল ফুটে শহরের এই অঞ্চলকে, শীতের বিকেলকে আরও মনোরম করছে।

উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য প্রীতি বড় বেশী শীত বোধ করছিল। ওর গায়ে দামী র‍্যাপার জড়ানো। সে নীচে বসেই বাবা এবং মার কণ্ঠ শুনতে পেল। ওরা যেন বলাবলি করছিল—শীত এবার জোর পড়বে। এই শীতকাল এলেই নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। দিনটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। প্রীতিকে এখন সকাল সকাল চেম্বার থেকে ফিরে আসতে হবে। এবং সেই বাড়ির ভিতর শুধু বাবা, মা, রাঁধুনী এবং সে নিজে। দাদারা বড় সৌখিন। ওরা নিজের মত করে ঘর বেঁধে আলাদা হয়ে গেছে। প্রীতি উল বুনতে বুনতে অনিমার কথা মনে করতে পারল। অনিমা দুঃখী এক যুবতী, মা হতে চাইছে না এবং অনিমার স্বামী সুভাষের সঙ্গে এই জননী হবার ব্যাপারে যত সংঘাত। প্রীতি জননী না হবার জন্য অনিমাকে এতদিন সাহায্য করছিল।

মনে হল কে যেন বাইরে বেল টিপছে। কুকুরটা দুবার চীৎকার করে উঠেছিল তারপর চুপ। অসময়ে কে আসবে! প্রীতি বুঝতে পারছে না। সে উল এবং কাঁটা খুব যত্নের সঙ্গে টেবিলের এক পাশে রেখে এই বৈঠকখানার কোথায় কোন ফুল হলে এই বিকেলের মত মনোরম হবে ভেবে একবার ঘরটা ভাল করে দেখে নিল। মনে হল কোণের টেবিলটার ফুলদানি একধারে সরে এসেছে। সে ফুলদানি ঠিক করে এবং অন্যান্য সব দেখে শুনে খুব ধীরে ধীরে দরজা খুলে অবাক—আরে আপনি! কি ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম মেসোমশায়কে ফোন করে অনুর কুশল জানব।

বোধ হয় প্রীতির এত কথা সুভাষ শুনতে পায় নি। সে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং একক মানুষের মত ঘরে ঢুকে একটা সোফায়

বসে পড়ল। কোন ভনিতা করল না, একবার প্রীতিকে দেখল না, এমন কি এটা অপরের পার্লার তাও বোধ হয় ওর সামান্য সময়ের জন্য ভুল হয়ে গিয়েছিল।

প্রীতি যত নিঃশব্দে দরজা খুলেছিল, যত নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে নিজের বেশবাস ঠিক করে নিয়েছিল ঠিক তত নিঃশব্দে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কুকুরটা পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে যেতে দেখেও সে কিছু বলল না। কুকুরটাকে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যেতে নির্দেশ করল। সেখানে মা-বাবা আছেন, ওঁদের পায়ের কাছে শুয়ে থাকুক কুকুরটা বোধ হয় মনে মনে এই চাইছিল প্রীতি।

শীতের বিকেল বলেই পথের উপর কিছু যুবক যুবতী—ওরা গায়ে শীতের ভিন্ন ভিন্ন গরম পোশাক পরে এই মনোরম বিকেলকে আরও উজ্জ্বল করছিল। গাড়িতে কত ভিন্ন রকমের মুখ ভেসে যাচ্ছে। সুভাষ এখানে বসে এই জানালায় এসব দেখতে পেল এবং জানালা অতিক্রম করলে সেই মসৃণ পথ, বড় বড় বাড়ি এবং সামনে কোন বাড়িতে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ ভেসে আসল। আর এই শীতের বিকেলে কোথাও যেন একর্ডিয়নের সুর ভাসছে অথবা মনে হচ্ছিল—কলকাতার এই পাড়াতে মানুষেরা সন্ধ্যা হলেই শীতের র‍্যাপার মুড়ে ঘরে ঘরে বিলাস বৈভবের বন্যাতে ডুবে যায়। কেবল এই বাড়িটার কোথাও যেন নিঃসঙ্গতা ছড়িয়ে আছে—বিশেষ প্রীতিকে দেখে, প্রীতির গলায় স্কার্ফ জড়ানো দেখে এবং সিঁড়িতে কুকুরের শব্দ শুনে এ কথাটা বেশী মনে হয়।

সুভাষ আর একবার এখানে এসেছিল। তখন সুভাষের ভিতর কিছু কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের দরুণ প্রীতি অসম্মান বোধ করেছিল। প্রীতি, ডাক্তার প্রীতি সুভাষের মত ঘাড়-গলায় উঁচু এমন বিশাল মানুষ কমই দেখেছে। অথচ এই যুবকের কাছে মাখনের দলার মত। নরম এবং উত্তাপে গলে যায়—দীর্ঘদিন সহবাসের জন্যই হোক অথবা একসঙ্গে থাকার দরুনও হতে পারে অথচ এই মানুষটার

প্রতি কিছু বিরূপ ধারণা পুষছে। অনুর কথা মনে পড়ছিল প্রীতির —গতরাতে অনুর ভারি বিপদ গেছে—সুতরাং প্রীতি ভাবল সুভাষ কিছু বিপদের খবর বয়ে এনেছে। যা ফোনে বলা যায় না এবং কাছে থেকে বলা দরকার।

প্রীতি চেয়ার টেনে বসল। ওর হাতের আঙ্গুল সাদা। এবং নখের উপর সামান্য নেল-পালিশ। ঠোঁটে কোন রঙ ছিল না। সাধারণ পোশাকে প্রীতিকে খুব সরল সহজ মনে হচ্ছিল। শীতের বিকেল বলে জানালার পর্দা খোলা ছিল না, ঘরে সামান্য অন্ধকার ছিল। এবং বাইরে তখন শীতের রোদ ক্রমশ সরে আসছে। এই জন্যই হোক অথবা এই বাইরের মানুষটির কাছে বসে থাকা, সামান্য অন্ধকারে ঠিক সন্তোষজনক নয়—আর আর এও হতে পারে মানুষটাকে অনেকদিন পর দেখে—ভাল করে দেখার ইচ্ছা—এই ভেবে প্রীতি জানালার সব পর্দা তুলে দিল। ঘরের ভিতরটা এখন বেশী পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। প্রীতি ফের চেয়ারে হেলান দিয়ে সুভাষের মুখ থেকে কিছু শোনার প্রতীক্ষা করছে।

সুভাষ, অনুর সুভ চুপচাপ বসেছিল। যেন সে কোন ওয়েটিং রুমে বসে আছে। শুধু গাড়ির জন্য প্রতীক্ষা। গাড়ি এলেই ওরা রেলগাড়িতে চড়ে গ্রামে মাঠে চলে যাবে।

প্রীতিই বলল, অনু কেমন আছে ?

সুভাষ অনুর কথা কিছু না বলে বলল, খুব ঠাণ্ডা পড়ছে। এবার জোর ঠাণ্ডা পড়বে।

তারপর উভয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একজন জানালা দিয়ে গোলাপের পাপড়ি উড়তে দেখল হাওয়ায় অন্যজন উলের কাঁটা হাতে নিয়ে আঙ্গুলে উল প্যাঁচাতে থাকল।

ভিতরে ভিতরে অনুর জন্য কষ্ট হচ্ছিল সুভর। বোধ হয় সুভ জানালার ও-পাশে সহসা একটা দৃশ্য দেখে ফেলেছিল—সেই এক দৃশ্য—অসীম নামক এক যুবকের প্রতি অনুর মমতা—অনু মা হতে

চাইছে না, অনু নিজের গর্ভজাত সন্তানকে বিনাশ করতে চাইছে। অনু যেন নর্তকীর মত জানালার পাশে নাচছিল এবং সব গোলাপের পাপড়ি উড়ে যাচ্ছে—শীতের সন্ধ্যায় অনুর মুখ বড় বিসদৃশ লাগছিল।

প্রীতির ভিতরে ভিতরে রাগ বাড়ছিল। আচ্ছা মানুষ তুমি বাপু। স্ত্রী অসুস্থ, রক্তপাত হচ্ছে, এবং প্রীতি নামক এক যুবতীর তোমার স্ত্রীর সেই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অসামান্য এক প্রচেষ্টা—ভোর রাতের ঘটনা প্রীতিকে বিরক্ত করছিল। ফলে প্রীতি মানুষটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত। সে ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করছিল যেন সুভাষকে।

সুভাষ এবার প্রীতির দিকে তাকাল। সে ওর টাই সামান্য আল্‌গা করে দিল এবং পায়ের মোজা সামান্য তুলে দিল। তারপর গলা সাফ করে বলল, আমি আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম প্রীতি।

প্রীতি সুভাষের দিকে বিস্ময়ে চোখ তুলতেই দেখল—সুভাষ ওর দিকে নির্লজ্জভাবে তাকিয়ে আছে। এতটুকু সংকোচ নেই মুখ খুব কঠিন দেখাল। শুকনো এবং ক্লান্ত চোখ। সমস্ত শরীরে অবসাদ। যেন সুভাষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রীতির কাছে সামান্য জলের আশায় উপস্থিত হয়েছে। প্রীতি সুভাষের কথায় জবাব দিতে পারল না। কেন এই সংকোচ সুভাষের, কেন ফের মাপ চেয়ে নেবার এত তাগিদ অথবা কি কারণ, ওর শুধু জানা ছিল জননী হবার ব্যাপারে অনু এবং সুভাষের ভিতর মতান্তর আছে। একজন মা হতে চাইছে না, নিজের সন্তানকে বিনাশ করতে চাইছে, অন্যজন সন্তান কামনা করে বসে রয়েছে। একজন রূপসী—গানে নাচে হল্লা, জীবনের জৌলুসকে এত সহজে ছেড়ে দিতে নারাজ, নাটকে অভিনয়ে সম্রাজ্ঞীর মত এবং অসীমের মত যুবকেরা স্বাভাবিক কারণেই ভিড় করছে। সুভাষের কি আছে—

এত উঁচু লম্বা মানুষটার কি আছে! ঘাড় গলা কাঁধ এত বিশাল দেখলে মানুষের ভয় হবার কথা—সুতরাং অনুর প্রতি এই যুবকের ভালবাসা অনুকে মা করে যুবকের মাত্র এক জলাশয় থাকবে—সেখানে সুভাষই শুধু অবগাহন করবে—অন্য যুবকের ভালবাসা, মমতা এবং সব আবেগ ঈর্ষার বস্তু। প্রীতি, সুভাষের মুখ দেখে সব যেন বুঝতে পারছে এখন। বড় চাকুরে এই মানুষ সংসারে একটি মাত্র ফুলের অপেক্ষাতে আছে। সুতরাং প্রীতি বলল, সুভাষবাবু আমাকে এ-সব বলে ছোট করছেন শুধু।

—আমি জানতাম আপনি এ-ধরনের কিছু কথা বলবেন।

—আর কি বলতে পারি। বলে প্রীতি মাথা নীচু করল।

—আপনার কিছু বলার আছে তবু। আমার ভর্ৎসনা সেদিন আপনাকে আরও ছোট করেছিল।

—ভর্ৎসনা! কিসের ভর্ৎসনা!

—ভুলে গেছেন।

—আমার মনে পড়ছে না সুভাষবাবু। প্রীতি মুখ তুলে তাকাল।

—আপনার মনে না থাকার কথা নয় প্রীতি!

প্রীতি হাসল সামান্য। সে উলের কাঁটা এবং উল নীচে রেখে বেশ ঝুঁকে বসল গোল বড় টেবিলটাতে। ছোট পার্লার। খুব ছিমছাম। কোণের একটা ছোট টেবিলে হাতির দাঁতের অশোক স্তম্ভ। কিছু ফুল এবং পাশের দেওয়ালে সব কৃতী পুরুষদের ছবি। প্রীতি ঝুঁকে বলল, মনে রাখলে অশান্তি বাড়ে সুভাষবাবু।

—অপনি ঠিক বলেছেন। তবে সংসারে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা মনে না রেখে উপায় থাকে না।

—রাখতে পারলে ভাল। তবে আমি ডাক্তার মানুষ বলেই হয়ত রুগীর চিন্তায় মাথাটা আমার ধরে থাকে। সুতরাং সুখ দুঃখ

ভেবে অত পীড়িত থাকতে পারি না সবসময়। আসুন বরং আমরা এই শীতে একটু গরম কফি খাই।

সুভাষ বুঝল প্রীতি সেই অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ ফের হোক মনে মনে চায় না। সে বলল, যখন বলছেন, হোক।

প্রীতি শাড়ির আঁচল বেশ করে জড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর উঠে তিভরে ঢুকে গেল। দেয়ালে কাচের আলমারি, প্রীতির ডাক্তারী বিত্মার কিছু বই, এবং পড়ার জন্য প্রথম যে মানুষের কঙ্কালটি সংগ্রহ করেছিল সুতো দিয়ে সেই কঙ্কাল ঝোলানো। কাচের আলমারিতে মানুষের কঙ্কালটিকে বড় বেশী লম্বা এবং শীর্ণ মনে হচ্ছিল।

শীতের বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সুভাষ এবার বারান্দা পার হয়ে রাস্তার দিকে তাকালে দেখল, কুয়াশায় সামনের পথটা বড় অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। আলোগুলো বড় ছোট মনে হচ্ছে এবং শীতের রাতে মানুষের মুখ বড় বেশী দেখা যাচ্ছিল না। সুভর মনে হল ওপরে প্রীতির মা এবং বাবা উপাসনা করছেন। ওঁদের ধর্মীয় সঙ্গীত নীচে ভেসে আসছিল।

প্রীতি কফি এনে বলল, আপনি আসবেন ভাবতে পারি নি।

সুভ বলল, কাল রাতে বাড়ি ফেরার সময় বার বার কেন জানি আপনার কথা মনে পড়ছিল প্রীতি। আজ সারাদিন অফিসে যাই নি।

—আচ্ছা অনুর ব্লিডিং ফের বেশী বেড়েছে!

সুভ বলল, ব্লিডিং!

—কেন আপনি জানেন না?

—না। জানি না প্রীতি।

—আপনাকে জানানো হয় নি ব্যাপারটা।

সুভ এ-সময় সামান্য কি ভাবল, তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল, আর জানাবে কেন, আমি তো ওদের কেউ নই।

—সুভাষবাবু। প্রীতি গম্ভীর গলায় ডাকল।

—বলুন।

—কি হয়েছে আপনার। আপনাকে বড় ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছে।

সুভ কি দেখল প্রথম প্রীতির ভিতর। অপলক তাকিয়ে থাকার জন্য বোধহয় প্রীতিরও অস্বস্তি লাগছিল। প্রীতি উঠে কাপ ডিস ভিতরে রাখার জন্য জড় করল। টেবিলের চাদরটা টেনে ঠিক করে ফের তাকাতেই দেখল, সুভ উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

—বড্ড ঠাণ্ডা ঢুকছে।

প্রীতি কিছু বলল না। সে ভিতরের দিকে তাকিয়ে বয়ের প্রতীক্ষা করল।

সুভ সোফাতে বসে ঠিক আগের মত মোজা টেনে বলল, আপনি অমুর বন্ধু।

প্রীতির উলের কাঁটাতে গিঁট পড়ে গেল।—হ্যাঁ বন্ধু।

—প্রীতি আপনি বিয়ে করেননি। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জানার কথা নয়।

—তা নয়।

—তবু আপনি অমুর ডাক্তার। ওকে আপনি কিছু ট্যাবলেট দিয়েছিলেন রক্তক্ষরণের জন্য। রক্তক্ষরণ হলে শুনেছি ভ্রূণটি নষ্ট হয়ে যায়।

—যায় সুভাষবাবু।

—আমি ওটা চাইনি। যার জন্য আপনাকে ফোনে একদিন গাল মন্দ করেছিলাম।

—সেটা আমি ভুলে গেছি।

—ভুলে যাননি, বলুন ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ মনে মনে আপনি আমাকে ক্ষমা করতে চেয়েছেন।

—ক্ষমা মহৎ গুণ সুভাষবাবু। আমি সাধারণ ডাক্তার অত বড় গুণ মাথায় থাকার কথা নয়।

—সাধারণ মানুষ বলেই অনুর এই বিশ্বজোড়া খ্যাতি আমার ভাল লাগেনা। সুভাষ সহসা অন্য কথায় চলে এল।

—খ্যাতির কথা বলেন তো অনুর সেটা আছে। রূপে বলুন, আর গুণে বলুন।

—অভিনয়, নাটকে, গানে। সারাদিন পরিশ্রম করে ফিরে শুধু দেখেছি চাকরটা আমার জন্য বসে আছে। খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। আমার খুব প্রাচুর্যের দরকার নেই, কিন্তু অনু শিল্পের দোহাই পেড়ে আমাকে একা ফেলে কোথায় কখন চলে যেত আমার ভাল লাগতনা প্রীতি, আপনি বিশ্বাস করুন আমার বড় কষ্ট হত। আর কেন জানি মনে হত আমরা মা বাবা হলে এই নিঃসঙ্গ ভাব থাকবে না। আমি সেজন্য অনুর অজ্ঞাতে ওর মা হবার বাসনাতে মিথ্যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা বলতাম। সুভাষ একনাগাড়ে কথা বলে কেমন ক্লান্ত বোধ করছিল বলে, একটু থামল। তারপর ফের সতেজ গলায় বলল, অনু মা হবার মুখে আমাকে ছোট ভাবল এবং সত্যি বলছি সেই অসীম নামক এক যুবা আপনার বোধ হয় মনে আছে, আপনি তাকে দেখেও থাকবেন যে প্রায়ই ওর সঙ্গে নায়কের অভিনয় করত তাকে বড় বেশী আস্কারা দিত।

এই সব কথায় প্রীতির কেমন কষ্ট হতে থাকল সুভাষের জন্য। মানুষটাকে বড় বেশী অসহায় লাগছিল। প্রীতি সান্ত্বনার কথা বলতে পারত কিন্তু সে অবিবাহিতা সুতরাং ভেতর থেকে এক ধরনের সংকোচ ওকে কাতর করছে। প্রীতি কোন সান্ত্বনার কথা না বলে বরং অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করল। প্রীতি বলল, এবার ত বাবা হচ্ছেন, মিষ্টি কিন্তু চাই। সুভাষ অবাক হল,—এ কথা কেন প্রীতি।

—আমি চেষ্টা করছি ভ্রূণটাকে রক্ষা করার। প্রীতি ডাক্তারসুলভ ইঙ্গিতে কথাটা বলল।

—রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়ে গেছে? সুভাষ পুনরাবৃত্তি করল কথায়।

—গেছে। ভোররাতে গিয়ে দেখলাম অনু বিছানায় পড়ে কাঁদছে। মেসোমশাই বারান্দায় পায়চারি করছিলেন।

—ওটাত ওর পক্ষে ভালো।

—কিন্তু অনু ওর সন্তানের জন্যই কাঁদছিল।

—তবে আপনার ওষুধে ভাল কাজ দেয়।

—বোধ হয়, না। কারণ মাসিমা বললেন, অনু প্রথম রাতের দিকে সিঁড়ি দিয়ে জোরে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছিল।

বোধহয় সুভাষ মনে করতে পারল, সুভ অনুদের বাড়িতে অসীমকে দেখে খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। ছোট লোকের মত চীৎকার করে পাড়াটাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘদিনের দুঃখ এবং আবেগ অথবা ভালবাসার জন্য সুভাষের অসীমকে অপমান করার সবরকমের প্রচেষ্টা এবং একটা সিন ক্রিয়েট করার সময় সুভাষ দেখল রাগে দুঃখে অনু মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সুভাষ, ক্লান্ত সুভাষ পায়ে হেঁটে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে ভেবেছিল—মৃত্যুই শ্রেয় এবং কাম্য। সে কেমন পাগলের মত সারারাত পায়চারি করেছে এবং মাঝে মাঝে যেন ভূতের আতঙ্ক—টেলিফোনটা মাঝে মাঝে বেজে উঠছিল। অথচ অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সুভাষ ভোরে আর একদণ্ড বাসায় থাকেনি। সুভাস অফিস যায়নি—কোথায় আর যাওয়া যায়—পায়ে পায়ে সে অনে। দূর হেঁটে গিয়েছিল, মাঠের নির্জন শাল গাছটার ছায়ায় সামান্য সমং বসেছিল—তারপর হেঁটে হেঁটে র‍্যামপার্ট পার হয়ে বিশাল গঙ্গা, এবং বড় বড় জাহাজ দেখে ভেবেছিল এইসব জাহাজ তাকে নিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। শেষে সহসা কি করে যেন প্রীতির কথা মনে পড়ে গেল। প্রীতি, ডাক্তার প্রীতির

সামান্য উত্তাপের জন্য বোধহয় সে এখানে চলে এসেছে। সে এবার খুব সপ্রতিভ গলায় বলল, অন্থ অভিনয় করেনিত প্রীতি!

প্রীতি বলল, না সুভাষবাবু। কি করে যেন ওর ভ্রূণটার জন্য ফের ভালোবাসা জন্মে গেছে। আমি ওকে কথা দিয়েছি ভ্রূণটাকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করব।

—অবাক, জানেন প্রীতি। আপনার শত চেষ্টাতেও কিন্তু ভ্রূণটা নষ্ট হয় নি। আর কিনা শেষে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ায় ভ্রূণটার নষ্ট হবার লক্ষণ দেখা গেল।

প্রীতির অপমান বোধ অসামান্য। তবু সুভাষের এই অনুযোগ গায়ে মাখল না। কারণ মানুষটাকে বড় রেচেড্ মনে হচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ, রাগে এবং অভিমানে হয়তো সারাদিন না খেয়ে আছে। কারণ সুভাষের মুখ চোখ বড় বেশী বসে গেছে। প্রীতির ভিতর থেকে এক ধরনের আবেগ উঠে এলো সুভাষের জন্য। মানুষটা স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হওয়ার জন্য কি না করেছে। একটা ছোট নির্মল জলাশয়ের জন্য মানুষটার চেষ্টার অন্ত ছিল না। অথচ সেই মানুষ কিছুতেই সেই নির্মল জলাশয়ে একা অবগাহন করতে পারল না। প্রীতি সারাজীবন হয়তো ডাক্তারী করবে—এমন এক মানুষ তার জন্য কোথাও অপেক্ষা করল না। অথবা প্রীতির ভেতরেই হয়তো পুরুষের প্রতি এক অহেতুক অহমিকা রয়েছে যা প্রীতিকে খুব বেশী রুষের সান্নিধ্যে আসতে দিল না। সব ব্যাপারেই প্রীতির ডাক্তার-সভ কথাবার্তা। ভয়ে কেউ যেন প্রীতির কাছে ভিড়তে সাহস রল না। প্রীতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, আমি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম মাত্র। আমাকে ক্ষমা করুন সুভাষবাবু। প্রীতির গলা খুব অসহায় শোনালো।

শীতের রাত বলে সহজেই মনে হচ্ছে শহরের সব ইট কাঠ এবং মানুষেরা বিশেষ করে এই অভিজাত অঞ্চলের বাড়িগুলো বড় নিঃসঙ্গ।

কোথাও রেকর্ড প্লেয়ারে কোন ইংরেজী গানের কলি—হয়তো ঘরে বসেই মদ্যপান করছে কেউ এবং বিদেশী সুরে নিমজ্জিত হচ্ছে। ওপরে বাবা মার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা বোধ হয় খেয়ে নিয়েছে। সুভাষ চুপচাপ বসেছিল, প্রীতি ঘাড় গুঁজে বসেছিল। কারণ সুভাষ আজ যেন যথার্থই ওকে ভ্রূণ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করতে এসেছে।

সুভাষ এতটা সময় চুপ করে থাকা পছন্দ করল না। সে খুব সহাস্যে বলল, আমি উঠি।

—আপনি এখানে কিছু খেয়ে যান সুভাষবাবু। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খান নি। খুব সাধারণ গলায় প্রীতি কথাটা বলার চেষ্টা করল।

সুভাষ প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন এ-জন্যই স্ত্রীজাতির প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা। অনুকে কত স্বাধীনতা দিয়েছি। অনু আমার এই স্বাধীনতার মূল্য বুঝল না। সুভাষ কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, আপনার অসুবিধা হবে। এখন রাত বেশ হয়েছে। সে ঘড়ি দেখল, রাত নটা বাজে।

—কোন অসুবিধা হবে না। বলে প্রীতি উঠে গেল। প্রীতি জানত বাড়িতে মানুষটার কেউ নেই। অনু বাপের বাড়ি রয়েছে। চাকরটা বাড়িতে আছে। এবং এই অধিক রাতে মানুষটা ঘরে ফিরে আলস্যের জন্য আর খাবে না। অনুর মুখ থেকে শোনা গল্পে সে যেন মানুষটাকে মুখস্থ করে ফেলেছে। বড় অলস প্রকৃতির মানুষ। অফিস থেকে ফিরে কোথাও সহজে বের হতে চায় না। শুধু ইচ্ছা দুজনে বেলকনিতে বসে থাকে। সুতরাং প্রীতির কেন জানি মনে হচ্ছিল এই শীতের রাত বেশ উত্তাপ বহন করে এনেছে তার জন্য। অহেতুক আনন্দে সে খুব তাড়াতাড়ি সামান্য ভাত এবং মাংস ফ্রিজ থেকে বের করে ফুটিয়ে দুজনে মুখোমুখি খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে সুভাষ বলল, আমি সারাদিন খাই নি কি করে বুঝতে পারলেন ?

—আমি ডাক্তার মানুষ সুভাষবাবু। মানুষের ভিতরে কি আছে তার খবর রাখা আমার কাজ।

—আমার পাকস্থলীতে কোন খাদ্য ছিল না বুঝতে পেরেছিলেন ?

প্রীতি হাড়টা চুষে নীচে রাখছিল। বলল, জিভ দেখলে সব বোঝা যায় রোগের। আর চোখ দেখলে মানুষটার সব চেনা যায়।

সুভাষ হেসেছিল। বলল, ভাল। তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত মোছার সময় বলল, তাহলে অনু ভ্রূণটাকে ভালবেসে ফেলেছে বলছেন।

—ওর কান্না দেখে তাই মনে হল।

—আপনার বিশ্বাস হয় ?

—হয়। কারণ কিসে মানুষের এই ভালবাসা জন্মায় কেউ বলতে পারে না সুভাষবাবু।

—আপনি ডাক্তার মানুষ। দার্শনিক কথা আপনার মুখে বড় বেমানান। প্রীতি কোন কথা বলল না। সে মনে মনে কি যেন চিন্তা করছে। প্রীতি সুন্দর নয়। প্রীতি কালো, লম্বা এবং পুরুষালি গঠন। প্রীতিকে সহসা ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু এই প্রীতির মধ্যেও এমন এক অমায়িক গড়ন রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে যা দূর থেকে স্পর্শ করা যায় না। সুভাষের সব নৈরাশ্য কেমন কেটে যাচ্ছিল। প্রীতির পাশে বসে এই আহার এবং প্রীতির সহৃদয় কথা ওকে যেন ঘরে ফিরে যেতে সাহায্য করছে।

ওঠার সময় সুভাষ বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন প্রীতি, কি করে কখন কার জন্য ভালবাসা জন্মায় কেউ বলতে পারে না। বলে সে দরজার বাইরে এসে বলল, দরজাটা বন্ধ করুন।

প্রীতি খুব ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করল। মনে হল মানুষটা খুব ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। এবং ধীরে ধীরে পায়ের শব্দ দূরে

মিলিয়ে গেল। এই শীতের রাতে ওর এতটুকু নড়তে ইচ্ছে হল না। এতক্ষণ ঘরটা যেন ভরে ছিল। কোন সম্পর্ক নেই, দুঃখ এবং বেদনার আঘাতে মানুষটা অবসন্ন, এত বড় মানুষটা তার কাছে কি এক শান্তির আশায় এসেছিল যেন। প্রীতির এই ভাবতে গিয়ে বড় বেশী শীত করছিল। কারণ ওর বারে বারে মনে পড়ছিল কোন যুবতী ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভ্রূণ ধারণ করলে যুবকের প্রতি ভ্রূণ পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক ঘৃণা থাকে। সেই ঘৃণার জন্য পরস্পর দীর্ঘদিন সহবাসে লিপ্ত হতে পারে না। এত বেশী শীত করছিল যে প্রীতি আর দাঁড়াতে পারছে না। সে ছুটে গিয়ে বিছানায় লেপ তোষক এবং কম্বল যা কিছু ছিল সব নিয়ে শুয়ে পড়ল। সেই দূরে তখনও কে যেন রেকর্ড প্লেয়ার বাজাচ্ছে এবং এক অদৃশ্য মানুষের দৃশ্য ভেসে উঠল কম্বলের নীচে। অন্ধকারের ভিতর প্রীতির মনে হল সেই মানুষের মত দিন দিন সে নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কেবল ভ্রূণের জন্য ভালবাসার কথা মনে হচ্ছিল।

প্রীতির কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সে লেপের ভিতর মুখ ঢেকে দিল। জানালার পাট খোলা। আলো অল্প ঘরে। কিছু বিচিত্র ছবি দেয়ালে। পাশের ঘরে কুকুরটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে কিংবা অন্য কোন কারণে কুকুরটা গোঙাচ্ছে। তারপর সিঁড়ির দরজা। ওর যেন বার বার মনে হচ্ছিল সুভ সেই সিঁড়িতে ফের এসে দাঁড়াবে এবং ওকে ডেকে তুলে—কি যেন ইচ্ছা সুভাষ বাবুর—কি যেন সারাক্ষণ বসে থেকে চাইছিল—আহা মানুষটার জন্য ভিতর থেকে অদ্ভুত এক মমতা উঠে আসছিল। প্রীতি, ডাক্তার প্রীতি এবং স্ত্রী বিশেষজ্ঞ প্রীতির যেন জানা এ সময় অনু সুভকে ভালবাসতে পারছে না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুর জননী হওয়া সুভকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

শীতকাল চলে যাচ্ছে। বসন্তের বাতাস বইবার কথা এখন। হঠাৎ কেন জানি শীত যাবার আগে শেষ বারের মত পথে ঘাটে এবং সর্বত্র শেষ কামড় বসাচ্ছে। অথচ সারাটা শীতকাল ভাল করে শীত পড়ল না, প্রীতির এই শীতকাল বড় মনোরম, প্রীতি শীতকাল এলে সারা অঙ্গ ঢেকে শুয়ে থাকতে পারে—এবং প্রায়ই শীতের সময় একজন যুবকের উষ্ণ উত্তাপের কথা থেকে থেকে মনে হয়।

প্রীতি, পাশ ফিরে শুল—সেই এক মুখ—সুভর মুখ, সুভাষের মুখ সারাক্ষণ ওকে শরীরের ভিতর উত্তাপের জন্ম দিচ্ছে। এ-সময় প্রীতির সেই হাত রাখার ইচ্ছা জাগল। সে পাশের টিপয় থেকে এই শীতেও এক গ্লাস জল খেয়ে দেখল সারা অঙ্গ কেমন কুঁকড়ে আসছে। ওর ভিতরে সেই এক জ্বর জ্বর মত ভাব হল। বড় ভাল লাগে—যখন এই জ্বর আসার ভাবটা জাগে, মনে হয় কোন অতলে প্রীতি নেমে যাচ্ছে, মনে হয় সুখ নামে সেই পাখী ওর সারা শরীরে ঠোকরায়। প্রীতি, ডাক্তার প্রীতি আর পারছিল না। সুভাষ, অনুর সুভ এবং সমবয়সী সুভ সহসা ঝড়ের পর ওর কাছে যেন সামান্য তৃষ্ণার জল চাইতে ছুটে এসেছিল। সুতরাং প্রীতি আর পারছিল না। যখন এই শরীরে জ্বর আসার মত ভাবটা হয়, যখন মা বাবা অন্য ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন এবং যখন একমাত্র ঘরের কুকুরটা জেগে—তখন প্রীতি মরার মত পড়ে থাকে। তখন প্রীতি প্রায় সব যুবতীর মত সারা অঙ্গ খুলে রেখে মরার মত পড়ে থাকে। সামান্য ওর হাত, মুখের মত সামান্য ওর মুখ এবং মুখে হাত রেখে সামান্য চাপ, চাপ, মৃদু চাপ, হায় কত মুখ এবং যুবকের কথা ভেবে যুবকের খোলা শরীর ভেবে, প্রীতি পড়ে থাকল, মরার মত পড়ে থাকল। প্রীতি টের পাচ্ছিল, উত্তাপের জল নেমে যাচ্ছে শরীর থেকে। যত উত্তাপের জল নেমে যাচ্ছে তত শরীর শিথিল মনে হচ্ছিল। তত শরীরে অবসাদ নেমে আসছিল—আর এই অবসাদের জন্যই বোধ হয় প্রীতি বাকি রাত ঘুমোতে পারল না।

প্রীতি, ভোরের দিকে জানালা দরজা খুলে গায়ে র‍্যাপার দিয়ে বসে থাকল।

সুভাষ সে রাতে খুব ভালভাবে ঘুমোল। যেন কোথাও একটি নৌকো বাঁধার জায়গা যাহোক মিলে গেছে। এবং যে হীনমন্যতা সুভাষকে মরিয়া করে তুলেছিল প্রীতির সঙ্গে সামান্য সময় কাটানোর জন্য সেই হীনমন্যতা সহসা প্লাবনের জলের মত নেমে গেল। খুব খটখটে শুকনো মনে হচ্ছিল মনটা। অথবা প্রতিশোধ। সে হয়ত, মনে মনে প্রতিশোধের স্পৃহাতে ভুগছিল।

ভোরবেলা সুভাষ দেখল সকাল সকাল রামচরণ চা করে দিয়েছে। যেহেতু অনু নেই, রামচরণ সুভ সম্পর্কে বেশী যত্ন নিচ্ছিল। বাবুর কোন ত্রুটি যাতে না ঘটে সেজন্য রামচরণ সকাল সকাল বাজার করে এনেছে, এবং ভাল মন্দ রান্নার আয়োজন করছিল। যদি বাবু আজও সকাল সকাল বের হয়ে যায়—সেজন্য রামচরণ রান্না সকাল সকাল বসিয়ে দিয়েছে। বাবুকে সে আজ আর কিছুতেই না খেয়ে বের হতে দিচ্ছে না।

সুভ অন্যান্য দিনের মত চা সামনে রেখে পত্রিকার কাগজ ওল্টাচ্ছিল। কাল রাতের ভয়ঙ্কর শীত এই ভোরেও দরজা জানালায় যেন লেগে আছে। ভোরের রোদ জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সেই রোদে দুহাত বিছিয়ে উত্তাপ নিল সুভ। পত্রিকায় সব ভিন্ন ভিন্ন খবর, সব লেন দেনের খবর। নেহেরু কোথায় যাচ্ছে, অথবা নৈনিতালের শীতের ছবি এবং মখমলের মত পোষাকের বিজ্ঞাপন, যুবতীর ছবি, খুব লম্বা যুবতীর পাশে ছিমছাম যুবক, চেহারাতে যেন সুভ এই যুবকের মত হতে চেয়েছিল এবং পাশে যুবতী অনু, সুভর এই ছবির মুখ দেখে অনুর কথা মনে পড়ল। অনুর অপমানের কথা মনে পড়ল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটির কোন পাবে আশা করেছিল, প্রৌঢ় একবার হয়ত এখানে চলেও আসবে এইসব ভেবে নিত্য দিনের কাজ কর্ম সারছিল সুভ। আর এলে কি বলবেন তিনি, কি

ভাবে তিনি, এই অপমানকর স্মৃতির কথা সুভকে ভুলে যেতে বলবেন—অথবা এও হতে পারে অনু এরপর থেকে অনুতপ্ত, অনু লজ্জায় আর সুভর সামনে দাঁড়াতে পারবে না বলে প্রৌঢ় মানুষটিকে চলে আসতে হল—কত কথা মনে হচ্ছিল সুভর কাজের ফাঁকে ফাঁকে। আর গত রাতে কি কি কথা হয়েছিল প্রীতির সঙ্গে, প্রীতি কত যত্ন নিয়ে দুটো খাবার দিয়েছিল সামনে—কাল সারাদিন অভুক্ত সুভকে প্রীতি কত যত্ন নিয়ে…এবং সুভকে প্রীতির কোথায় যেন ভাল লেগে গেছে…সুভ প্রীতির মুখ মনে করতে পেরে অনুর ছবি মন থেকে মুছে দিতে গিয়ে দেখল ফিরে ফিরে সেই এক গানের কলির মত অনুর মুখ মনের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। তবু সে কিছুতেই ক্ষমা করবেনা অনুকে, ভাবল—এই অপমান বড় ভয়ানক। ঠাণ্ডায় সাপের মত চোখ নিয়ে সে শুধু বসে বসে একটা গাছের সব পাতা ঝরে পড়তে দেখল। আর এমন সময় ফোন…সুভ ভাবল বোধ হয় অনুর বাবা। সে নিজে ফোন না ধরে রামচরণকে ধরতে বলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সে একটা সিগারেট ধরাল। রামচরণ নির্দেশমত ফোনে জবাব দিল, কে বলছেন? সুভাষ কান খাড়া করে রেখেছে।

—কেরে?

রামচরণ ফোন নামিয়ে বলল, মেয়েছেলে বাবু।

—কি বলছে?

—কিছু বলছে না। কেবল আপনাকে চাইছে। নাম বলতে বললাম, কিছু বলছে না।

তবে কি প্রীতি! অনু! না, অনু হলে রামচরণ গলা শুনে বুঝতে পারত। অফিসের সেই টেলিফোন অপারেটার! সে ধীরে ধীরে সিগারেট টানতে টানতে খুব সহজ ভাবে বলল, ধরতে বল, আর বল বাড়িতেই আছি।

তারপরও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বারান্দায়। যদি অনুর

মা হয়, যদি মণিমাসি হয়, কি জবাব দেবে, গলার স্বর কেমন হবে ভাবল—এবং কঠিন গলায় কিছু জবাব দিতে হবে এই ভেবে ফোন ধরতেই মনে হল খুব অপরিচিত গলা। সে বলল, আপনি কাকে চান?

—আমি সুভাষবাবুকে চাই।

—আমি সুভাষ বাবু বলছি।

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি সুলতা। আমি অনুর বন্ধু। একটু অনুকে ডেকে দেবেন।

—তিনি এখানে এখন থাকেন না। ঠিক অপরিচিতের মত কথা বলল। সুভ বুঝতে পারল অপর প্রান্তের গলা কেমন কাঠ কাঠ এবং শুকনো শোনাচ্ছে।

—আচ্ছা ৪২-৬৫…এই নম্বর তো!

—আপনি ডায়াল ঠিকই করেছেন। তিনি এখন এখানে থাকেন না। বরং আপনি নাম্বারটা আমার কাছ থেকে টুকে নিতে পারেন। বলে সে নাম্বারটা বলে দিল।

সুভাষের মুখে এবার খুব বিরক্তি ফুটে উঠল। সব কিছুই খারাপ লাগছিল। এই যে এখন অনু এখানে থাকছে না বলতে পেরে যেন কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়া গেল। সে যেন বলতে চায় নি কথাটা অথচ ভিতর থেকে কি করে যে উঠে এল কথাটা। সংসারের এই দুঃখজনক ঘটনাকে বরং লুকোতে পারলে ভাল হত। সে যেন নিজের ওপরই কিসের এক প্রতিশোধের স্পৃহাতে ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। যত আশা করেছিল একটা ফোন আসবে, যত আশা করেছিল অনুর বাবা এখানে ছুটে এসে একটা ফয়সলা করবে এবং যত ওর অপেক্ষা ক্রমশ সময় নিচ্ছে তত সে বিরক্ত, তত সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল। অনুর বাবা এলেন না, অনু অনুশোচনায় এখানে ছুটে এল না, এমনকি মানুষটা কি ভাবে আছে, কি ভাবে বেঁচে রয়েছে এত বড় অপমানের পর, মানুষটা

কিছু করে ফেলতে পারে—এ পর্যন্ত ভেবে দেখল না। গতকাল সে ওদের থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য ভোরে নিরুদ্দেশে বের হয়ে গিয়েছিল—আজ এখন ফের সেই অন্নুর মুখের জন্য অন্নুর সেই কৈশোরের ভালবাসার জন্য যেন বারান্দায় বের হয়ে পার্কের সেই দেবদারু গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এক ভয়ঙ্কর অভিমান এবং আত্মসম্মানবোধ ওকে ভেতর ভেতর কুরে খাচ্ছিল।

তখন অন্নুর জানালা দরজা সব খুলে দিয়ে গেছে মণি মাসি। অন্নু পাশ বালিসের উপর থেকে ডান পাটা তুলে একটু উঠে বসার চেষ্টা করছিল। কাল থেকে শুয়ে আছে। প্রীতি বলে গেছে নড়াচড়া করবে না বেশী। চুপচাপ শুয়ে থাকবে। সামান্য যে রক্তপাত ঘটেছিল—এখন আর তা নেই। তবু অধিকক্ষণ শুয়ে থাকার জন্যই বোধ হয় গভীর অবসাদের কেমন আলস্য গোটা গায়ে। মণিমাসি দরজা খুলেছে, জলের গ্লাস নিয়ে গেছে মাথার উপর থেকে, জানালা খুলে দিয়েছে। বাবা কাল থেকে বড় বেশী এদিকে আসছেন না। এমন কি অন্যান্য দিনের মত তিনি রেডিও খোলেন নি দুদিন। সুভকে কেন্দ্র করে যে ঝড় এই বাড়ির ভিতর বয়ে গেছে—সেই ঝড়ের আঁচড় এবং কামড় বড় বেশী যেন। অন্নু উঠে ঝড়ের পর আজ প্রথম আয়নায় মুখ দেখল। সে বুঝতে পারল দু' রাতের এক রাতেও ওর ভাল ঘুম হয় নি। চোখের নীচে সেই এক অবসাদের চিহ্ন। বড় শীর্ণ লাগছে নিজেকে। সে হাতের আঙ্গুল দেখল, রক্তের সেই তেজ যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। সে গতকাল বার কয়েক সকলের অলক্ষ্যে বাবার ঘরে ঢুকে কাকে ফোন করার জন্য গোপনে সব কিছু লক্ষ্য রাখছিল কিন্তু বাবা সেই যে সারাদিন ঘরে বসে থাকলেন, সেই যে সারাদিন একটি ধর্মীয় পুস্তকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকলেন যেন তাঁর কিছু আর করণীয় নেই এবং এই সংসার এক জেদী মেয়ের কাছে হার মেনে যাচ্ছে—সকলে সেজন্য চুপচাপ এমন কি বাবা কাল

এবং আজ বাজার পর্যন্ত গেলেন না। মণিমাসি সব করছে। বাজার থেকে ওষুধ ফল আনছে এবং সব সেবা শুশ্রূষার পর নিজে গিয়ে এই সংসারকে আবিলতা থেকে রক্ষা করছে। অনু সারা বিকেলে একবার অবসর পেল না, একবারও সুযোগ পেল না। মানুষটিকে ফোন করে দুঃখের কথা বলে মন ভেজানোর সামান্য চেষ্টা—তাছাড়া সে রাতে অনুর আর কি করণীয় ছিল—গোঁয়ার মানুষ সুভ, প্রচণ্ড ক্ষোভ সুভর এবং একগুঁয়ে মানুষটা সেদিন যেন সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল--অথবা সকল পরিচিত অপরিচিত মানুষকে ডেকে যেন বলার ইচ্ছা ছিল মানুষটার—তোমরা দেখ, এই নটীর তামাশা দেখ। ছোকরা যুবকের সঙ্গে ঘুরছে। গর্ভ ধারণ করায় শরীর অসহনীয়, জননী হওয়ায় জীবন ধারণ অসহনীয়। আর কি বলার ছিল, সুভ, গোঁয়ার সুভ। অনুর অবহেলা সহ্য করতে পারছিল না। ওর নিশ্চিন্ত ধারণা অনু, ভালবাসার অনু অসীম নামক যুবকের সঙ্গে ভিড়ে যেতে চাইছে। কথাটা মনে হতেই অনুর হাসি পেল এবং এই হাসি অনুকে আয়নার ভিতর কিছুক্ষণ বড় করুণ করে রাখল। সে তার উচ্চাশার কথা এ-সময় বলতে পারত এই আয়নার করুণ প্রতিবিম্বকে, বলতে পারত আমার ভিতরে সেই এক ইচ্ছা কাজ করছে, বড় হওয়ার ইচ্ছা সুভ, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। স্ত্রীজাতির এর চেয়ে আর কি অপমানের আছে! আমি তোমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। তোমার সন্তানের জন্য দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি।

অনু বারান্দায় বার হলে বাবা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর নিজের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। তিনি দেখলেন, অনু বারান্দার রেলিঙে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এখন এই ভোরে কি ক্ষতি ছিল বিছানা থেকে না উঠলে। তিনি নিজে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় এলেন। বললেন, কি দরকার

তোর অনু এই ভোরে ওঠার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দরকার ঠাণ্ডা লাগানোর।

শুনতে না পাওয়ার মত সে চেয়ে থাকল বাবার দিকে।

সুতরাং বাবা ফের বললেন, প্রীতি তোমাকে ঘোরাফেরা করতে বারণ করেছে অনু। তুমি কেন উঠে এলে।

—কত শুয়ে থাকব বাবা। অনুকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল।

—এ-সময় একটু শুয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে যখন প্রীতি বলেছে।

—আমি একটু বেলকনিতে বসব বাবা। মণিমাসি কোথায় গেল?

—কেন, ডেকে দিতে হবে? বলে তিনি ডাকতে থাকলেন, মণি, মণি।

বোধহয় মণিমাসি রান্না ঘরে মায়ের সঙ্গে চা এবং জলখাবারের সাহায্য করছিল। সে বলল, যাই দাদাবাবু।

মণি এলে একটা ইজিচেয়ার পেতে দিতে বলা হল বারান্দায়। অনু ইজিচেয়ারে বসে সামনের রাস্তা দেখতে পেল। সে ইচ্ছা করেই মাথা এলিয়ে রেখেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল সে দীর্ঘ পথ হেঁটে এইমাত্র এসে পোঁছেচে। চোখে মুখে সেই এক অবসাদের ছাপ। কি যেন ভাবছে সারাক্ষণ। কি যেন মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একবার সেই মানুষকে ফোন করে ভোরের খবর জানতে—কিন্তু মানুষটার যা অভিমান—হয়ত ওর গলা পেলে ফোন ছেড়ে দেবে।

এখন বাবার ঘরে অনুর ফোন। বাবা ডাকলেন, অনু তোমার ফোন এসেছে।

—কে বাবা, কে! অনুকে খুব উদ্‌গ্রীব দেখাল।

—তোমার বন্ধু কেউ হবে!

—নাম কিছু বলছে না! সে ধীরে ধীরে হেঁটে আসার সময় এ-সব শুনতে চাইছিল।

—আপনি কে? অনু ফোন তুলেই বলল।

—হ্যারে আমি সুলতা!

—সুলতা! কবে এলি।

—এসেছি দু দিন হল। ভাবলাম আজ তোর ওখানে যাব। কিন্তু ফোন করে জানলাম তুই এখন ওখানে নেই।

—যা! আমিত ওখানেই আছি। শরীরটা ভাল নেই বলে বাবার কাছে আছি কদিন।

—কিন্তু সুভাষবাবু যে বললেন, তুই এখন ওখানে থাকিস না। ও আমাকে চিনতে পারেনি নারে!

—ওর কথা বলবি না! মুডি মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেছে।

— তা যাক্ শোন। আমরা দিল্লী থেকে চলে এসেছি। কর্তা এখানে বদলি হয়ে এসেছে।

—অঃ তাই বুঝি। অনুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সে প্রায় দাঁড়াতে পারছে না। সে সামনের একটি ডিভানে বসে পড়ল। ওর মাথাটা ঘুরছিল। সুলতা এসে দেখবে, অনু সন্তানের জননী হতে যাচ্ছে। সুলতা মনে মনে কি যে খুশী হবে। ফোনে সুলতা তখনও খুব বক বক করে যাচ্ছিল। কিরে! কিছু যে বলছিস না! তোর গান আর অনেকদিন রেডিওতে শুনতে পাচ্ছি না, কি ব্যাপার। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটা তোকে গিলে ফেলল।

লতার সেই কথা মনে হচ্ছে—প্রেম নামক বস্তুটি বড় বেশী কাঁচের মত, বড় বেশী ক্ষণভঙ্গুর, বড় স্বার্থপর, আপন আপন সত্তার জন্য সংগ্রাম। অনু, ভালবাসার অনু বুঝি দূরে সরে যাচ্ছিল—সুভ, গোঁয়ার সুভ ওকে বুদ্ধিমানের মত গর্ভবতী করে অসির খেলা দেখাচ্ছে! অনুর সেই ঘৃণার ভাবটা, সেই ওকের মত অসহনীয় আবেগ ফের উঠে আসছে। সুভর জন্য সে এ-মুহূর্তে কোন মমতা ধরে রাখতে পারল না।

অনু ফোন রেখে ডিভানেই কিছুক্ষণ পড়ে থাকল। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। লতা এতক্ষণ যেন ফোনে পরিহাস করছিল। ওর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিল লতা।

আর তখন ফের ফোন বাজছে। অনু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা তুলতেই মনে হল প্রীতি কথা বলছে।

—আমি অনু বলছি।

—তোর শরীর কেমন।

—ভাল যাচ্ছে। বেশী কথা অনুর বলতে ভাল লাগছিল না।

—ওষুধটা ঠিক মত খাচ্ছিস ত?

—খাচ্ছি।

—কোন অবহেলা করবি না।

— করছি না।

—জননী হবার রোমান্স পেয়ে বসলে তখন জীবনের সব দিক ছার।

—বোধ হয়।

—সংসার ধর্ম মানুষের বড় ধর্ম।

—হয়ত তাই হবে।

—কি রে অমন শুকনো গলায় কথা বলছিস কেন?

—শরীর বড় দুর্বল।

—হ্যাঁরে তোর কর্তাটির কি হয়েছে রে। সহসা কথাটা যেন ভেসে এল, যেন প্রীতি কথা বলছে না, অন্য কেউ কথা বলছে। লঘু পরিহাসের স্বর। অনু আর যেন গ্লানি বইতে পারছিল না।

—জানি না ত!

—বলছিস কি! কিচ্ছু জানিস না!

—না। অনু দৃঢ় হল। প্রীতি কি তবে সব জেনে গেছে। জেনে গেছে অনু সুভর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অনু

সুভকে বলেছে, নীচ। অনু সুভর মুখ দেখতে চায় না, দুঃখে এবং রাগে যা একসময় বলে ফেলেছিল যা যথার্থই ওর মনের কথা নয়, অভিমানের কথা, স্বার্থপরতার কথা—প্রীতি কি তবে সবই জেনে ফেলেছে। অনু বলল, কেন কি হয়েছে।

—কাল সন্ধ্যায় তোর কর্তাটি হাজির।

—সত্যি! অনু খুব অভিনয়ের গলায় বিস্ময় প্রকাশ করল।

—হাজির।

—তারপর?

—তারপর আর কি। উসখো খুসকো চুল, চোখে মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, যেন সারাদিন কোথাও ঘুরেছে। খুব খারাপ লাগল দেখে।

—মানুষটাকে খুব খারাপ লাগার ত কথা নয়! অনু লঘু স্বরে সুভর দুঃখকে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিতে চাইল—অন্তত এসময় অনু প্রীতির কাছে ছোট হতে চাইল না।

—না খারাপ লাগার কথা নয়। ভালই লাগল। কিন্তু মালকিন যদি রাগ করে তার জন্য জানালার পাট সব সময় বন্ধ রেখেছি।

—খুললে ক্ষতি ছিল না। লোক তত খারাপ নয়। যে সে জানালায় উঁকি মারে না।

অপর প্রান্তের গলা থেকে সামান্য কাসি উঠছিল অথবা আমতা আমতা ভাব। কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে। অনু কি ওর পরিহাস সুস্থ মনে নিতে পারছে না, অনু কি দুঃখিত হচ্ছে। সারা রাত প্রীতি ঘুমোতে পারেনি। সারারাত সেই মানুষটার ছায়া ওর চার পাশে ছিল। ভিতরে তার দুর্বলতা সব সময় কাজ করছে। মনে হচ্ছে মাথার পিছনটাতে সময়ে অসময়ে এক যুবক কেবল তাড়া করে ফিরছে। সব সময় ভালবাসার ইচ্ছা অথচ বয়স বাড়ছে, সব সময় ভালবাসার ইচ্ছা অথচ বয়স গম্ভীর হতে বলছে, সব সময় ভালবাসার ইচ্ছা অথচ ডাক্তারি মুখে রুগীর সিম্‌টম পরীক্ষা করে যেতে হচ্ছে। বড় ডাক্তার হতে গেলে বুঝি ভাল করে ভালবাসা

হয় না। বিশেষ করে প্রীতি, নিজের এই দুর্বলতা পরিহার করার জন্যই সকালবেলা অনুকে সব খুলে বলে দিল। ঘটনা জানাজানি হলে নিজের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সুভ নামক মানুষটা ঠাট্টার মত অথবা শালী ভগ্নিপতির মত ঘটনাটা—মনে মনে চেপে গেলে অনেকদূর গড়িয়ে যেতে পারে ভেবেই এই সকালে প্রীতি ফোনে সব কথা-প্রসঙ্গে বলে দিতে চাইল।

—কি রে চুপ করে থাকলি কেন? অনু কিছুক্ষণ প্রীতির গলা না পেয়ে কথাটা বলল।

—মানুষটার ওপর তোর এত বিশ্বাস! প্রীতির মুখে সামান্য প্রতিশোধের ভঙ্গী ফুটে উঠল।

—মানুষটা ভালবাসার কাঙ্গাল।

—ভালবাসা যুবতীর না তোর।

—আমার।

—ডাক্তারি মতে বলে যুবতীর। সুতরাং দরকার হলে সব জানালাই খুলে দিতে হয়। ভেতরের অন্ধকারটা আমরা যত দেখেছি অনু তুই তত দেখিসনি।

—তুই কি রাগ করছিস প্রীতি!

—নারে। রাগ করব কেন। বয়স বাড়ছে, বিয়ে করছি না, পড়শীরা অবশ্য বলছে বিয়ে হচ্ছে না, তখন অপরের বেশী মুখের কথা শুনলে বুকে বাজে।

—তবে এবার মাসিমাকে বলতে হয়।

—নে বাজে কথা রাখ। যা বলছি শোন, কালতক যদি ভাল থাকিস তবে ট্যাবলেট বন্ধ করে দিবি। আর খেতে হবে না। এ যাত্রা তোর ভালবাসার মানুষের দান টিকে গেল।

—তুই ভারী অসভ্য প্রীতি।

—তোর কর্তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী নই। হাসতে হাসতে ফোন কেটে দিল প্রীতি।

অনু কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে থাকল। ফোনের সব কথাবার্তা ওর মাথায় গুলিয়ে যাচ্ছে যেন। বিশেষ করে শেষের হাসি। প্রীতি এত তীর্যক কথাবার্তা শিখল কি করে, এত শ্লেষ শিখল কি করে। প্রীতির কি হয়েছে। অনু মাথা চেপে ডিভানে শরীর এলিয়ে দিল। ছিঃ ছিঃ এতক্ষণে সব ধরতে পেরে মরমে মরে যেতে ইচ্ছে হল অনুর। সুভ প্রীতির কাছে জল চাইতে চলে গেল! প্রীতি কি এই ভেবেছে! প্রীতি কি ভেবেছে সুভকে জল দিলেই হাত পেতে জল তুলে নিত সুভ।

মাথার ভেতরটা কেমন করছিল অনুর। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এক দিকে জননী হতে যাচ্ছে অনু, একদিকে এই জননী হতে গিয়ে ভালবাসার জীবনে বড় হওয়ার ইচ্ছাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে সুলতা নিজের জীবনের সঙ্গে অনুর জীবন তুলনা করে পরিহাস করছিল। একদিকে প্রীতি সুভকে নিয়ে পরিহাস করছিল এবং সেই ঘটনার পর থেকে বাবা ভালভাবে অনুর সঙ্গে কথা বলছেন না। সব কেমন চুপচাপ থাকছেন—এই বাড়ির ভিতর স্বাভাবিক আবহাওয়া বইছে না। অনু কিছুতেই সুভর মুখ মনে করতে পারছিল না এ সময়। সুতরাং অনু যেন সুভর মুখ স্মৃতিতে আনার জন্যে সব সরমের মাথা খেয়ে ডায়াল করল—ফোর টু সিক্স ফাইভ নাইন এইট।

– ইয়েস ফোর টু সিক্স ফাইভ নাইন এইট। খুব অফিসিয়েল ভঙ্গীতে সুভ ফোন ধরল। অনুর গলা চিনতে সুভর এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।

– কাকে চান?

—আপনাকে চাই। আচ্ছা তুমি কি পাগল।

—কেন পাগল হতে যাব। খুব ধীরে সুস্থে খেয়ে দেয়ে অফিস যাচ্ছি।

—তুমি নাকি প্রীতিদের বাড়িতে কি সব যাতা করে এসেছ।

—যাতা বলতে তুমি কি বলতে চাইছ।

—কি আবার বলতে চাইব। তুমি বুঝতে পারছ না—কি বলতে চাইছি।

—না। স্পষ্ট করে না বললে বুঝতে পারছি না।

—যা খারাপ দেখায়।

—এমন কিছু তো করিনি অনু। আমি বিধবার পোশাক পরে অন্ততঃ রাত্রিবাস করার চেষ্টা করিনি। সে যেন আবোল তাবোল বলে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইল।

—কি করেছ না করেছ তুমিই জান। এ-সব শুনতে আমার ভাল লাগে না।

—কে তোমাকে বলতে গেছে!

—প্রীতি বলেছে। প্রীতি বলল তুমি ওর ওখানে গিয়ে সহসা হাজির হয়েছ। লোকে দেখলে কি বলবে!

—প্রীতি যদি বলে থাকে বলেছে। আমি গিয়েছি ভাল করেছি। তুমি নেই ঘরে, আমাকে তো কোথাও যেতেই হবে। সুভ প্রায় ক্ষেপে গেল। আমার একা কি করে কাটবে বল। তোমার না হয় অসীম আছে, আমার কে আছে বল।

—সুভ তুমি নীচ, হীন।

—যুবতীরা যুবকদের এমনি গাল দেয় শুনেছি।

—সুভ আমি তোমার স্ত্রী।

—স্ত্রী কখন আবার বিধবার পোশাক পরে আয়নায় মুখ দেখে! তুমি স্ত্রী নও। তুমি আমার কাছে পরস্ত্রী।

—সুভ! তুমি কি বললে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল অনু।

মণিমাসি এবং মা ছুটে এলেন। বাবা দরজা পর্যন্ত এসে তারপর কি ভেবে বারান্দায় রেলিঙে উবু হয়ে থাকলেন। মা এবং মণিমাসি পাশে বসে বললেন, অনু, এই অনু তোর কি হয়েছে, তুই কাঁদছিস কেন? অনু মা আমার বল।

অন্নু ওদের ছেড়ে উঠে পড়ল। এবং নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে থাকল। মা এবং মণিমাসি হয়ত সেই ঘরেও ছুটে যেত কিন্তু প্রৌঢ় মানুষটির সঙ্কেতে ওরা অন্নুর ঘরে ঢুকতে সাহস পেল না। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, ওকে একা থাকতে দাও। সুভর সঙ্গে বোধহয় কথা কাটাকাটি হয়েছে। বোধহয় কোন অপমানজনক কথা বলেছে সুভ! তোমরা ওকে এখন কিছু বল না। বললে ওর কষ্ট আরও বাড়বে।

সেদিন বোধহয় আকাশ পরিচ্ছন্ন ছিল না। সেদিন শেষ শীতের জন্য বোধহয় আকাশে কিছু মেঘের আভাস ছিল। সারাদিনমান এই কলকাতায় আর রোদ উঠল না। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল জোরে। রাস্তায় কিছু শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। বোধহয় কোথাও কোন অঞ্চলে দাঙ্গা লেগে গেছে। এর জের এই কলকাতার বুকে নেমে আসছে। অন্নু সেই যে শুয়েছিল আর বিছানা থেকে ওঠেনি। সে শুয়ে শুয়ে হাজার রকমের চিন্তা করেছে। সন্তানের জননী হতে যাচ্ছে সে। এখন ইচ্ছা করলেই ঝুম করে কিছু করে বসতে পারে না। নতুবা যেন অসীমকে ডেকে সে আজই বলে দিতে পারত, অসীম মামাবাবুকে বল, আমি এই শরীরেই অভিনয় করব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা আর ক'মাস মামাবাবুকে অপেক্ষা করতে বল, আমি সুস্থ হয়ে উঠি, মঙ্গলমত আমার সন্তান প্রসব হোক, আমি আমার বড় হওয়ার ইচ্ছাকে সন্তান বড় করে তোলার ভিতর শুধু আবদ্ধ রাখব না, আমি আরও বড় হব।

মাসুদি বললেন, বুঝলে চ্যাটার্জী, খুব বড় সওদা না হলে সুখ হতে পারে না।

সুভ ঘাড় নাড়ল।

এখন শরীর কি রকম আছে ?

—ভাল।

—এবার রাইট শেয়ারগুলো ছেড়ে দিতে হয় বাজারে।

—সে কথা বলতেই এলাম আপনার কাছে। একটা মোটামুটি লিষ্ট করে ফেলেছি।

—ভাল। দেখি লিষ্টটা। তিনি লিষ্ট দেখে বললেন, আরও দুটো নাম ঢুকিয়ে দিতে পার। আর লোন লিষ্টটা আমার কাছে রেখে যাবে। আর বুঝলে, ভাবলাম তেল ঘি বেচে শুধু সুখ নেই। বড় ডায়েরি ফার্ম যখন সেকেন্দ্রাবাদে খোলা হচ্ছে, তখন সেখানে পার্টনারশিপে ঢুকে পড়ি। তোমার কি মত !

—আপনার লোক যদি সেখানে না থাকে তবে ঢোকা উচিত হবে না।

—ওরা আপাতত তোমাকে লোন চাইছে। তুমি লোন হিসাবে ঢুকে পড়। তারপর দেখছি কি করা যায়।

—কিন্তু কলকাতা ছেড়ে !

—আরে না না। হেড অফিস আমরা কলকাতায় করছি। তুমি এ অফিস, ও অফিস দুই করবে। নামটা শুধু ওদের খাতায় থাকবে।

—সে আপনারা যা ভাল বোঝেন।

—শোন চ্যাটার্জী। বলে মাসুদি পাশের দামী বার্মা টিকের সেলফ থেকে একটা ফাইল বের করে বললেন, ফাইলটা সব পড়ে বলবে, দেখবে আমার কিছু নোট দেওয়া আছে ওপরের চিঠিতে। গোটা কেস-হিস্ট্রি জানার জন্য তোমাকে ফাইলটা পড়তে বলছি। খুবই কনফিডেনশিয়াল। পড়া হলে তোমার ব্যক্তিগত নোট দেবে। লোকটার সম্পর্কে তোমার কি মত জানাবে।

সুভর কিছুই ভাল লাগছিল না। সে নিজের ঘরে চলে এল। সে দেখল, সেই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষটির বিরুদ্ধে প্রবল নোট পড়েছে।

শুভ মনে মনে হাসল—মানুষটি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বড় বড় পরিকল্পনার ছবি এঁকে মাসুদি সাবকে বুঝিয়ে বড় অঙ্কের টাকা বের করে নিয়েছে। এই নীতিজ্ঞানহীন মানুষটি সব কিছু করতে রাজী ছিল এক সময় মাসুদির জন্য। সাধারণ কর্মচারী থেকে প্রবল দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা সে মাসুদি সাহেবের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল—তারপর কি কারণে আবার মানুষটা দূরে সরে গেছে। এই ফাইল তার সাক্ষ্য। সে এক এক করে পড়ল সব। যেহেতু অফিসের নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু লিখিত পড়িত আছে—তার জন্য প্রথমেই দেখল—এক দিকে বড় অঙ্কের লোন দেখানো আছে। মানুষটি সেই বড় অঙ্কের লোন এষ্টিমেট সেকসান থেকে পাস করিয়ে খরচের হিসাবটা নিজের হাতে রেখেছে। উপরে দেখল শুভ—লেখা রয়েছে সাল—১৯৫৩। লোনের টাকা মাসুদি সাবের ঘরের কালো টাকা। সুতরাং মাসুদি সাব প্রশ্ন রেখেছিলেন—আমি কোম্পানীকে লোন দিচ্ছি, কিন্তু আমার নামে জমা হলে খারাপ দেখাবে।

তখন মানুষটি বড় বিজ্ঞের মত বুদ্ধির একটা খসড়া রেখেছিল—খসড়াটা লিখিত ছিল না। কিন্তু মাসুদি সাবের ষ্টেনো গোটা খসড়াটির নকল শুনে লিখে রেখেছিলেন। খসড়াটি এমত—লোনের টাকা অন্য নামে জমা হবে। এবং বছর শেষ হবার আগে ফিক্টিসাস পার্টির নামে টাকা এডভান্স দেখিয়ে পরে ফিক্টিসাস বিল করে লেন দেন সমান করে দিলেই ইনকাম ট্যাক্সের ভয় থাকবে না। টাকার পরিবর্তে কোম্পানী সরকার থেকে যে কোটা পান—যার বাজার মূল্য কোটার চেয়ে অনেক বেশী—সেই মূল্যে মাসুদি সাবকে ব্যক্তিগতভাবে কাঁচামাল দিয়ে দেওয়া—সেই পরিমাণ টাকার। বাজার মূল্যে বিক্রি, অনেক চড়া দাম। মোটা অঙ্কের টাকায় মাসুদি সাব ডবল টাকা পেলেন। এই লেন দেনের ভিতর দুষ্ট প্রকৃতির মানুষটির লাভ। কারণ বাজার দর তার হাতে। কারণ বিক্রি করার দায়িত্ব সবটাই তার। তিনি চার টাকা পেয়ে মাসুদিকে তিন

টাকা হিসাবে দিয়েছিলেন—যদিও নোটে এমন কিছু লেখা ছিল না। মাসুদি ব্যক্তিগত ভাবে কথাটা এক সময় সুভকে বলে দিয়েছিলেন—কারণ এই কথাটা মাসুদি সাবের কাছে কে এক শত্রু যে সেই মানুষটির সঙ্গে বখরা মেলাতে পারে নি, বলে দিয়েছে।

কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স ধরে ফেলেছে সব। কারণ যে টাকার লোন, সে টাকারই বড় অঙ্কের সব বিল মিলে একটা এডভান্স। সে অস্বীকার করেছিল—কারণ মাসুদি সাবের মত না পেলে সে এমন করত না। মাসুদি সাবের মত যে, সে মাসুদিকে এ ব্যাপারে ইনফ্লুয়েন্স করিয়েছে। যাই হোক ইনকাম ট্যাক্স অফিসার প্রত্যেক পার্টিকে চিঠি দিয়েছে। সব চিঠি আনক্লেমড এই বলে ফেরত এসেছে—এবার জেরার সম্মুখীন হতে হবে। বোধ হয় অর্ধেকটা টাকা বের হয়ে যাবে ঘর থেকে। আর পেনালটি হিসাবে বাকি টাকাটা।

সুভ তারপর দুটো নোট দেখল। সেই নোট দুটো ক্যাস ডিপার্টমেন্টের বড় বাবুর। খুব আগ্রহ ভরে সে দেখল না। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেল। কি আর দেখবে এসব—কারণ যে মানুষটির বিরুদ্ধে এই ফাইল তৈরী হয়েছে—তাকে আসকারা দেবার মূলে মাসুদি সাব নিজে। কি করে আল্‌গা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল—এই আল্‌গা টাকা পাবার লোভ মাসুদি সায়েবের ষোল আনা—এবং এই সুযোগই খুঁজছিল সে। তারপর এক এক করে অনেক খাতে সে টাকা বের করে নিয়ে গেছে, ঘুষ, দালালী এবং ইমপোর্ট লাইসেন্স অথবা কোটার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নূতন নূতন সব অছিলা সৃষ্টি করে টাকাটা নিজেই হজম করে দিয়েছে অথবা বখরা হয়েছে, অথবা কিছু কাজ দেখিয়ে বেশী পরিমাণের টাকা মেরে নেওয়ার ব্যাপার আছে এতে।

সুভ অনেকক্ষণ সময় নিল রিপোর্টটা পড়তে। মাসুদি সাবের এই রিপোর্ট পড়তে দেওয়ার অর্থ-ই সুভকে কাজের ভারটা দেওয়া। মোটামুটি সব ফাইল ঠিক আছে। এবার ব্যক্তিগত ভাবে জেরা

করে হেস্তনেস্ত করা। সুতরাং শুভ টিফিনের পর মুক্তি বসুকে ডেকে পাঠাল। সুভ জানত, মাসুদি সাবের ইচ্ছা নয় আর মুক্তি বাবু এই কোম্পানীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকুক। মাসুদি সাব মুক্তি বসুকে বিদায় দিতে চান।

সুভ একবার ভেবেছিল মাসুদি সাবকে বলবে, এসব আগলি ম্যাটার স্যার আমাকে না দিলে ভাল হয়। কিন্তু ভাবল, এক জনকে না হয় অন্য জনকে এই ব্যাপার ডিল করতেই হবে। এ সব ব্যাপারে আবার কিছু কিছু নীতিবাগীশ মানুষ কোম্পানী জেনে শুনেই পুষে রাখে। তারা কোম্পানী এবং বোর্ডের সদস্যদের জন্য সব করবে, মিথ্যা অহমিকার জন্য ঘুষের টাকাটা ঘরে আনবে না। মিথ্যা অহমিকার জন্য নীতির নাম করে সংসারকে দুঃখে ডুবিয়ে রাখবে। যদিও সুভর এমন একটা অবস্থা নয়—সে ভাল রোজগার করে, কোম্পানী গাড়ি পর্যন্ত দিতে রাজী এবং ওর কাজের জন্য কোম্পানী খুব উদার ওর প্রতি। সুতরাং এই মানুষের ওপরই এমন একটা কাজের ভার পড়বে তার আর বিচিত্র কি।

সুভ ফাইলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে বসে থাকল। সে বুঝতে পারল মুক্তিবাবু চুপচাপ ওর সামনে এখন বসে রয়েছে। সে না দেখেও মুক্তিবাবুর চোখের দৃশ্যটা ধরে ফেলল। একটু শক্ত হলে ওর পা চেপে ধরবে মুক্তিবাবু। এবং ঈশ্বরের সমতুল্য করে ফেলবে তাকে। এই ধরণের দৃশ্য সুভ ঠিক সহ্য করতে পারে না। সুভ নিজের ভিতরও এক প্রচণ্ড গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে। সে অফিসে ঢোকবার সময় খুব সন্তর্পণে সেই চোখের দৃশ্য অর্থাৎ মনের ভিতরে যে গ্লানিটুকু ছিল এবং যে গ্লানিটুকুর জন্য চোখের ওপরে দুঃখের ছবি—সে ইচ্ছা করেই নিজেকে গম্ভীর করে ফেলল।

সে ঘাড় না তুলেই বলল, আপনার শরীর কেমন মুক্তি বাবু?

—শরীর ভাল যাচ্ছে না স্যার। ভেবেছি স্যার কদিনের ছুটি, কদিনের ছুটি পেলে বড় ভাল হত।

—কেন কি হয়েছে।

—পেটের ভিতর আজকাল প্রায়ই ব্যথা হচ্ছে।

—ওটা লিভারের ব্যথা নয়ত।

—সঙ্গদোষ তো স্যার আমার একেবারেই নেই।

—ঠিক বলছেন ?

—হ্যাঁ স্যার ঠিক বলছি। আপনি ওপরওয়ালা, আপনি পিতৃতুল্য আপনাকে মিথ্যা বলতে পারি !

মুক্তি বাবু মানুষটি কালো। তোষামোদে এবং চাটুকারিতায় অদ্বিতীয় এই মানুষটিকে এখন বড় বেশী লম্বা মনে হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে মানুষটা কি জেনে ফেলেছে সব ! মাসুদি সাব বলে খালাস —কিন্তু এইসব মানুষকে চটালে খারাপ। কারণ কোম্পানীর খাতাপত্রে এমন সব ফিক্টিটাস ব্যাপার আছে, এমন সব জাল জুয়াচুরি আছে সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন দিক থেকে ছোট একটি খবর সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়ে যাবে। তখন সেই টাকায় এমন পাঁচটা চোর ছ্যাঁচোড় পুষে রাখা যাবে। তাই সুভ খুব সাবধানে এগুচ্ছিল। মানুষটা কোম্পানীর অনেক খবর রাখে, পুরনো লোক, বয়েস হয়েছে। সাধারণ কেরাণী ছিল—তিন বছরের ভিতর ওর ওপরওয়ালা মরল। সৎ-মানুষটিকে এমন এক ল্যাং মারল যে বেচারা শোকে বেশীদিন আর বাঁচলেন না। সুতরাং সুভ খুব পরিমাপ মত বলল, মুক্তি বাবু এ কোম্পানীর দৌলতে আপনি দুটো পয়সা করেছেন।

—সে সামান্য স্যার।

—কোম্পানীর আর ইচ্ছা নয় আপনাকে কষ্ট দেবার। এবার ছুটি নিন।

—স্যার কি বলছেন।

—বলছি আপনার বিরুদ্ধে এই ফাইলটি তৈরী হয়েছে।

—স্যার আপনি আমার মা বাপ। আপনি স্যার আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

সুভাষ সিগারেটের আগুন ঝেড়ে বলল, কিন্তু মাসুদি সাবের ইচ্ছা নয়···।

মুক্তি বাবু কোন উত্তর করল না।

সুভাষ বলল, আপনি এত টাকা কোম্পানীর চিট করেছেন—আপনার একবারও ভয় হয়নি?

মুক্তিবাবু যেন বুঝলেন ব্যাপারটা থেকে মুক্তি নেই—সুতরাং সব খুলে বলা ভাল, তিনি এই ভেবে বললেন, স্যার বড় হওয়ার বড় ইচ্ছা। সকলে বাড়ি গাড়ি করে, সুন্দরী বউ রাখে, স্যার শেষ বয়সে বাড়ি গাড়ি বউ করে বড় হতে চেয়েছিলাম, স্যার আপনার পায়ে পড়ে শুধু বলতে পারি একটা টাকাও আমি খরচ করি নি। সব গিন্নির হাতে দিয়েছি।

—তবে তো টাকা সবই আছে।

—গিন্নি যে স্যার আমার কথা বলে না।

—কার কথা বলে।

—অপরের কথা। অপর মানুষ তার কাছে এখন ভগবান। সব বেহাত হয়ে যাবে ভেবে ওর নামে সব করেছিলাম স্যার।

—তবে কি করবেন এখন!

—চাকরী গেলে না খেয়ে থাকতে হবে স্যার।

—কি বলেন মুক্তি বাবু! এত টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন, বাকি জীবনটা সে আপনাকে দু মুঠো খেতে দেবেনা বলেন? তাছাড়া সব টাকা এভাবে কেউ দেয় স্ত্রীর হাতে?

মুক্তিবাবু ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঢোক গিললেন। তারপর বললেন, কিছু মনে না করলে বলি স্যার।

—বলুন।

—স্যার শেষ বয়সের বিয়ে। বউয়ের কাছে বাকি জীবন

হিরো সাজবার জন্যে কি না করেছি স্যার। টাকা দিয়ে বলেন, গয়না দিয়ে বলেন, যখন যা বলেছে।

—কিন্তু হিরো হতে পারলেন না।

—না স্যার। কোথাকার একটা উটকো লোক···শুনেছি লোকটা যাত্রাগানে ভাল হারমোনিয়ম বাজায়।

সুভ নিজের সঙ্গে এই মানুষটার কোথায় যেন মিল খুঁজে পেল। অন্বেষণ সারা জীবন—টাকার অন্বেষণ অথবা ভালবাসার অন্বেষণ—এই সব অন্বেষণই বড় হতে বলে, অনেক বড়, সে যে কত বড় হওয়া যায় জীবনে তার যেন পরিমাপ চলে না।

আরও কিছু জেরা করার পর সুভ একটা রিপোর্ট লিখে ফেলল। রিপোর্টে সে লিখল—প্রথম মাসুদি সাবের চাকরি যাওয়া প্রয়োজন, পরে মুক্তি বাবুর। সে রিপোর্টটা খুব বড় করে লিখল না। নীচে সে দুটো লাইনে লিখে দিল—তবে উভয়েই এই কোম্পানীর জন্য ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয়। একজনের টাকা, অপরের দুষ্টবুদ্ধি। মাসুদি সাবের টাকা—মুক্তি বাবুর প্রতারণা করার স্বভাব—এ স্বভাবই এই কোম্পানীকে অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থব্যয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যুগ কালের দিকে তাকালে মুক্তি বাবু এই কোম্পানীর গৌরব।

সুভকে দেখলে এখন খুব শান্ত স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। কোন গ্লানি নেই ভিতরে। ওকে নির্বিঘ্ন চিত্ত দেখাচ্ছিল। যেন জীবনের প্রতি আর কোন কৌতূহল নেই। সব খেলা সাঙ্গ। এই রিপোর্ট লেখার জন্য ওর বরখাস্তের নোটিশ হয়তো কালই আসবে। মাসুদি সাব সুভর এত বড় অহমিকা কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

সুভ এবার বাথরুমে ঢুকে নিজের টাই ঠিক করে নিল। মুখের সব সরল রেখা দেখে বুঝল ওকে আদৌ উদ্‌বিগ্ন মনে হচ্ছে না। বেশ সপ্রতিভ, সুখী এবং স্বাধীন পায়রার মত সে যেন এখন থেকে সারাজীবন বক-বকম করে যেতে পারে। সে বাথরুমে ভাল করে মুখে সাবান ঘষল। তারপর বেসিনে জল ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে

তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে সব জল শুষে নিল। সে জামার হাত সামান্য গুটিয়ে নিয়েছিল সেটা ফের ঠিক করে বাইরে এসে রিঙ করতেই বয় হাজির। সুভ বয়কে এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ না করে খুব শান্ত গলায় বলল, এই ফাইল লেও। বড় সাবকা পাস ফাইল ভেজ।

বয় চলে গেলে সে খচখচ করে একটা দরখাস্ত লিখে ফেলল। লিখল, সার এবার আমাকে ছেড়ে দিন।

দরখাস্তটা লিখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সুভ। সামনে ফাইলের গাদা পড়ে আছে। শুধু একবার দেখে সই করে দেওয়া। কিছু ডিক্টেশান দিতে হবে। কারণ কিছু জরুরী চিঠির উত্তর এবং কোম্পানী আইন সম্পর্কিত চিঠি। সে কিছুই আজ করল না। শুধু মাসুদি সাবের ফোনের অপেক্ষায় বসে থাকল।

ফোন আসতে দেরী দেখে সুভ একবার নিজেই উঠে গেল মাসুদি সাবের চেম্বারে। সে দেখল ফাঁক দিয়ে কেউ নেই—সুতরাং সে নিজে ঢুকে গেল। মাসুদি সাব ফাইলটার ভেতর তখনও যেন্ কি দেখছিলেন, তারপর সামনে সুভকে দেখেই কেমন আঁৎকে উঠলেন। তিনি সুভকে সহসা বলে ফেলতে পারলেন না, বোস চ্যাটার্জী।

ধীরে ধীরে সবই সহজ হয়ে এলে মাসুদি সাব বললেন, তোমার কিছু হয়েছে চ্যাটার্জী।

সুভ হেসে বলল, না স্যার কি আর হবে।

—বিচার করতে দিলাম মুক্তি বাবুর, তুমি আমার বিচার করলে।

—স্যার বিচার আমি কারো করি নি। আপনি রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন, তাই দিয়েছি। এবং আমার মত জানতে চেয়েছিলেন, রিপোর্টে তাও বলেছি।

—এ রিপোর্ট তুমি উইথড্র কর চ্যাটার্জী। আমি মুক্তি বাবুকে কোনদিন তাড়াব না কথা দিচ্ছি।

—স্যার মুক্তি বাবুর ওপর আমার কোন দুর্বলতা নেই।

—তা জানি চ্যাটার্জী।

—আপনার কাছে ফাইল, আপনি ইচ্ছা করলে পুড়িয়ে দিতে পারেন। আমার দিক থেকে কোন ভয় থাকবে না, বলে সে তার রেজিগনেসনের দরখাস্তটা রাখল।

মাস্‌দি সাব চিঠিটা পড়ে মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর করে ফেললেন। ঠিক যেন ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি চ্যাটার্জীকে এমন কি বলেছেন, অথবা চ্যাটার্জীর এত সুন্দর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছু ঠিক ভাবতে পারছিলেন না। এ সময় একবার কার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলে ভাল হয় এ সব ভাবলেন। তিনি মাঝে মাঝে সুভকে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে কি যেন ধরে ফেললেন, তুমি যাও চ্যাটার্জী। চিঠিটা আমার পকেটে থাকল। যে কোন কারণেই তোমার মন উত্তেজিত। তুমি কিছুদিনের ছুটি নাও। ফাইলপত্র সব যা আছে এ ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলছি। তোমার খুশীমত তুমি ছুটিতে থাকবে।

সুভ আর কিছু বলতে পারল না। মাস্‌দি সাবের এই ব্যবহারটুকু ওকে মুগ্ধ করেছিল কেন জানি। সুভ ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে নেমে এলে সিঁড়ির নীচে মুক্তিবাবু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যার আমার কি করলেন।

সুভ দাঁড়াল না, নামতে নামতেই বলল, চাকরি আপনার যাবে না মুক্তিবাবু। আপনি ইচ্ছা করলে এবার আর একটা বিয়ে করে দেখিয়ে দিতে পারেন, হিরো হবার সৌভাগ্য আপনার এখনও শেষ হয়ে যায় নি।

এক অদৃশ্য অভিমান মাঝে মাঝে মানুষের ভিতর কাজ করে—তখন মনে হয় এই পৃথিবীর সব শুভ ইচ্ছা তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে—মনে হয় তখন এই পৃথিবীতে তার জন্যে কোন মাটি থাকছে না, ক্রমশ সব অর্থহীন হয়ে পড়ে, ক্রমশ জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা জাগে। আর ক্রমশ কোন এক শান্ত জলাশয়ের কথা তখন বার বার

মনে হয়—মার কথা সুভ মনে করার চেষ্টা করল—এই পথের উপর অফিসের গাড়ি ওর জন্য অপেক্ষা করছে, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না—যেন মার মুখ কোথাও না কোথাও ওর জন্য, ওর শুভ ইচ্ছার জন্য জেগে রয়েছে। দীর্ঘদিন পর মায়ের কথা মনে হওয়ায় ভেতরটা কেমন হয়ে গেল।

কিছুদিন সুভাষ খুব ঘুরল। পুরনো বন্ধুদের খোঁজ খবর করে বের করল—এবং এই অফুরন্ত সময় তুহাতে কেটে সে ক্রমশ এক তুরন্ত অস্থিরতায় নিমজ্জিত হতে থাকল। সে প্রৌঢ় মানুষটির কোন ফোন পেল না আর। তুরন্ত আবেগ মাঝে মাঝে সেই বাড়ির দিকে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছে—সে একবার অনুর মুখ দেখতে চেয়েছে খুব সামনে থেকে—সে একবার ভেবেছে সব অভিমান ভুলে আবার অনুকে বুকে টেনে কাছে নেবে—কিন্তু সেই রাতের ঘটনা মনে হলেই সব মুখ বিস্বাদে ভরে যায়। কোমল ভালবাসার কথা তখন আর মনে থাকে না, কোমল ভালবাসার জন্য সে আর ছোট হতে চায় না, ওর পৌরুষ বার বার সে জন্য ঘা খাচ্ছে। অপর প্রান্তের মানুষেরা যত নীরব থেকে যাচ্ছে, যত প্রৌঢ় মানুষটা আর কাছে আসার চেষ্টা করছেন না তত সে তুঃখের ভার, কখনও হিংসায় কখনও সংকীর্ণতায় অথবা অনু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ক্লিষ্ট ছবির কথা ভেবে প্রায় উন্মাদের মত। অনুর অপেক্ষায় প্রতিদিন পল দণ্ড গুণে যখন দেখত রাত বাড়ছে, ক্রমশ পথ জনবিরল হয়ে আসছে তখন তুঃখে সে বিছানার ওপর চোখ বুজে পড়ে থাকত—আর কত রকমের সব প্রতিশোধের কথা মনে হত। মনে হত সংসারে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই—কখনও মনে হ'ত চুপি চুপি ফের চলে গেলে হয় আর সব ভিন্ন ভিন্ন হত্যাকাণ্ডের স্বপ্ন দেখত সে রাতে। সে ভয়ে উঠে বসত। সে ভয়ে জানালা খুলে বদ্ধ আবহাওয়া ঘর থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করত। রাতে ঘুম না এলে সে বারান্দায় ব্যালকনিতে বসে

বসে বিগত সব অতীতের কথা ভাববার সময় মনে হত এই রাত বুঝি আর নিঃশেষ হবে না। বস্তুত সুভকে কে যেন ক্রমশ এক অসীম অন্ধকারের ভিতর ঠেলে দিচ্ছে।

পুরনো বন্ধুদের আড্ডা বেশীদিন সুভাষের ভাল লাগল না। সকলেই প্রায় সংসার করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। সুভর শুধু দিন কাটছিল না। সে মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্য বিকেলের দিকে গড়ের মাঠ ঘুরে ঘুরে কোনদিন চৌরঙ্গির কোন রঙীন মদের দোকানে সামান্য এক দু গ্লাস মদ সামনে নিয়ে বসে থাকত। বেশী খেতে ইচ্ছে হত না। সে কোনদিন এই বস্তুটিকে রপ্ত করতে পারেনি—ওর ভাল লাগত না—কিন্তু শরীরের ভিতর অসুর কষ্টদায়ক যে ছবি ঝুলে থাকত, যা তাকে সবসময় পীড়ন করছে এই সামান্য মদের জন্য, অথবা কড়া মদের ঝাঁজ ওর সর্বরোগহারকের মত যেন সর্ব দুঃখ হারক—সে বেশ একটু একটু করে বস্তুটিকে করায়ত্ত করে ফেলল। এবং এ সময়েই ওর মনে হত প্রীতির কথা, সে এই বস্তুটির ভিতর প্রীতির ছবি দেখতে পেত। কিন্তু ভীরুতার জন্যই হোক অথবা প্রীতির প্রতি অকারণ সংকোচের জন্যই হোক সে কিছুতেই প্রীতিকে ফোন করে বলতে পারল না, আসুন একদিন প্রীতি—আসুন একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।

সেদিনের প্রীতি যে ভাবে সুভকে কাছে বসে খাইয়েছিল, প্রীতি যে আন্তরিক যত্নটুকু করেছে তার জন্য যেন সুভর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ওর মনে হয়েছিল প্রীতি মহৎ পুরুষের চরিত্র নিয়ে ওর পাশাপাশি হাঁটছে বন্ধুর মত। যেন প্রীতি ওকে কোন শুভ সঙ্কেত দিতে পারে যাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে বাঁচা যায়। সুভ বিকালে বের হবার মুখে এসব ভাবল, আর তখনই অনেকদিন পর ঘরের ভিতর ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল, হ্যালো।

—কে! সুভাষ গম্ভীর গলায় বলল।

—আমি ডাক্তার প্রীতি।

—কি খবর আপনার ?

—আগে আপনার খবর বলুন।

—আমার আর কি খবর।

—সেদিন চলে আসার পর অনুকে ফোন করে আপনার কথা বললাম, বললাম অনু তুই ভাল কাজ করছিস না।

—তাই বুঝি !

—আমি তো অনুকে চিনি। ভয়ঙ্কর জেদী মেয়ে। যা একবার ভাববে, তাই করবে।

—হবে হয়ত। সুভাষ খুব উৎসাহ প্রকাশ করল না।

—তারপর আপনার খবরও নেব নেব করে আর নেওয়া হচ্ছে না। অনু কিছু বলছে না আপনার সম্পর্কে। সে খুব একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। শরীর ভাল নেই। তবু দেখলাম, নীচের ঘরটাতে গানের স্কুল খুলেছে অনু।

—কিছু কিছু খবর আমার কাছে আসছে।

—শুনছি সেই অসীম ছেলেটিকে…।

—প্রীতি, ওঃ প্রীতি দোহাই আপনার এ সব কথা আমাকে আর শোনাবেন না। আমি দুর্বলতাবশে আপনাকে সেদিন অনেক কথা বলে ফেলেছিলাম। আমার মাথার ঠিক ছিল না, কিন্তু আপনার আতিথ্য আমাকে বড় মুগ্ধ করেছিল। বলে একটু থামল সুভাষ তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি পুরুষমানুষ প্রীতি, আমারও জেদ থাকা বাঞ্ছনীয়। বলে সে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, একদিন আসুন না একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।

—অনেকদিনই ভেবেছি একবার ফোন করে চলে যাব। একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। কিন্তু যা কাজের চাপ কিছুতেই হয়ে উঠছে না।

—মানুষ তো একজন, এই কাজের চাপ নিয়ে জীবনে কি হবে।

—মাঝে মাঝে কথাটা খুব মনে হয়।

—একটু কম কাজ করুন। পথ ঘাট দেখে বেড়ান, মাঝে মাঝে নৈনিতাল মুশৌরি চলে যেতে পারেন, কেবল কাজের ভিতর ডুবে থাকলে নিজেকে দেখা যায় না, নিজেকে চেনা যায় না।

—মাঝে মাঝে বড় নৈরাশ্যে ভুগি। কিছুতেই কোন উৎসাহ পাই না। প্রীতি এই কথাটুক বলে কেমন লজ্জা পেয়ে গেল। হ্যাঁ শুনুন, যে জন্য ফোন করেছিলাম।

—বলুন।

—আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন।

—উপকার। আমি আপনার কি উপকার করতে পারি।

—পারেন।

—পারলে নিশ্চয়ই করব।

—আপনার কোম্পানীতে আমার এক দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলেকে কাজ দিতে হবে।

—আমি তো এখন ছুটিতে আছি। আর কাজ ফের করব কিনা তাও ঠিক নেই। অফিসে কোন ভেকেন্সি আছে কি না আমার আপাতত জানা নেই। তবে আপনি সকালের দিকে অথবা ফোন করে আত্মীয়টিকে পাঠিয়ে দেবেন, কি পড়াশোনা করেছে—

—পড়াশোনা, এবার বি. কম পাস করেছে। টাকার অভাবে বাবা পড়াতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, কিছু উপার্জন করে বাপমাকে না দিলে গোটা সংসারটা ডুবে যাবে।

—আমি চেষ্টা করব প্রীতি। আপনি ওকে পাঠিয়ে দেবেন।

সুভ ফোন ছেড়ে দিল। সুভ আশা করেছিল প্রীতি অন্য কথা বলবে। বলবে, কি খবর কোথায় থাকছেন আজ কাল, অফিস ফেরত এখানে চলে আসতে পারেন। কিন্তু প্রীতি সে সব কিছু বলল না। সে নিজেই কথাটা বেহায়ার মত বলে কেমন সঙ্কোচ বোধ করতে থাকল। প্রীতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হতে পারে। কারণ প্রীতির আদৌ কোন আন্তরিকতা নেই এ সম্পর্কে। বরং প্রীতি

তার এই দুর্বলতার সুযোগে একটি আত্মীয়ের চাকরি করিয়ে নিচ্ছে।

এখন গ্রীষ্মের দিন নয়, তবু বিকেলের দিকটা প্রচণ্ড গরম দিচ্ছিল। বসন্ত কাল। মাঠের গাছগুলোর পাতা ঝরতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই বসন্তের সময়ে অনু মাঝে মাঝে সুভকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে চলে যেত। মাঝে মাঝে বি টি রোড ধরে চলে যেত। বসন্ত কাল এলেই অনু ঋতুমতী গাভীর মত কাছে কাছে সুভর থাকতে ভালবাসত। সুভাষ সাধারণ পোষাকে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। পাশে অন্য কোন মুখ আর কিছুতেই ভেসে উঠছে না। সে এই ঘরে একাকী অনুকে কত রকম ভাবে ব্যবহার করেছে। সেই সব ব্যবহারের ছবি খুব একা থাকলে, বিশেষ করে রাম যখন ঘরে থাকে না, সুভর একা একা ভাবতে বড় ভাল লাগে। সেই সব ব্যবহারের ছবি সুভাষকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার জন্ম দেয়। সুভাষ তখন আর কোনমতেই স্থির থাকতে পারে না, অস্থির চিত্ত সুভাষের ঘরের চারপাশে উন্মাদের মত দু হাত তুলে, তোমরা আমায় কে নেবে গো কিনে বলার ইচ্ছা হয়।

সে আলমারি থেকে ভাল পোষাক বের করে নিল। সে তার দামী পোষাকের ভিতর নিজেকে দামী করার ইচ্ছাতে সামান্য প্রসাধন করল আজ। ওর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা। ওর সিঁড়ি ধরে নেমে কোন শো দেখার ইচ্ছা। তারপর সেই এক পাল মাতাল মানুষের আড্ডাখানা। সে প্রসাধন করার সময়ই মুখে ভিন্ন ভিন্ন রেখা টেনে নিজেকে দেখল তারপর শিস দিতে দিতে নীচে নেমে গেল। সে কেন জানি আজ এক সরল হিন্দি চিত্রের গান গাইল প্রথম, তারপর সোজা প্রীতির বাড়িতে ঢুকে বলল, আমি আপনার কাছে চলে এলাম।

—এই অসময়ে!

—খবরটা দিতে এলাম।

—কিসের খবর বলুন তো!

—কেন বললেন না, আপনার আত্মীয়ের চাকরি দরকার!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগে তো জানালাম।

—আমি আপনার ফোন পেয়েই মাসুদি সাবকে ফোন করেছি, তিনি রাজী আছেন। সুভ মিথ্যা কথা বলল। বস্তুত সুভাষ প্রীতির কাছে আসার লোভ সামলাতে পারে নি। সে কোন অজুহাত খুঁজছিল মনে মনে। সে জানত মাসুদি সাব তার অনুরোধ ফেলতে পারবে না। সুতরাং চাকরির কথা প্রীতির কাছে বলতে আসা চলে।

প্রীতি বলল, এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবতেই পারি নি।

—আমিও কি ভেবেছি। ইচ্ছা করলে ফোনেই খবরটা দিতে পারতাম। কিন্তু শুভ খবর সামনাসামনি দিতে পারলে কিছু আহার মিলে যেতে পারে এই আশায় চলে এসেছি।

—ভাল করেছেন।

— কিন্তু খুব যে ব্যস্ত দেখছি।

-- কোথায় আর ব্যস্ত। আপনি একটু বসুন, হাতের সামান্য কাজ সেরে নি।

বলে প্রীতি পাশের ঘরে চলে গেল।

সুভ ঘরের সামান্য পরিবর্তন দেখল। কঙ্কালটা নেই। বাঁদরের মুখওয়ালা কার্পেটটার বদলে অন্য কার্পেট—বড় বড় ফুলের ছবি এবং মন্দিরের ছবি। যেন প্রীতি ঘরটা এইমাত্র সাজিয়েছে। প্রীতির আজ ছুটির দিন। সে কোথাও আজ বের হবে না। সে ভোর থেকে এই ঘরের সর্বত্র ছবি টাঙিয়ে, রেডিওর টাওয়েল পালটে, জলের গ্লাসে নূতন ঝালর এবং অন্যান্য বিলাস দ্রব্যে ঘরটাকে নিপুণ করার চেষ্টা করেছে।

অথবা প্রীতির বিকেলের দিকে কেন জানি মনে হল সুভাষবাবুকে ফোন করলে হয়। কারণ ছুটির দিন, সুভাষবাবু নিশ্চয়ই ঘরে বসে

একা একা কোন উপন্যাসের ভিতর মুখ ডুবিয়ে রেখেছেন, যেমন প্রীতির বদভ্যাস, ছুটির দিন হলে তাড়াতাড়ি স্নানাহার করে হাতে পায়ে নেল পালিশ মেখে, মুখে সামান্য প্রসাধন মেখে ধবধবে সাদা বিছানার উপর শরীরটা এলিয়ে দেবে, এরপর যেন কত কষ্টে বালিশ টেনে নেবে একটা এবং মাথার কাছে বইটা রেখে একটু সুপুরির কুচি মুখে ফেলে কিছুক্ষণ পাতা ওল্টানো, কিছুই মনে হয় না তখন, সামনে এক অজ্ঞাত নায়কের ছবি থাকে, বই পড়তে পড়তে সেই অজ্ঞাত নায়ককে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ার ইচ্ছা। অথচ আজ এসব কিছুই হল না। বরং ভোর থেকে সারাটাদিন কি ভাবে কাটানো যায়, একটু ঘুরে ফিরে বেড়ানো, একটু আলগা হয়ে চলা, সহাস্যে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যুবকের প্রতি অদৃশ্য ভালবাসা জানানো, এইসব বার বার মনে হচ্ছিল।

প্রীতিকে, ঘর পরিষ্কার করার সময়ই সেই ভোরের স্বপ্নটা কি করে যেন অজ্ঞাতে ওকে কাহিল করে ফেলেছিল। কি ভেবে, ফোনের ডায়াল ঘোরালে--বুঝল, এটা সুভাষ বাবুর ফ্ল্যাটের নম্বর। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে ভাবল, কিন্তু তখন অপর প্রান্তের কণ্ঠ ওকে বড় দুর্বল করে ফেলেছিল। ছিঃ ছিঃ, কি ভাববে মানুষটা, কি আর বলা যায়, কিছু বলতে হলে এবং কিছু বলার সময় দেখল বড় বেশী দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে কোন অলীক গরীব আত্মীয়ের চাকরির কথা বলে ফেলল। অর্থাৎ প্রীতির এই ফোন কোন দুর্বলতার জন্য নয়। আদি প্রয়োজন মানুষের খাদ্য। গরীব আত্মীয়ের সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার শুধু প্রয়াস। এই অভিনয় নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না প্রীতি। এত বড় মিথ্যা কথাটা সে অনায়াসে বলে ফেলতে পারল কিন্তু ফোন ছেড়ে দিয়ে ভাবল, চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে গেলেই হত।

সুভাষ বসার আগে রেডিওটা খুলে দিল। কোথাও থেকে বীণের বাজনা ভেসে আসছিল। এই বীণের স্বর ওর চেনা চেনা।

আজ কি অনুর প্রোগ্রাম আছে, সে এতদিন সব যেন ভুলে বসেছিল। সে তাড়াতাড়ি আর একটু চড়িয়ে যখন বুঝল অনুই বীণ বাজাচ্ছে তখন এক বিষণ্ণতা ওকে গ্রাস করতে থাকল। সে রেডিওর পাশে উপুড় হয়ে প্রায় শুনল। অন্যদিন হলে হয়তো বন্ধ করে দিত, অনু তার স্ত্রী এ কথাটা এ সময় কেবল বার বার মনে পড়ছিল। অনু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অনুকে, অথবা অনু সুভকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

প্রীতি পেছনে ঢুকে বলল, অনুর হাতটা বড় মিষ্টি।

সুভাষ প্রীতির মুখ দেখল, কিছু বলল না।

—ভারি মিষ্টি হাত কি বলেন!

সুভাষ উত্তর না করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

প্রীতি বলল, অনুর আজকে প্রোগ্রাম ছিল জানতেন না?

সুভাষ পাশের বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। কিছুই ওর ভাল লাগছে না। প্রীতি কেবল অনু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে ভেতরের দুঃখটাকে উসকে দিচ্ছে। সুতরাং সে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, অনু আপনার স্ত্রী হলে ভাল হত।

প্রায় পাগলের মত কথা! প্রীতি ভাবল সুভাষ এই অসম কথা বলে কি আনন্দ পাচ্ছে। তবু ব্যাপারটাকে হাল্কা করার মত করে বলল, আমরা বড় কাছাকাছি থাকতাম এক সময়। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে পারি নি। বিয়ের পর অনু বড় পালটে গেল। আমাদের কথা প্রায় ভুলে গেছিল, ফের ভ্রূণ হত্যার কথা মনে হতেই আমার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

—ওর মনে পড়ে নি। যখন অনু পাগলের মত করছিল তখন আপনার নামটা আমি ওকে বলেছি।

—ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে আপনি কি আমাকেই সাব্যস্ত করে-ছিলেন?

—আপনি ডাক্তার মানুষ। তার উপর স্ত্রী জাতি। ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে আপনার সাহায্য বেশী মনোরম।

প্রীতির মুখটা কালো হয়ে গেল। প্রীতি পায়ের নখে কি যেন দেখছে অথবা প্রীতি ভিতরে ভিতরে কি সব ভাবছিল যা খুব কষ্টদায়ক। সুভাষ একটা সিগারেট ধরালো। প্রীতি এখনও মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। তবে কি অনু প্রীতির কুমারী জীবনের সেই দুর্ঘটনার কথা স্বামীকে পরিহাসচ্ছলে, অথবা যৌন ক্রিয়ার সময় স্বামী স্ত্রী যে অপরের যৌনবিলাসের গল্প করে সুখ পায়, অথবা তৃপ্তি পায় সে সব বলে দিয়ে সুভকে বেশী উত্তেজিত করতে চেয়েছিল! প্রীতি কিছুতেই আর মুখ তুলে সুভাষের দিকে তাকাতে পারল না। অনুর প্রতি ওর ভয়ানক জিঘাংসা জেগে উঠেছে। অনু আমাকে অসম্মান করে তোর কি লাভ হল। অনু সেইসব জীবনের কথা আমার মা জানতেন, বাড়ির অন্য কেউ টের পায় নি। তুই আমার কাছে কাছে ছিলি, তুই সব জেনে সুভাষকে আমার অসম্মানের কথা না বললে বড় ভাল করতিস।

সুভাষ বলল, আপনার গরীব আত্মীয়টি কোথায়?

প্রীতির সহসা মনে হল, এবারে বলে ফেলি, গরীব আত্মীয়টি মারা গেছেন।

সুভাষ বলল, ওকে কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—বলব। একটু কফি খান সুভাষ বাবু। আমি আসছি ওপর থেকে

সুভাষ প্রীতি উপরে উঠে গেলে টেবিল থেকে একটা মেডিকেল জার্নাল তুলে নিল, ভেতরে বড় বড় বিজ্ঞাপন। এ বাড়িতে এখন কেউ নেই। শুধু প্রীতির চাকর এবং প্রীতি, উপরে বাবা মার কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো ওঁরা কোন উপাসনার মন্দিরে গেছেন। কারণ প্রীতি বলেছিল, বাবা মা প্রায়ই কোথাও না কোথাও চলে যান। সুতরাং প্রীতি ক্রমশ একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের ভিতর মুখ রেখে সুভর এসব কথা মনে পড়ছে।

প্রীতি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর অনুর

ছবির পাশে প্রীতি নিজের ছবি রেখে পরস্পরকে দেখল। কেমন যেন বিপরীতমুখী দুই যুবতী—একজন অপরূপ সুন্দরী, মাখনের মত কোমল এবং অন্য জন দীর্ঘ সিংহীর মত কঠিন। নীচে সুভাষ বসে রয়েছে। সেই পুরুষকে পাশে রেখে বড় আয়নায় মনে মনে নিজের কাঁধ এবং গলা মিলিয়ে দেখল। গলার নীচটা দেখা যাচ্ছে না, সে অন্তর্বাস খুলে শরীরের সব দেখল। এবং এক সময় এই শরীরে মাতৃত্বের ছবি ছিল, পেটের নীচে সামান্য কোমল সাদা রঙের জল-ছবির দাগ সে কত যত্ন করে, কত রকমের ভেজলিন ব্যবহার করেও সেই দাগ তুলে ফেলতে পারে নি।

আজ অনেক দিন পর প্রীতি পাশের একোরিয়ামগুলোর ভেতর আলো জ্বেলে দিল, এক সময় কুমারী জীবনে প্রীতির, ভ্রূণ হত্যার জন্য ঘুম আসত না। বাবা মা ওর ভাল ঘুমের জন্য দুটো একোরিয়াম করে দিয়েছিলেন। দুটোতে দু রকমের মাছ থাকত। ওর এগবিয়ারিঙ মাছের চেয়ে লাইফ বিয়ারিঙ মাছের প্রতি বেশী অনুরাগ ছিল। সে অনেকদিন পরে যেন এত বড় দুটো একোরিয়াম ঘরে আছে মনে করতে পারল। সেই অপমানের কথা মনে এলে মানুষটার কথা মনে আসে··দূর সম্পর্কের আত্মীয় মানুষটা তার শরীরে ভ্রূণের জন্ম দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কুমারী জীবনের দুঃখ এবং বেদনার কথা মনে হলে মানুষটার কথা মনে হয়, আর মানুষটা সম্পর্কে ওর স্মৃতি দুর্বল হয়ে আসছিল, হয়তো সবই একদিন মুছে যাবে, কেবল পেটের নীচে সামান্য জলছবির মত দাগ মুছে যাবার নয়। প্রীতি নিজের প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনা হয়ে গেল—নীচে একজন মানুষ বসে রয়েছে, মানুষটির কি ইচ্ছা, এবং সে এখানে এ সময় কেন চলে এসেছে প্রীতির যেন সব জানা। প্রীতি নিজের দুর্বলতার জন্য মনে মনে নিজের উপর রাগ না করে থাকতে পারল না। সে ফোন না করলেই পারত। ফোনের জন্য একটা অজুহাত মিলে গেছে মানুষটার, সে সোজা এখানে চলে এসেছে।

কপালে ঘাম ফুটে বের হচ্ছিল প্রীতির। পাখার হাওয়া ওর ভেতরের গরম কিছুতেই নষ্ট করতে পারছে না। এই বাড়ির ভিতর সে প্রায় একা। চাকর বলতে মানুষটি ভীতু এবং সরল, দিদিমণির সব আজ্ঞা পালন করাই ওর ধর্ম। সুতরাং এই বাড়ির ভিতর প্রীতি এবং সুভাষ, বাইরে বিকেল মরে আসছে, নীচে বোধ হয় লংপ্লেয়িং রেকর্ড বাজাচ্ছিল সুভাষ। সারা বাড়িময় সহসা উৎসবের মত মনে হল প্রীতির। সে তার ভ্রূণ হত্যার কথা ভুলে গেল। একদা ভ্রূণ হত্যা করে কুমারী জীবনে সে যে অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিল এখন সে সেই অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে আর ডাক্তার প্রীতি থাকল না। সে এখন যুবতী প্রীতি। এখন তার যেন অন্য কোন পরিচয় নেই। যুবতী প্রীতি অভিসারে যাবার আগের মত মুখ করে শেষবারের মত আয়নায় নিজেকে দেখে নীচে নেমে গেল।

সুভাষ দেখল প্রীতি খুব কোমল গলায় বলছে, দেরী হয়ে গেল সুভাষ বাবু।

—তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

—ঘরে ছুটো আমার একোরিয়াম আছে। চাকর বাকরগুলো আজকাল যা হয়েছে! মাছগুলোর কোন যত্ন নেয় না।

—চাকর বাকর মানুষের কথা আর বলবেন না।

—দেখি বড় এনজেল মাছটা জলের উপর ভেসে খাবি খাচ্ছিল।

—কি করবেন?

—কি আর করব! একটু আইডিন জাতীয় ওষুধ জলে গুলে দিলাম।

—বোধহয় ঠিক মত জল বদলায় না।

—তা হলে আর খাবি খাবে কেন। এখনও কফি দেয় নি! সহসা যেন কথাটা মনে পড়ে গেল প্রীতির।

—কোথায় আর।

– দাঁড়ান দেখছি, বলে ভিতরে ঢুকে নিজেই দু কাপ কফি এনে মুখোমুখি বসে গেল।

তখনও প্লেয়ারে রেকর্ড বাজছে। ইংরেজী গানের কলি। ওরা গান শুনছিল না। ওরা, সব মিলে গানের যে অলীক সাম্রাজ্য তৈরী করার ক্ষমতা থাকে তার ভিতর ডুবে যাচ্ছিল।

সুভাষ বলল, বাইরে বের হলে হত।

—কোথায় যাবেন?

—কোন শোতে গেলে মন্দ হয় না।

—কেন এইত বেশ। রাস্তায় বের হলেই খারাপ লাগে। রাস্তার দৃশ্য আজকাল আর দেখা যায় না।

—যেমন?

—এই ধরুন, রাস্তায় ভিখারীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শিয়ালদার ওদিকটাতে তো হাঁটাই যায় না। রিফুজীতে জায়গাটা ভরে গেছে।

—ক্রমশ আমরা কেমন নীচে নেমে যাচ্ছি প্রীতি।

প্রীতি কথা বলল না। সে কাপে ঠোঁট লাগিয়ে কি ভাবল। তারপর সুভাষের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার এখন দিন কাটছে কি করে?

—এই নানা রকম বইয়ের ভিতর দিন কেটে যাচ্ছে।

—আপনার অমুর জন্যে কষ্ট হয় না! প্রীতি, খুব আচমকা কথাটা বলে দিয়ে সুভাষের মুখের রেখা দেখতে চাইল যেন।

—প্রীতি, সুভাষ কোমল গলায় ডাকল।

—বলুন।

—প্রীতি, আপনি ভালবেসেছেন?

প্রীতি সহসা জবাব দিতে পারল না।

—প্রীতি আপনি শৈশবে ভালবেসেছেন?

প্রীতি জবাব দিতে পারল না।

—প্রীতি আপনি গ্রাম্যযুবকের ভালবাসা পেয়েছেন?

প্রীতি জবাব দিতে পারল না। এতগুলো প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে সে বুঝতে পারল না। এতগুলো প্রশ্নের যেন একটি উত্তর হয়, ভালবাসিনি। অথবা যাকে ভালবাসা বলে ভেবেছি, তা যৌনক্রিয়ার সামিল—আমার কাছে ভালবাসাকে এর চেয়ে বড় বলে মনে হয়নি।

সুভাষ বলতে পারত, আমি ভালবেসেছি। অনুকে ভালবেসেছি। সে ভালবাসা আমার মরে যায়নি প্রীতি। বরং অনুর অদর্শনে ভিতরে ভিতরে সেই ভালবাসার আগুন আমাকে ক্রমশ মরিয়া করে তুলছে। আমি যে কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারি। অনু তার সারাজীবনের সহনশীলতায়ও সেই অপমানের বোঝা লাঘব করতে পারবে না।

প্রীতিকে কিছু বলতে না দেখে সুভাষ নিজেই ফের বলল, প্রীতি, আমি গ্রামের ছেলে। এখনও বর্ষায় মাঠ দেখলে, কদম গাছ দেখলে আমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ভিতরে ভয়ঙ্কর আবেগ। আবেগের জন্যে আজে বাজে বলে ফেললে ক্ষমা করে দেবেন।

সুভাষের এই সঙ্কোচিত ভাবটুকু প্রীতির মন্দ লাগল না। সে বলল, আপনি এখন একা মানুষ। আপনাকে দুটো আমি একোরিয়াম করে দেব। দুটোতে দু রকমের মাছ থাকবে। তখন আপনি দেখবেন কাজ করে সময় পাবেন না।

—ঝামেলা বাড়বে বলুন।

—না, এটা এক ধরনের গেম বলতে পারেন। দু চারদিন নিজে হাতে কাজ করলেই দেখবেন এক ধরনের সুখ আছে যা আপনাকে ঠিক এখন বোঝানো যাচ্ছে না।

—ধরুন, যারা বড় বড় কুকুর পোষে। এই কুকুর পোষাও এক ধরনের সুখ এবং সখ বলতে পারেন। সুভাষ কথাপ্রসঙ্গে ওর এক আত্মীয়ের নাম করে বলল, মানুষটি এখন নিজের কথা ভুলে গেছে।

মানুষটি এখন কুকুরকে নিয়ে সারাদিন খেলছে, কথা বলছে এবং নাকি আজকাল সে কুকুরটা সম্পর্কে স্বপ্নও দেখছে।

—পুরুষ মানুষদের সব ব্যাপারেই উন্নাসিকতা!

—আপনি ভুল করছেন প্রীতি, কুকুরের প্রতিপালকটি পুরুষ। এ সব ব্যাপারে পুরুষ কাপুরুষ সব সমান।

—সব ব্যাপারেই প্রায় তাই।

সুভাষ 'সব ব্যাপারটা' কি রকমের অর্থ বহন করছে অর্থাৎ সুভাষ এই যে এসে তক এ কথা সে কথা বলছে, কাজের কথা কিছু বলছে না, অথবা বলতে পারছে না, সুভাষ কি কাপুরুষের মত থাকছে! অথবা ভেতরের ইচ্ছাগুলোকে নিয়ে এখন পলাতক হতে পারলে ভাল হ'ত—যেন সুভাষ সরল বালক, মনে প্যাঁচ নেই, যৌন আচরণ সম্পর্কে নির্বিবাদ। সুভাষকে প্রীতি বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারল না, সুভাষ প্রীতির পাশ থেকে উঠে বলল, চলুন কোথাও বের হওয়া যাক, ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

প্রীতি বুঝল সিংহের মত মানুষটি এই নির্জন বাড়িতে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। সে বলল, আপনি ওপরে আসবেন একটু।

—এই অসময়ে।

—একোরিয়াম ছুটো দেখাব। মাছগুলো দেখতে পেতেন।

—আজ থাক প্রীতি। বরং আর একদিন আমি আপনার মাছ দেখব।

—মাছ দেখতে আপনার ভাল লাগে না সুভাষবাবু, আশ্চর্য!

—খুব ভাল লাগে প্রীতি।

—এনৃজেল মাছের রঙ দেখলে আপনার চোখ বড় বড় হয়ে উঠবে।

—আমার চোখ নয়। বরং বলুন মানুষের চোখ।

—এনৃজেল মাছ দেখে আমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি।

—দু দিন বাদে আমিও পারব প্রীতি। আপনাকে কিছুদিন এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

প্রীতি আর কিছু বলল না। প্রীতি এবং সুভাষ বিকেলে শহরের রোদ দেখার জন্য পথে বের হয়ে গেল।

রববারে অনুকে অধিকাংশ সময় নীচে থাকতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা সেদিন ভোর থেকেই আসে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সে আরও আলাদা দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছে। দুজন শিক্ষয়িত্রী আসেন। সুতরাং অনু এবং অন্য দুজন শিক্ষয়িত্রী মিলে গানের স্কুলটিকে ইতিমধ্যেই বেশ তুলে ধরেছে। বাইরে সামান্য যে লনের মত, জায়গা আছে, সেখানে কিছু শীতের ফুল এখনও ফুটে রয়েছে। তার পাশে নীল রঙের বোর্ড। 'রবীন্দ্রবীথি' বিদ্যালয়ের নাম। বোর্ডে কোন কারুকাজ নেই। সাদা বর্ডার দেয়া লাল রঙের খুঁটি—নীচে ঘাস আর সামনে বিদ্যালয়ের জানালা।

ঘরগুলোর ভিতর কিছু বড় বড় গায়কের ছবি। কিছু স্বনামধন্য পুরুষের ছবি। নীচে কার্পেট পাতা। এক কোণায় সব ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। রববারের ভোরে এই ঘরগুলোতে জায়গা না হলে অনু ওপরে নিজের ঘরে চলে আসে। সে এখন আর পা তুলে বেশী ছুটতে হাঁটতে পারে না। সে শুধু মাঝে মাঝে হাতের মুদ্রা অথবা কোন কোন সময় সামান্য হাত পা সঞ্চালন করে নাচের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে শরীরে। প্রীতির বারণ আছে, প্রীতি বলে গেছে—এখন অনু তোমার বিশ্রামের সময়, এখন বেশী লাফালে ঝাঁপালে আবার অনর্থ ঘটতে পারে। সেই ভয়েই সম্ভবত অনু প্রায় সময়ই চুপচাপ বসে থাকে। এক কোণায় এক চেয়ারে বসে থেকে সে সকলের নাচ দেখতে ভালবাসে। নিজে পারে না বলে, ওর অন্য দুজন বেশী খাটছে। অনুর দায়িত্ব তারা নিজেরাই প্রায় ভাগ করে নিয়েছে।

বারটার পর থেকে চারটা পর্যন্ত সময় ফাঁকা। রববারে বিকালের দিকে ক্লাশের ব্যবস্থা আছে। রাত্রিতে একজন সেতারের শিক্ষক আসেন। রাতের দিকে অধিকাংশ সময় বাদ্যযন্ত্রের ক্লাশ নেওয়া হয়। সাধারণত এই সময় নিখিলবাবু এবং অমলবাবু আসেন। রাতের দিকে অনুর বেশী সজাগ থাকতে হয় না। তারা নিজের স্বার্থে—এই ঘর দুটোর পুরো ব্যবহার করার চেষ্টায় আছে। অনুকে ওরা ওদের আয়ের অংশ থেকে ঘর ভাড়া এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি খরচ বাবদ মোটা অংশ দিচ্ছে।

সুতরাং অনুকে দেখলে মনে হবে যে সে স্বাবলম্বী হবার বাসনাতে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুভর কাছ থেকে যত আঘাত আসছে তত নিজের পায়ে ভর করে বেঁচে থাকার অধিক বাসনা জাগছে। অনু বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিল. মা তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে আছেন, বাবার দিবা নিদ্রায় অভ্যাস নেই বলে কোত্থেকে কি করে কিছু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছেন, তাই পড়ছেন —অথবা পুরানো খবরের কাগজ থেকে যে সব কাটিং রেখেছিলেন একদা তাই এখন ফের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ছেন। আর বোধহয় মণিমাসি এখন নিজের জন্য চা করছে, এবং এই চা হলে অনুও সামান্য চা পাবে। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল। উঠোনের একপাশে ছোট বাতাবি লেবুর গাছ। গাছটা থেকে এখন দুটো একটা পাতা ঝরছে। পাতা ঝরা দেখতে ওর ভাল লাগছিল, পায়ের কাছে রোদ পড়ে আছে। পাশে ছোট টিপয়। মণিমাসি নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখছে সব। সুতরাং সে এককাপ চা পাবে, মণিমাসি চা রেখে গেলে সে আরামে চা খাবে। এখন আর ওক ভাবটা একেবারেই নেই। শরীর মন্দ যাচ্ছে না। মাঝে একদিন অসীম এসেছিল। অসীমের চোখে কিছু বিস্ময় ছিল মনে হয়। অসীম এসেই বলেছিল, বা বেশতো অনুদি, আপনাকে বড় লাভলি দেখাচ্ছে। অনু উত্তরে বলেছিল,— শীত চলে গেছে অসীম! শরীরের সব জড়তা কেটে গেছে। এখন

শরীর দিন দিন ভাল হচ্ছে। অসীম আমি মা হব তো—ওর ইচ্ছা হচ্ছিল বলতে, অসীম আমি মা হব, আমার কত দায়িত্ব। যে মানুষের জন্য মা হওয়া অসীম, সে আমার কাছে আর আসছে না। সে দূরে দূরে থাকছে। আমার বড় অভিমান অসীম, তুমি এক যুবক, অসীম তুমি এক যুবক, যুবকের কাছে যুবতীর কি আর প্রাপ্য, ভালবাসা প্রাপ্য, গুণগান প্রাপ্য, আমার আর কোন বাসনা নেই অসীম। তুমি আর এস না। আমি মা হতে যাচ্ছি। যে মানুষের জন্য মা হওয়া সেই মানুষ দূরে দূরে থাকছে, আমি তাকে অপমান করেছি। কি আর অপমান। ঘুরে ফিরে আমার শুধু অপমানের কথাই মনে হয়। তুমি আর এস না অসীম। নীচে কে যেন সেতার বাজাচ্ছে। বড় আনাড়ী হাত, কানে বড় বাজে অসীম—ঘুরে ফিরে সেই এক নাম অসীম, সুভ নামে এক নাম আমার ভিতরে গাঁথা হয়ে আছে। ঘুরে ফিরে জলের রেখার মত কে যে আসে, মনের ভিতরে কি যেন খেলা করে অসীম —আমি বুঝি না, তুমি এস না অসীম।

কি করে যেন অমু ভিতরে ডুবে গিয়েছিল। মণিমাসি সেই কখন রেখে গেছে, বোধ হয় চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। মণিমাসি যাবার আসবার মুখে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন, অমু চা খাও চা তোমার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কি এক উদ্‌বিগ্নচিত্ত অমুর ভিতরে ভিতরে। বসন্তের হাওয়া কিছু ফুলের গন্ধ অথবা বাতাবি ফুলের কুঁড়ি—ওরা বোধহয় ফুটবে, কৈশোরের সেই বাল্যসখা সুভ কেমন স্বার্থপর হয়ে গেল! কেবল নিজের হাঁ বড় করে বসে থাকল, কেবল খাওয়া আর খাওয়া, খেতে পেলে আর কিছু লাগে না। মানুষটার শরীরে রাজ্যের খিদে। সেই বাল্যসখা আগুনের মত একটা স্বার্থপর শরীর নিয়ে বসে থাকল। অপরের শান্তি, এবং বাসনার কথা বেমালুম ভুলে গেল। তবু মানুষটার জন্য সময়ে অসময়ে মনটা বড় কেঁদে

ওঠে। ইচ্ছে হয় তখন দু'পা জড়িয়ে ধরতে, ইচ্ছে হয় সব ফেলে ছুটে যেতে—আর যাবার মুখে কত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, পা নড়তে চায় না, মনে হয় মানুষটা একেবারে নির্বিকার হয়ে গেছে। অথবা নিষ্ঠুর হৃদয় নিয়ে মানুষটা অসম্মান করার জন্য প্রস্তুত। তিক্ত বিস্বাদে শরীর মন ভরে যাচ্ছিল। কতদিন যেন সুভর সঙ্গে দেখা হয় নি। কতদিন যেন সুভ তাকে অনু বলে ডাকে নি—আর কতদিনই বা এভাবে চলবে। বাবা নিজে কিছু করতে পারতেন। তিনি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারতেন অথচ বাবা নির্বিকার। সেদিনের সামান্য কথা বাবা হয়ত আজও ধরে রেখেছেন—সেকি এত সব ভেবে বলেছিল—সে কি জানত ঘটনাটা ক্রমশ এত তিক্ত হয়ে পড়বে? এবং সুভ একসময় একেবারে চুপ মেরে যাবে। বিশেষ করে অনুর ধারণা ছিল—সে এক মহার্ঘ ধারণা—অনু, সুন্দরী অনু, রসে বসে অনুর চেহারা সুভর পক্ষে ভোলাবার নয়। আর মানুষটার যখন এত খিদে, এত জ্বালা ভালবাসার তখন মানুষটা আবার ফিরে আসবে অথবা ফোন করলে সব ভুলে গিয়ে সাধারণ ভাবে ঘটনাকে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেদিন সুভ যে ভাবে ওকে গালাগাল করল, অপমান এবং অসম্মান করল তারপর কিছু যেন ওর পক্ষ থেকে বলার নেই। এখন শুধু এক সময়, সময় কেটে গেলে ভিতরের যত গ্লানি ক্রমশ মুছে যাবে, আবার আকাশ নির্মল হবে একদিন এবং অনু সুভর কাছে সেদিন অনায়াসে ছুটে যেতে পারবে।

এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেশ সময় কেটে যাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে অনু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। অসীম মাঝে মাঝে আসছিল, ওর কাছে অনুর আকর্ষণ যেন ক্রমশ কমে আসছিল। ওর মামাবাবু এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। বিশেষ করে অনুকে দেখার পর অন্য কোন যুবতীকে তিনি নায়িকার মত ভাবতে পারছেন না। তিনি হয়ত শেষ পর্যন্ত অনুর জন্যই অপেক্ষা করবেন। অনুর সন্তান হয়ে গেলে তিনি অনুকে আলগা করে তুলে

নিয়ে যাবেন। আর বোধহয় অসীম সেজন্য এখনও সামান্য সংযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে।

অনু বারান্দায় বসেছিল, বসন্তের হাওয়া উত্তর কলকাতার উপর দিয়ে ক্রমশ পাশাপাশি সব চটকল পার হয়ে মাঠ পার হয়ে, নদী-নালা পার হয়ে যেন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যাচ্ছে—যেখানে অনুর মাঝে মাঝে চলে যেতে ইচ্ছা হয়। কোথাও না কোথাও মানুষের কেবল চলে যাওয়ার ইচ্ছা। অনু বিকেলের সূর্য আর দেখতে পাচ্ছিল না, অনু বুঝল ঠাণ্ডা হাওয়া আবার উঠবে, এবং অনু এই বারান্দায় বসে আকাশের কিছু নক্ষত্র দেখল। রাত বাড়ছে। সে সেই কখন চুপচাপ একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে শরীর আল্‌গা করে শুয়ে আছে, সেই কখন থেকে রাজ্যের চিন্তা পুষে রাখতে পারছে না। কেন সব বিসর্জন দিয়ে এখনও ছুটে যেতে পারছে না—কি আছে মনের ভিতরে, কি এক বাঘের মত জীব বাসা বেঁধে আছে ভিতরে যা তাকে কেবল গরবিণী করে রাখতে চাইছে। মেয়েমানুষের এত গরব কিসের! সুতরাং অনু সব অহঙ্কারের কথা ভুলে, অপমানের কথা ভুলে দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। খুব প্রসাধন করল না। সামান্য শাড়ি পরে, সামান্য প্রসাধন মুখে আয়নায় সামান্য সময় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। শাড়িটাকে একটু আলগা করে পরল অনু। ঘর থেকে বের হবার মুখে সে মণিমাসিকে দেখতে গেল।

—মণিমাসি, আমি একটু ও-বাড়িতে যাচ্ছি। বাবাকে বল।

—মণিমাসি বলল,—এ সময় একা একা। আমি সঙ্গে গেলে হত না?

—না।

—রামচরণকে ও-বাড়ি থেকে বলি আসতে!—সঙ্গে কিছু নিতে হবে!

—না। বলে অনু আর দাঁড়াল না। সে বাবা অথবা মাকে

কিছু না বলে একা একা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল। সে ভাবল আজ অবাক করে দেবে সুভকে। সুভ যদি নানা ভাবে ওকে অপমান করার চেষ্টা করে তবে ওর অন্তর্বাসের ভিতরে যে তূণ আছে, যে বাছা বাছা তীর আছে সব বের করবে আজ! সব বের করে ওকে আঘাত করার চেষ্টা করবে। সুভ, অনুর সুভ যে সারা মাস, কাল, বৎসর শুধু অনুর শরীর গিলে বসে থাকতে চায়—দিলে পর সে, সেই লালসার তীর নিশ্চয়ই গিলে ফেলবে। অথবা অনু অনেকদিন পর নিজের ভিতরই যেন সহবাসের তাড়না অনুভব করছিল। কি এক সময় আসে, সুভর কথা ভেবে ভেবে সময়ে সময়ে ভিতরে বড় দুশ্চিন্তা জাগে, রাতে ঘুম আসে না, সারারাত জল খেতে ইচ্ছা হয়, মাথা গরম হয়ে যায়, মাথার ভিতরে সুভর লালসায় মুখ চোখ কেবল ঠেসে থাকে। সুভর ভালবাসার কথা মনে হয়। দুঃখী মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, মুখটা সব সময় সুভর মত। বড় করুণ চোখ ওর। বোধহয় অপেক্ষায় আছে মানুষটা। মানুষটার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে বুঝি সব অভিমান ভুলে, সব গ্লানির কথা ভুলে বুকে টেনে নেবে। অনু সিঁড়ি ধরে নামছিল আর কত কথা ভাবছিল। অনু নীচে এসে দাঁড়াল না। সে লন পার হয়ে প্রথম রাস্তার ওপর দাঁড়াল। একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা। এখানে দাঁড়ালে হয়ত দেরী হবে ট্যাক্সি পেতে—সে হাঁটতে থাকল। পার্কটা পর্যন্ত হেঁটে এল। কিছু স্টল এখানে কাপড়ের। ছিট কাপড় কিনছিল সব যুবতীরা। বিকেল মরে আসছে। অনেকদিন পর অনু বাইরে বের হতে পেরে খুব হাল্কা বোধ করছিল। কোন দুর্ঘটনার কথা আর মনে আসছে না যেন। কোনদিন সে সুভ নামক এক ব্যক্তির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মনে আসছে না যেন—সব কিছুই ভাল লাগার মত। বসন্ত চলে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের গরম এখন রাস্তায়, গাছের পাতায় পাতায়। পার্কটায় কিছু অপরিচিত গাছ, গাছের ছায়া এবং ছোট ছোট স্টলে মানুষের এই বেচা-কেনা। বেঁচে

থাকার জন্য এই বেচা-কেনা, দর-দস্তুর—অতুর বেঁচে থাকার জন্য গানের স্কুল—কি যে কারণ ছিল এই স্কুলের! সুভর কাছে গেলে সব হাস্যকর মনে হবে—অতু প্রায় রাস্তায় গিয়েই নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে হেসেছিল।

পার্ক পার হলে বড় রাস্তা। ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি। ব্যালকনিতে সুখী পরিবারের সব ছবি ভাসছিল। কেউ চা খাচ্ছে দোকানে, দরজায় মানুষের ভিড়। পথে মানুষের চলাচল বাড়ছে। অতু ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে এসব দেখল। একটা গাছের নীচে অতু এখন দাঁড়িয়ে আছে! বরফওলা আইসক্রিম খাচ্ছে। কিছু শিশু বালক বালিকা আইসক্রিম কিনে খাচ্ছে। এখানে কে আর আছে, প্রতিবেশীদের ভয় হয়ত আছে। সুতরাং অতুর ভিতরের ইচ্ছাকে বেমালুম চেপে যেতে হল। শিশু বয়সের স্মৃতি এইসব আইসক্রিমওলাদের দেখলে মনে হয়। ঢাকা শহরের ছোট গলির কথা মনে হয়। বড় দাড়ি মুখে মিঞা নুরুলের কথা মনে হয় বিকেল হলেই মানুষটা রাস্তায় হাঁক দিয়ে চলে যেত। অতু একবার পাঁচিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, এই নুরুল চাচা আজ আমাদের দুটো আইসক্রিম দেবে। অতু সেই প্রথম অন্য মানুষের জন্য কেমন ভালবাসার উত্তাপ নিয়ে একটা আইসক্রিম নিজে এবং অন্য আইসক্রিম সুভ নামক এক বালকের জন্য, সুভ শহরে সেবারই প্রথম বেড়াতে এসেছিল ছোট পিসিমার সঙ্গে। বড় একটা বিলাতি গাবের গাছ ছিল বাড়ির দক্ষিণ কোণে। নীল রঙের ঘর ছিল মতু কাকার। ঘরের বারান্দায় বসন্তের দিনে দুজন বসে বসে আইসক্রিম খেতে খেতে প্রথম কেমন পরস্পর ভালবাসার আবেগ বোধ করেছিল। কি আর বয়েস ছিল সেটা! কত ছোট সুভ, দাড়ি গোঁফ নেই মানুষটার। অতুর গায়ে সামান্য ফ্রক—লাজুক সুভ প্রায় কথা বলতেই চাইত না, যেমন গ্রামের বাড়িতে, তেমনি এই শহরে—অতু স্মৃতির ভিতর সেই মানুষ সুভর

মুখ স্মরণে আনতে চাইছিল—আর সেই সব দিনের ছবি স্মরণে এলেই একটা নীল রঙের আইসক্রিম খাবার ইচ্ছা জাগে। আড়ালে আবডালে নীল রঙের আইসক্রিম—আহা আইসক্রীম, নীল রঙের আইসক্রিম, প্রায় অনুর জিভে জল এসে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবেশীরা দেখে ফেলবে ভয়ে সে একটা নীল রঙের আইসক্রিম কিনে খেতে পারল না। বড় লজ্জা ভিতরে। গর্ভবতী হলে মেয়েরা টক ঝাল খায়, আইসক্রিম খায়। টক ঝাল আইসক্রিম ভাবতেই জিভে জল আসে। অনু এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার তাড়নাতেই যেন প্রায় ছুটে গিয়ে একটা ট্যাকসি ধরে ফেলল, এবং ভিতরে ঢুকে রাস্তার নাম বলে চুপ চাপ বসে জানলায় মুখ বার করে ঘর বাড়ি, শহর, রাস্তা, দোকান, ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি, মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে একসময় একটি মানুষ শুধু, দাঁড়ি গোঁফ বিহীন মানুষ, সুভ লাজুক সুভ, গ্রাম মাঠ ফসলের মত পরিচ্ছন্ন সুভকে আবিষ্কারের নেশাতে মনের ভিতর ডুবে গেল।

বিকেল মরে আসছে, শহরে গাছপালা খুব কম। রোদের তাপ কমছে না। গাছ গাছালি থাকলে বোধ হয় এ সময়টা শীতল মনে হত। বোধ হয় এখন সুভ বসে একা একা বই পড়ছে। অথবা সুভ যদি বিকেলে কোথাও বের হয়ে যায়, সুভ যদি না থাকে ঘরে—কেমন বিচলিত বোধ করল অনু। কিছুদিন থেকে অফিস যাচ্ছে না। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছে। কি ব্যাপার ঠিক যেন এখন সব অনুমান করা যাচ্ছে না।

একটু আগে সে ট্যাকসি থেকে নেমে পড়ল। একটু হেঁটে গেলে খুব ধীর স্থির হয়ে কথা বলা যাবে, সহসা ট্যাকসি থেকে নেমে তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলে একটু হাঁফ ধরতে পারে, চোখ মুখে উত্তেজনার চিহ্ন থাকতে পারে এবং রক্তে ক্রিয়াশীল অহঙ্কার, গরিমা, ব্যক্তিত্ব, সবার ওপরে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম দিতে হবে এই ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠতে পারে। সে নেমেই ভাল করে মুখ মুছে

নিল। সে টেলিফোন করে আসেনি—করলে খারাপ হতে পারত। রেগে টঙ হয়ে আছে সুভ, অভিমান এবং অহঙ্কার নিয়ে বসে আছে। ফোনে দুবার কথা বলে দেখেছে। বৃথা চেষ্টা। কেবল চীৎকার করে অপমান করার ইচ্ছা। এবার যা ঘটে সামনাসামনি ঘটুক। সিঁড়ি ধরে উঠে প্রথমই কাজ হবে, রামচরণকে কোন কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। ঘরে অন্য কেউ থাকবে না, নিশ্চয়ই ঢুকলে সুভ প্রথম কথা বলবে না, ওকে কথা বলাতে হলে কি কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে—প্রায় সব ঠিক করে সে খুব সরল অনাড়ম্বর বালিকার মত মোড় ঘোরার মুখে ওর ফ্ল্যাটের জানালায় মুখ তুলে দেখল, জানালা খোলা, পর্দাটা উড়ছে। নতুন পর্দা, খুব ঝক ঝক করছিল। সুভ এত ফিটফাট থাকছে আজকাল। ওর আমলের পর্দাগুলো কোন জানালায় নেই, একেবারে নতুন মনে হচ্ছে সব। বারান্দায় দেখল ফুলের ভাস, ওপরে যে সব ওয়াটার প্ল্যাণ্ট ছিল, কোন তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। জানালা খোলা বলে ভিতরের কিছু কিছু অংশ রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে। সে, সব কিছু ভেদ করে সুভকে আবিষ্কারের চেষ্টা করল। কিন্তু মনে হল ভিতরে কেউ নেই। অথচ দরজা জানালা খোলা। রামচরণকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। খুব বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস নিল। বুকের ভিতর কেমন এক অসামান্য বেদনা অনুভব করল। ভিতরে ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছিল অনুর। ওর পা প্রায় সরছিল না। মানুষটা, বিকেল ভাল করে শেষ না হতেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল!

যত অনু সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠছিল তত হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। সিঁড়িটা কত বড় হয়ে গেছে, ওই সিঁড়ি যেন কত বেশী লম্বা হয়ে গেছে, কিছুতেই আর শেষ করা যাচ্ছে না। অনুর চোখে মুখে যেন সেই শুকনো ভাব—ওর বড় জল তেষ্টা পাচ্ছিল, সে যেন এই সিঁড়ি থেকে চীৎকার করে বলতে চাইল, রামচরণ তোরা কোথায় সব, সবই নতুন দেখছি, তোরা কি সব পালালি!

রাম, রামচরণ আমি এসে গেছি, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোরা কি দেখতে পাসনা, আমি এসে গেছি। রাম, রামচরণ!

পায়ের শব্দে রামচরণ রান্নাঘর থেকে উঁকি মারলে দেখল—অনু মা, আনন্দে প্রায় হাত পা কাঁপছিল। আপনি মা, আপনি। বলে সে সিঁড়িতে নেমে পিছন পিছন উঠে এল।

অনু সামনের বসবার ঘরটিতে ঢুকেই বসে পড়ল, বলল, আমায় একটু জল দে রাম। তারপর চারিদিকে একবার তাকাল ভাল করে। সব কিছুই প্রায় বদলে গেছে। এই ঘরের রুচির সঙ্গে অনুর যেন কোনদিন পরিচয় ছিল না। কিছু ছবি সব হাড়গোড় বের করা মানুষের ছবি। ফুলের ছবি দেয়ালে একটাও ঝুলছে না। অনু এবার জলটুকু খেয়ে বলল, তোর দাদাবাবু এই অবেলায়···।

অনু সবটা কথা বলতে পারল না। গলায় আটকে গেল। শুকনো ভাবটা গলায় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, সব অহেতুক ভয়, এই ভয় এতদিন কোথায় ছিল অনুর। সে নিজেকে আয়নায় দেখলে বুঝতে পারত ভয়টা বড় কুৎসিত ভাবে ওকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিছু হারাবার ভয়, কি যেন অমূল্য ধন সংসারে এতদিন ছিল অনুর, শত অপমানে যা ভাঙবার নয়, শত অপমানে যা চলে যাবার নয়, এমন এক দামী কিছু তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

রামচরণ কিছু যেন বলতে ইতস্তত করছে। আর যত ইতস্তত করছে তত অনুর ভয়টা বাড়ছে। তত অনু বেড়ালের ইঁদুর ধরার মত গুটিয়ে আসছে। ওর চোখে ঘরের হাড়গোড় বের করা ছবিগুলি নড়ে উঠছিল সব। রুগ্ন মানুষের ছবি দেয়ালের কোথাও, কোথাও এক কদাকার বন মানুষের ছবি আর এই সব ছবিই বা সে কোথা থেকে সংগ্রহ করল! অনু প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, রাম ঘরগুলো এমন হয়ে আছে কেনরে! বলে অনু উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। পায়ে অস্থিরতা ছিল। ভয় ছিল, নিশ্চিত কিছু ঘটে যাচ্ছে। সে সহসা স্থির হয়ে গেল। রামচরণ ইতস্ততঃ করছে

বেশী কথা বলছে না এবং এই সংসারে অন্যের প্রবেশ এমন কিছু ভাববার সময়ই চোখে পড়ল প্রীতির স্টেথিস্কোপ দেয়ালে ঝুলছে।

অন্নু এবার চীৎকার করে ডাকল, রাম, রাম! রাম এলে বলল, ওটা দেয়ালে কি রে! যেন সে ওর নাম ঠিক জানে না। অপরিচিত বস্তু। রাম মোটামুটি ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে। কারণ সে সব সময় এখানেই ছিল।

—ওটা ডাক্তার দিদিমণি নিয়ে এসেছিল। ওরা কোথায় গেল। ফিরতে অনেক রাত হবে।

—রাত হবে কেন রামচরণ! প্রশ্ন করার ইচ্ছা অন্নুর। অথচ কোন প্রশ্ন না করে কোমলমতি বালিকার মত কেবল স্টেথিস্কোপটা দেখতে থাকল। একবার ইচ্ছা হল গলায় ঝুলিয়ে বুকের ভিতরে যে অসহায় আর্তনাদ হচ্ছে তার শব্দ কান পেতে শোনে। কত রকমের ইচ্ছা হচ্ছিল—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখমুখ জ্বালা করছে, আর সেই অস্থির ভাব। ওরা কোথায় যায়, কতদূর যেতে পারে—এমন ঘটনা ঘটছে অথচ রামচরণ কোন খবর দেয়নি। এই কি মানুষের স্বভাব। বাবা পর্যন্ত চুপ মেরে গেছেন। তিনি জানতেন সব, কারণ বুড়ো মানুষেরা সব আঁচ করতে পারে, কারণ তিনিই একমাত্র পুরুষ সংসারে যাঁর হাতে তুরুপের তাস ছিল। সকলে মিলে এক ষড়যন্ত্র! মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল—অপমানের এই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অন্নুকে প্রায় ভিতরে ভিতরে পাগলের মত করে তুলছিল। সে কিছু না বলে রামচরণকে একটা গাড়ি ডেকে দিতে বলল।

—আপনি চলে যাবেন মামণি। সংসারটা…

পাগলের মত অন্নু এবার চীৎকার করে উঠল—আমি। স্কাউণ্ড্রেল! সংসারে এত সব হচ্ছে……বলে কাকে যে সে এই সব কথা শোনাচ্ছে কিছু বুঝতে পারল না। এবার কেমন ধীর গলায় বলল, শরীরটা ভাল নেই রাম। তারপর ভীতু গলায় বলল, ওরা কোথায় গেছে তুই জানিস রাম?

—না মা। ওরা কোথায় গেছে, যাবে, কিছু বলে যায়নি।

—কিছু বলে যায়নি!

—না মা বলে যায়নি।

—তুই আমাকে তবে ট্যাক্সি ডেকে দে রাম। বলে অনু খুব শক্ত হতে চাইল। ঘরের ভিতরে খাট ছিল, আলমারি ছিল, সবই সাজানো, নিজের হাতে সবই সাজানো, সে ওগুলো একবার ভাল করে দেখল না পর্যন্ত। সংসার থেকে চলে যাবার পর রামচরণ সব ঠিক করে রেখেছে কিনা, না সংসার আউল বাউলের মত ক্রমশ উদাসীন হতে হতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—সে দেখেও ঠিক বুঝতে পারল না। যে মানুষের জন্য আসা, যে সরল মানুষের জন্য এই সংসারে আসা, পরিচ্ছন্ন ঘাস মাঠের মত যাকে মনে মনে অনু এমন একটা জায়গায় বসিয়ে রেখেছিল—সেই মানুষ এঁদো খালের মত ছোট বড় কই সিঙ্গি নিয়ে বেশ খেলা চালাচ্ছে। ভাবতে ভীষণ বুক ফেটে যাচ্ছিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই এক ঘৃণা, কোথায় থাকে এইসব ঘৃণা, ঘৃণার জন্য নিজের উপর বিরক্ত হয়ে পড়ল অনু। কি দরকার ছিল আসার। এমন একটা ঘটনা ঘটবে যেন জানা ছিল। মাটির মানুষ সুভ রাগে অভিমানে—আর রাগ অভিমান কেন বলা, এগুলো সবই নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ, অনু, সুভকে নষ্ট চরিত্রের মানুষ ভাবতেই ভিতরের ওকটা ফের মুখে উঠে এসে থেমে গেল। চোখে মুখে কষ্টকর এক ছবি, গ্লানি অথবা বলা যেতে পারে অনু কেমন প্রতিশোধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল! মানুষটা কোথায়, কি করছে, প্রীতিকে জানতে বাকি নেই, কত কাল আগে প্রীতি দরজা খুলে বসেছিল, এখনও সেই দরজা জানালা খোলাই রেখেছে। ট্যাকসি নিয়ে রামচরণ এখনও ফিরছে না। অনুর কষ্ট হচ্ছিল। মাথা দপ দপ করছে। সোফার উপর অবসন্ন শরীরটা এলিয়ে দিল অনু। এলিয়ে দিতেই স্টেথিস্কোপ, গলায় বুকে সাপের মত প্যাঁচ দিচ্ছিল স্টেথিস্কোপটা

আর এই স্টেথিস্কোপ দেখলে, গাল গলা সহ সুভ এবং প্রীতির মুখ একসঙ্গে বাতাসের উপর ভর করে উড়ে আসছিল। ওরা উভয়ে বুঝি খিল খিল করে হাসছে। ওরা উভয়ে চোখের পাতা নাচাচ্ছে। অনু একবার ওদের অদৃশ্য হতে দেখল, একবার ওদের নগ্ন শরীর দেখতে পেল। একবার ওদের মুখে প্রেতের মত জোনাকি পোকার চোখ দেখতে পেল। এবং অনু এই সংসারের এক অদৃশ্য নাট্য প্রবাহের ভিতর ডুবে গেল। অনু অসহায় পাগলিনীর মত অদৃশ্যে দুই হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, সুভ আমি কত জলে ডুব দিতে পারি এবার একবার চেষ্টা করে দেখব। বলে সে যেন কিছুই হয় নি এমন এক ভাব দেখাল। ঘরে কেউ নেই তবু সে কিছু হয় নি এমন এক ভাব দেখাল। টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি—দেয়ালে সব হাড়গোড় বের করা ছবি—সে সেই সব বস্তুকে ঘরের জীব বলে ভেবে নিল। বলল, ছাখ তোরা আমার কিচ্ছু হয় নি। সে উঠে দাঁড়াল—টেবিল, আলমারি এবং দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর নীচে সিঁড়ি ধরে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে নেমে গেল। যেন খেলাচ্ছলে সে এই সংসারে একবার উঁকি দিতে এসেছিল—খেলাচ্ছলে সে একবার সুভ নামক এক মানুষের ঘর দেখে, চিড়িয়াখানা দেখে অথবা যাদুঘরে কোন মমির মৃত হাত-পাওলা মানুষের চেহারা দেখে সে চলে যাচ্ছে। সিঁড়ির মুখে রামচরণ। সে দেখল, অনু খুব প্রসন্ন। গুন গুন করে গান গাইছে। এবং সিঁড়ি ধরে নামছে। নেমে যাচ্ছিল অনু। সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে যাচ্ছিল। সব অহমিকা জড় করে সে মন প্রফুল্ল করার চেষ্টায় তখন গুন গুন করে গান গাইছে—কিন্তু আর পারছে না। সে ভিতরে ভিতরে অসহায় আর্তনাদের ভিতর ডুবে যাচ্ছিল।

সেদিন ফিরতে সুভাষের রাত হল খুব। সিঁড়ি ধরে উঠতে

থাকল এবং গুন গুন করে গান গাইতে লাগল। সে প্রীতিকে বেশী দূর নিয়ে যায় নি, প্রীতিকে সামান্য পথ হাঁটিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রীতির বিশ্বাস ছিল, সে অনেকক্ষণ সুভাষবাবুর সঙ্গে থাকতে পারবে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুলের যে স্তবক রয়েছে তার পাতার আড়ালে বসিয়ে, সুভাষবাবু মনোরম সব সুড়সুড়ি দেবে। বস্তুতঃ প্রীতি সুভাষের সুড়সুড়ির লোভে মাতাল রমণীর মত, অথবা সুভাষের হাতছানি পেলে বর্ষার ময়ূরীর মত নাচতে আরম্ভ করে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় প্রীতির করুণ মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রীতির ঘাড় গলা এত মসৃণ যে সামান্য উত্তেজনাতে ঘাড় গলা কাঁপতে থাকে। সুভাষ শিস দিতে থাকল। সিঁড়িতে মনে হল সামান্য অন্ধকার। আজ ওর পা বেশী টলছে। সে প্রীতিকে ছেড়ে দেবার সময় বলেছে, ডাক্তার একটা ভুল হয়ে গেল।

প্রীতি বলেছিল, কি ভুল।

—ভাবলাম এক সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা হৈ চৈ করে বেড়াব।

—এইত ঠিক ছিল।

—কিন্তু কি জানেন ডাক্তার প্রীতি আমি আমার একটা জরুরী এপয়েন্টমেণ্টের কথা একেবারেই ভুলে গেছি।

—অঃ। প্রীতি তার ঘাড় গলা গাড়িতে বসে মুছে ফেলল। তারপর বলল, অন্ততঃ চলুন একটু ময়দানে হাঁটি।

সুভাষ ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, আধঘণ্টা সময় আমি আপনার সঙ্গে আর থাকতে পারছি প্রীতি।

প্রীতি কিছু বলল না। যেন এই আধঘণ্টা সময়ই প্রীতির কাছে বড় অমূল্য সময়। প্রীতি নিজেই গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিল। খোঁপাটা একটু উপরে তুলে দিল, দুটো কাঁটা দুদিকে বেশী গুঁজে দিল অর্থাৎ খোঁপাটাকে আরও তীর্যক করে গ্রীষ্মের এই আলো বাতাসকে এবং এও হতে পারে দ্যাখো দ্যাখো আমি প্রীতি, এক যুবতী প্রীতি—

যার ঘাড় গলা মসৃণ, যার শরীরে সিল্কের শাড়ি নরম পদ্মপাতার মত কোমল এবং মনে হয় বুঝি শরীরে সুবাসিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়, প্রীতি হাসতে-হাসতে কামগন্ধ নাহি তায় এমন এক শরীর নিয়ে গ্রীষ্মের আলো বাতাসের ভিতর চুপ করে ডুবে গেল।

কোথাও কোন ফুল ফুটেছিল, কোথাও কোন পাখি ডাকছিল আর কোথাও কোন হিসাবের কড়ি ভুল-গোনা হচ্ছিল, প্রীতি হিসাবের কড়ি ভুল গুনে দেমাকে প্রায় পা পড়ে না, সুভাষ তুমি সামান্য যুবক, যুবতী অনুর তুমি শাঁখা সিঁদুরের হকদার আর আমি অনুর বান্ধবী, আমাকে তুমি আর কতদূর নিয়ে যাবে, অথবা বলার ইচ্ছা প্রীতির এই যে সব যুবকেরা রয়েছে, যুবতীরা রয়েছে, তারা কি কেবল অসুরের মত মহিষমর্দিনীর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে চায়! বিজয়িনীর মত প্রীতিকে দেখলে তখন তাই কেবল মনে হত।

সুভাষ শিস দিচ্ছিল আর পা টিপে টিপে উঠছিল। ঠিক ওপরে মনে হল কুকুরেরই মত কে যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। অধিক রাত, কে এই বারান্দায় সিঁড়ির মুখে শুয়ে আছে। সুভাষ একটু দাঁড়াল, তারপর নুয়ে দেখবার সময়ই মনে হল কুণ্ডলী পাকানো জীবটা ধরফর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। খুব সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। সে উঠেই দরজা খুলে দিল। মানুষটা ওকে ধরে ফেলল, এবং ভিতরে নিয়ে সোফাতে বসিয়ে পাখা চালিয়ে দিল।

সুভাষ এবার হেঁকে উঠল—কে তুমি।

রামচরণ কোন কথা বলল না। সে অনেক রাত পর্যন্ত প্রভুটির জন্য জেগে থাকতে পারে নি। সিঁড়ির মুখে বসে বসে কখন ঘুম এসে গেছে, কখন এই নিঃসঙ্গ মানুষ সিঁড়ি ধরে উঠে এসেছে ঠিক খেয়াল করতে পারে নি। সে উত্তর না দিয়ে সুভাষের জুতো খুলে দিচ্ছিল। কারণ উত্তর দিলেই যেন চেঁচামেচি বেড়ে যাবে। সে

চুপচাপ থাকলে ফের সুভাষ ধমকে উঠল, কে তুমি কথা বলছ না! বলে ওক্ মত একটা শব্দ করল।

রামচরণ খুব বিব্রত বোধ করছে। সুভাষ এই প্রথম মাতাল হয়েছে, এবং মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে। এর আগে সুভাষ সামান্য মাতাল হয়ে মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরেছে, রামচরণ সেটা টের পেয়েছে, কিন্তু সুভাষের ব্যবহারে এতটুকু ত্রুটি ছিল না। সে ঠিক একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের মত থেকেছে। সে নিজেই চেষ্টা করেছে যাতে রামচরণ ওর সামান্য পানীয়ের গন্ধটুকু পর্যন্ত না পায়। সে সেজন্য চুরুট কিনে রাখত, বাড়ি ফিরে চুরুট টানত, এবং বেশী চলাফেরা করলে পা টলার দরুণ রামচরণ টের পেয়ে যেতে পারে, রামচরণ টের পেলে বড় অসম্মানের কারণ হবে- সেজন্য ফিরে বেশী সময় টেবিলে বসে থাকত না, রামচরণকে ছুটি দিয়ে নিজে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত।

রামচরণ কিছুক্ষণ অসহায় মানুষের মত সুভাষের দিকে তাকিয়ে থাকল। একজন জলে ডোবা মানুষ যেন এই সুভাষ, কোথায় কি এক অভিমান আছে, কি এক অহঙ্কার আছে, যে অহঙ্কারের বোঝা বয়ে মানুষটা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই অভিমান এবং অহঙ্কারের জন্য মানুষটা বিকেলে আর বাড়ি থাকে না। মামণি আজও এ-বাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু কেন জানি, তিনি কি দেখে আঁৎকে উঠেছেন। এতক্ষণে যেন রামচরণের মনে হল দেয়ালে প্রীতি দিদিমণির স্টেথিস্কোপ ঝোলানো দেখে টের পেয়েছে—প্রীতি, ডাক্তার প্রীতি, এখন এ-বাড়ির ঘরের বিবির মত ব্যবহার পাচ্ছে। যেমন এসেছিলেন, তেমনি তড়বড় করে নেমে গেলেন। রামচরণ পায়ের মোজা এবং জুতো খুলে দেবার সময়ই বলল, সন্ধ্যার সময় মামণি এসেছিলেন।

সুভাষ মুখটি বেঁকিয়ে দিল। এত নেশার ভিতরও সে অনুর মুখটা হুবহু মনে করতে পারল। ফের ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

ভিতরে ভিতরে সে এত উত্তেজিত যে সে আর সামলে রাখতে পারল না নিজেকে। চীৎকার করে বলে উঠল, নটি! ব্যাশ্চা!

পাশের ফ্ল্যাটের কুকুরটা চীৎকার করে উঠল, এবং যারা প্রতিবেশী তারা দ্রুত জানলায় মুখ বের করে দিল। রাত গভীর। খুব বেশী রাত করে ফেরার অভ্যাস এমনিতেই সুভাষের নেই। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে হেঁটে চলে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

অনু এসেছিল, দরজা বন্ধ করার সময় কথাটা মনে হল। কেন এসেছিল, কি কারণে এসেছিল—বুঝি কোন কারণ, বিজ্ঞাপনে ছবি—অনুর জেদ সে সেই অসীম নামক যুবকের সঙ্গে মাঠে ঘাটে ছবি তুলবে—তারপর সেই ছবি পর্দায় ভেসে মানুষের অনন্ত দুঃখ এবং সুখের সাক্ষী থাকবে—বোধ হয় তেমন কোন খবর দেবার জন্য এসেছিল। বুঝি অনু জানাতে চেয়েছিল, বদ্ধ জলাশয়ের মত অনু বাঁচতে আর রাজী নয়।

নেশা করলে মানুষের যা হয়। নেশা করলে মানুষের মনে হয়, পৃথিবীর সব কিছু এক গোলক ধাঁধার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গোল গোল মুখ মানুষের সাদা লম্বাটে হয়ে যায়। চোখগুলো ছোট বড় হয়ে যায়। পার্কের গাছগুলো বড় বড দৈত্য হয়ে যায় আর মনে হয় তখন কলকাতার বুকের ওপরে গঙ্গা, গঙ্গা তার সব জলরাশি নিয়ে মনুমেণ্টের ওপরে উঠে বুঝি নাচছে। ঠিক নটি অনুর মত। অনু বিবাহিত জীবনে মা হতে গিয়ে কেমন আত্মসমর্পণ করে দিল—আমি সুন্দরী, আমি অভিনয়ের জন্য পাগল, আমার নাম যশ হবে, নামযশের গোড়ায় বালি দেবার জন্য তুমি সুভ, স্বার্থপর সুভ আমাকে আমার অজ্ঞাতে মা করে ফেললে।

অথবা ওর ভেতরে সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা উঁকি দিতে থাকল। নেশা হলে বুঝি তাও হয়। সব দুঃখ কষ্টের স্মৃতি মনের ভেতরে কেবল ভেসে বেড়ায়। সুভাষ বিছানার ওপর পড়ে থেকে ভাবল,

পা টিপে টিপে এতদিনে একটা দৈত্য তার ভালবাসার সব জগৎকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

গরমের জন্য ওর হাঁসফাঁস করা বেড়ে গেল। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। জানালা খোলা এবং দেবদারু গাছে রাতের সামান্য জ্যোৎস্না লেগে আছে। ওর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না অথচ ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল। দরজা জানালা খুলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এবং ফোন তুলে ডায়াল করে জানার ইচ্ছা বাপের বাড়িতে সেই নটি এখন কি করছে। অথবা বাড়িতে এক প্রৌঢ় মানুষ আছেন, মানুষটির কাছে তার নালিশ, সে যেন এই মুহূর্তে সেই প্রৌঢ় মানুষটির কাছে থাকলে পা মুড়ে পায়ের কাছে বসে পড়তে পারত এবং বলতে পারত, বলুন আমার কি অপরাধ। আমি সামান্য এক জলাশয় চেয়েছিলাম, সেই জলাশয়ে একমাত্র আমিই অবগাহন করব, অন্য মানুষের সামান্য প্রতিবিম্ব পড়ুক সেই জলাশয়ে তা পর্যন্ত চাইনি। কারণ আমার ভালবাসার জলাশয়ে অন্য যে কোন প্রতিবিম্ব আমাকে বড় ছোট করে দেয়, ক্ষীণ করে দেয়।

হাত পা অসাড়। পাশ ফিরতে পর্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে না। কেমন ভোঁতা ভোঁতা লাগছে সব। কোন স্মৃতিই অতল থেকে উঠে আসছে না। এই ঘরে প্রীতি এসেছিল বিকেল বেলা। প্রীতি ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং প্রীতি যেন সব সময় ঝুঁটি উঁচু করেই রেখেছে, শুধু সামান্য হাওয়ার প্রয়োজন। হাওয়া পেলেই উত্তরের মুরগি দক্ষিণে ঘুরে যাবে, এবং কক্ কক্ করে ডেকে উঠবে। সুভ কিন্তু সেই হাওয়ায় যখনই প্রীতি উড়তে চেয়েছে— দে ছুট গোছের সব ফেলে সে অন্য কোন কাজের অছিলা করে ময়দানের অন্য কোন গাছের ছায়ায় চলে গেছে। যেখানে মানুষজন আছে, অথবা প্রীতির বাড়ির কথাই ধরা যাক, প্রীতি কিছু এঞ্জেল মাছ পুষে রেখেছে। প্রীতি অনেকদিন সুভকে এঞ্জেলমাছ দেখাবে বলে দোতালায়

ওর নিজস্ব ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, এবং বলেছে সেই এক কথা, ওপরে চলুন, একোরিয়ামে আপনাকে দুটো মাছ দেখাব।

—আজ থাক প্রীতি। সুভাষ এই বলে প্রীতিকে ঠেকিয়ে রেখেছে, এই বলে সে উত্তরের মুরগিকে দক্ষিণে ঘুরে যেতে দেয় নি।

—মাছ দেখতে আপনার ভাল লাগে না সুভাষবাবু, বড় আশ্চর্য।

—খুব ভাল লাগে প্রীতি। এই বলে সে তার নিজের জলাশয়ে একটা এঞ্জেল মাছ ছেড়ে দিতে চেয়েছিল।

—এঞ্জেল মাছ দেখে আমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি।

—দুদিন বাদে আমিও পারব প্রীতি। বোধ হয় আরও কিছুদিন সুভ প্রতীক্ষার জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিল প্রীতির কাছ থেকে অথবা এও হতে পারে সংসারে সকলেই আশায় ঘর বেঁধে বসে থাকে। নির্মাল্যের মত সব আজ হোক, কাল হোক, নির্মল হয়ে যাবে, পূজার ফুল ফল, চন্দনের মত ফের আবার সৌরভ ঘরময় ছড়িয়ে পড়বে। তখন আর কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নয়, শুধু সুখ এবং সৌরভ। সেই সৌরভের প্রত্যাশায় সুভাষ ফোনের কাছে উঠে গিয়ে ডায়াল করল। কিন্তু একি! ডায়ালে অনু কথা বলছে না, প্রীতি কথা বলছে। সে বলতে চাইল প্রীতি আপনি কেন? সে বলল, অনু আছে?

—কে আপনি?

—আমাকে চিনতে পারছ না অনু।

—আমি অনু নই সুভাষবাবু, আমি প্রীতি।

—না আপনি অনুই। আমি ভুল করি না অনু।

—আপনি আজ, আজ আবার মদ খেয়েছেন।

—খেয়েছি। মদ খেয়েছি।

—আপনি যে বললেন, আপনার কি একটা জরুরী কাজ আছে, আপনি আমাকে একা ফেলে চলে গেলেন।

—আপনাকে আমি একা ফেলে চলে গিয়েছি। ছিঃ ছিঃ কি করেছি বলুন তো! আর কখনও এমনটি হবে না। আমি তিন সত্যি করছি।

প্রীতি এবার নরম গলায় বলল, আপনি ঘুমোতে যান। রামচরণ কি করছে।

—রামচরণ কিছু করছে না। সে শুয়ে বেড়ালের মত নাক ডাকাচ্ছে।

—আপনি কখন ফিরলেন!

—এই কি বলছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলেন, এখন দেখছি অনুর ফোন নাম্বারটা আমি ভুলে গেছি। আপনার ফোন নাম্বারটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। বলতে বলতে আবার সব বেমালুম গোলমাল করে ফেলল।

প্রীতির খুব কষ্ট হচ্ছিল। একজন খুব সৎ মানুষ অবিশ্বাসের ভিতর ডুবে গেল যা হয়, সুভাষবাবুর এখন সেই অবস্থা। সে ফোনেই সমবেদনা জানানোর জন্য নানাভাবে ছল চাতুরী খেলতে থাকল, কিন্তু সুভাষ সেই যে ধরে রেখেছে, না অনুই এখন প্রীতির গলায় কথা বলছে, অনু নটি, অনু সব পারে, অভিনয়ে পটু অনু সব পারে, বিশেষ করে বেতারে অনু যে সব নাটক করে, সেই নাটকে অনুর গলার স্বর কখনও স্বাভাবিক হয় না, সে অনু যেন অন্য অনু, তেমন অনুর সঙ্গে সুভর কোনদিন পরিচয় ছিল না, বোধ হয় অনুই এখন প্রীতির গলার মত ঢং করে কথা বলছে। কারণ আজই সন্ধ্যায় এসে জেনে গেছে সুভাষ প্রীতির সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে রামচরণ বলেনি, কিন্তু দেয়ালে প্রীতি ভুলে স্টেথিস্কোপ রেখে গেছে, ভুলে কি ইচ্ছা করে রেখে গেছে কে জানে। এখন মনে হল প্রীতি ইচ্ছা করেই এমন একটা কাজ করেছে। অনু সব দেখে শুনে জেদের বশে তার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করছে।

সুভ এবার চীৎকার করে বলল, অত রসিকতা কেন!

প্রীতি বলল, সুভাষবাবু দোহাই ঘুমোতে যান।

—আমি সব বুঝি। তুমি ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না, তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করে পার পেতে চাও। বলে অসীম কেমন চিঁচিঁ করে কথা বলে অনুকে ঠেস দিতে চাইল।

এমন একটা বিকৃত গলার স্বর শুনে প্রীতি না হেসে পারল না।

—তুমি হাসছ অনু! আমি অসীমের মত কথা বলতে পারছি না বলে তুমি হাসছ।

—প্রীতি বলল, আপনি যদি অবুঝ হন তবে আমি চলে আসতে বাধ্য হব।

—এলে কোন ক্ষতি হবে না অনু। আমার ঘরে আমি একা, কেউ নেই। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—সুভাষবাবু আমি অনু নই, আমি প্রীতি কথা বলছি।

—বলুন না। বলতে ত আমি বাধা দিই নি।

—ছিঃ ছিঃ সুভাষবাবু আপনি এত মাতাল।

—মাতাল আমি! তুমি আমাকে মাতাল বললে। বলে সে ধপ করে রিসিভারটা নীচে নামিয়ে রাখল তারপর ডানদিকে বারান্দার দরজা খুলে বেলকনিতে সটান শুয়ে পড়ল। বোধহয় পরে আর হুঁস ছিল না মানুষটার! রাতের জ্যোৎস্না দেবদারুর মাথায়। আকাশ পরিচ্ছন্ন। কিছু নক্ষত্র জ্বলছে। পার্কের ভিতর কিছু অন্ন বস্ত্রহীন মানুষ ঘোরাফেরা করছে আর তখন দূরে একটা নীল আলো জ্বলছিল। কোথাও একটা ট্রেন ছুটে যাবার পথ ক্লিয়ার পেয়েছে। আর কি ছিল রাতের নগরীতে, ছিল সেই যুবতী অনু, যে সন্ধ্যায় দেখে গেছে সুভাষ একজন অন্য যুবতীকে নিয়ে কোথায় কোন ময়দানের উদ্দেশ্যে চলে গেছে! যুবতী দুঃখে হতাশায় ঘুমোতে পারছিল না। সেও বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আকাশের নক্ষত্র দেখছিল।

বেশ বেলা করে আজ সুভর ঘুম ভাঙল। দুবার রামচরণ কড়া নেড়ে গেছে। সাধারণত সুভর সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস। কিন্তু রামচরণ ধরেই নিয়েছিল—বাবু যখন রাত করে ফিরেছেন এবং ভালমানুষ সুভ যখন মদ্যপান করে ফিরেছে তখন বেলা করে ওঠা স্বাভাবিক।

দরজা খুলতেই রোদটা এসে সুভর মুখে পড়ল। ভিতরের অন্ধকারটা কেমন সহসা চলে গেল। গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা সে মনে করতে পারল। সে বাথরুমে ঢুকে গেল না, কেমন আলস্য শরীরে, এবং হাতে পায়ে ব্যথা। শরীরটা বড্ড বেশী ম্যাজ ম্যাজ করছে। সে সামনের বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। নীল রঙের বেতের চেয়ার। ছোট একটা ফুলের ভাসে রামচরণ কিছু রজনীগন্ধা রেখে গেছে। এসব কে করছে এখন বোঝা দায়। অনুর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না কত দীর্ঘদিন থেকে, অনুর সঙ্গে কেবল বচসা হচ্ছে, গতরাতে কি সব কথা বলে ফোনে অনু সুভকে গালাগাল করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য কি করে জেনে ফেলেছে সুভ প্রীতির সঙ্গে বেড়াতে গেছে! মনে হতেই ব্যাপারটা বড় বেশী তিক্ত মনে হল মুখটা। মুখের ভিতরে বাসি গন্ধ লেগে আছে। অথবা মুখে দুর্গন্ধ রয়েছে কিনা পরখ করার জন্য সে তার দুই হাতের ওপর শ্বাস ফেলল, এবং নাকটা চেপে রেখে বুঝল এখনও পাকস্থলিতে মদের গন্ধ। সে তার মুখে মদের বিস্বাদের মত গন্ধটা দূর করে দেবার জন্য টুথব্রাসে পরিমাণে বেশী পেষ্ট লাগাল। এবং দাঁতে ব্রাস দেবার মুখেই দেখল দেয়ালে ডাক্তার প্রীতির স্টেথিস্কোপ ঝুলছে। প্রীতি গত বিকালে ভুল করে স্টেথিস্কোপ ফেলে গেছে। ভুল করে কি ইচ্ছা করে কে জানে। সুভ সামান্য হাসল। তারপর স্টেথিস্কোপটা দু আঙুলে ধরে নীচে ফেলে দিল। কেমন একটা

ঘেন্না ঘেন্না ভাব। প্রীতির অহমিকা, প্রীতির দুর্ধর্ষ শরীর, লম্বা তেজী ঘোড়ার মত শরীর এবং ঘাড় গলা এত মসৃণ যে মনে হয় শুধু সামান্য স্পর্শ করা, স্পর্শ করলেই এক অঘটন ঘটে যাবে—অহমিকার সব বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। শরীরে মনে অথবা রক্তের ভিতর নূতন এক স্বাদ—দীর্ঘকাল ধরে যে স্বাদ শরীর বহন করার জন্য মাতাল—যার জন্য নিজের শরীরে সে কতকাল থেকে নিজেই কপিকল লাগিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন হলে সে তার কপিকলটা শরীরে ঝুলিয়ে দিয়ে রক্তের ভিতরে মানুষের স্বাদ, মানুষের জন্ম নেবার কৌশলের কৃত্রিম স্বাদে বিভোর হয়ে থাকে। আর এখন সুভ, কালো রঙের ঘোড়ার মত লম্বা তেজী ঘোড়া—ফাঁকা মাঠ পেলেই যে দৌড় দেবে, সেই সুভকে কাছে পাবার লোভে এবং ছল চাতুরি করে আসার লোভে এই স্টেথিস্কোপ ফেলে যাওয়া। সুভ ফের হাসতে হাসতে নীচু থেকে প্রায় দু আঙ্গুলে যেন কোন পচা দুর্গন্ধযুক্ত পোকা মাকড় অথবা বিড়াল ইঁদুর তুলে ধরেছে তেমন আলগাভাবে স্টেথিস্কোপটা চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখল। কালো রঙের স্টেথিস্কোপ সে নিজের কানে লাগাল এবং বুকের উপর লাগিয়ে বুকের ভিতর ধুকপুক শব্দ, ভীষণ শব্দ, যেন একটা কল লাগানো পাখি ভিতরে, পাখিটা লেজ তুলছে নামাচ্ছে। রামচরণ ঘরে ঢুকতেই সুভ নিজের এই ছেলেমানুষীর জন্য কেমন লজ্জা পেল। সে তাড়াতাড়ি স্টেথিস্কোপটা রামচরণের হাতে দিয়ে বলল, যদি প্রীতি দিদিমণি আসে দিয়ে দিবি। আমি ভাবছি এক্ষুণি বের হব।

রামচরণ বলল, কাল মা-মণি এসেছিলেন।

—সে ত বলেছিস। এক কথা বার বার কেন?

রামচরণ ভেবেছিল গতকাল বাবুটি মদে অসুস্থ ছিলেন, ওর কথা হয়ত ধরতে পারেনি, তাছাড়া নেশার ঘোরে কি বলতে কি শুনেছেন ভেবে সে ঢুকেই আবার প্রসঙ্গ ফের টানতে চাইল। কিন্তু বাবুটি সব খেয়াল রেখেছেন, নেশার ঘোরে মানুষটি আপন ভালবাসার ধনটিকে

ভুলে যাননি। তবু রামচরণ ঘর থেকে নড়ল না। সে বলল, আপনি কোথায় যাবেন ?

—দেখি কোনদিকে যাওয়া যায়।

রামচরণ এই হেঁয়ালি কথা আরও শুনেছে। যেদিন ভোরে বের হয়ে যান সেদিন আর দুপুরে তিনি ফেরেন না। রাতে, প্রায় অধিক রাতে তিনি ফেরেন।

রামচরণ বেহায়ার মত বলল, দুপুরে না ফিরলে আমার একার জন্যে রান্না করে কি হবে। আমি কোথাও খেয়ে নেব।

—তাই করিস। সেই ভাল। বলে বাথরুমে ঢুকে গেল সুভাষ। দাড়ি কামাল। আয়নায় নিজের মুখ দেখল। রাতে ঘুম হয় নি। চোখের নীচটা মরা কবুতরের চামড়ার মত দেখাচ্ছে। সে ঘসে ঘসে চোখের নীচটা তাজা কবুতরের চামড়া করার চেষ্টা করল। চোখের কোনে একগাদা পিঁচুটি, উসকো খুসকো চুল এবং পেটের নীচে ভয়ঙ্কর ভার। এখন সব লাঘব করতে পারলে শরীর হালকা হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা মুখ এই বড় আয়নায় ভেসে উঠলে মনে হল প্রীতিরও এখন প্রায় এই দশা। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। সারারাতের অবসন্ন প্রীতি এখন বোধহয় সামান্য ঘুমোচ্ছে। গতকাল প্রীতিকে সে নানা রকমের লোভ দেখিয়েছিল, প্রায় খেলার ছলে প্রীতিকে সে রেমপার্ট পার করে দুর্গের পাশে বসতে বলেছিল, অথবা স্মৃতিসৌধের পাশে বসে যখন প্রীতির মুখে লালসা, ভয়ঙ্কর লালসা, প্রায় ঢোক গিলতে পারছিল না তখন সুভাষ ওকে ফেলে কাজের অজুহাত দেখিয়ে চলে এসেছে। সুতরাং রাতে ঘুম না হবারই কথা।

সুভাষ বাথরুম থেকে বের হয়ে তোয়ালেটা রোদে দিয়ে দিল। গাল খুব মসৃণ, একটু ক্রিম ঘসে ঘসে মাখল গালে। ডিম সিদ্ধ, দুটো পাঁউরুটির টোষ্ট রেখে গেল রামচরণ। গরম চায়ের গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। সুভ রামচরণকে ডেকে ওর দুপুরের খাবারের

জন্য পয়সা দিল। সে চা খেতে খেতে কাগজ দেখল। অভ্যাসের মত কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে রামচরণকে বাকি টুকিটাকি কাজ সেরে চলে যেতে বলল। সে যাবার সময় তালা দিয়ে যাবে। কেউ এসে উৎপাত করুক—এটা ওর ইচ্ছা ছিল না। বিশেষ করে গতকাল অনু এসে গোলমাল করে গেছে, অনুর কথা মনে হলেই ওর ভিতর থেকে তেতো জল গলা বেয়ে ওঠে। গত রাতে অনু ওকে মাতাল বলেছে ফোনে। সুভ এবার কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিল।

রামচরণ চলে গেলে সুভাষ বের হয়ে গেল।

একদিন গেল, দুদিন গেল অথচ প্রীতি স্টেথিস্কোপ নিতে এল না। দু সপ্তাহ গেল, প্রীতি স্টেথিস্কোপ নিতে এল না। চাবিটা কোন কোন দিন সুভ সঙ্গে নিয়ে যায়, কোনদিন রামচরণের কাছে থাকে। যেদিন মনে হয় প্রীতি স্টেথিস্কোপটা নিতে আসতে পারে সেদিন চাবিটা রামচরণের কাছে দিয়ে যায়। যেদিন মনে হয় আসবে না সেদিন চাবিটা সে নিজেই নিয়ে যায়। ওর ঠিক থাকে না সে কোথায় যাবে। সে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের খুঁজে বের করছে। বৃদ্ধ কোন আত্মীয় স্বজন থাকলে দেশের গল্প করে তার সময়টা কেটে যায়। কোন কোন দিন সে চুপচাপ গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে বসে থেকে। পাখিদের কলরব শোনে—আবার কোনদিন ভাড়া গাড়িতে সে কোন পল্লী অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। সেই গ্রাম্য এক ছবি—ধান ভরা মাঠ, এবং ফসলের ক্ষেত দেখার ইচ্ছা হয় সুভর। বস্তুত অনুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর কেমন এক অন্তর্দাহে পুড়ে যাচ্ছিল সে। এই অন্তর্দাহ তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সে বই নিয়ে বসেছে, মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেছে, এবং ভেবেছে সারাদিন সে কোথাও যাবে না, ঘরে বসে বসে শুধু পড়াশুনা করবে। বইয়ের ভিতর ডুবে যাবে। কিন্তু হায়

সুভ, অসহায় সুভ এখন এক অস্থিরচিত্ত পুরুষ। সে সব বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ভেবেছে পথে বের হলে শান্তি। সে পথে বের হয়ে গাছ পাখি এবং কোন কোন সময় ট্রামগাড়ি, মানুষ জন, দোকান পাট দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করেছে! কিন্তু সেই এক মুখ, অনুর মুখ, ভালবাসার মুখ ওকে বার বার তাড়না করেছে। অনুর বান্ধবী প্রীতি, ডাক্তার প্রীতি যে সামান্য ট্যাবলেট দিয়ে অনুর সন্তানকে জখম করতে পারে নি, যে সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে বলে প্রায় স্থির নিশ্চিত এবং যে জন্মকে অনু অস্বীকার করে হাওয়ায় ফুরফুরে পাখি হতে চেয়েছিল সেই অণু এখনও সুভকে তাড়না করছে।

রাতে ফিরে সেদিন সুভ রামচরণকে প্রায় প্রতিদিনের মত প্রশ্ন করেছিল, প্রীতির কথা, প্রীতি এসেছে কিনা। রামচরণ প্রায় প্রতিদিনের মতই উত্তর করেছে, না আসেনি। সুভ ভিতরে ভিতরে কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। সে নিজে আর স্থির থাকতে পারল না। মেয়েদের জিদ ভীষণ। সুভাষ ভেবেছিল প্রীতি ছল ছুতো করে স্টেথিস্কোপটা নিতে আসবে, এই ছল ছুতোর জন্যই সে ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। কিন্তু দু সপ্তাহের উপর হতেই ওর মনে হল প্রীতি হয়ত ওর স্টেথিস্কোপটার কথা ভুলে গেছে। সে প্রীতির বাড়ির নাম্বারে ফোন করল। এখন রাত, নিশ্চয়ই প্রীতি ডিসপেনসারিতে নেই। বাড়ি ফিরে গেছে। সে ফোন করলে মনে হল প্রীতির গলা নয়। অন্য কেউ কথা বলছে।

—ডাঃ প্রীতিকে চাইছি। সুভ কোমল গলায় বলল।

—তিনি ত এখন ফেরেননি!

—কখন ফিরবেন?

—কলে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক বলতে পারছি না।

—আপনি···

—আমি ওর মা।

—অঃ আচ্ছা। শুনুন, বলবেন, সুভাষ, আমি সুভাষ কথা বলছি।

—সুভাষ!

—হ্যাঁ, সুভাষ বললেই চিনতে পারবে।

—আর কিছু বলবেন?

—না। আপনার শরীর কেমন?

—আমি ঠিক···ও পাশের কণ্ঠ সুভাষকে চিনতে না পেরে ইতস্তত করছিল।

—আমি অনুর বর। অনু, প্রীতির সঙ্গে পড়ত।

—অহঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি অনুর বর। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ত আমাদের বাড়িতে দু' একবার এসেওছিলে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। বলে সুভাষ কৃতার্থ হবার ভঙ্গীতে ফোনের ওপর মুখ রাখল।

—এলে, আমি তোমার কথা বলব। বলে, তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

এবং পরদিন সকালেই প্রীতি এসে উপস্থিত। তখন সুভাষ রামচরণকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। শরীর ভাল লাগছিল না, জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে, তবু কেন জানি আর এই ঘর ওর ভাল লাগছে না। বড় খাঁ খাঁ করছে। যত্র-তত্র ঘুরেও কোন সুখ নেই। ঘরে ফিরে আসার কি এক আকর্ষণ যেন। কেবল কেন জানি মনে হয় অনু আজ হোক কাল হোক সব অহঙ্কার ভুলে তার কাছে চলে আসবে। দীর্ঘদিনের এই ব্যবধান আজ হোক কাল হোক অনুকে কাতর করবে। মনে হত, ওর বার বারই মনে হত, যখন সে একা একা কোন বার অথবা ময়দানে চুপচাপ বসে থাকত—মনে হত অনুকে সে গিয়ে দেখতে পারে, অনু ঠিক আগের মত ওর প্রতীক্ষায় বসে আছে, অনু ওর ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এসেছে। কিন্তু প্রতিদিন সেই এক ঘটনা। রামচরণ বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে, ঘর অন্ধকার।

সে ঘরে ঢুকলে আলো জ্বলবে ঘরের ভিতর। সব আসবাবের সৌখীনতার জৌলুস ঝেড়ে মুছে রামচরণ বাড়িয়ে দেবে—এতক্ষণ ফ্ল্যাটটা অন্ধকারের ভিতর ডুবে ছিল, ওর আসার মুহূর্তেই ঘরে লাল নীল বাতি জ্বলে উঠল। এমনি হচ্ছিল কিছুদিন থেকে, যত এমন হচ্ছে তত অন্য এক সরোবরে কেমন পদ্ম ফুল ফুটে আছে দেখার বাসনা। গতকাল ফোনে প্রীতির খবর নিয়েছিল সেজন্য। প্রীতি যে প্রীতি সে পর্যন্ত না ডাকলে সাড়া দেয় না।

প্রীতিকে দেখেই সুভ বলল, একটু দেরী করলেই আর পেতেন না। বের হয়ে পড়তাম।

—কোথায় যান?

—কোথায় আর যাব!

—ফোন করে করে ত হয়রান।

—কেন বলুন ত!

—রোজ দুপুরে বিকেলে ফোন করেছি। কারো সাড়া নেই। কেবল ফোন বেজেই চলেছে।

—চুপচাপ—একা একা বাড়ি বসে থাকতে ভাল লাগে না।

—এভাবে আর কতদিন চালাবেন।

—যতদিন চলে।

—এভাবে বেশীদিন চলে না সুভাষবাবু।

—মনে হয় আপনি আমাকে শাসন করতে এলেন।

—চোখ-মুখ দেখে ভাল লাগছে না। রামচরণ কই?

—বের হয়ে পড়ব বলে রামচরণকে ভাগিয়ে দিয়েছি।

—খুব ভাল করেছেন। বলে হাতের ব্যাগটা সে ছুঁড়ে একটা শোফার উপর ফেলে দিল। তারপর নিজের হাতে কি দেখল প্রীতি, নিজের পোষাক দেখল, লম্বা প্রীতি আজ সাদা মখমলের কাপড় পরেছে, প্রীতি ঘন সবুজ অথবা মনে হয় টিয়াপাখি রঙের ব্লাউজ পরেছে, চটি রঙ মিলিয়ে এবং হাতের কব্জিতে ঘড়িটা পর্যন্ত রঙ

মিলিয়ে পরা। ঠিক অশ্বের দানাপানি খাবার মত মুখ এখন প্রীতির। প্রীতি আলস্যে প্রায় গা এলিয়ে দিল।

সুভ দেয়াল থেকে স্টেথিস্কোপটা এনে প্রীতির সামনে রেখে দিল। বলল, এটা ভুল করে সেদিন ফেলে গিয়েছিলেন।

—ভুল করে ফেলে যাইনি। আপনার কাছে আসার সময় ওটা গলায় ঝুলিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বেড়াতে বের হতে গেলে এটা নিশ্চয় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারি না।

সুভ কোন কথা না বলে বের হবার জন্য প্রায় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সে জানালা বন্ধ করে দিল, এখন একদিকে দরজা শুধু খোলা। ওটা বন্ধ করে দিলেই এই ফ্ল্যাটের প্রায় শেষ আলো আসার পথটুকু বন্ধ হয়ে যাবে। প্রীতি বেশী সময় বসে থাকতে পারল না। দেখল দরজা জানালা প্রায় দিকের বন্ধ। সে উঠে দাঁড়াল এবং পূবের আর পশ্চিমের জানালা খুলে দিয়ে ফের এসে সোফাতে বসে পড়ল। সে একবার সুভাষের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বস্তুত এখন দেখলে প্রীতিকেই এ বাড়ির লোক বলে মনে হয়। যেন প্রীতি দীর্ঘদিন পর তীর্থযাত্রা সেরে বাড়ি ফিরছে। সে শ্রান্ত, সে চুপচাপ জানালা খুলে দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বিশ্রাম করছে।

সুভ বলল, কাল আপনাদের দিকে যাব।

প্রীতি উত্তর করল না।

—আজ ভেবেছি একবার মামার কাছে যাব।

প্রীতি হাই তুলল একটা।

—আপনি এমন অসময়ে এলেন?

—না মশাই আমি ঠিক সময়েই এসেছি। আপনার বের হওয়া চলবে না। বলে হুমদাম সে দরজা জানালা সব খুলে দিল। কলের জল তুলে এনে রেখে দিল। ভাঁড়ারে ঢুকে দেখল কি কি আছে। ভাঁড়ার একেবারে ফাঁকা। গ্যাসের উনুনটা জ্বেলে দেখল—কেমন

জ্বলছে। মানুষটার চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না—যেন এক্ষুনি প্রীতিকে খেয়ে ফেলবে। প্রীতির এই বাড়াবাড়ি সুভর বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না। সে বলল, আপনি অনর্থক আমার সঙ্গে দুঃখ ভোগ করছেন প্রীতি।

প্রীতি এবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে দুটো বাজার এনে দেবেন!

—প্রীতি। সুভ দৃঢ় গলায় ডাকল।

—বলুন।

—ঘরগুলো এখন কত বড় দেখাচ্ছে দেখছেন?

—দেখছি।

—জানালাগুলো?

—দেখছি।

—একটা মানুষ, ভালবাসার মানুষ না থাকলে কত ছোট মনে হয় এই জানালা দরজা, আপনি বুঝতে পারবেন না।

প্রীতি এবার কোমল গলায় ডাকল, সুভাষবাবু।

—বলুন।

—রোজ রোজ এই যে বের হয়ে যাচ্ছেন কার জন্য?

—জানি না। কার জন্য এমন ছুটে বেড়াচ্ছি জানি না।

—যদি এমন মনে হয় অনু আপনাকে ছুটিয়ে মারছে তবে আপনি আর দেরি করবেন না। ঈশ্বরের দোহাই আপনি সব মান অপমানের কথা ভুলে যান। অনুকে তুলে আনুন। বেশীদিনের ব্যবধান আপনাদের দু জনকে আরও দূরে ঠেলে দেবে।

এখন মনেই হয় না, এই প্রীতি ডাক্তার প্রীতি, মনেই হয় না এই প্রীতি ওকে কতবার ওর প্রিয় এনজেল মাছটা দেখাতে চেয়েছে, মনেই হয় না প্রীতি সারারাত শীতের ভিতর দ্রুতগামী অশ্বের মত দৌড়ায়, অশ্ব তেজী হলে বায়ুচাপ বড় বাড়ে, প্রীতির মসৃণ ঘাড় গলা এবং অশ্বের মত তেজী ভাব সুভকে কেমন অসহায় করে দিল।

দরজার চৌকাঠ পার হতে পারল না। সে সোফাতে মাথা গুঁজে বসে থাকল।

প্রীতি উঠে গেল। সে গ্যাসের উনুন জ্বেলে দিল। প্রায় বাড়ির গৃহিণীর মত ওর এখন ব্যবহার। খুব চটপট কাজ করতে পারে প্রীতি। প্রীতি বলল, সকালের জলখাবার করে দিচ্ছি। আপনি, বলে সে একটা চিরকুট ধরিয়ে বলল, এগুলো জলদি নিয়ে আসুন। বেশী দেরি করবেন না।

সুভাষ বলল, আপনিও একটা মানুষ প্রীতি, তার জন্য আপনার এই হাঙ্গামা কিন্তু আমাকে খুব বিব্রত করছে। আমি যেমন রোজ কোন হোটেলে খেয়ে নিই, আজও না হয় তেমনি খেয়ে নিতাম। আপনি কাজের মানুষ, আপনার ডিসপেনসারি রয়েছে, সেখানে রোজ আপনাকে হাজিরা দিতে হয়।

—আচ্ছা মানুষের তো পাল্লায় পড়েছি। প্রীতি কেমন ধমক দিল সুভাষকে।—আরে মশাই আমি কি সব ঠিকঠাক না করে এসেছি। জরুরী কল এলে দাসবাবু আমাকে ফোনে জানাবেন। নাম্বারটা তাঁর কাছে রেখে এসেছি।

—সে না হল। বলে ফের ইতস্তত করতে থাকল সুভাষ।

প্রীতি বলল, কোন কথা শুনছি না। যখন এসেছি তখন রান্না করে খাইয়ে যাব। এভাবে উচ্ছন্নে যাবেন তা হতে দেব না। মান অভিমান বেশীদিন থাকে না। তাছাড়া আপনাকে তো বলেছি অনুর ভীষণ জিদ। একবার যা ভাববে তাই করবে। ওর মাথায় যে কি ঢুকেছে ঈশ্বর জানেন। বলে অনু সম্পর্কে কি বলতে গিয়ে প্রীতি থেমে গেল।

সুভাষ সামান্য সময় প্রীতির মুখ দেখল। লাবণ্য উপচে পড়ছে মুখে। শরীর বড় বেশী তাজা রেখেছে প্রীতি। চোখের কালো মণি দুটো বড় উজ্জ্বল, কথা বললে মনে হয় সমস্ত শরীরের লাবণ্য ঝলসে উঠছে। মখমলের কাপড় বলে এবং কড়া ইস্ত্রি কাপড়ে,

প্রীতি যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে চলাফেরা করছে—এবং প্রীতির এই বাড়ি-ঘর আসবাবপত্র সব প্রায় নিকট আত্মীয়ের মত, প্রীতিকে কিছুই বলে দিতে হচ্ছে না। সে প্রায় অনুর মত সংসার দেখে-শুনে কাজকর্ম করে যাচ্ছিল।

সহসা সুভাষের কেন জানি মনে হল এই ঘরে ফের আলো জ্বলে উঠেছে। এবং ঘরে এক প্রাণপাখি ছিল, যে উড়ে গেছে, যে সুভাষের প্রতি মান অভিমানের জন্য হোক অথবা সুভাষের খাই খাই ভাব বড্ড বেশী বলে চলে গেছে।

সুভাষ খুব জলদি বাজার করে ফিরে এল। সে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অন্যমনস্কভাবে শিষ দিয়েছিল, এবং বাড়ি ফেরার সময় সে গুন গুন করে গান গাইছিল। রামচরণকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, সে থাকলে আরও ভাল হত। তাহলে এই বাজার করার হাঙ্গামাটাও তাকে পোহাতে হত না। যেমন অনু থাকলে সে, সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখত না, কেবল দুবেলা দুটো খেতে পেত, নানা রকমের ভোজ্যদ্রব্য অনু তৈয়ার করতে ভালবাসত, সুভ যা যা খায় সময়ে অসময়ে নিজের হাতে তৈরী করে খাওয়াত, আজও ঠিক তেমনি প্রীতি এসেছে ওকে খাওয়াতে--বড় ভাল লাগছিল প্রীতিকে, এত সুন্দর আর কোনদিন মনে হয়নি প্রীতিকে। সংসারে এই প্রীতি দুঃখের দিনে বড় আপনজনের মত ব্যবহার করছে। কেমন মায়া পড়ে যাচ্ছে এই সংসারের উপর। অনু চলে যাবার পর যে হীনমন্যতায় সে ভুগছিল, সংসার সম্পর্কে যে উদাসীনতা জেগেছিল, প্রীতি, প্রায় ঈশ্বরের মত এসে সেই সংসারকে আবার প্রায় ফুলে ফলে ভরে তুলল।

সুভাষ ঠিক আগের মত, কত দীর্ঘকাল আগে সুভাষ যেমন অফিস ফেরত এসে অনুকে কেবল দেখত, ওর হাত মুখ এবং শরীরের কমনীয়তা দেখত, ওর কাজ, কাজে কি এক অপরূপ ছন্দ ছিল মনে হত, প্রতিটি জিনিসকে সে ঘরে সাজিয়ে রাখত—কি লক্ষ্মী স্ত্রী ছিল

অনু, প্রায় একটা প্রজাপতির মত অনুকে মনে হত ঘরের চার পাশটায় উড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক তেমনি আজ প্রীতির চলাফেরা, কথা-বার্তা, মেয়েরা বুঝি তাই হয়, এখন মনেই করতে পারছে না সুভাষ, অনু বলে এক যুবতী এই ঘরে বছরের পর বছর বসবাস করে গেছে, মনেই হবে না অনু সুভাষের সঙ্গে কোন সম্পর্কীত—সবটাই কেমন রূপান্তর হয়ে গেল যেন, সে দেখল অনুর মত প্রীতিও পরে প্রজাপতি হয়ে গেছে এবং নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

সুভাষ ঘরে ফিরে প্রীতিকে বলল, আপনার যা যা দরকার বলবেন, এনে দেব।

প্রীতি, ব্যাগ থেকে খুলে বাজার দেখল। তারপর মনে মনে কি হিসাব করল। আর কিছু প্রয়োজন, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তবে ভাবতেই মনে হল, দেখা যাক—সে এবার মুখ তুলে তাকাল সুভাষের দিকে। বলল, এবার আপনি রেস্ট নিতে পারেন। দরকার হলে বলব।

—চুপচাপ বসে কি করব। বরং রান্নাতে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—এটা কি আপনি বনভোজন পেয়েছেন। বলে প্রীতি আঁচলটা সামলে নিল। আঁচলটা পড়ে গিয়েছিল কাঁধ থেকে, সেটা তুলে রান্না ঘরে চলে গেল।

সুভাষ প্রীতির এই চলে যাওয়াটুকু দেখল। প্রায় উৎসবের মত মনে হচ্ছে বাড়িটা। সে অনেকদিন পর কেমন ফের সেই কৈশোর বয়সের মত সরল বালক হয়ে গেল। অন্য অনেকদিনের মত প্রীতি কিন্তু আজ কোন উচ্ছল ভঙ্গী টেনে কথা বলল না। কোন ঠাট্টা তামাসা করল না। বড় সিরিয়াস। সে কাজ করতে করতে থেমে গেছে। ওর অন্য কোন কাপড় সম্বল নেই। সুভ বলল, যদি বলেন একটা অনুর কাপড় বের করে দি। আপনার কাপড়টাতে নোংরা লাগছে।

এবার প্রায় প্রীতি খুন্তি নিয়ে তেড়ে আসার মত ভাব করল। সে বলল, ফের আপনি দরজায় এসেছেন। বলে ফিক করে হেসে দিল। খিচুড়ী খেতে ভাল লাগবে, কি বলেন। নারকেলের কুচি দিলাম। আদা কম দিয়েছি। নিরামিষ খিচুড়ী হবে।

—নিরামিষ খিচুড়ী মানে!

—নিরামিষ খিচুড়ী জানেন না?

—না।

—আপনার দেশ তো পূর্ববঙ্গে ছিল। লক্ষ্মী পূজায় হয়। আতপ চাল মুগের ডাল। ডালটা ভাল করে ভেজে নিতে হয়।

—তারপর।

—দরজা থেকে নড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না দেখছি।

—ও খুব সুন্দর গন্ধ উঠছে। বলে প্রীতির দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল।

—ওটা হাতের গুণ মশাই। আচ্ছা হলুদ জিরে সেদ্ধতে দিতে হয়। কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা গোটা তিনেক। কোরানো নারকেল ছটাকের মত।

—তারপর?

—তারপর তেল ঢেলে আদা লঙ্কা এবং মৌরি মেতি তেজপাতাতে সম্বার, সামান্য গাওয়া ঘি ওপরে ফেলে দিলে প্রায় অমৃতের স্বাদ।

—গাওয়া ঘি এখন যে অমূল্য।

—সেই জন্য একটু আমুল বাটার। সঙ্গে ডিম ভাজা।

—উত্তম। বলে সে দরজায় মুখ বাড়িয়ে ভিতরের ঘ্রাণটা নিতে চাইল ফের।

—এখন আর ইদিকে নয়। রান্না হলে ডাকব। ভিতরের ঘরে বসে সুবোধ বালকটির মত যেমন আগে ধর্মগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস ছিল—এখন ফের অভ্যাসটি গড়ে তুলুন।

—আমার একা ভাল লাগছে না প্রীতি। বরং আপনাকে

সাহায্য করতে পারলে ভাল লাগবে। বলুন, ফরমাস করুন—কি করতে হবে ?

—আপনি স্নানটা সেরে ফেলুন।

সুভাষ আজ অনেকদিন পর খুব ভালভাবে স্নান করল। অন্নুর প্রতি যে রাগ বিদ্বেষ জমা করে রেখেছিল, আজ এই উৎসবের দিনে তা একেবারেই মনে থাকল না। সে স্নান করে পাট ভাঙ্গা কাপড় এবং পাতলা আদ্দির জামা গায়ে দিল। নীচে কোন গেঞ্জি ছিল না। ফলে ওর সেই প্রশস্ত বুকে যেন অন্ধকারময় বনমহোৎসবের ছবি ভেসে উঠল। সে ঘরে ঢুকে দেখল—টেবিলে জল, এবং কাঁসার থালাতে উষ্ণ খিচুড়ী মাখনের গন্ধ উঠছে, ডিম ভাজা। সে একটা থালাতে খিচুড়ী দেখে বলল, আপনি স্নান করে নিন প্রীতি। একসঙ্গে খাব।

—আমার জন্য করিনি সুভাষবাবু। বাড়ি গিয়ে আমি খেয়ে নেব।

প্রীতির প্রতি কেমন উষ্ণ হয়ে উঠল সুভাষ। বলল, ছিঃ ছিঃ আপনি শুধু আমার জন্য রান্না করেছেন। আপনার জন্য করেন নি।

—আমি ত জানতাম না এখানে এসে দেখব আপনি না খেয়ে-দেয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। তাই আপনার রান্নাটা করে দিয়ে গেলাম।

সুভাষ আর কোন কথা বলল না। সে নিজের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পাল্‌টাল। বাইরে বের হবার পোশাক পরে নিল। তারপর ভিতরে ঢুকে বলল, চলুন একসঙ্গে নামা যাক।

—আপনি খাবেন না !

—না। রামচরণ এলে খেয়ে নেবে।

—মানে !

—মানে, আমি তো আপনাকে বলিনি আমার জন্য কষ্ট করুন !

—বিশ্বাস করুন সুভাষবাবু, আপনার মুখ চোখ দেখে আমার

বড় কষ্ট হচ্ছিল। আমি স্টেথিস্কোপটা নিতে এসেছিলাম। বাড়িতে আমি খাব না বলে আসি নি। নানারকমের জরুরী কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি আপনার জন্যে দুটো রান্না করে দিয়ে যাব ভাবলাম। আমার জন্য করতে গেলে দেরি হবে।

সুভাষ উত্তর করল না। হাতের ঘড়িটা দেখল।

প্রীতি বলল, সুভাষবাবু আসুন। বলে প্রীতি সুভাষের হাত ধরে অনুরোধ করল, খেয়ে নিন। তারপর অদ্ভুত এক চোখ, ছলছল ভালবাসার চোখ—সেই যেন অনু ভালবাসার চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যে চোখ দেখলে বন্য সুভাষ পোষমানা জীবের মত হয়ে যেত—প্রীতি হাত ধরে বলল, আসুন আর কষ্ট দেবেন না নিজেকে।

সুভাষ খেতে বসে বলল, এটা কিন্তু আপনি ভাল করলেন না প্রীতি। না খেলে আপনাকে অসম্মান করা হবে, তাই খাচ্ছি। কিন্তু মনে হবে এটা আপনি আমাকে বড় রকমের শাস্তি দিয়ে গেলেন। আমি জানতাম রান্না যখন করছেন, এবং খুব আপনজনের মত এসে যখন একজন জলে ডোবা মানুষকে রক্ষা করতে চাইছেন তখন একসঙ্গে দু'জনের রান্নাই করবেন। বড় খারাপ দেখাচ্ছে।

প্রীতি বলল, বাবা এত রাগ! আচ্ছা দাঁড়ান। বলে সে বলল, একটা কাপড় দিন তো অনুর। সুভাষ আলমারি খুলে অনুর একটা কাপড় দিল। প্রীতি স্নানটা সেরে নিল। এবং বাথরুম থেকে বলল, একা সবটাই কিন্তু খেয়ে ফেলবেন না রাক্ষসের মত। আমি খাব আপনার সঙ্গে।

প্রীতি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল। ভিতরে যে দুঃখবোধটা কাজ করছিল সুভাষের প্রীতির এই কথায় সব উবে গেল। মনে হল অনেকদিন পর ফের সূর্য আকাশে উঠেছে। সুভাষ হাত তুলে বসে থাকল। প্রীতি এলে খাবে। এবং প্রীতি আসতে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তবু যখন একসঙ্গে দু'জন আধপেটা খেয়ে ঢেকুর তুলল, তখন বোঝাই গেল না ওরা পরস্পর সম্পর্কহীন মানুষ।

সুভাষ খেয়ে উঠে বলল, বুঝলেন প্রীতি মেয়েমানুষদের চেনা বড় দায়। সারাদিনের ব্যবহারে বার বার মনে হয়েছে আজ কোথায় যেন আপনার কাছে হেরে যাচ্ছি। অন্যদিন মনে হত আপনি ঝুঁটি উঁচিয়ে রেখেছেন এবং উত্তরের মুরগি দক্ষিণে ঘুরে যাবার জন্য কক্ কক্ করছেন--কিন্তু আজ মনে হল মুরগিটা ঠিকই আছে। শুধু মোরগটা বড় বেশী তড়াক তড়াক করে লাফায়।

প্রীতি এবার সুভাষের ঠোঁটের উপর আঙ্গুল দিয়ে বলল, চুপ, দুষ্টু কথা বেশী বলতে নেই। দেয়ালের কান আছে। অনু এলে দেয়ালগুলো সব বলে দিতে পারে। বলে প্রীতি উঠে পড়ল। তারপর স্টেথিস্কোপটা গলায় ঝুলিয়ে নীচে নেমে গেল। যেন এক রুগী দেখে, খুব অসুখে ভুগছিল মানুষটা, তাকে নিরাময় করে দিয়ে চলে গেল।

ফোনটা বেজে উঠতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল অনু। বসার ঘরে ফোনটা বেজে চলেছে অনবরত। অনুর বিছানা থেকে নেমে হেঁটে যাবার ইচ্ছা হলো না। অথচ এই ফোন বেজে উঠলেই মনে হয় দূরাগত প্রিয়জনের মত এই ফোনে তার আপন প্রিয়জনের গলা ভেসে উঠবে। সুভ রাগ, দুঃখ ভুলে ছুটে আসবে। একটা অলীক স্বপ্নের মত মনের ভিতরে এখনও কত রকমের সব সুখের পায়রা ঘুরে বেড়ায়। অনু আপন মনে বিড় বিড় করে তখন কি যেন বকে চলে।

মণিমাসি এসে বলল, অনু তোমার ফোন। তোমাকে কেউ ডাকছে।

অনু ছুটে গেল না। যদি সুভ ফোন করত মণিমাসী খুশী হয়ে বলতেন, শিগগীর এস অনু, সুভ তোমাকে ফোন করেছে। কোন অপরিচিত মানুষ যার গলা শুনে সহজে ধরা যায় না নিশ্চয়ই এমন

মানুষ ফোন করছে অনুকে। অনু বারান্দা পার হয়ে গেল। আঁচলটা ঢিলে ঢালা ছিল, সেটা সামান্য বুকের উপর তুলে সে যেন কোন রকমে সোফায় বসে পড়ল। তারপর অনিচ্ছাবশত ফোনটা তুলে ধরতেই অনু সুলতার গলা পেল, তুই কি রে!

—কেন কি হয়েছে!

—তোকে গতকাল ফোন করলাম। তোর বাড়ী থেকে বলল তুই কোথায় গিয়েছিলি!

—গিয়েছিলাম।

—কোথায়?

অনুর প্রথম ইচ্ছা হল ফোনটা ছেড়ে দেবে। কোথায় আবার যাব, বলার ইচ্ছা হল। রাগ অথবা দুঃখের গলা তুলে ধরতে ইচ্ছা হল অনুর। রাগ অথবা দুঃখের গলা পেলে খুশী হবে সুলতা—সেই কথা অথবা প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মত, এমন কি বলতে পারে—তোমার ভিতরে এক সাপ সব সময় ফোঁস ফোঁস করে কেন অনু, তুমি আর হেসে গেয়ে বেড়াও না কেন অনু, তোমার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে তোমাকে দেখি না কেন অনু…আর কি বলতে পারে?

—কিরে কথা বলছিস না কেন?

—অঃ কে, সুলতা বলছিস?

—বা ব্বা। কিরে, এত কি ভাবছিস!

—না, কিচ্ছু ভাবছি না ত! তোর ছেলেপিলেরা কেমন আছে?

—খুব ভাল।

—কর্তাটি!

—খুব ভাল। এম্বিসানের গোড়ায় ছাই দিলে কি ভাল না থাকা যায়?

অনু বলল একটু থেমে, তাই বুঝি!

—হ্যাঁরে এই দেখনা আমার প্রথম প্রথম কি না কষ্ট হত।

আমাকে বলত পরিচিত জনেরা—কি, আর গান কেন শুনি না, কি আর নাটকে তোমার গলা পাই না কেন—তখন মনে হত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই। লাইফের জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে পারলে মনে হত আমার মুক্তি।

—তারপর অনু ফোনেই জোর করে হাসার চেষ্টা করল।

—তারপর, আবার কি! কর্তাটির শক্ত কথার ভয়ে এক পা এদিক ওদিক হওয়া গেল না! বড় স্বার্থপর মানুষ। নিজেরা হাসবে গাইবে খেলবে, গান করবে, নাটক করবে, প্রেম করতেও পারে ধরো, কোন বাধা নেই, আমারা স্ত্রী জাতিরা সব থেকে বঞ্চিত। এমন একটা ব্যাপার জানিস, অনু, এ সব পুরুষ মানুষদের ভিতরে কেবল কাজ করে।

অনু এবারেও জোর করে না হেসে পারল না। সুলতা এখন আর নাটক করে না, গান করে না, সংসারে ডুবে গেছে। কিন্তু ক্ষোভে সে ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছিল। যখনই সহ্য করতে পারে না, যখনই মনে হয় জীবন বিফলে গেল তখনই ফোনে অনুকে কাছে পেতে চায়। অনুর বীণের হাত বড় মিষ্টি, অনু নাটকে যদি কোনদিন ভাল অভিনয় করে অথবা অনুর গান শুনতে পেলে কেমন ক্ষেপে যায় সুলতা। আর তখন টেনে টেনে কথাকে লম্বা করতে থাকে। প্রেম এক দীর্ঘ রজ্জুর মত, যত ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাই তত লম্বা হতে থাকে, এমন সব উক্তি সুলতার কণ্ঠে।

—কিরে চুপ কেন? সুলতার কণ্ঠ।

—হ্যাঁ, বল।

—না, তুই আজকাল কেমন হয়ে গেছিস। একদিন আয় না।

—যাব। শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না, শরীর ভাল হলেই যাব। ফোনটা এবার কেটে দিল অনু। সুলতার আজকাল বড্ড টিজ করার স্বভাব। সে কি জেনে ফেলেছে সুভর সঙ্গে ওর বনাবনি হচ্ছে না? সে কি জেনে ফেলেছে সুভ এখন প্রীতিকে নিয়ে

ঘোরাফেরা করছে অথবা সুভ, ভালবাসার সুভ, যার ঘরে বিশ্বাসের দরজা খোলা ছিল, যে মানুষের জন্য অনু প্রাণপাত করছে খোলা দরজায় ঢুকে যেতে, কিন্তু সুভ বার বার সেই দরজায় ওর জন্য স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে রেখে গেল—ডাক্তার প্রীতির স্টেথিস্কোপ। বসে থাকলে মনে হয় কেবল স্টেথিস্কোপটা সাপের মত দেয়াল বেয়ে উঠছে নামছে অথবা ওর পায়ের কাছে এসে ফোঁস করে উঠছে। অনুর মাথাটা ধরে যাচ্ছে, ভিতরে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। এবং শরীরটা হাঁসফাস করছিল। কিছু ভাল লাগছে না। প্রীতি, বান্ধবী প্রীতি, যে অনুকে সন্তান হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, যে অনুকে সন্তানের জন্য ভালবাসার কথা বলেছে, সেই প্রীতি এখন সুভকে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

অনু বসে থাকতে পারছিল না। সে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকল। সূর্য এখন কত ওপরে, সে সূর্যকে দেখার জন্য একবার উঁকি দিল। সে উঁকি দিয়ে সূর্য দেখতে পেল না! বাতাবি লেবুর গাছটাতে ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ। বিকেলের কিছু পাখি আকাশে দেখা যাচ্ছে। পাশের বাড়িতে কে রেডিও চালিয়েছে, রেডিওতে কোন বিদেশী গানের সুর, নীচের ঘরে এখনও কেউ আসে নি।

আজ রোববার, রোববারে আজকাল গানের স্কুল সকাল সকাল বসার কথা, কিন্তু কেউ নেই কেন? ক্লাস বন্ধ যাচ্ছে কেন? সে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। দরজা খোলা ঘরগুলোর। দু-একজন ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করেছে। নিজের এই বিদ্যালয়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রীর মুখ দেখতে দেখতে ভিতরের অসহায় ভাবটা কেমন সহসা কেটে গেল অনুর। সে ঢুকে বলল, নিখিলবাবু আসে নি যখন, এস আজ আমিই ক্লাস নিচ্ছি। সে বেদির মত আসনটাতে বসে বলল, মিতু ওপরের ঘরে যাও, মণিমাসিকে বলবে আমার সেতারটা দিতে।

সেতারটা নিয়ে এসে অনু পা ভাঁজ করে বসল। তারপর ধীরে ধীরে কেমন এক অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে সেতারে আঙুল চালাল। সে

যেন নিজেই জানেনা কি বাজাচ্ছে। কি সুর হবে তার জানা নেই। প্রাণের ভিতর কে যেন কি বাজায়। অন্নু চোখ বুঁজে বুঝি তাই বাজাতে চাইল। প্রথমে আলাপ, খুব ধীরে ধীরে সামান্য আলাপ, অনেক সময় নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপের ভিতর অন্নু প্রায় ডুবে যেতে যেতে সহসা উদাস হয়ে গেল, ছাত্র ছাত্রীদের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ফের চোখ বুঁজে জোরে বড় দ্রুত, তালে অথবা মূর্চ্ছনায়, জোড় অথবা ঝালাতে উঠে কেমন সে ঘেমে যেতে থাকল। ছাত্র ছাত্রীরা দেখল দিদিমণি এক নাগাড়ে দ্রুত বাজিয়ে যাচ্ছেন। হুঁস নেই। ঘরটা গম গম করে উঠছে। অন্নু দিদিমণির কপাল এবং মুখ ঘামছে। এত দ্রুত বাজাতে যেন ওরা কোনদিন দেখেনি। অন্নু শেষ প্রহরের আলোর উৎসবের মত সঙ্গীতের শেষ রশ্মিটুকু—আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনিই লীলা তব—সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে সহসা চুপ মেরে গেল। তারপর চোখ খুলে বলল, তোমরা বস। নিখিলবাবু এক্ষুনি বোধ হয় এসে যাবেন। বলে, অন্নু খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে মণিমাসি। মণিমাসি তাড়াতাড়ি অন্নুকে ধরে ফেলল। অন্নুর মুখের চেহারা খুব ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। অন্নুর সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে, এবং রেলীঙ অবলম্বন করে হাঁপ নিচ্ছিল। ক্রমশ অন্নু অসহায় হয়ে পড়ছে, যত অসহায় বোধ করছে তত তীব্র এক জ্বালা ভিতরে ভিতরে। অন্নু নুয়ে পড়তে চাইছে না। নিজের এই দুর্বলতার কথা কেউ না জানুক, প্রাণপণ সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুভ প্রীতির সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ওকে জব্দ করার চেষ্টায় আছে। মণিমাসি বললেন, কি দরকার তোমার অন্নু, এত ওঠা নামার। তুমি চুপচাপ বসে থাকতে পার না। চুপচাপ বসে বই পড়তে পার, চুপচাপ বসে…।

অন্নু আর বুঝি ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে বলল, মাসি তুমি আমাকে ধরলে কেন! আমার কি হয়েছে! তোমরা আমাকে এত অসহায় ভাব কেন। আমি তো বেশ উঠে আসছিলাম সিঁড়ি

মণিমাসির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। অন্যদিন তবু অসীম সামান্য লাজুক এবং মুখচোরা মানুষের মত ব্যবহার করে কিন্তু অনু দেখল অসীম কেন জানি আজ এই বাড়ির বড় আপন জনের মত ব্যবহার করছে। সে অনুকে দেখে বলল, অনুদি একটা খবর দিতে এলাম।

অনু বিস্মিত মুখে বলল, আমাকে?

—তবে আর কাকে!

—কিসের খবর? খুব তাড়াহুড়ো মনে হচ্ছে।

—মামাবাবুর দেখছি এখন আর তর সইছেনা।

—তিনি কি তবে অন্য নায়িকা তার বইয়ের জন্য খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছেন? বলে অনু সামান্য সময় অসীমের মুখ দেখল, তারপর সোফায় বসে কেমন হতাশ মুখে জানালার বাইরে যে ছোট্ট আকাশের ছবি ঝুলে আছে তা দেখতে থাকল।

—তা দেননি। তিনি আমাকে গতকাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কিছু দৃশ্য এখনই তুলে রাখতে চান। তিনি বললেন, অনুর এ-অবস্থায় যদি আমরা কিছু দৃশ্য তুলে রাখতে পারি তবে খুব ন্যাচারেল হবে।

অনু বুঝল ছবির দৃশ্যে যে বিধবা যুবতির মা হবার দৃশ্য আছে, যেখানে নায়িকা ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখোমুখি, পেটে তার অবৈধ সন্তান আর সব বড় বড় অজগর সাপের প্রতীক চার পাশে অথবা অনুর মুখে ক্লিষ্ট ছাপ ফুটে থাকে কেবল, সতেজ অথবা সরল মুখের চেহারা অনুর মুখে ফুটে থাকে না আর—যেন কোথায় কোন সাগরের উদ্দেশ্যে সে চলে যেতে যেতে এক অরণ্যের ভিতর তার পথ হারিয়ে গেছে, সুতরাং এ সময় মামাবাবু তার মহৎ গরিমাটুকু পর্দায় অনিমাকে দিয়ে ধরে রাখতে চান। ভাবতে ভাবতে অনু খুব তলিয়ে যাচ্ছিল—এক সময় অসীমের ডাকে হুঁস হলে বলল, দিনক্ষণ ঠিক করে ফেল। আমি রাজী। তবে মামাবাবুকে বলবে লোকেশন যেন খুব বেশী দূরে না হয় এখন। খুব ছুটোছুটি করলে শরীরের পক্ষে খারাপ হতে পারে।

অসীম বলল, মামাবাবু এখন আপনাকে নিয়ে বই করার জন্য সব কিছু করতে রাজী।

অনু উত্তর না করলে অসীম ফের বলতে থাকল, তিনি কিছু কাগজপত্র দিয়েছেন। সেগুলো আপনাকে সই করে দিতে হবে।

—এত তাড়াতাড়ি?

—আর সময় কোথায়?

—তোমার সই? তুমি তো নায়কের অভিনয় করছ।

—আমারটা মামাবাবু আগেই করিয়ে নিয়েছেন।

অনুর আঁচলটা একটু খসে গিয়েছিল। সে তুলে নিল আঁচলটা। এ সময় সুভর মুখ ওর মনে পড়ল না। ভিতরে ভিতরে অনুর যে জ্বালা, তা মুহূর্তের ভিতর কেমন উবে গেল। যেন বলার ইচ্ছা, সুভ তুমি আর কতদূর যাবে প্রীতিকে নিয়ে। এবার আমি অনেকদূর রওনা হলাম। অথবা এমন এক কাণ্ড করে বসতে ইচ্ছা হল—যা কল্পনাতীত, সে জোরে জোরে গান গাইতে থাকল। সহসা এই গান শুনে অসীম পর্যন্ত চমকে উঠল।

মা, মণিমাসি এবং প্রৌঢ় মানুষটি ছুটে এলেন। এত জোরে কোনদিন গান করে না অনু। ওঁরা দরজায় এসে উঁকি দিলে অসীম ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করতে থাকল। এমন কি ঘটনা, এমন কি অঘটন ঘটে গেল সহসা পাগলের মত অনু জীবন তোলপাড় করে গান গাইছে। মণিমাসিকে দেখে অনু কিঞ্চিৎ হেসে দিল। —তোমরা সকলে, কি ব্যাপার? তারপর নিজের এই অসমীচীন কাজের জন্য অনু কেমন নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ চাইল। মনের ভিতরে এমন কি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এমন কি ঝড় বইছে যার বল্গা এখন আর অনুর হাতে নেই। ভাবতেই বড় বিমর্ষ বোধ করল অনু। তারপর অজুহাতের গলায় সকলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল—কতদিন গলা ছেড়ে গান গাই না। আজ গেয়ে দেখলাম গলা ছেড়ে দিলে গান আমার কতদূর

থেকে শোনা যায়। গলা ছেড়ে আমি এখনও তেমন গাইতে পারি কি না দেখলাম।

মা বললেন, অসীম বস। চা হচ্ছে। চা খেয়ে যাবে।

মণিমাসি বললেন, কতদিন পর আবার এলেন।

বাবা বললেন, অসীম তোমাদের দিকে আজকাল চালের দর কেমন? বলে সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে শেষে সরে গেল। ঠিক পর্দায় কিছু মুখ ভেসে উঠে তারপর যেমন অদৃশ্য হয়ে যায় ওরাও তেমন প্রায় সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনু এবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে সেই গীর্জাটা দেখা যায়। দুজন সন্ন্যাসিনী বড় অর্জুন গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই গীর্জার চত্বর। কিছু ফুলের গাছ। নানা রকমের পাতাবাহারী গাছ। বড়দিনের উৎসবে ওরা এই সব গাছে নানা রকমের লাল নীল বাতি জ্বালিয়ে দেয়। এমনি এক উৎসবের দিনে সুভাষ এসেছিল ভালবাসার কথা নিয়ে। সুভাষ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রেলিং ধরে। অনু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রেলিং ধরে। কোন ধর্মীয় সঙ্গীত হচ্ছিল গীর্জার ভিতরে। লাল, নীল আলো জ্বলছিল গাছে গাছে। ভুবনময় আলোর উৎসব যেন এই গীর্জা, সামনের পথ এবং সুভাষকে অনুকে কিছু সময়ের জন্য মহিমময় করেছিল। ওরা পরস্পর কত দীর্ঘদিন পর ভালবাসার কথা বলেছিল। অনু তাকাতে পারছিল না সুভাষের দিকে, সুভাষও মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। এক অসীম সংকোচ উভয়ের প্রাণে প্রবল ভালবাসার বন্যা ঢেলে দিয়েছিল। জানালার পাশে দাঁড়াতেই সব মনে পড়ছে। ভালবাসা এবং বিবাহ। এই বিবাহের জন্য ওদের কত কালের প্রতীক্ষা। বাবার নানা রকমের সংস্কার এবং ভিন্ন ভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে অনুর প্রায় সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছিল যেন। ভালবাসার দাম দিতে গিয়ে অনুকে অসম্ভব রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল জীবনে—সেই সুভাষ, এখন অনুকে

প্রবল বেগে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। অথবা মনে হল, আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, কি যেন পরের কথাটা? অনু মনে করার চেষ্টা করল। ···মজিনু অবরণ্যে বরি, মজিনু···অনু স্পষ্ট ঠিক ঠিক কিছুতেই মনে করতে না পেরে সে অসীমকে বলল, কৈ দেখি তোমার কাগজপত্র। তারপর কাগজপত্রে সে কি দেখল যেন। বোধ হয় কিছুই দেখল না, খচ খচ করে শুধু সই করে বাঁধা পড়ে গেল অন্য এক জীবনে। অনুকে ভয়ঙ্কর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

অসীম সিঁড়ি ধরে শিস দিতে দিতে নেমে গেল। সে চা খেল না। যাবার আগে বলে গেল, অন্য দিন মাসীমা সময় হাতে করে আসব। চা খাব। গল্প করব। অনুর মনে হল অসীম এই চুক্তি পত্রে সই করতে এসে এত সহসা কাজ উদ্ধার করতে পারবে ভাবে নি। সে তাড়াতাড়ি আজ চলে গেল। সই করার পর এক মুহূর্ত দেরি করল না। আচরণে অসীম কেমন তস্করের মত ভাব দেখাল। দেরি করলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, এবং মত বদলে যেতে পারে অনুদির। আর সেই গোঁয়ার গোবিন্দ সুভাষের কানে উঠলে তো কথাই নেই, ফের হয়তো তেড়ে আসতে পারে, এবং সেই ঘটনার মত এই বাড়িতে আর একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। অসীমের নেমে যাওয়াটুকু, ওর ব্যস্তভাব, ওর শিস্ দেওয়া, সবই কেমন স্বার্থপর মানুষের মত মনে হচ্ছিল। যেন একটু দেরি করলেই চুক্তিপত্রটা কেউ ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, একটু দেরি করলে অনু ফের চুক্তিপত্রটা পড়ে দেখতে পারে অথবা প্রৌঢ় মানুষটি সব দেখে ফেলে যদি বলে ফেলেন, এ-আবার চুক্তিপত্র হল নাকি, সবটাই তো পরিচালকের সপক্ষে সওয়াল—কি যেন আর সব ঘটতে পারে ভেবে অসীম প্রায় ছুটে এ-বাড়ি থেকে বুঝি পালিয়ে গেল! অনু জানালার পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেভাবেই থাকল। প্রায় যেন কোন চেতনা ছিল না, আপন মনে সে নিবিষ্ট হতে হতে কেমন পাগলের মত বিড় বিড় করে কাকে বকতে

থাকল। বুঝি অদৃষ্টকে, বুঝি জীবনের উচ্চাশাকে। তখন মনে হল ভিতরে এক শিশু কেমন নড়ে চড়ে উঠছে। সুভাষের জাতক ভিতরে ভিতরে হাত ছুঁড়ছে। অনু বাঁ হাতটা বাঁ দিকে রাখতেই মনে হল ঠিক ইঁদুর ছানার মত কি লাফাচ্ছে পেটে। অনু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বেলে দিল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় আলগা করে দেহে সাদা শঙ্খের মত পেটে ভালবাসার হাত রাখল। বড় অসীম ভালবাসা এই সন্তানের জন্য, সে প্রায় তার সব দুঃখ এবং হতাশার কথা ভুলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধুকপুক করছে—আহা সুভাষ থাকলে বলতে পারত, সুভ আমি শুয়ে পড়ছি, আমি শাড়ি সায়া আলগা করে দিচ্ছি, তুমি পেটের এ-পাশটায় কান পেতে দেখ, দুষ্টু আমাদের কি দাপাদাপি করছে। তুমি কান পেতে দ্যাখো সুভাষ।

সুভাষ ভোর রাতের দিকে টের পেল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সারারাত পাখা চালিয়েও ভাল ঘুমোতে পারেনি। ভীষণ গরম ছিল সারারাত। ভোরের এই বৃষ্টির জন্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। সুভাষ পাশ ফিরে শুল। মনে হল এবার ঘুম আসবে। কতদিন যেন বৃষ্টি হচ্ছে না, প্রখর রোদে গাছ পালা পাখি নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছিল। রাতের গুমোট গরম। আষাঢ় মাস চলে যাচ্ছে তবু বৃষ্টি নেই। খরা। চারিদিকে প্রায় লু বইবার মত। সুতরাং দীর্ঘদিন পর যেন এই বর্ষার জল শহরের উপর আশীর্বাদের মত। সুভাষও যেন ক্রমে এই আশীর্বাদের মত কোন এক অন্য জলাশয়ের উদ্দেশ্যে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। শুয়ে শুয়ে সুভাষের তাই মনে হল। প্রীতির কথা মনে হল, শুয়ে থাকলে, বসে থাকলে, এবং যখন সুভাষ

বেশ কাজের ভিতর ডুবে থাকে তখনও প্রীতির মুখ ভেসে ওঠে। অন্নুর কথা মনে হয়, অন্নু একদা ভালবাসার জন ছিল শুধু এই মনে হয়। অন্নুর জন্য ভিতরে আর যেন আবেগ বোধ করতে পারছে না। প্রীতি যত ওর ভালমন্দ দেখা শোনার ভার নিয়ে নিচ্ছে তত অন্নু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। ঠিক আগের মত অন্নুর মুখ মনে পড়লে সুভাষ যন্ত্রণায় ছটফট করে না। বুকের ভিতর তেমন উগ্র জ্বালা বোধ হয় না। আকাশ আলো এবং বাতাসের মত শুধু মনে হয় মাঝে মাঝে অন্নু বড় আপনার জন ছিল। অন্নু তাকে ছেড়ে চলে গেল। অন্নুকে এখন প্রায় নক্ষত্রের মত দূরের প্রিয়জন বলে মনে হয়। মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে সুভাষ কি করে সব ভালবাসার জ্বালা ভুলে গেল, কি করে অন্নু এত দূরের মানুষ হয়ে গেল সে যেন ভেবে পেল না।

সুভর ঘুম আসছিল না। বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরছে। সে শুয়ে শুয়ে টের পেল, বৃষ্টির চেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশী। সে উঠে পড়ল এবং এক দুই করে জানালা বন্ধ করে শুধু ব্যালকনির দিকে দুটো জানালা খোলা রেখে শুয়ে পড়বে ভাবল। কিন্তু আশ্চর্য! বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও কিছু কিছু হচ্ছে, পশ্চিমের আকাশে কোন নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না, বড় মেঘলা আকাশ অথচ পূবের আকাশ কি অপরিসীম নির্মল এবং সেখানে একটা বড় নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে। সে আর বিছানায় চলে যেতে পারল না। অনেকদিন পর সে যেন এমন নির্মল আকাশ দেখতে পেয়েছে, অনেকদিন পর ওর মনে হল নক্ষত্রের চারপাশে যে মেঘ নক্ষত্রটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা কেমন করে যেন সরে গেছে। ঠিক অন্নুর মত এই নক্ষত্র। অন্নু তার স্ত্রী, ভালবাসার স্ত্রী। অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ক্রমে ওদের দুজনকে নদীর দুপারের মানুষ করে দিয়েছে। অন্নু মা হতে যাচ্ছে। এ-সময় অন্নুর কাছাকাছি থাকা কত বাঞ্ছনীয় ছিল অথচ পারছে না। মনের ভিতরে এক দুরারোগ্য

ব্যাধির মত অন্নুর অপমানের জ্বালা কেবল থেকে থেকে মনে পড়ছে। তবু আজ অনেকদিন পর এই নির্মল নক্ষত্র দেখে কেন জানি মনে হল আর একবার সে অন্নুর কাছে যাবে, অন্নুর কাছে তার শেষ ইচ্ছার কথা জানাবে, বলবে—অন্নু আমি আবার এলাম। যতই ভুলে যাবার চেষ্টা করি না কেন জীবনের প্রথম প্রেম মানুষকে বড় জ্বালা দেয়, ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। থেকে থেকে আপনজনের মত ঘরের দেয়ালে, জানালায় অথবা কোন মাঠের ভিতর, কোথাও ফুল ফুটে থাকলে সেখানে কেবল তোমার মুখই দেখতে পাই। যেমন এই নক্ষত্রের ভিতর আমি এখন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

বৃষ্টি ক্রমে কমে আসছিল। আকাশ ক্রমে নির্মল হয়ে আসছে। এবং ক্রমে প্রভাতী তারাটি সূর্যের আলোতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সুভাষ, অন্নুর সুভ চুপচাপ বসে এখন সূর্যোদয় দেখছে। সামনের পার্ক পার হলে রেল লাইন, তারপর ছোট এক বস্তি অঞ্চল এবং ওপারে তার সূর্য উঠছে। লাল রঙের সূর্য। কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছিল আকাশে, গাছ পালার ওপর পাখিগুলোকে কালো রঙের দেখাচ্ছে। ট্রাম বাসের শব্দ থেকে থেকে পাচ্ছিল। বৃষ্টির জন্য গাছপালা পাখি সব কেমন পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। সুভ সেই যে চুপচাপ বসে বসে কি ভাবছিল এখনও বুঝি তাই ভাবছে।

এ-সময়ে রামচরণ আসবে। সে অলস ভঙ্গীতে উঠে গেল দরজার সামনে। সে সদর খুলে দিয়ে ফের এসে ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। একা একা আর কিছুই ভাল লাগছে না। বিকেল হলেই এখন খানিক সময় প্রীতির জন্য অপেক্ষা করা। প্রীতি এলে একসঙ্গে বের হওয়া। যেদিন আসতে পারবে না বলে ফোনে জানিয়ে দেয় সেদিনটি আরও খারাপ লাগে। কিছুতেই সন্ধ্যাটা কাটতে চায় না। এত লোক এই শহরে, এত দেখার আছে এই শহরে তবু বড় একা মনে হয়, যেন ওর কেউ নেই, প্রিয়জন

সংসার ত্যাগ করে গেলে সংসারের মানুষটির যেমন হয় সুভর প্রায় তেমন কিছু জীবনে ঘটে গেছে।

এখানে বসলে সব টের পাওয়া যায়। দরজা গলিয়ে হকার কাগজ দিয়ে গেলে সে বুঝতে পারবে। রামচরণ উঠে এলে ওর পায়ের শব্দে বুঝতে পারবে—রামচরণ উঠে আসছে। প্রীতি এলে ওর পায়ের শব্দে বুঝতে পারবে প্রীতি উঠে আসছে। আর অনু যদি উঠে আসে—অনু কতকাল এই সিঁড়িতে পা রাখে নি যেন, কতকাল সে আর সিঁড়িতে অনুর পায়ের শব্দ শুনতে পায় না। প্রথম প্রথম একা ঘরে থাকলেই মনে হত সিঁড়িতে কে যেন উঠে আসছে—প্রায় অনুর মত দ্রুত ওঠার অভ্যাস। সে ছুটে যেত, না, পাশের ফ্ল্যাটের দত্তবাবুর বড় মেয়ে। সে বসে থাকত—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, কে? অনু বুঝি! সে দ্রুত উঠে যেত। না, অনু নয়। অনুর সমবয়সী বৌ। বোসবাবুর বিধবা পুত্রবধূ। ওর তখন মনে হত সব মেয়েরাই একরকম করে সিঁড়ি ভাঙে, সব যুবতীরাই ভালবাসার কথা কয়, আর রক্তে বুঝি দ্রুত এক চরিত্রহীনতা কাজ করে, মুখে চোখে সেই চরিত্রহীনতার কোন ছাপ থাকে না। তুমি বাদে আমার আর অন্য ঠাকুর কে আছে, তুমি বাদে আমার জীবনে কোন সূর্য ওঠে না এমন মুখ করে ওরা বসে থাকে। অনুও বোধ হয় এখন এমন মুখ করে বসে থাকে। অসীম নামক সিনেমার ছোকরা ওর দরজায় এলে বুঝি অনুও এমন মুখ নিয়ে বসে থাকে।

ভিতরে ভিতরে সুভাষ ভোরের শুকতারাতে যে নির্মল রশ্মিটুকু আবিষ্কার করেছিল এখন মনে হল তা আবার কেমন নিভে গেছে। সে পায়চারি করতে থাকল। যেমন অন্যান্য দিন বাড়ি থাকার ইচ্ছা হয় না, বেলা হতে থাকলেই যেমন বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করে —কারণ এই এখন এক ভূতের রাজত্ব প্রায়, রাতে একা শুয়ে থাকলে ঘুম আসে না, অকারণ মনে হয় বেঁচে থাকা, যতক্ষণ প্রীতি কাছে কাছে থাকে ততক্ষণ সব কিছু ভুলে থাকা যায়, তারপরই মনে হয়

কি যেন ওর হারিয়ে গেছে—যা প্রায় পরাজয়ের সামিল। অনুর জন্য ওর যত না দুঃখবোধ, অনুর ভালবাসার জন্য যত না দুঃখবোধ তার চেয়ে গভীর দুঃখবোধে সে পীড়িত কারণ সে অসীম নামক এক যুবকের কাছে হেরে গেছে। সুতরাং যখনই অসীম নামক সিনেমার ছোকরার কথা মনে হয়, ভিতরের রক্ত প্রায় বিদ্যুতের মত তখন খেলা করতে থাকে। নিজের গলা তখন নিজে টিপে ধরতে ইচ্ছা যায়। অথবা এক হত্যাকাণ্ডের ছবি ওর চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তখন সে শ্বাস ফেলতে পারে না, শ্বাস ফেলতে ওর ভীষণ কষ্ট হয়। বুকের ভিতরটা কে যেন খালি করে দিয়েছে মনে হয়। বুক ভরে শ্বাস নিয়েও সে ভেতরটা সামান্য ভরে দিতে পারে না।

রামচরণ ঘরে ঢুকেই প্রথমে গ্যাসের উনুন জ্বেলে সুভাষকে চা এবং সামান্য ডিমভাজা করে দিলে সুভাষ বলল, কাগজ দিয়ে যায় নি রাম!

রামচরণ বলল, কৈ দেখছি না তো বাবু।

—আজকাল লোকটা কাগজটা দিতে দেরি করে।

—কিছু বলব ওকে?

—বলবি কাগজ তাড়াতাড়ি দিতে হবে। তাড়াতাড়ি না দিলে অন্য হকার দেখব।

—বলব বাবু।

সুভাষ অন্যমনস্ক মনে চা এবং ডিমভাজা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। একটা কিছু করতে হয়, মনে মনে ভাবল। এভাবে চুপচাপ বসে থাকা অথবা অকারণ বইপত্র নিয়ে ডুবে থাকতে আর ভাল লাগছে না। একবার ইচ্ছা হল মাসুদি সাবকে ফোন করে বলবে কিনা, কাল থেকে কাজে ফের যোগদান করছি। খবরটা দিলেই মাসুদি সাব ছুটে আসবে গাড়ি করে। তুমি চ্যাটার্জী ঠিক বলছ, কাজে যোগদান করবে! আমি তো উষারামকে বলে দিয়েছি, চ্যাটার্জীর মন মেজাজ ভাল নেই, সে দীর্ঘদিনের ছুটিতে আছে, তাকে আমরা

এখন তোমাকে লোন দিতে পারছি না। মাস্থদি সাব নানা রকমের কথা বলবে মন ভেজানোর জন্য। মাঝে দু তিনবার মাস্থদি সাব নিজে এসেছিলেন, পার্টিতে নিয়ে গেছেন। বড় হোটেলে নিয়ে গিয়ে অ্যাংলো যুবতীদের নাচ দেখতে দেখতে বলেছেন, লাইফটা দেখে নাও চ্যাটার্জী। বড় তুমি খুঁতখুঁতে লোক। সুন্দরী যুবতীরা নাচছে, লাল নীল কাগজের ফুল, হলুদ রঙের অথবা সাদা রঙের ঝাড়লণ্ঠনের মত কাচের ভিতর যুবতীদের যুবকদের জোড়ায় জোড়ায় ছবি। মদ এবং ভিন্ন ভিন্ন সব ভোজ্যদ্রব্যে ঘরময় যেন হাজার হাজার পাখি, লাল নীল রঙের পাখি কোন দূরের জলাশয়ের উদ্দেশ্যে অকারণ খাবারের লোভে ছুটছে। অকারণ বেলেল্লাপনা চারিদিকে। হোটেলের ব্যালকনিতে সামান্য অন্ধকারে, ভিন্ন ভিন্ন সব ছবি সে দেখতে পেয়েছিল। যুবতীর মুখে দুরারোগ্য ব্যাধির গন্ধের মত মদের গন্ধ, প্রায় আঁকড়ে ধরেছে প্রৌঢ় মানুষটিকে। অথবা টাকার বিনিময়ে লেজ তুলে খোলা আকাশের নীচে বাঁদরের মত ডিগবাজি খাচ্ছিল তারা। মাস্থদি সাব বললেন, চ্যাটার্জী ওখানে লাইফ হচ্ছে। ওখানে যাবে না। ওদিকে তাকাবে না।

মাস্থদি সাব চুটকি হাসলেন।

সুভ তাড়াতাড়ি অন্য দিকের বারান্দা ধরে নেমে এসেছিল। ওখানে লাইফ হচ্ছে কথাটা সুভাষের অনেকদিন পর যেন মনে পড়ল। এই সাধারণ যৌন ব্যাপারগুলো মাস্থদি সাব আদৌ কিছু মনে করেন না। ভোজ্যদ্রব্যের মত ব্যাপার। অন্নবস্ত্রের মত প্রয়োজনীয়। এক পাত্রে আহার অধিক দিন বাঞ্ছনীয় নয়। ভালও লাগে না। ঘরে বৌ বিবি আছে, থাকবে। খুব একটা খুঁতখুঁতানি রাখতে নেই। লাইফ ইজ এ গেম। সুভাষের মনে হল লাইফ ইজ এ স্কাউণ্ড্রেল। সে যে কি চায় বোঝা দায়। তার সব কিছুই চাই। ভাল যুবতী চাই, নির্মল জল চাই এবং প্রসন্ন অবকাশ চাই। স্ত্রীর ভালবাসা চাই। অথচ স্ত্রীর অন্য মানুষে আসক্তি এলে ঘৃণা শুধু ঘৃণা! অথচ

কি ছাখো জীবনে, এই যে প্রীতি এসে ঘুরঘুর করছে, জোয়ারের জলের মত ছুপাড় ভিজিয়ে রাখছে সব সময়, এবং অকারণ প্রীতিকে নিয়ে খোলা মাঠে কেবল ছুটতে ইচ্ছা করছে তার বেলাতে কোন দুঃখবোধ অথবা ঘৃণাবোধ থাকছে না।

সুভাষের এই অন্যমনস্কতা বেশী সময় থাকল না। রামচরণ খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। ছুটো কাগজ রাখার অভ্যাস সুভাষের। ইংরেজী দৈনিকটি সে প্রথম একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেবে। বাংলা দৈনিকটি সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। এখন কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে অথবা বলা যেতে পারে কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কিছুই ভাল লাগছিল না বলে সময় কাটানোর জন্য সচিত্র মাসিকও সে ছু তিনটে রাখছে। সাপ্তাহিক রাখছে। যে সব বই সে এক সময় সংগ্রহ করেছিল, সবই প্রায় নাটক সংক্রান্ত। সে সময়ে অসময়ে সে সব বইও পড়ছে। ভোরে যতক্ষণ বাড়ি থাকে বাংলা দৈনিকটাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাসের মত আজও পড়তে গিয়ে—চলচ্চিত্রের পাতায় এসে কেমন চোখটা থেমে গেল। ছুটো মুখ। খুব সংলগ্ন। সুটিং-এর প্রথম দিন। নূতন ছবির খবরে সে দেখল অনু এবং অসীমের ছবি পাশাপাশি। বসন ভূষণে স্বল্পতার জন্য সে প্রথম অনুকে প্রায় চিনতেই পারছিল না। পাশে অসীম খুব চালাক চতুর ছোকরার মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ ছবি থেকে কিছুতেই সরে আসছে না। ওর মনে হল আলোর স্বল্পতার জন্য অনুকে দেখতে পাচ্ছে না সে। আলোর জন্য সে উঠে দাঁড়াল। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। সে সেই আলোতে রাখতেই পত্রিকার ছবিটা আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠল। সে চোখের কাছে নিয়ে দেখল—না সে অনুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ওর মনে হল চোখের আলো কমে আসছে। ক্রমে শরীর শিথিল হয়ে এল, ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে হল—নটি! ওর আরও কি যেন বলার ইচ্ছা। কিন্তু রামচরণ ছুটে এল তখন এবং বলল, বাবু আমাকে ডাকছেন!

—না। বলে সে কাগজটা কেমন লুকিয়ে ফেলল। রামচরণের কাছে গোপন করার জন্য সে কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল। রামচরণ চলে যাচ্ছে দেখে ওর মনে হল বুকের ভেতরে তেষ্টা, কি যেন সেই জ্বালা, যা সে প্রায় নিরাময় করে এনেছিল, দীর্ঘ পাঁচ মাসের অদর্শনে যে অস্থিরতা ধীরে ধীরে মরে আসছিল, এই ছবি, যুগলে ছবি তার কাছে তখন মাঠের ভিতরে পরাভূত সৈনিকের নল নীচু করা বন্দুকের মত। এই প্রথম মনে হল অসীম নামক এক সিনেমার ছোকরা এসে ওর কাছ থেকে অনুকে কেড়ে নিয়ে গেল। তার সমস্ত পৌরুষ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। পরাভূত সৈনিকের শেষ জলপানের মত যেন সে রামচরণকে ডেকে বলল, আমাকে একটু জল দে রাম। আরও বলতে পারত, আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। আমি কি করব রাম। আমার আর কি থাকল।

সে কি করবে, কি করা উচিত, অনুকে ফোনে শেষবারের মত কটূক্তি অথবা প্রাচীন গল্পগাথার মত জীবনের অতীত ইতিহাস বলে উদ্বুদ্ধ করা যায় কিনা— তুমি এটা কি করলে অনু, যা আমি ভালবাসি না, আমার যা নোংরা এবং খুব ইতর বলে মনে হয়, তুমি ভেবে দেখ অনু, সেই প্রথম দেখার কথা, তুমি একটা বড় বাড়ির দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে, আমি তোমাদের নীলকুঠিতে দাঁড়িয়ে থাকতাম, সূর্য উঠত বুড়িগঙ্গায়, আইসক্রিমআলাকে ডেকে তুমি দুটো আইসক্রিম কিনতে, একটা আমার জন্য, একটা তোমার জন্য। আমারা হাঁটতে হাঁটতে যাদুকরের মত আকাশে কত অজস্র শ্বেত পায়রা উড়িয়ে দিয়েছি। তোমার গায়ে মখমলের জামা, পায়ে লাল রঙের জুতো, মাথায় সোনালি ফুল থাকত অথবা আমরা দৌড়ে দৌড়ে কতদিন বিলের ধারে নেমে গেছি। তুমি কিন্তু কোনদিন আমার সঙ্গে ছুটতে পার নি। তুমি অনেক পেছনে পড়ে থাকতে। আমি ফিরে আনতে গেলে তোমার মুখে দুঃখ এবং অভিমান ভেসে থাকত। তুমি হেরে গেছ বলে প্রায় তুমি কেঁদে ফেলতে। আমি কিন্তু অনু সত্যি বলছি,

তিন সত্য করছি—কোনদিন তোমাকে হারাতে চাই নি। বরং আমাকে হারিয়ে দিতে পারলে তুমি আনন্দ পেতে।

সুভ বসে থাকল। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেমন এক জরদগব পাখির মত মুখ করে বসে থাকল। সব সময় যে অবিশ্বাসের ছবি মাথার ভেতর ভেসে বেড়াত আজ যেন অনু তা সত্যে পরিণত করেছে। সন্দেহ সুভকে মাঝে প্রায় অমানুষ করে দিয়েছিল—এখন সেই অমানুষটাই আবার ফিরে ফিরে আসছে। অনু কত জায়গায় চলে যাবে। কত জায়গায় এখন ফুল ফোটাবে। অনু, সুন্দরী অনু, লাবণ্যে ভরা অনুর শরীরে এমন এক আকর্ষণ রয়েছে, মুখে চোখে এমন এক ভালবাসা রয়েছে অথবা জৌলুস ঠিক দুপুরের রোদে এক পাখির মত, কামনার পাখি। সুতরাং অনু ঘরের ভিতর, জানালার পাশে অথবা কোন নিঃসঙ্গ দুপুরে, গভীর রাত্রে যেভাবে ওকে কাছে টেনে পাগলের মত পিপাসা মেটাত, এখন সুভাষের চোখে সেই সব পিপাসা। অসীম অনুকে নিয়ে চলে যাবে। পরিচালক ভদ্রলোকটি, ফরাসী দেশের আদব কায়দা যার আচরণে এবং ছবি সম্পর্কে পূর্বে যা সে শুনেছে—মানুষটা নাকি নুভেলভাগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কি এক আন্দোলন—নুভেলভাগ কিংবা সব ভাগই এক ভাগ, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে যার হদিশ পাওয়া যায় না।

রামচরণ জল দিয়ে গেলে সে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে ফেলল। আকাশে আলো নেই মনে হল, বাতাস নেই মনে হল। চোখে মুখে ক্রমে গাঢ় অন্ধকার। চোখের ভিতর হালকা আগুনের ঝাপটা। সে উঠে দাঁড়াল এবার। হাত পা জোরে ছুঁড়ে দিতে চাইল। পাশের থামে সে কিসের উদ্দেশ্যে এমন এক ঘুষি মেরে দিল যা দেখে রামচরণ বিস্ময়ে হতবাক। সে ডেকে উঠল, বাবু বাবু!

সুভ বলল, রামচরণ তোর কত বয়েস হয়েছে রে!

—তা বাবু তিন কুড়ি হবে।

—যা বুদ্ধু। তোর আবার তিন কুড়ি বয়েস কবে হল?

—হ্যাঁ বাবু তিন কুড়িই হবে।

—তোর বয়েসটা তুই আমাকে দিয়ে দিবি?

—কি যে বলেন। কেমন লজ্জা পেল রামচরণ।

—আমার বয়সটা তুই নিয়ে নিতে পারিস।

মাথা খারাপের মত মনে হচ্ছে। বলল, বাবু আপনাকে চানের জল দেব?

—কেন? চানের জল কেন?

—রাতে আপনি নিশ্চয়ই ঘুমোন নি বাবু!

—আমি ঘুমোইনি তাতে তোর কি। খুব কথা বলতে শিখেছিস?

—রামচরণ থতমত খেয়ে বলল, না বাবু—যাই।

—তুমি যাও। লক্ষ্মী ছেলের মত চলে যাও। তোরা আর কত জ্বালাবি।

কেমন ক্ষেপে গেল এবার সুভ। সবাই মিলে তোরা কি পেয়েছিস? আমি কি পাগল! আমি কিছু বুঝি না মনে করিস?

রামচরণ কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। বাবুকে সে এমন কি বলেছে, যার জন্য বাবু তাকে অযথা গাল দিচ্ছে। সে বলল, আমি চলে যাচ্ছি বাবু।

—হ্যাঁ তুমি যাও। সুভ প্রায় চীৎকার করে বলতে চাইল। অথচ বলতে পারল না! কাকে যে চীৎকার করে কথা বলছে, রামচরণ সামান্য নফর ব্যক্তি, আচরণে সদা সন্ত্রস্ত, এখানে এসে পর্যন্ত যে সুখ দেখেনি, কেবল খিটিমিটি দেখেছে। সে চুপচাপ কাজ করে গেছে, কোন কোন দিন সাহসে ভর করে বলেছে—মামণিকে একবার খবর দেব, আপনার শরীর ভাল যাচ্ছে না, আপনি সারারাত ঘুমোননি, চোখ দেখলে টের পাওয়া যায়। না ঘুমোতে পেলে বাবু আপনি বাঁচবেন না, একবার যাব। ওর মনে হল আজও হয়ত অনেক কথা বলে ফেলতে পারে এই রামচরণ—সে ধমক না দিলে, হয়ত

মামণির খোঁজে বের হয়ে পড়তে পারত, বের হয়ে পড়লেই যেন ঘটনাটা সদর দরজা খুলে লোক অন্দরে ঢোকার মত ব্যাপারটা ঘটে যাবে, অন্থ মামণি বাইস্কোপে পাট করছে, সে প্রায় রুমাল উড়িয়ে অন্য সব ফ্ল্যাটবাসীদের কাছে সগৌরবে বলে দিতে পারে। অথবা অন্য কোন কারণ হবে, মানসিক স্থিতি কি সে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে! সে কি ক্রমশ জীবনের অমূল্য ধন হারিয়ে ফেলছে। সে দাঁড়াতে পারছিল না। অন্ধকার দেখছে চোখে মুখে। রাগে দুঃখে এবং অভিমানে ওর চোখ ভীষণ জ্বলছে। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। রামচরণ সামান্য এক নফর---সে টের পেলে অসম্মানের। সে রেলিঙের উপর ঝুঁকে থাকল---তার ভালবাসার ধন ক্রমে এক দূরবর্তী উপবনে উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

কতক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়িয়েছিল সে মনে করতে পারে নি। চোখ তুললে দেখল রামচরণ নেই। কোথাও এখন গা ঢাকা দিয়েছে। সে রামচরণকে ডেকে কিছু বলল না। সোজা ঘরে ঢুকে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়াল। গালের চামড়া টেনে টেনে দেখল। না, শক্ত চামড়া, মজবুত। খুব উদ্ধত দেখাচ্ছিল তাকে। সে আলমারি খুলে জামাকাপড় সব টেনে টেনে ফেলতে থাকল। ভোর রাতের বর্ষণের জন্য যে মাঠ-ঘাট পরিচ্ছন্ন ছিল, যে গাছ ফুল পাখি নির্মল মনে হচ্ছিল এখন সব আবার কেমন নোংরা এবং এই শহর বসবাসের অনুপযুক্ত···সে এই শহর ছেড়ে চলে যাবে এমন মেজাজ শরীরে মনে কাজ করছে। রামচরণ কোথায়, কোন্ দিকে থাকতে পারে এবং এই মেজাজের সঙ্গে রামচরণ ঠিক পরিচিত নয়, সুতরাং রামচরণকে ভীত দেখাতে পারে ভেবে মুখ তুলতেই সে দেখল দরজায় কেউ নেই। বোধহয় রামচরণ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। সে কেন সব টেনে টেনে নামাচ্ছে, কেন দরজা জানালা একবার বন্ধ করছে, কেন নিজেকে আয়নায় বার বার দেখছে বুঝতে পারছে না। সে হাতের পত্রিকাটা ঠেলে ঠুলে আলমারির ভিতরে যে ভাঁজ

করা কাপড় আছে তার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখল। মনে হল ওর জন্য আর ছবিটা কেউ দেখতে পাবে না, সকলের অলক্ষ্যে সে প্রায় কাজটা করে ফেলে কেমন পাগলের মত হাসতে থাকল—এ-সব করার কি মানে! এতক্ষণ পর যেন মনে হল প্রায় গোটা পৃথিবী জেনে ফেলেছে—অমু অভিনয় করছে। অমুর বিধবা যুবতীর রিহার্সেল এতদিনে কাজ দিল। সে কিছুতেই এত করেও খবরটা গোপন রাখতে পারল না।

যে অস্থিরতা ওকে পাগল প্রায় করে দিয়েছিল, যে অস্থিরতার জন্য সে ছুটোছুটি করছে তা ক্রমে সংক্রমিত হতে হতে ওকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলছে। চোখ ছুটো লাল দেখাচ্ছে। ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে। দেয়ালে বড় বড় ছবি। হিজিবিজি ছবি সব। সে এক ছুই করে দেয়াল থেকে সব ছবি নামিয়ে দেয়ালটা খালি করে দেখল কেমন দেখায়। সাদা দেয়ালে হাত রাখল। ঘুরে ঘুরে দেয়ালের চারপাশটায় কি দেখল। তারপর বাথরুমে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল, ভাল করে চান করল আজ। সারাক্ষণ জল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকল। বাথরুমের আয়নায় নিজের শরীর দেখল। বুকের পেশী দেখল। যেমন কুস্তিগীর ওঠাবসা করে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে নেয় তেমনি সে ছুবার ওঠাবসা করে মনের ভিতর সাহস সঞ্চয় করে নিল। ছুবার ছু বাহু ভাঁজ করে মাসল দেখল শরীরের। নিজের শক্ত গলা ছু হাতে ধরল প্রথম। ছুহাতে টিপে ধরল। কতক্ষণ সময় লাগে অথবা শ্বাস বন্ধ হলে গলার ভিতরটাতে কি কষ্ট থাকে সে অনুভব করতে চাইল। কোন্ জায়গায় টিপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হতে সময় কম নেবে, কম সময়ে কাজ হাসিল হবে,…সে ধরে রাখল গলাটা। টিপে ধরতে ছুটো চোখ গোলাকার দেখাল, চোখ ছুটো উঠে আসছে, মনে হল চোখ ছুটো এবার ঝুলে পড়বে। গোঁ গোঁ আওয়াজটা উঠতেই সে গলা ছেড়ে প্রথম বসে পড়ল। তারপর নিজের মৃত মুখের পাশে অন্য মুখের মৃত চোখ আবিষ্কার করে খুশী

খুশী গলায় শিস দিতে থাকল। আই মাস্ট কিল ইউ। মনে মনে উচ্চারণ করল সুভ। গলা টিপে হত্যা, নৃশংস, বরং অন্য পদ্ধতিতে। সে ভাবল, অন্য কোন পদ্ধতি নিতে গেলে জানাজানি হবে। আর জানাজানি হলেই কি ক্ষতির! সে গলাটা সাফ করার সময় ভিতরের হাঁ-টা দেখল। জানাজানি আজ হোক কাল হোক হবে। সে তো কাপুরুষের মত পালিয়ে পালিয়ে হত্যার দায়ে নিযুক্ত থাকছে না। সে সোজা অন্য সুসময়ে যেমন শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেত, আজও ঠিক তেমনি যাবে। সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে, মণিমাসির সঙ্গে দেখা হলে টুক করে যেমন প্রণাম করত, প্রণাম করে ফেলবে, এবং প্রৌঢ় মানুষটি এলে একেবারে আজানু প্রণিপাত। তখনই হয়ত পার্লারে অসীম হা হা করে হেসে উঠবে রসিকতা করার জন্য। অনু প্রায় অসীমের গায়ের উপর এলিয়ে যেন পান খেয়ে কিশোরীর মত ঠোঁট দেখাচ্ছে তেমন ভঙ্গীতে বসে ঠোঁট এবং জিভ এবং নীচের ঠোঁটে কি লাল আভা, শরীরে মনে কি লাল আভা, কত লাল আভা আছে দ্যাখো অসীম এমন এক ভঙ্গীতে বসে থাকার সময়ই সে তার নলটা ব্যবহার করবে। কিন্তু নলটা কোথায়, কোথা থেকে এই নল নিলে আপাতত কেউ টের পাবে না। সুভর কেমন জানি এ-সময় মুক্তিবাবুর কথা মনে হল। মুক্তিবাবু একমাত্র মানুষ যে কোম্পানির বিপদে মাসুদি সাবকে কলকাতার বুক থেকে বাঘের দুধ সংগ্রহ করে দিয়েছিল। তাকে দিয়ে কাজটা হাসিল করানো যায়। সে একবার ওপরআলা হিসাবে যখন ওর চাকুরি নষ্ট করতে দেয়নি তখন মুক্তিবাবু অবশ্যই কৃতজ্ঞতা বশে সুভকে না খুশী করে পারবে না।

এই তো সময় সুভকে খুশী করার।

সে স্নান সেরে খুব ঝকঝকে পোশাকে প্রথম ডায়াল করল, হ্যালো মাসুদি সাব আছেন?

—আছেন?

—একবার মাসুদি সাবকে দাও। আমি চ্যাটার্জী সাব বলছি।

ফোনেই অপারেটর বলল, গুডমর্নিং স্যার। আপনি স্যার কতদিন আসছেন না।

সুভ কড়া মেজাজে বলল, তুমি ফোনটা মাসুদি সাবকে দাও।

—হ্যালো!

—আমি চ্যাটার্জী বলছি স্যার।

—আরে কি খবর? ছুটির এক্সটেনসান চাইছ?

—না, তা বলছি না। আমার একটা গাড়ির দরকার।

—জান নূতন একটা গাড়ি ইমপোর্ট করেছি।

—না।

—নূতন গাড়িটাই পাঠাব।

—খুব ভাল হয় তা হলে।

—কবে জয়েন করবে ঠিক করলে?

—এখনও কিছু ঠিক করি নি। গাড়িটা দরকার হলে আজ আমার কাছে থাকবে কিন্তু।

—সে রাখো। ড্রাইভার?

—না দরকার নেই।

—ইমপোর্টেড কার। অসুবিধায় পড়তে পার।

—কোন অসুবিধা হবে না।

—লেফ্ট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভিং।

—কোন অসুবিধা হবে না।

—বাড়িতে একা একা বসে কি করছ?

—কিছু করছি না স্যার। শুধু ঘুমোচ্ছি।

—জীবনটাকে এ-ভাবে নষ্ট করে কি লাভ চ্যাটার্জী। কিছু যদি মনে না কর তবে দু চারটে কথা বন্ধুর মত বলতে পারি তোমাকে।

—একশ বার।

—তুমি ভাল থাক, তোমার মঙ্গল হয় এমনই আমি চাই।

শুভ মনে মনে স্কাউণ্ড্রেল কথাটা ভেবে ফেলল।

—শুনলাম তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না!

—না তেমন কিছু নয়।

—তোমার স্ত্রী সিনেমায় অভিনয় করছে।

সে বুঝল সব ফাঁস হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ করছে।

—এইতো লাইন চ্যাটার্জী। তোমার তো বরং খুশী হবার কথা। যার স্ত্রী এত লিনিয়েন্ট তার জীবনের মূল্যও বেড়ে যায়। তুমি চ্যাটার্জী কেন শুধু শুধু মাথা খারাপ করছ বুঝতে পারছি না।

—গাড়িটা পাঠাবেন স্যার। পরে কথা বলব। সে ফোনটা ছেড়ে দিল। তারপর হতাশ মুখে বসে থাকল কিছুক্ষণ। মাসুদি সাবের জন্ম এখানে। তিনি ভাল বাংলা বলতে পারেন। কিন্তু বাংলা পড়তে পারেন না। তার স্ত্রী অভিনয় করছে কি অন্য কোন অন্নু করছে সে জানল কি করে। অন্নুকে মুক্তিবাবু দেখেছে। পত্রিকায় ছবির মুখ দেখে নাম দেখে মুক্তিবাবু চিনে ফেলেছে। আর অফিস বসতে না বসতেই সে কথাটা চাউর করে দিয়েছে অফিসময়।

এখন আবার মনে হল প্রীতি বলে কোন যুবতী ওর কাছে পিঠে নেই। শুধু অন্নু আছে, এত চেষ্টা করে যাকে ভুলে থাকবে স্থির করেছিল, এবং মনে মনে প্রায় হালকাবোধ করছিল, তখন পত্রিকায় সামান্য যুগলে ছবি সুভাষের মাথা খারাপ করে দিল।

সে উঠে দাঁড়াল। ওর হাত পা কাঁপছে। সে বলল, স্কাউণ্ড্রেল।

সুভাষ ফের অফিসে ফোন করে এবার মুক্তিবাবুকে চাইল।—কে মুক্তিবাবু? আপনি এক্ষুণি একবার আমার বাসায় চলে আসুন। মাসুদি সাব গাড়ি পাঠাচ্ছে, আপনি সেই গাড়িতেই চলে আসুন। মাসুদি সাবকে আমার কথা বলবেন, বলবেন আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

—স্যার এক্ষুণি যাব ?

—হ্যাঁ এক্ষুণি চলে আসুন।

সুভাষ ফোন ছেড়ে দিল, সিগারেট ধরাল একটা। দু বার ম্যাচ জ্বালল। কিন্তু অন্যমনস্কতার দরুন সে দু বারই সিগারেট জ্বালতে ভুল করে ফেলল। ওর এখন কোন অনুশোচনা নেই। কেবল প্রতিহিংসাপরায়ণ এক মানুষের খেলা ভিতরে ভিতরে চলছে। এতদিন, প্রায় পাঁচ মাসই হবে ওর, প্রীতি হাঁসের মত লম্বা গলা তুলে তাকিয়ে থেকেছে, হাটে ঘাটে মাঠে এবং এই ঘরে প্রীতি সময়ে অসময়ে চলে এসেছে, প্রীতির মত যুবতী হয় না, অথচ সুভ কত অনায়াসে নিজের সংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সতী অসতী বোধ ওকে বার বার প্রীতির সহবাস থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করেছে। তবু তার ভালবাসা মনে মনে, যেন তুমি অনু যত দূরেই যাও আমার প্রীতি তত কাছে কাছে থাকছে। তোমাকে আমি কাছে না পেলে প্রীতির পাশে আমিও হাঁসের মত লম্বা গলা তুলে ধরব। তখন তুমি বলতে পারবে না বসন্তে কোকিল ডাকে না কেন ?

কি সব আজে বাজে কথা ওর মনে আসছে। সে চেষ্টা করছে খুব স্বাভাবিক থাকার। ওর মনে হচ্ছিল আচরণে এত উদ্বিগ্ন না থাকাই বাঞ্ছনীয়। রামচরণ তবে সব টের পেয়ে যাবে। সে স্নান সেরে নিয়েছে আজ। অফিস থেকে ছুটি নেবার পর তার স্নানের সময় ঠিক ছিল না। তবু এত তাড়াতাড়ি সে কোন দিন স্নান করে নি। স্নান সকাল সকাল করায় রামচরণ ভাবতে পারে, বাবু অফিস যাবেন। সে এক্ষুনি হয়তো ছুটে আসবে। সুতরাং রামচরণকে ডেকে বলল, কি রান্না করবি ?

—যা বলবেন।

—বাজারে যা। ভাল মাছ আনবি। বেশ তাজা মাছ। বেশী করে আনবি। মেটে আনবি। তাজা মেটে। মটরশুঁটি আনবি। সবুজ তাজা মটরশুঁটি। দই আনবি। তোর যা পছন্দ, খুব ভাল-

ভাবে রান্না করবি। বেশ নানা রকমের রান্না। কতদিন তোর হাতের ভাল মন্দ খেতে ভুলে গেছি।

তখন গাড়ির শব্দ নীচে। সুভ রামচরণকে বাজার করার জন্য দুটো দশ টাকার নোট বের করে দিল।

—প্রীতি দিদিমণি খাবে এখানে আজ?

ভাল কথা। প্রীতিকে বললে মন্দ হয় না। সে বলল, রান্নার দেরি হয়ে যাবে না? দশটা তো বাজে।

—আমি সব তাড়াতাড়ি করে ফেলব। একটার ভিতর সব সারা হয়ে যাবে। বলে রামচরণ দেরি করল না। প্রায় বালকের মত ছুটে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল।

মুক্তিবাবু ওঠার সময় দেখল সিঁড়িতে রামচরণ। সে তাকে প্রশ্ন করল, সাবের মেজাজ কেমন?

রামচরণ বলল, খুব ভাল। সোজা ওপরে উঠে যান।

—সাব কি করছে?

—বসে আছে। স্নান সেরে স্যুট কোট পরে আছেন।

—কোথাও বের হবেন?

—না।

মুক্তিবাবু ওঠার সময় সিঁড়ির দু পাশে লক্ষ্য রাখল। কেমন ভীতু মুখে সে প্রথম দরজার সামনে দাঁড়ালে সুভ ডাকল, কে!

—আমি স্যার, মুক্তিবাবু।

—ভিতরে আসুন।

ভিতরে ঢুকলে সুভাষ দরজা বন্ধ করে দিল।

—স্যার আপনার গাড়ি এসেছে।

—ঠিক আছে। বসুন। বলে সে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল।

—আপনার শরীর কেমন? সুভাষ খুব অন্তরঙ্গ গলায় প্রশ্ন করল।

—ভাল না স্যার।

সুভাষ মুক্তিবাবুর মুখের রেখা দেখল। কপালে নানা রকমের ভাঁজ। মুখ কুঁচকে গেছে। চোখ দুটো সাদা সাদা। বোধ হয় রক্তহীনতায় তিনি ভুগছেন। সারা জীবন মানুষটা মাসুদি সাবকে নানা রকমের দুষ্টু বুদ্ধি দিয়ে কালো বাজার থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে সাহায্য করেছে। এবং নিজেও প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারত। প্রিয়দর্শন নয় বলে যুবতী স্ত্রীর কাছে অর্থের বিনিময়ে প্রেম চেয়েছিল। যুবতী স্ত্রী মুক্তিবাবুকে অন্ধকারে রেখে কোথাকার এক যাত্রাগানের যুবকের সঙ্গে প্রেম করছে। সেদিন মুক্তিবাবুর চাকুরির বিনিময়ে যেমন তার জীবন রহস্যের খানিকটা আঁচ পেয়েছিল সুভ আজ তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে একটা খবর নেবার প্রলোভনে মুক্তি বাবুকে প্রায় আপনার জনের মত প্রশ্ন করল, আপনার স্ত্রীর খবর কি? সেই যাত্রা গানের লোকটা আসে?

—আসে স্যার।

—আপনি কিছু বলতে পারেন না?

—বললে, যাও ওকে দেখতে পাচ্ছি, তাও দেখতে পাব না। আমাকে ফেলে চলে যাবে। ও চলে গেলে কি নিয়ে বাঁচব স্যার?

সুভাষ চুপ করে থাকল কিছু সময়। তারপর বলল, আপনার বয়সকালের কথা এখন মনে পড়ে না মুক্তিবাবু?

—মনে পড়ে।

—তখন তো শুনেছি সব অসাধ্য সাধন করেছেন।

—করেছি স্যার।

—এখন করতে পারেন না? কোথাকার কে এক উটকো লোক এসে আপনার জীবন বিপন্ন করে তুলছে, আপনি পারেন না তাকে সরিয়ে দিতে?

—সব পারি স্যার। আপনাদের পায়ের আশীর্বাদে সব পারি। কিন্তু কি জানেন…বলে মুক্তিবাবু থেমে গেল। যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে

না, অথবা কি ভাবে প্রকাশ করলে ঠিক বলা হবে, তার ভিতরে যে আগুন জ্বলছে নিয়ত তার কি ভাবে প্রকাশ হবে ভেবে উঠতে পারল না।

সুভাষই বুঝি কথাটার খেই ধরিয়ে দিল, যুবতী মেয়ের মুখ আপনি তবে আর দেখতে পাবেন না। অথবা বলার ইচ্ছা হল সুভাষের, আপনি মুক্তিবাবু সহবাসে এখনও পটু আছেন? যুবতী স্ত্রী সন্ধ্যা হলে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে? আপনার পাশে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ঠোঁট ভেজাতে ভালবাসে?

—জানি না কি যাদু আছে স্যার। ওর মুখ দেখলে আমার আর সুখের অন্ত থাকে না।

খচ্চর। সুভাষ বলতে পারত ইতর অথবা প্রায় কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাপার। সে বলতে পারত বাপু, তোমার অক্ষমতা তোমার প্রেম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার কি অক্ষমতা, বলো বাপু আমার কি অক্ষমতা আছে যে আমার প্রেম অপরে কেড়ে নিল, বড় জলাশয় কে আর আমার মত পার হতে পারে। আমি দু বাহু তুলে, যত বড় জলাশয়ই তুমি পার করে দিতে বল না, আমার সাধ্য আছে আমি অনায়াসে তা পার করে দিতে পারি। তোমার যুবতী বৌ, প্রীতি এবং কত এমন ছোট বড় মাঝারি জলাশয় আছে। জলাশয়ে আমি সহজে নামি না, অবগাহন করি না, আমার প্রিয় এক জলাশয় ছিল, কতভাবে অবগাহন করেছি। সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে, ভোরে, বিকালে, রাতে, মাঝরাতে অথবা পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের আলোতে আমরা উভয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে যখন ক্লান্ত তখন দুজনে দুই পারে বসে আলো এবং ইচ্ছার গান গেয়েছি। তবে কেন আমার প্রেম অপরে কেড়ে নিল বাপু।

সুভাষ যেন মুক্তিবাবুর কথার উত্তর দিতে পারছে না, তেমন এক ভঙ্গী নিয়ে পায়ের উপর পা রেখে বসে থাকল। তারপর সহসা

মনে হবার মত বলল, অফিসের কাজকর্মে আর আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো!

—না স্যার। সেই থেকে মাসুদি সাব আমাকে দিয়ে আর কোন অপকর্ম করাতে সাহস পাচ্ছেন না।

—তা হলে মনে শান্তি ফিরে পেয়েছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে এবার আমার একটা উপকার করে ফেলুন।

—আপনার উপকার! কি যে বলেন! আমি আপনার উপকার করতে পারি!

—আপনিই পারেন।

—লজ্জা দিচ্ছেন কেন স্যার। আপনি আমার কোন উপকার নেবেন?

—খুব দরকার। আপনাকে ছাড়া এ ব্যাপারে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

—বলেন কি স্যার! এমন উপকারে আমি আপনার আসব! মুক্তিবাবুর চোখে মুখে বিগলিত ভাব ফুটে উঠল।

সুভাষ এবার ফিস ফিস করে কি যেন কানের কাছে গিয়ে বলল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বলল, আজই দেবেন। মানুষের মন তো! কাল আবার কি মেজাজ থাকে বলতে পারি না।

মুক্তিবাবু প্রায় বাজপড়া মানুষের মত বসেছিল। এমন মানুষ গুলিগোলা দিয়ে কি করবে! এমন সরল এবং সৎ মানুষ হয় না। কাজে এমন নিষ্ঠা মুক্তিবাবু মানুষের ভিতর এই প্রথম দেখেছে। মাসুদি অ্যাণ্ড কোম্পানির রবরবা একা এই এক মানুষ ধরে রেখেছিল। সে প্রথম সুভাষের কথার কোন জবাব দিতে পারল না। সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন সময়ে বিবাহ করলে তার ঘরে এমন এক উপযুক্ত পুত্র

থাকতে পারত। মুক্তিবাবু এবার বললেন, স্যার আপনি আমাকে এটা কি বললেন?

—কেন আপনার অসুবিধা আছে?

—না। কোন অসুবিধা নেই। তবু আপনার এ উপকারটা আমি করতে পারব না।

—আপনি ভুল বুঝছেন মুক্তিবাবু। আপনি ভেবেছেন আমি কোথাও সাংঘাতিক কিছু করতে যাচ্ছি।

মুক্তিবাবু উত্তর করল না।

সুভাষ নিজের মনেই জোরে হা হা করে হেসে উঠল।—আপনি ভেবেছেন আমি আত্মহত্যা টাত্মহত্যা করব। সিলি ব্যাপারে আমি নেই। এমন শক্ত মানুষ, আমার মা বলতেন, আমার নাকি নৌকার মাঝির মত চেহারা! এমন চেহারার মানুষ সেন্টিমেণ্টাল কিছু কোনদিন করে না। বরং বলতে পারেন প্রায় আত্মরক্ষার্থেই দরকার। আপনার কাছে তো কোন উপকার আশা করিনি, কিন্তু এখন এ সব ব্যাপারে কেন জানি মনে হয় একমাত্র মুক্তিবাবুই খোলা পথ দেখাতে পারেন। ভাবলাম তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অতি সহজে এটা আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন।

—দেব স্যার। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন···বলে কেমন আমতা আমতা করতে থাকল।

—অসুবিধা হলে করতে হবে না। সুভাষ মুক্তিবাবুকে পরীক্ষা করতে চাইল।

—খুব সামান্য ব্যাপার। কোন অসুবিধা হবে না।

—চা খান। বলে রামচরণকে ডাকতে উঠে গেল সুভাষ। তারপর মনে হল রামচরণ বাড়ি নেই। সে বাজার গেছে।

মুক্তিবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, আজ থাক স্যার, অন্যদিন এসে চা খাব

—কখন আসছেন?

—বিকেলেই দিয়ে যাব। বলে মুক্তিবাবু বের হয়ে গেল।

সুভাষ ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। সে যেমন ছেলেবেলাতে এক দুই তিন করে কড়িকাঠ গুনত ঘুমোনোর আগে আজ তেমনি কড়িকাঠ গুনতে থাকল। কেন এই গোনা! সে কেমন উদ্দেশ্য-বিহীন হয়ে পড়ল। জীবন পণ করে যে জীবনের জন্য সংগ্রাম তা ধীরে ধীরে কেমন মরে আসছে। কার জন্য আর সংগ্রাম, কে এই সংগ্রামের ভাগীদার হবে। উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের প্রতি ক্রমশ বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে। অথবা মনে হয় যত অনু দূরে সরে গেল তত সে মনে মনে অনুর জন্য গভীর এক অভিমান নিয়ে পলাতক আসামীর মত কেবল সেই শুভ দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় আছে। সব মেঘ কেটে যাবে, ক্রমশ রোদ উঠবে, ফুল ফুটবে। অনু ফিরে এসে বলবে, আমার ভুল হয়েছে সুভ, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে আমার আর কে আছে ক্ষমা করার। কত প্রতীক্ষায় কতদিন গেছে। কত রাত সে নিদ্রাহীন কাটিয়েছে। ভোরে উঠে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আঁতকে উঠেছে। সব অপমান, অভিমান ভুলে যাবার জন্য যে দিকে দু চোখ যায় ফের ছুটে বেরিয়ে গেছে।

আর এখন মনে হয় অনু তার নির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে। সে এই চাইছিল। সুভাষের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। যেমন ফুলের গাছে লোকে ফুল চুরি যাবার ভয়ে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে রাখে, সুভ অনুর শরীরে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে ফুল চুরির ভয় থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল। অনুর শরীরে সেতু নির্মাণের ইচ্ছায় অজ্ঞানে জননী করে দিল। কেবল মনে পড়ে যুবতীরা এখন আর জননী হতে চায় না। প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে অথবা খোলা মাঠে, বর্ষায় কদম ফুলের মত ভেজার ইচ্ছা। সুভর মুখে কিছু তেতো জল উঠে এল। অনিয়ম করে শরীরের এই চেহারা হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় কেমন ফিক্ ব্যথা অন্ত্রের ভিতর। বুক বেয়ে তেতো জল জিভে

এসে লাগতেই সে বাথরুমে ছুটে গেল। মুখটা ধুয়ে ফেলল। এখনও রামচরণ আসছে না। সে আর এখন কিছু মন্দ ভাববে না। সে সব সময় উৎফুল্ল থাকার চেষ্টা করল।

কিন্তু কিছুতেই কেন জানি উৎফুল্ল থাকা যায় না। ভয়ঙ্কর অন্তর্দাহে সে পুড়ে মরছে। এ সময় প্রীতি কাছে থাকলে এত কষ্ট হত না। পরস্পর কথা বলতে পারলে বোধ হয় দুঃখ লাঘব হত। সে উঠে গেল ভিতরের ঘরে, তারপর ফোনে বলল, ডাক্তার প্রীতি আছেন।

দাসবাবু ফোন ধরেছেন। বললেন, আপনি কে বলছেন।

—আমি সুভাষবাবু বলছি।

—আছেন। ডেকে দেব?

—দিন।

—হ্যালো।

—কে প্রীতি। শুনুন। আমি রামচরণকে পাঠিয়েছি বাজারে। আজ রান্নাবান্না হচ্ছে। সেদিন নিজে রান্না করে খাইয়ে গেলেন, আজ রামচরণ আমাদের রান্না করে খাওয়াবে। আসতে হবে কিন্তু।

—কখন!

—দুপুরে।

—এখন তো সাড়ে দশটা বাজে।

—রামচরণ খুব করিতকর্মা লোক। সে রান্না করতে বেশী সময় নেয় না।

—কিন্তু!

—কিন্তু টিন্তু নয়।

—একটু অসুবিধা আছে। আজ থাক।

মুখে আবার তেতো জল উঠে এল। মুখে সামান্য অপমানের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে তবু যতটা পারল গলা পরিষ্কার করে বলল, কি এমন অসুবিধা?

—আছে। সামান্য হাসল প্রীতি।

—বলতে দোষ আছে?

—আমি ডাক্তার মানুষ সুভাষবাবু।

—অঃ। সুভাষ আর কিছু বলল না। ফোন ছেড়ে দিল। যুবতীরা তবে কোন কোন সময় কর্তব্যপরায়ণ হয়! অসুখ-বিসুখ নিয়ে কারবার। হুট করে বললে আর হুট করে যাওয়া যায় না। সংসারে একমাত্র অকর্মা মানুষ সে নিজে। সে এবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। এবং উঁকি দিয়ে দেখল ঝকঝকে গাড়িটা নীচে পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সে আর দেরি করল না। কেবল রামচরণের জন্য সামান্য অপেক্ষা করল। রামচরণ এলে সে বলল, তোর মত রান্না করে নে। আমাকে একটা জরুরী কাজে বের হতে হবে।

—বাঃ প্রীতি দিদিমণি খাবে বললেন, আমি দিদিমণিকে বলে এলাম। তিনি আসবেন বললেন।

—প্রীতি আসছে!

—বললেন তো আসছেন।

—ঠিক আছে। এলে বসতে বলবি। আমি ঘুরে এক্ষুণি চলে আসব। এসে স্নান করে তাড়াতাড়ি আমরা খেয়ে নেব। প্রীতি যদি স্নান না করে আসে, আমি আসার আগেই স্নানটা সেরে নিতে বলবি।

—বলব। বোধ হয়, এই পরিকল্পনা রামচরণের মর্জিমত হল না। একজন অতিথি আসবেন খেতে, আর অসময়ে তিনি বের হয়ে পড়ছেন। সে কোন কথা না বলে রান্না ঘরে ঢুকে গেল।

সুভাষ নীচে নেমে ড্রাইভারকে বলল, তুমি বাপু যাও। সে ড্রাইভারকে দুটো টাকা বখশিস দিল। তারপর নিজের মর্জিমত গাড়িতে উঠে কোন্ দিকে গেলে দু চোখের ছায়ায় গ্রাম মাঠ সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের ছবি ফুটে উঠবে ভাবতে লাগল। এই এক নিয়ম

জীবনে এসে গেছে। যখন কিছু ভাল লাগে না, বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, দিন নেই রাত নেই কি যেন তার হারিয়ে গেছে ভাব, না পেলে সবই গেল, কি আর থাকল জীবন ধারণে, অথবা কে বুঝি তার প্রিয় খেলনা চুরি করে এখন তামাশা দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি কাউকে ক্ষমা করব না! আমি কোনদিন কোন যুবতীকে ভালবাসি নি অন্নু, তোমাকে ভালবেসে এতদূর চলে এসেছি, এখন যে প্রীতিকে দেখছ, সে প্রায় বেঁচে থাকার জন্য, সে না থাকলে এতদিন তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারতাম না। প্রীতি আমাকে তোমার জন্য বাঁচতে সাহায্য করছে।

অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে এখন। একা একা বিড় বিড় করে কথা বলার অভ্যাস। হাঁটলে ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে। সে এখন মনের ভিতর আর কিছু যেন গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। যা কিছু অন্তরের সব এখন চোখে মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। উত্তেজনাতে সে চীৎকার করতে চাইছে। দ্যাখো দ্যাখো আমার অন্নুকে কারা কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমি নাচার মানুষ। আমার অহমিকা অভিমান আমাকে নাচার করেছে!

সুভ ঝকঝকে গাড়িটা নিয়ে একবার ভাবল তক্ষুনি সেই বাড়িটাতে যায়। যেখানে অন্নু ব্যালকনিতে বসে বাতাবিলেবুর গন্ধ নিচ্ছে। ওর শরীর এখন ভাল। আর পাঁচ মাস বাদে অন্নু জননী হবে। পাঁচ মাসের সন্তান পেটে অন্নু কি করে ছবির পর্দায় কাজ করবে ভেবে উঠতে পারল না। তারপর সেই দৃশ্য মনে এল, বিধবা যুবতীর দৃশ্য। সুভাষ যে দৃশ্যটা অফিস ফেরত একদিন বাড়ি ফিরে দেখেছিল, যা দেখে সুভাষের কি না মাথা খারাপ, তুমি অসতী বলার চেষ্টাতে সে চীৎকার করতে গিয়ে দেখেছিল, ওর চোখ ফেটে জল বের হচ্ছে। সে অন্নুকে কোন অসম্মানের কথা আর বলতে পারেনি।

পুলিশের হাত দেখে সে গাড়িটা থামাল। সে এখন কোথায়

কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। আপন মনে চলে যাওয়া। মনের ভিতরে স্মৃতি কাজ করছে। বাইরে বের হলেই মনটা কেমন হালকা লাগে অন্যদিন। কিন্তু আজ সে কিছুতেই উৎফুল্ল হতে পারছে না। উৎফুল্ল হতে পারলে বুঝি মনে হত—আমিও অনু কম যাই না। আমিও দেখব কতদূর যাওয়া যায়। পাপ এবং অনাচার আমায় কত শীর্ষে পৌঁছায় দেখব। অথবা বলার ইচ্ছা এই যে অনু তুমি যার গরবে পা ফেল না মাটিতে, আমি তাকে হত্যা করব। আমার হত্যায় কোন অহমিকা থাকবে না। আমি বিনীত যুবকের মত বলব, আমি তোমাকে বাপু হত্যা করলাম। আমার জলাশয়ে তুমি অবগাহন করবে, তীরে দাঁড়িয়ে আমি তা দেখতে পারি না। আমি তোমাকে ইচ্ছা করলে গলা টিপে হত্যা করতে পারি। বীভৎস দেখাবে, মৃত্যুটা তোমার অন্তত বীরের মত হোক। আমি কাপুরুষের মত তোমাকে হত্যা করব না। হত্যার আগে তোমাকে সময় দেব। তুমি ইচ্ছা করলে পালাতে পারবে।

যেতে যেতে কত রকমের বিচিত্র চিন্তা মনের ভিতরে তোলপাড় করছিল। এই হত্যার পরের ছবি, কাগজে ছবি এবং অন্য অনেক চিন্তা—ঠিক ফাঁসির আসামী যেমন গলায় দড়ি দেখে মুখ হাঁ করে রাখে সে তেমনি মুখ হাঁ করে নিজেকে দেখল। এর দরকার আছে —সে নিজেকে বোঝাতে চাইল। অনু এমন করতে পারে, আমি অনুকে শাস্তি দেব না। আমি শাস্তি দেব না। শাস্তি দেব না। দেব না। সে বিড় বিড় করে হাজার বার দেব না বলল। প্রায় বীজমন্ত্রের মত অথবা ঈশ্বর চিন্তার মত। মাথাটার ভিতর দপ দপ করছিল। স্পিড অজ্ঞাতেই গাড়ীর বেড়ে যাচ্ছে। পাশে ট্রাম বাস পার হয়ে সে চিড়িয়াখানা ডাইনে ফেলে এগুতে থাকল। এবং এই চিড়িয়াখানায় সে অনুকে নিয়ে কোথায় কিভাবে বসেছিল প্রথম যৌবনে, একে একে সব মনে পড়ছে। বিয়ের আগে অনু যে সব আস্বাদের সুযোগ সুভকে দিয়েছিল হাটে

মাঠে এবং কোন গাছ-গাছালির নিরালাতে, এখন সেই সব সুযোগ বুঝি অনু অসীমকে এনে দিচ্ছে। লোকালয়ের সামান্য বাইরে গেলেই উভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠত। এখন আর সুভাষের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে না, অন্য এক পুরুষ, নাম অসীম, এক যুবক, যার মত সরল সহজ যুবক হয় না, অনুর মতে এমন সরল সহজ যুবকের দেখা পাওয়া নিরন্তর ঘটে না—হায় অনু তুমি জান না যুবকেরা কিসের প্রত্যাশায় যুবতীর পাশে হেঁটে বেড়ায়। এক প্রত্যাশা তাদের। যুবকের কাছে যুবতীরা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। নরম সিল্কের ভিতর তোমার পুষ্ট বাহুর কথা আমি ভুলে গেছি।

গাড়িটাকে সে কোথায় এনে ফেলেছে! চারিদিকে ধানখেত। নারকেলের ছায়া এবং কুঞ্জবনের মত মনে হল জায়গাটা। সে গাড়িটা পার্ক করে ধানক্ষেত মাড়িয়ে হাঁটতে থাকল। সামনে এক কুঞ্জবন আছে। রোদ উঠে চারিদিকটা বড় লাবণ্যময় করে রাখছে। সে ছোট ছোট আলপথে হেঁটে যেতে থাকল। দাঁড়ি কমাবিহীন এলোমেলো চিন্তা। সে পুরোপুরি একটা বাক্য গঠন করতে পারছে না। সে এবার ভাবল মাথাটাতে বুঝি আর পদার্থ নেই। সে সব কিছু ভুলে থাকার জন্য গাছ-গাছালি ভরা বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। পরিচ্ছন্ন আকাশ, পুবে পশ্চিমে যে দিকে তাকাও আদিগন্ত মাঠ, দূরে রেললাইন, এবং শহর থেকে ঝকঝকে ইতস্তত মোটরগাড়ি, ট্রাক, কখনও যাত্রিবাহী বাস ক্রমাগত দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে প্রায় যেন নিজেকে এই গাছ-গাছালির ভিতর অদৃশ্য করে দিল। কোমল দূর্বা ঘাস, সবুজ পাতা পেয়ারা গাছের, খেজুরের ছায়া দুপাশে, তারপর ছোট্ট একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ মিলে গেল। সাদা কাঞ্চন ফুল, গাছটাকে একেবারে নির্মল করে রেখেছে। নিচে মসৃণ ঘাস। কিছু কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি ঠিক প্রজাপতির ডানার মত পড়ে আছে। সে কেন জানি এই নিরিবিলি আশ্রয়টুকু

বেছে নিল। কতদিন পর, কতকাল পর সেই কৈশোরের মত এমন এক নিরালা আশ্রয় আবিষ্কার করে সে নড়তে পারল না। সে গাছটার নীচে দাঁড়াল। ওপরে সূর্য তেমনি কিরণ দিচ্ছে। সে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। গাছটার সাদা সাদা ফুলের ভিতর পাতা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। ফুল এত ঘন এবং নিবিড় যে তার ছায়া প্রায় গাছের মত। সে প্রথম বসে পড়ল। পা ছড়িয়ে দিল। তারপর কেন জানি, হাত পা বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। বুকের উপর হাত রেখে সে শুয়ে থাকল। কোথাও আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। একটা কাক ডাকছে অনবরত, কিছু পাখ-পাখালির শব্দ কানে আসছে। আর ভিন্ন ভিন্ন কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। চারিদিকে রোদ খা খা করছিল, দূরে কেউ হয়তো এই বনের ভিতর কাঠ কাটছে। কাঠ কাটার শব্দ এমন নির্জন নিঃসঙ্গ মাঠে বিচিত্র এক অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল। সুভ যেন মরে যাচ্ছে, কেউ কোথাও নেই। ছায়াহীন শব্দহীন মাঠে তাকে কে যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সে চোখ বুজে আরও দূরের শব্দ শোনার চেষ্টা করলে মনে হল সা-সা করে এক উত্তরের পাখি দক্ষিণে যায়। আবার শীত আসবে, শীতের ভয়ে উত্তরের পাখিরা সব দক্ষিণে চলে যায়। জীবন যাপনে সেই এক উত্তরের হাওয়ার ভয়। কখন মনের ভিতর উত্তরের হাওয়াটা উঠবে কেউ যেন টের করতে পারে না অথবা মনে হয় প্রাণের ভিতরে আমরা সব ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ায় কেবল উড়ছি। দক্ষিণের হাওয়া লাগলেই পাল খাটিয়ে সমুদ্রে চলে যেতে ইচ্ছা হয়। হায়, আমরা জানি না সমুদ্রেও উত্তুরে হাওয়া আছে।

বস্তুত সুভ এখন কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না। অথবা যে হত্যাকাণ্ডের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে তা অতি নাটকীয় দেখাবে ভাবতেই গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই অসীমের মুখ, অনু এবং অসীমের ভালবাসার মুখ আবিষ্কার করতেই ভিতরে কেমন ছটফট করতে থাকল। বুকের ভিতরে তীক্ষ্ণ ব্যথা। অপমান

অনুশোচনা সব কিছু আবার কেমন পাগল করে দিল সুভকে। সে আর শুয়ে থাকতে পারল না। খাঁ খাঁ মাঠে সে ছুটে বেড়াল। এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট অনুর জন্য এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল। সে ছুটে বেড়াল।

বেলা পড়তেই মনে হল মুক্তিবাবু আসবেন। সে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। লোকালয়বিহীন এক মাঠ থেকে দ্রুত শহরের ইট কাঠের ভিতর ঢুকে গেল। অঞ্চলটা বরিষা। এবং ট্রাম লাইন পেতেই সে ফের গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। এবং এতক্ষণ পরে মনে হল প্রীতির আসার কথা। প্রীতি এসে বসে থাকবে। সে প্রীতিকে পর্যন্ত ভুলে খাঁ খাঁ মাঠে কেবল ছুটছিল। যুগলে ছবি দেখার পর সে যত ভেবেছিল সারাদিন উৎফুল্ল থাকবে, সারাদিন এমন কিছু করবে না যা অস্বাভাবিক, বরং সরল সহজ মানুষের মত কথায় কথায় হাসবে, কথায় কথায় বোকা বনে যাবে, এমন এক ভাব থাকবে যেন নগরীর সে মানুষ নয়—সে গ্রামের মানুষ অথচ সারাটা দিন সে কেবল অস্বাভাবিক ভাবে নিজেকে নিয়ে ঘোড়দৌড় করায় নি, প্রীতিকে নিমন্ত্রণ করে অসম্মান করেছে। সে ফের গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল এবং সিঁড়ি ধরে ওঠার মুখেই দেখল ব্যালকনিতে বসে প্রীতি। মুখের উপর বই। বোধ হয় বই পড়তে পড়তে এবং সুভর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুভাষ ঘরে ঢুকে দেখল রামচরণ রান্নাঘরে বসে আছে। কোন শব্দ নেই। সেও কি ঘুমোচ্ছে! কেমন প্রস্তরীভূত মনে হচ্ছে বাড়িটাকে। সে ধীরে ধীরে রামচরণকে ডাকল।

—কে বাবু! কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো! প্রীতি দিদিমণি আপনার জন্যে বসে বসে বুঝি চলে গেল। হতাশার সঙ্গে কথাগুলো বলল রামচরণ।

—যায় নি।

—যায় নি! বাবু আমার পর্যন্ত ঝিমুনি ধরেছিল।

সুভাষ ঠোঁটে আঙুল রাখল। সে পা টিপে টিপে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখল প্রীতি যথার্থই ঘুমোচ্ছে। হাঁ করা মুখ। একটু একটু করে লালা গড়াচ্ছে। এখন মনেই হয় না এই প্রীতি সেই প্রীতি। মনেই হয় না ডাক্তার প্রীতির মুখ এটা। কেমন এক অসহায় যুবতীর মুখ।

সে ধীরে ধীরে ডাকল, প্রীতি! প্রীতি! উঠুন। আমার বড় দেরি হয়ে গেল। মাপ করবেন।

প্রীতি চোখ খুলে তাকাল। নির্বোধের মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। বুঝি প্রীতি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। এবং লজ্জায় কেমন বিব্রত বোধ করল। সে আঁচল টেনে প্রথমে গা ঢেকে তারপর নিজেকে গুছিয়ে বলল, আপনি তো মশাই আচ্ছা মানুষ।

—আমাকে মাপ করবেন প্রীতি।

—সব খাবার তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—আপনার কষ্ট হবে প্রীতি।

—আমার হবে না। ঠাণ্ডা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে। কখন কোথায় ডাকে বের হতে হয়, কখন ফিরি ঠিক থাকে না। প্রীতি নিজেই উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিল। তারপর রামচরণকে খাবার গরম করতে বলে বলল, অবেলায় খেলে আপনার শরীর ঠিক খারাপ করবে।

—আমার কিছুতেই খারাপ হয় না প্রীতি। বলে প্রীতির দিকে সরল বালকের মত তাকিয়ে থাকল।

রামচরণ বলল, বাবু, মুক্তিবাবু আপনাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে। বলেছে, ওটা যেন আপনার হাতেই দিই।

—চীৎকার করবি না রামচরণ। বড় জোরে কথা বলতে পারিস। বলে দ্রুত সে প্যাকেট হাতে নিল তারপর সকলের অলক্ষ্যে প্যাকেটটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিল। টেনে টেনে দেখল ড্রয়ারটা,

টান দিলে খোলে কি না—তারপর কেমন নিশ্চিন্ত আয়াসে সে একটা সিগারেট ধরালে—ফের প্রীতির ধমক—কি হচ্ছে! এখন খাবেন, আর সিগারেট না খেলে চলত না?

প্রায় যেন অনুর মত কথা বলছে প্রীতি। সেই এক শাসনের সুর। যার জন্য প্রথম প্রথম সুভাষ খুব কম সিগারেট খেত। শেষ দিকে সুভর প্রতি বোধ হয় অনুর নজর দেবার তেমন সুযোগ হয় নি, ক্রমে মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। সে এখন খেতে বসলেও সিগারেট জ্বালিয়ে বসে। অনু চলে যাবার পর সব কিছুই বেড়ে গেল, এবং কিঞ্চিৎ অন্য নেশাও এখন সুভকে গিলতে হচ্ছে।

সুতরাং সে সিগারেট নিভিয়ে দিল। বলল, চলুন। এক সঙ্গে খেয়ে নেব।

—খেয়ে নেবার পর কোথাও বের হচ্ছেন?

—কোথাও না।

—ঠিক বলছেন?

—এখনও তো তাই ভাবছি।...বুঝি ফাঁস করে দিচ্ছিল সব। বললেই মুশকিল হত, সন্ধ্যার পরে অনুদের বাড়ির দিকে যাব ভাবছি। নূতন গাড়ি করে যাব। ওকে তাক লাগিয়ে দেব। এবং নূতন গাড়ি করে সেই নাটকীয় ব্যাপারের পর ছুটে বের হয়ে যাব। যেদিকে দু চোখ যায় প্রীতি, যে দিকে এই গাড়ি ছুটতে ভালবাসবে সেদিকে ছুটে বের হয়ে যাব। কি আর আছে আমার, কোথায় আর প্রিয়জন আছে, যে আমার পিছনে ছুটে ছুটে আমার নাগাল ধরবে। আমার সঙ্গে আমি আর কাউকে ছুটতে দেব না।

অবেলায় খেলে যা হয়—আলস্য আসে। প্রীতির আলস্য লাগছিল। সুভ বেশ ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলল। বাইরের বারান্দায় এসে দুজন বসল। সূর্য নেমে গেছে ফোর্টের ওপাশে। এখন শুধু গাছে গাছে সূর্যের আলো। গরমে হাঁসফাঁস করছিল প্রীতি। সে হাতপাখা নিয়ে বসেছে। আর কি কথা বলা যায়, কি গরম পড়েছে

না ! রাতে এত বৃষ্টি হল অথচ শরীরের গরম শহরের গরম মরছে না। বোধহয় এসব বলারও ইচ্ছা হল প্রীতির ! কিন্তু পাশের মানুষটা, কোন কথা বলছে না। বোবা কালা বনে গেছে। অথবা কিছু ভাবছিল। গাছপালা পাখি, পার্কে বালক বালিকাদের কলরব এবং সূর্যের এই শেষ আলোর দৃশ্য বুঝি মানুষটাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। প্রীতির উপস্থিতি সামান্য অন্যমনস্ক করতে পারছে না। সে ডাকল, সুভাষবাবু।

—আমাকে কিছু বলছেন ? সে চোখ তুলে তাকাল। বুঝি প্রীতি এখন সেই খবর দেবে। আপনি কি দেখেছেন আজকের খবরটা ? দেখেছেন অনুর কি বেলেল্লাপনা ! এমন করে কি কারু স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে ছবি তুলতে পারে। তারপর যা হয়ে থাকে এক প্রস্থ অনুর নিন্দা, অনুর কিছু অন্ধকারের দৃশ্যও তুলে ধরতে পারে। কারণ এইতো সময়, অনুর সম্পর্কে যা কিছু সত্য মিথ্যা বানিয়ে বলা যাবে, সুভ সবই ঘটতে পারে এবং বিশ্বাস্য ভেবে পুরোপুরি সম্পর্ক ত্যাগ করতে উদ্যত হবে। আপনি প্রীতি কি তেমন কথা বলতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রীতি বলল, চলুন না আপনার নূতন গাড়িটাতে একটু ঘোরা যাক।

—যাক তবে প্রীতি অশুভ সেই ছবির কথা টেনে আনেনি। সে যেন সামান্য স্বস্তি অনুভব করল।

—যখন বলছেন চলুন

—কেন আপনার ভাল লাগছে না বের হতে ?

—ভাল লাগবে না কেন।

—তবে যে বললেন, যখন বলছেন চলুন, যেন আপনি আমার ইচ্ছাতেই বের হচ্ছেন।

—আপনারা যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন আর আমাদের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয় না।

—বেশ বলেছেন মশাই। বলে প্রীতি ছোট্ট ঠেলা মারল সুভাষকে। এটা স্বভাব প্রীতির! কথা বলতে গেলে সোরগোল তুলে ফেলবে। হাসতে গেলে গলা তুলে হাসবে। আর যখন মুখ গোমড়া করে রাখবে তখনই মনে হয় প্রীতি ডাক্তার প্রীতি! তখন প্রীতিকে অন্য কিছু বলে চেনা যায় না। নতুবা প্রীতি ঠেলে ঠুলে কথা বলে হাসবে। কি যে বলেন মশাই, আমাদের আর কি দুঃখ। জীবনটাতো কেটে গেল! এখন আর লবঙ্গলতা হয়ে কি লাভ! এসবও বলে কোন কোন সময়। সুতরাং প্রীতির দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমি কিন্তু আটটার ভিতর আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

—এত তাড়াতাড়ি! প্রীতি চোখ টিপে হাসল।

—আমার একটু কাজ আছে প্রীতি।

—আপনার কাজ আছে, আমাদের কোন কাজ নেই।

—আপনারও আছে। আপনি তো ভারি ব্যস্ত মানুষ। তবু মাঝে মাঝে আপনি আসেন, ভাল না লাগলে আপনার কাছে যাই, গল্প করি, জানি না প্রীতি কি আছে আপনার ভিতর! কোনো কোনো সময় আমি অনুর কথা পর্যন্ত ভুলে যাই। তখন শুধু আপনি, মনেই হয় না আপনি কাজের মানুষ, আপনার হাতে কত মানুষের প্রাণ। তা ফেলে যখন চলে আসেন তখন আপনাকে কাজের মানুষ না বলে ভাবি কি করে! বলে সুভ কেমন হতাশায় ডুবে গেল।

—বাবাঃ কি যে আপনি সেন্টিমেণ্টাল!

—আমাকে সেন্টিমেণ্টাল বলছেন! বোধ হয় আমি তা নই প্রীতি। হলে অনেক দিন আগে কিছু একটা অঘটন ঘটে যেত। এত দেরি করতে পারতাম না। তা ছাড়া কি জানেন প্রীতি মানুষের ঐ একই ইচ্ছা—সে যাব যাব বললেই যেতে পারে না, খাব খাব বললেই খেতে পারে না। আর যখন খেয়ে ফেলে তখন অজান্তেই সব হয়।

—কি সব তত্ত্ব কথা বলছেন বুঝছি না।

—তত্ত্ব কথা নয় প্রীতি। এলোমেলো কথা। আপনি সোজা করে বললে তাই অর্থ হতো। মুখে এল বলে ফেললাম।

—দেখুন মশাই আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। ঝগড়ার মানুষটিকে এবার ডেকে এনে সব ফয়সলা করে ফেলুন। যত দেরি হবে তত ক্ষতটা বাড়বে বৈ কমবে না।

—সুভ এবার হাসল। আপনি আমাকে ভালবাসেন প্রীতি।

—ভালবাসি না ছাই। ভালবাসার মানুষটিকে এবারে তুলে আনুন।

—তবু বলব আপনি আমাকে ভালবাসেন।

—আচ্ছা মুশকিল হল তো। আপনি আমাকে জোর করে ভালবাসবেন। বলে জোর হেসে উঠল প্রীতি। খুব হালকা করে দিতে চাইল কথাটা।

—ভালবাসেন বলেই না অনুর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বলছেন।

প্রীতি এবার কেমন বোবা বনে গেল। সে চোখ তুলে এবার তাকাতে পারল না।

সুভ ধরতে পেরে বলল, চলুন। আপনাকে আজ কলকাতা দেখাব।

প্রীতি কোন কথা বলল না। শুধু সুভাষকে অনুসরণ করে নীচে নেমে গেল।

গাড়ি চলতে থাকলে সুভ একবার পাশ ফিরে প্রীতিকে দেখল। কথা বলছে না। স্থির এবং প্রায় নিষ্পলক অথবা মনে হয় গাড়িতে উঠে প্রীতি আরও বেশী লাজুক হয়ে পড়েছে। সুভই সুতরাং প্রথম কথা বলল, বুঝলেন প্রীতি এই শহর কলকাতা—কত বড় বাড়ি গাড়ি যাদুঘর নিয়ে বেঁচে আছে, কত কালের মৃত সব স্মৃতি নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় যেতে যেতে মনে হবে আপনার আমার কত সুখ। লম্বা গাড়ি দেখলে মনে হবে প্রায়

জোয়ারের জল এসে গেছে এবার নৌকা ভাসিয়ে দিলেই হল, আপনাকে সাগর সঙ্গমে পৌঁছে দেবে। মনে হয় কোন দুঃখ নেই, ফিটফাট গৌরবময় পোশাক দেখলে মনে হয় পার্থিব সব সুখ করায়ত্ত। একটু থেমে বলল, সাধু ভাষা ব্যবহার করছি বলে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো! কি জানেন প্রীতি নাটকের রোগ থাকলে এমন হয়। নাটক। বুঝলেন নাটক করে করে একসময় আমি অনুর সঙ্গে কত সুচতুর কায়দায় কথা বলেছি, তখন অনু সব বিশ্বাস করত, আর বুঝলেন জীবন যাপনের জন্য একটা সন্তান চাইতে গিয়ে অবিশ্বাসে ডুবে গেলাম।

প্রীতি কোন জবাব দিল না।

—আমি আজকে খুব বকছি। কি বলেন। আপনি ওথেলো নাটক দেখেছেন!

প্রীতি বলল, না। পড়েছি।

—পড়া আর নাটক দেখা এক নয় প্রীতি। এই দেখুন না আমরা চৌরঙ্গি-পাড়ায় এসে গেছি। আপনি গাড়িতে বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

—কোথায় যাবেন?

—একটু ভিতরে।

—আমি একা একা বসে থাকব?

—একা বসে থাকবেন কেন, রাস্তায় কত লোকজন থাকে, তাদের দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

সুভাষবাবু আপনি আমাকে বাড়ি দিয়ে আসুন। তারপর আপনার যা খুশি করুন।

—আপনি রাগ করছেন প্রীতি?

—রাগ না। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

—অঃ। আচ্ছা চলুন আপনাকে দিয়ে আসি। বলে সে গাড়িতে উঠে বসল এবং স্টার্ট দেবার আগে বলল, দৈনিক কাগজ পড়েন না।

প্রীতি বলল, আপনি আমাকে আজ কলকাতা দেখাবেন বলেছিলেন।

—আপনিও সব জানেন, বোঝেন। কলকাতায় আপনার জন্ম। আপনার কলকাতা কত বড় আমি জানি না প্রীতি, কিন্তু আমার কলকাতা বড় ছোট, একটু পথ যেতে আসতেই তাই দেখা হয়ে যায়।

—বুঝলাম না।

—না বুঝতে পারলে আমি নাচার। আমি বলতে চাইছিলাম কলকাতার প্রাণ বড় অসুখী।

—সে সব জায়গাতেই।

—আমার এখন আর গ্রাম সম্পর্কে ভাল কোন ধারণা নেই। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। আমার দাদুর স্বপ্ন। তিনি তাঁর বাড়িতে ফুল ফলের গাছ লাগাতে ভালবাসতেন। তাঁর কোন আর ইচ্ছা ছিল না।

—কলকাতায় আমরা ফুল ফলের গাছই লাগাতে চাই।

—কিন্তু পারি না প্রীতি।

—কেন।

—বড় স্বপ্নে আমরা ডুবে থাকি, যে স্বপ্ন সফল হলে আরও বড় ইচ্ছা আমাদের কাতর করে।

—যেমন ?

—যেমন আপনি গান ভালবাসেন। গানে আপনার গলা ভাল। আপনার স্বপ্ন ঐ ছোট বড় জলসায় গায়ক হবার। হলেন, তখন স্বপ্ন, আকাশের পাখির মত নদীর পাড়ের বাড়িটাতে গিয়ে বসার।

—কথায় কথায় আপনি আজকাল কাব্য করতে চান। প্রীতি গলা সাফ করে বলল।

—আপনি দৈনিক কাগজ পড়েন না তা হলে! নীরস গলা করে ফেলল সুভ।

—ও কথা কেন বার বার ?

—না এমনি বলছিলাম।

—আপনি এমনি বলেন নি সুভাষবাবু। অনু এবং অসীমের ছবিটা আমি দেখেছি কি না জানতে চাইছেন।

কেমন ধরা পড়ে যাবার মত গলা করে ফেলল, না না এমনি বলছিলাম।

—ছবিটা আমি দেখেছি। বলতে চাই নি। বললে আপনি বেশী কষ্ট পেতেন। সংসারে কারও আর জানতে বাকি নেই—আপনার স্ত্রী সিনেমায় অভিনয় করছে।

সুভাষ আর কথা বলল না। ওর মাথার ভিতরটা ফের দপ দপ করছে। চোখে জ্বালা। বুকের ভিতর ভয়ঙ্কর কষ্ট! সে কিছুতেই আর উৎফুল্ল হতে পারল না। সে কিছুতেই আঘাত ভুলে থাকতে পারল না। সে এই আঘাতকে আরও বড় আঘাত দিয়ে অনুকে প্রতিশোধের মুখে নিক্ষেপ করতে পারল না। বরং কাপুরুষের মত সে অসীম নামক যুবককে হত্যার পরিকল্পনাতে ডুবে আছে। সামান্য মদ্যপানের প্রয়োজন ছিল। মদ্যপানে কেমন শরীরটা শিথিল হতে থাকে, মাথায় ভালবাসার কথা থাকে না। যাবতীয় দুঃখ অভিমান এসে মাথাটাকে ছোট ক্ষুদ্রাকার হস্তির মত পাথর করে দেয়। তখন খুশিমত সব কিছু করা চলে। অথচ এই প্রীতি কথা বলে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। বাড়ির দরজায় গাড়ি লেগে রয়েছে, তবু নামছে না। কেবল কথা বলতে চাইছে।

প্রীতি, দোহাই প্রীতি এবারে আপনি নেমে পড়ুন, আমাকে ছেড়ে দিন। সময় মত না গেলে আমার ইচ্ছার কোন দাম থাকবে না বলার ইচ্ছা হল সুভাষের।

প্রীতি দরজা খুলে বলল, চলুন ভিতরে।

—এখন আর নয়। কাল আসব।

—আপনি আপনার কলকাতা দেখালেন, আমি আমার কলকাতা দেখাব না?

প্রীতি তার একিউরিয়ামের প্রসঙ্গে কলকাতার প্রসঙ্গ টানল

—সে অন্যদিন হবে প্রীতি।

—অনেকদিন কিন্তু আপনাকে বলেছি। আমার একিউরিয়ামে মাছ আছে।

একটু থেমে প্রীতি বলল, সেখানে আপনাকে এনজেল মাছের খেলা দেখাব। আপনি দেখবেন দেখবেন বলে এড়িয়ে গেছেন।

—আমি অম্বুর কাছে সময় চাইছিলাম।

—সেতো আপনাকে সময় দিল না। সে নিজের মত কাজ করে যাচ্ছে।

—আপনি যুবতী, প্রীতি, আপনি কিছু দেখাতে চাইলে না দেখে পারি না। চলুন। তবে কথা দিন বেশী সময় আমাকে আজ অন্তত ধরে রাখবেন না।

প্রীতির কেমন আত্মসম্মানে লাগল।—ঠিক আছে আপনাকে আসতে হবে না। বলে সে হন হন করে নেমে দরজার কড়া নাড়ল।

সুভাষ বসে থাকল না। সেও দরজা লক্ষ্য করে ছুটে গেল। চলুন বসা যাক। গল্প করা যাক। আপনার একিউরিয়ামে মাছের খেলা দেখা যাক। এখন কটা বাজে বলে সে ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। আটটার সময় অসীম আসবে। এক ঘণ্টা হাতে। অনেক সময়। বরং সে আজ মদ খাবে না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় যে কাজটা সে করছে সকলকে তা বুঝতে দেওয়া ভাল। সে এবার গান ধরে দিল। উচ্চরোলে গান গাইলে প্রীতি ধমক দিল সুভাষকে, এই কি হচ্ছে!

—অঃ আমার গলাটা ভাল নয় মনেই ছিল না।

—অমন গলায় গান গাইলে প্রতিবেশীরা ভাববে চোর পড়েছে বাড়িতে।

—না গাইলেও ভাবতে পারে। আপনার মাকে দেখছি না।

—মা তো এ সময় থাকেন না। মা বাবা এ-সময় মঠে যান। গুরুদেবের চরণ সেবা করেন।

—বেশ আছেন তাঁরা। বলে পার্লারে ঢুকে বসে পড়ল।

—এখানে বসে পড়লেন?

—এখানেই তো বসার কথা। বলে সে চারিদিকে চোখ বুলাল। তেমনি সেই বাঁদরের মুখ নিয়ে কার্পেটটা বিছানো, তেমনি উজ্জ্বল নীলরঙের পর্দা। শুধু লম্বা সুতোয় বাঁধা নরকঙ্কালটা ঝুলছে না। সুভাষ বলল, ঘরের মানুষটাকে দেখছি না!

—ঘরের মানুষ কোথায় আবার গেলেন!

—কেন ও কোণায় যেটাকে ঝুলিয়ে রাখতেন। তিনি নেই?

—অঃ! বলে হাসার চেষ্টা করল প্রীতি! সুতোটা ছিঁড়ে গেছে বলে ওকে বেঁধে-ছেদে তুলে রেখেছি। সেতো অনেকদিন।

—প্রথমদিন এসে মনে হয়েছিল ওটা আপনি ইচ্ছা করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। যেন সতর্ক করে দেওয়া—কুকুর হইতে সাবধান গোছের। ছাখো হে বাপুরা, বেশী নিমিত্তের ভাগী হইও না। ভাল ছেলের মত আসিয়াছ, ভাল ছেলে চিরকাল থাকিয়া যাইও। দুষ্টছেলের মত হাত পা নাড়িবে না। প্রলোভনে মত্ত হইলে আমি নড়িয়া উঠিব।

—তাই বুঝি!

—আমার তাই মনে হয়েছিল। আপনি সেজেগুজে এসে বসলেন। ঘরের দেয়ালে সবুজ ঘাসের গুচ্ছ। এবং এমন এক রুচি যা দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

—এখন আমার সব বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে। রুচি এখন আর চোখে পড়ে না।

—খুব চেনা হয়ে গেছে।

—আপনি মিথ্যা কথা বলছেন সুভাষবাবু। আদৌ চেনা হয় নি। আপনি মেয়েদের কতটুকু চিনেছেন। মেয়েদের কথাটা ইচ্ছা

করে বলল প্রীতি। ও বলতে চাচ্ছিল আপনি আমাকে কতটুকু চিনেছেন। অথবা বলার ইচ্ছা যেন আমাকে সুভাষবাবুর চেনার সুযোগ তো আমি এখনও দিই নি। কিন্তু কথাটা খুব স্পষ্ট শোনাবে বলে তাড়াতাড়ি সে মেয়েদের কথাটা বলে অন্য অর্থ করতে চাইল।

—এ কি.আপনি দাঁড়িয়েই কথা বলছেন দেখছি!

—এখানে তো আমাদের বসার কথা নয়। প্রীতি খুব চটপট উত্তর দিল।

—আমি ভেবেছিলাম এখানেই আমাদের বসার কথা।

প্রীতি এবার শক্ত গলায় বলল, সুভাষবাবু, আমরা বড় হয়েছি। কিন্তু আপনার ব্যবহারে মাঝে মাঝে তরুণের স্বভাব ফুটে উঠছে।

সুভাষ বলল, মানে?

—আপনি তো জানেন আমার একিউরিয়াম এখানে নেই। ওপরে আছে। আপনি ওপরে যেতে সংকোচ বোধ করছেন।

এত স্পষ্ট শোনাল যে সুভাষ আর বসে থাকতে পারল না। সে বলল, চলুন।

—আপনিতো আমাদের বাড়িটাও ভাল করে ঘুরে দেখেন নি।

—না তা দেখিনি।

—আসুন আমার সঙ্গে।

প্রীতি ওকে নিয়ে দোতালায় উঠে গেল। করিডোর দিয়ে গেলে দক্ষিণে ছোট ফুলের বাগান। কিছু বেতের চেয়ার ব্যালকনিতে। দুদিকের ঘরে তালা বন্ধ। শেষদিকের ঘরটাতে বাবা মা থাকেন। নীচের দিকে ছোট একটা ঘরে মালী আছে। ওরা সিঁড়ি ধরে দক্ষিণের বারান্দায় নেমে গেল। এবং বাগানের ভিতর ঢোকার আগে প্রীতি ওর মালী মাধবকে ডাকল। বলল, বাবুকে তোর সব গাছের নাম শুনিয়ে দেতো।

প্রীতি গাছের পরিচয় সম্পর্কে বলল, একসময় বাবার সব দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা সংগ্রহ করার বাতিক ছিল। এখন সে সব কিছুই নেই। কেবল ধর্ম ধর্ম। রামায়ণ মহাভারত পাঠ।

শ্রীমৎভাগবৎ গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে পড়া। মনেই হয় না বাবা একদা বড় একজন বিচারক ছিলেন দেশের। যাঁর এত বিচার বুদ্ধি তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কি করে এমন নিঃসন্দেহ বুঝতে পারি না।

সুভাষ দেখল নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। ফুলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন নীল লাল রঙের ডুম জ্বালানো। হলুদ পাতা, লাল ফুলের পাপড়ি এবং পাতাবাহারের গাছ মিলে প্রায় তপোবনের মত জায়গাটা। প্রীতি আগে আগে হাঁটছিল। সুভর এতক্ষণে মনে হল, প্রীতি সৌরভ মেখেছে। সেই সৌরভ ফুলের সৌরভের চেয়ে যেন মিষ্টি। ওর নরম সিল্কের গোলাপী রঙের আভা শরীরের ভিতর বড় বেশী উত্তেজনার জন্ম দিচ্ছে। প্রীতি এই বাগানের ভিতর ওকে ঘুরিয়ে মারছে, অথবা দ্যাখো সুভাষ আমি এই ফুলের ভিতর, লাল নীল ফুলের ভিতর কেমন মায়াবিনী দ্যাখো। আর বুঝি মালী মাধবের অবুঝ দৃষ্টিতে প্রীতি দিদিমণি এখন এই ফুলের উৎসবে সুখী পায়রা হয়ে গেছে। মাধব বলল, দিদিমণি, ফুল। বলে একগুচ্ছ ফুল এনে ওদের সামনে ধরল।

প্রীতি সুভাষকে উদ্দেশ্য করে বলল, ধরুন। উপহার।

—উপহার। বেশ ভালো। এই দিয়ে তবে বিদায় করতে চাইছেন!

প্রীতি চোখ তুলে তাকাল। এখানে মাধব আছে এমন কথা কেন সুভাষবাবু—দৃষ্টিতে এমন ভাব প্রকাশ করছে। তারপর বলল, চলুন। ঘরে বসবেন। আপনাকে সুন্দর সুন্দর গান শোনাব।

—গান জানেন?

—গলায় নয়। রেকর্ডে। আসুন। বলে হাত ধরে সুভাষকে টানতে টানতে ওপরে তুলে নিয়ে গেল।—আপনি যে কি না। প্রীতি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল।

—আমি আবার কি!

—মাধবের সামনে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন!

—সেটা আমি না আপনি।

—এখন তো সব দোষই আমার। বলে ফের সামান্য ধাক্কা দিয়ে কথা বলার যেমন অভ্যাস তেমনি হাত রাখল সুভাষের শরীরে।

সুভাষ ক্রমে জলাশয় ছেড়ে যেতে পারছিল না। ক্রমে সুভাষ নিজের সব পরিকল্পনার কথা ভুলে যাচ্ছিল। চুম্বকের আকর্ষণ প্রীতি শরীরে রেখে দিয়েছে। কিছুতেই প্রীতিকে ফেলে সে যেতে পারছে না। ক্রমে যেমন তুষার ঝড়ে অভিযাত্রী পথ চলতে চলতে অন্তহীন এক অলৌকিক মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যায়, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছুটে বেড়ায় তেমনি খাঁজে খাঁজে প্রীতি কি সব অলৌকিক রহস্য লুকিয়ে রেখে এই বাড়ি, ঘর, বাগান এবং অলিন্দে অলিন্দে ওকে ঘুরিয়ে মারছে। সুভাষ একসময় বলল, আপনার মাছ, আপনার প্রিয় একিউরিয়ামের এনজেল মাছ।

—আসুন দেখাচ্ছি। আপনি খুব একা এখন। অনু নেই। সময় না কাটলে দু তিনটে একিউরিয়াম কিনে ফেলতে পারেন। সোর্ড টেল, ব্ল্যাক মলি যা খুশি পুষে রাখতে পারেন। ভিতরে আলো জ্বেলে দিন, দেখবেন সময় সময় দেখতে দেখতে মনে হবে আপনি এক বিশাল সমুদ্রের নীচে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মাছগুলো আপনার সঙ্গে খেলাচ্ছলে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—আপনি দেখছি দেখার আগে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করছেন।

—আসুন। বলে দরজা খুলে দিল। পরে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। একিউরিয়ামের ভিতরে লাল নীল হলুদ আলো জ্বালা। বেশী বড় নয় ঘরটা। দক্ষিণের জানালা খুলে দিলে ফুলের বাগান স্পষ্ট। উত্তরের জানালা খুলে দিলে রাজপথ, ট্রাম বাস স্পষ্ট। পূবের জানালা খুলে দিলে মা বাবার ঘর চোখে পড়বে। প্রীতি ইচ্ছা করেই পুবের জানালাটা খুলল না। ইচ্ছা করে পর্দা ঠেলে দিল। ভিনদেশী মানুষকে বেশী দূর নিয়ে যেতে নেই। নিরালা পেলেই চেটে পুটে দিতে পারে।

ঘরের ঠিক দক্ষিণের জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ার। সাদা তোয়ালে দিয়ে চেয়ার ঢাকা। মাথার কাছে নরম সিল্কের তাকিয়া। প্রীতি এখানে বসে দিবানিদ্রার আগে এই ছোট ছোট মাছেদের খেলা দেখে। বাগানের ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখে। এবং নভেল নাটক হাতে এলে শুয়ে শুয়ে পড়ে। প্রীতি সুভাষকে সেই চেয়ারটাতে বসতে বলল। তারপর ডাক দিতেই মাধব এসে হাজির। বলল, আমাদের দু কাপ কফি করে দে মাধব। ওরা তো কেউ দেখছি বাড়ি নেই।

সুভাষ বলল, বেশ যাহোক ভাল লোক পেয়েছেন। ঘরের কাজ বাগানের কাজ দুই চলে।

প্রীতি গা এলিয়ে বসেছিল খাটে। সুভাষের কথায় সোজা হয়ে বসল। সে ইচ্ছা করে অন্য কথায় এল। কোন্‌টা কি মাছ জিজ্ঞেস করলেন না তো!

—আমার কাছে মাছ মাছই প্রীতি।

—তাও তো লোকের জানতে ইচ্ছা হয় কোন্‌টা কোন্ জাতের। কোন্‌টা এগ্ বিয়ারিং কোন্‌টা লাইফ বিয়ারিং।

—তা হলে আপনার মাছেরা ডিম বাচ্চা দুই দেয়।

—সকলে না। আসুন না এদিকে, আসুন আসুন। বলে প্রীতি খাট থেকে উঠে পা মুড়ে ডান দিকের একিউরিয়ামের পাশে বসল। দেখছেন এরা সব ব্ল্যাক মলি। কি কালো রঙ। এটা মাদি। এটাও মাদি। পেটে বাচ্চা হয়েছে।

—কি করে বুঝলেন!

—কি করে বোঝা যায়!

—ও মাছটার পেট মোটা বলে।

—কি জানি মশাই। আপনি বুঝতে পারেন না!

—বুঝলে আর আপনাকে বলব কেন! সুভাষ উঠে এসে পাশে বসল। ছোট ছোট শ্যাওলার ভিতর মাছগুলো খেলে বেড়াচ্ছে।

নীচে বালিমাটি, কাঁকর শঙ্খ। কৃত্রিম পাহাড় এবং স্থানে স্থানে ঝিনুক। মাছগুলো ওপরে নীচে দক্ষিণে উত্তরে শ্যাওলার ভিতরে ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা বড় মাছ আবিষ্কার করল সুভাষ। মাছটা ওপরে উঠে চিত হয়ে আছে। সরু একটা সুতোর মত কি যেন পেট থেকে নীচে নেমে গেছে। চার পাঁচটা ব্ল্যাক মলি বোধ হয় ওরা পুরুষ মাছ সেই সুতোর মত পদার্থটি শুঁকে শুঁকে উপরে উঠে যাচ্ছে। এবং ঠিক প্রজাপতির মত ওপরে নীচে ঘুরে সন্তরণ করছে। প্রীতি চোখ তুলতে পারছিল না। ভয় হচ্ছে। বোধ হয় এক্ষুণি বলবে সুভাষ, এটা কি হচ্ছে! মাছগুলো এমন করছে কেন। দুটো মাছ একসঙ্গে জড়ো হয়ে আছে কেন। মনে হয় কামড়ে ধরেছে। মনে হয় মাছটাকে মেরে ফেলবে।

সুভ কাচের ওপর মুখ গুঁজে রেখেছে। লাল নীল সাদা রঙের মাছ। সাদা রঙের দুটো কিসিং গোরামিন। ওরা কিস্ করছে। সুভ বলে উঠল, প্রীতি দেখুন দেখুন। মাছ দুটো মুখে মুখ লাগিয়ে কি করছে! প্রীতি মুখ তুলতে পারছে না। শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। জ্বর এসে যাচ্ছে যেন। চোখ জ্বলছে। এমন কতদিন হয়েছে। জ্বরের মত এলেই সে দু-পায়ের নীচে পাশবালিস অথবা আরামদায়ক ঘটনা, ভিতরে ভিতরে সুড়সুড়ি···প্রীতি পাগলের মত হিক্কা তুলে উঠে এল। প্রীতি দরজার কাছে এসে চীৎকার করে ডাকল, মাধব মাধব। তোর কফি কি হবে না!

সুভ উঠে দাঁড়াল। প্রীতির গোলাপী রঙের সিল্কের শরীরটা দরজার পাশে ঝুলে আছে। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কাঁধ দেখা যাচ্ছে। পেছনটা প্রায় সাপের মত বেঁকে আছে। বনের ভিতর সেই তাজা পানস সাপের মত পিঠের একটা অংশ বেঁকে আছে। প্রীতি কি ইচ্ছা করে ওর দিকে এমন একটা ভঙ্গী ছুঁড়ে দিয়েছে? প্রীতির এক একদিন এমন হয় কেন! প্রীতি কি মায়া জানে, যাদু জানে অথবা প্রীতি তাকে নিয়ে খেলাচ্ছে। তার অন্তরের ছাই নিয়ে

খেলা করছে। প্রীতির কি জানা নেই এমন মানুষকে নিয়ে খেলতে নেই। মরণ খেলায় মাতলে এই সংসারে আর কি থাকল! সে বলল, প্রীতি আমি চলি। আমাকে ছেড়ে দিন।

প্রীতি উঠে এল দরজা থেকে। বা রে কফি হচ্ছে, আপনি কফি না খেয়ে যাবেন। বলে প্রীতি সামনে এসে সহজভাবে দাঁড়াল।

—আর একদিন এসে খাব প্রীতি।

—তা কি হয়! বলে প্রীতি আবার সুভর মুখোমুখী দাঁড়াল। কেমন লাগছে আমার ঘরটা। যখন ঘুম আসে না তখন আলো জ্বেলে বসে থাকি। এইসব মাছেদের খেলা দেখি। রাতে, গভীর রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে, ট্রাম বাসের শব্দ থেমে যায় তখন এই মাছের জগতে ডুবে যাই। কি সুন্দর এরা! কি সুন্দর এদের জীবনযাত্রা, আপনি দেখলে অবাক হতেন।

জ্বর আসছিল সুভাষের। ওর ভিতরটা কাঁপছে। মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত উঠে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে খুব অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। এমন হয় না কোনদিন, ভালবাসা জানাজানির পরে অনুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হলে ঠিক এমন হত। মনে হত জ্বর আসছে। মনে হত হাত পা জ্বালা করছে। মনে হত তলপেটের ডানদিকে ফিক ব্যথার মত। যেন আর শান্তি নেই। সন্তরণে নেমে না গেলে শান্তি নেই। ওর হাই উঠছিল। চোখমুখ ঘোলা দেখাচ্ছে। আর প্রীতি ঘরের ভিতর গ্রামোফোনে রেকর্ড চালিয়েছে। মাধব কফি রেখে গেছে। ওরা মুখোমুখি বসে কফি খাচ্ছে। কেউ এখন আর কথা বলছে না। উভয়কে নেশায় আক্রান্ত মনে হচ্ছে। গলায় কোন স্বর উঠে আসছে না। চোখ বুজে আসছিল। হাত কাঁপছে! সুভ আর পারল না। সকল অহংকার মুছে রাতের নিশীথে যেন সুভাষ কতকাল পর পাহাড় নদী অতিক্রম করে এক ঝর্ণা আবিষ্কার করেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রাখল প্রীতির। প্রীতি চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

সে প্রীতিকে তুলে নিল পাঁজাকোলে, সে খাটের ওপর প্রায় যেন একটা মৃত যুবতীকে নিয়ে খেলা করছিল। প্রীতির কোন জ্ঞান ছিল না। প্রীতি চোখ বুজে পড়েছিল। এখন প্রীতি সুভাষের কাছে মদের পাত্রের মত। অথবা এক বাঘ হালুম হুলুম করছে। দরজা জানালা খোলা। সুভাষ পাগলের মত করছে। আলোর কথা মনে ছিল না। মাধব ছুটে আসতে পারে। প্রীতি চোখ বুজেই উঠে দাঁড়াল। পাগলের মত উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। পর্দা ফেলে দিল। তারপর অন্ধকারে সেই মত্ত হস্তীর মত এক প্রতিযোগিতা। বুঝি আমায় ছাখো, রসিয়ে রসিয়ে ছাখো। সুভাষ কিছুই যেন করছে না অথবা করতে পারছে না। প্রীতিকে নিয়ে খেলা জমে উঠতে গেলে সময়ের দরকার। সুভাষ হাঁসফাঁস করছিল। ওরও জ্ঞান ছিল না প্রায়। অনুর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ভিতরে ভিতরে যে অন্তর্দাহ সব এখন গলে গলে পড়ছে। প্রায় মোমের মত সব ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

প্রীতি এক সময় বলল, সুভাষবাবু!

সুভাষ সাড়া দিল না।

প্রীতি বলল, মা বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।

সুভাষ বলল, আমার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না প্রীতি।

—ছি! কি করছেন! উঠুন।

—দোহাই প্রীতি। সে প্রায় চোখ বুজেই বলল। আমি আপনার কাছে সারারাত থাকব।

—আপনি কি পাগল!

—প্রীতি তুমি এত সুন্দর।

—সুভাষ এমন কর না। আমার মান সম্মান নিয়ে তোমার কি হবে!

—প্রীতি তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছ।

—দোহাই সুভাষবাবু। উঠুন, মা বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।

সুভাষ এবার উঠে বসল।—তুমি কাল এস প্রীতি।

—আমি ঠিক যাব।

—তিন সত্যি করছ?

—আমার লক্ষ্মী।

আলো জ্বালতেই নগ্ন শরীর প্রীতির বড় প্রকট দেখাল। প্রীতি বড় নিস্তেজ। কামনা বাসনা মিটে গেলে উৎসব শেষের বাড়ির মত মনের অলিগলিতে জড়তা এসে ভিড় করে। প্রীতি পা ভাঁজ করে শুয়ে আছে। এখনও মনে হয় চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলছে। সে খাটে শুয়ে থেকেই ফিস ফিস গলায় বলল, আলোটা নিভিয়ে দাও লক্ষ্মী। আমার ভারি লজ্জা লাগছে।

সুভাষ ছুটে এসে পায়ের কাছে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি উঠে বসল।

সুভাষ জোর করতে চাইলে প্রীতি সুভাষের পা জড়িয়ে ধরল। আর না। আমি আর পারছি না।

সুভাষ শুনল না। সে এতক্ষণ বেহুঁস হয়ে চিৎকার তুলছিল, এবার সে হুঁস ফিরে শরীরের সব পূতিগন্ধময় নরক ঘেঁটে ঘেঁটে অবসন্ন সৈনিকের মত ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। খাটের ওপর প্রীতিকে মৃত ব্যাঙের মত দেখাচ্ছে। প্রীতি ফোলা ফোলা চোখে পড়ে আছে। লজ্জায় চোখমুখ নিজের বাহুতে ঢেকে রেখেছে। সুভাষ নীচে এসে প্রথম ট্রাম বাসের ভীড়ে মনে করতে পারল গাড়িটা ফেলে এসেছে প্রীতিদের দরজায়। সে ছুটে গেল এবং দেখল দরজায় প্রীতি, মা বাবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। সাদা গরদ হবে হয়ত, অথবা দুধের রঙের মত বসন ভূষণে প্রীতি এখন নিজেকে বড় মহিমময়ী করে রেখেছে। প্রীতির মুখের দিকে কেন জানি তাকাবার ইচ্ছা হল না। সে গাড়িতে বসলে প্রীতিই হাত তুলে স্মিত হাসল। কিন্তু সুভাষ হাসতে পারল না। রাস্তার ভিড়ে ওর কি যেন কেবল মনে পড়ছিল, কি যেন আজ করার কথা ছিল। কাকে হত্যা-টত্যা

করার কথা ছিল। বুঝি সেই মানুষ অসীম। আশ্চর্য রহস্য এই শরীরের অন্তস্থলে জমে ছিল, প্রীতির সঙ্গে মিলনের পর ক্রোধ ঘৃণা এবং প্রতিশোধের সব স্পৃহা কেমন উবে গেল। অন্থর জন্য এ মুহূর্তে আর কোন আবেগ বোধ করল না। ওর কেবল ঘুম পাচ্ছিল।

গাড়িটা চলছে কি চলছে না টের পাওয়া যাচ্ছে না। সুভাষ যন্ত্রের মত বসেছিল। এখন রাত কত হবে! ঘড়িতে কটা বাজে! সে ঘড়ি দেখল। রাত খুব একটা হয় নি। সুতরাং বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হল না। বাসায় ফিরে গেলেই কেমন পাগল পাগল লাগে। সে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। তারপর এক সময় চোখের উপর বড় বড় বিজ্ঞাপন ঝুলতে দেখল—ডাইনে বাঁয়ে ব্লু ফক্স, পিপিং, ওয়ালডরফ্। আরও কি সব নাম যেন। গাড়ির স্পীড না কমালে বোঝা যাচ্ছে না।

সে এখানে প্রীতিকে নিয়ে এসেছিল। প্রীতি মদ খায় না। প্রীতিকে বসিয়ে রেখে গাড়িতে সে মদ খাবার অনুমতি চেয়েছিল— প্রীতির কি রাগ! যেন বোঝে না কিছু, করে না কিছু, খুকি খুকি ভাব। তুমি খুকি ভাবো নিজেকে। তুমি খুকি, কত রসিকজনে রসাতলে পাঠাও, তুমি খুকি কত গভীরে ডুবে আছ, বলে সুভাষ গাড়িটা থামিয়ে দিল।

নানা রকমের কাচের কাজ করা কাঠের দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। বয় সেলাম দিল, সুভাষ সে সব কিছু লক্ষ্য করল না। সে বলল, বোধহয় নিজেকেই বলল, আমি মদ খাব। মদ না খেলে আমার মাথা হাতির মত বড় দেখাবে না, জরদগব হবে না। মাথাটা রাতে যদি আমার মাথা থাকে তবে ঘুমোতে পারব না। সারারাত ছুটোছুটি করব, ছটফট করব। সুতরাং সোজা হেঁটে যেতে চাইল। মদের দোকান, বাহারি সব কাচের লাল নীল পাত্র, বাহারি সব দেয়ালে ময়ূর অথবা পাখির ছবি।

বয় বলল, স্যার ওখানটায় বসুন। জায়গা করে দিচ্ছি।

সুভাষ বয়কে দেখল অথচ কোন জবাব দিল না।

পাশের মানুষটা ওর দিকে তাকাল, তারপর সোজা যেখানে রের্কড প্লেয়ার আছে সেখানে চলে গেল! ঝুয়ে দেখল। নীচে সব টাইপ করা রেকর্ডের নাম, সে ঝুয়ে দেখল, তারপর বোতাম টিপতেই হ্যাঃ হ্যাঃ হে। হোঃ হোঃ হোঃ। হাঃ হাঃ হাঃ তারপর ভিতরে রীণা রাণা নাচ, রীণা রীণা আগে পিছে ত্বলে ত্বলে নাচ। সুভাষ লোকটার দিকে মুখ তুলতেই মনে হল লোকটা পায়ে পায়ে তাল দিচ্ছে। এবং এত মদ খেয়েছে যে সে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। রেকর্ড প্লেয়ারের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে গান শুনতে শুনতে সে এক সময় সকলের অলক্ষ্যে এই নাচঘরে বমি করে যাবে।

এই তো হয় সময়ে। সুভাষ সময়ের কথা ভেবে কেমন কুঁকড়ে গেল। সে কোণার দিকে চলে গেল। প্রথম দিকে যখন খেলার ছলে মদ খেত তখন একদিন সে বমি করে দিয়েছিল। বমিটা হত না যদি না মাসুদি সাব একগাদা সোলন ঢেলে দিত বিয়ারের গ্লাসে। তাছাড়া একগাদা পেঁয়াজ, এবং শশার কুচি ওর পেটের ভিতর একটা গোলমালের ঘর তৈরি করে দিয়েছিল। সে থাকতে পারে নি। পেচ্ছাপ করতে গিয়ে বাথরুমে প্রথমে বেসিনে বমি করে ছিল। তারপরে রাস্তায় এবং মাসুদি সাবের গাড়িতে। সেই থেকে ওর একটা ভয় ভয় আছে। বমি বমি ভাব। ভয়ের ভাব। খাওয়া বেশী হলেই মনে হয় এবার বমি হবে।

সে কেমন নিস্তেজ গলায় ডাকল, বয়!

—কি দেব স্যার। বলে টাওয়েল ভাঁজ করে রেখে দিল।

—হোয়াইট হর্স। বলে সে একটা আঙুল খাড়া করে দিল।

আজ সে ভাল মদ খাবে। ভাল মদের গুণ মনে হচ্ছে বমি হয় না, ঝাঁজ কম থাকে বুঝি। ভাল মদ খেতে ভাল লাগে। বেশীক্ষণ বসে খাওয়া যায়। বেশীক্ষণ মাথাটাকে হাতির মাথা করে রাখা

যায়। এবং দীর্ঘ এক আমেজ থাকে, আমেজের ভিতর স্বপ্নের মত তখন হয়তো অন্নুর মুখ মনে পড়তে পারে।

সুভাষ প্রথম পেগটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলল। দ্বিতীয় পেগটা ধীরে ধীরে। তৃতীয় পেগটা ক্রমে ক্রমে রাত বাড়লে এবং চতুর্থ পেগের বেলায় সে চুপচাপ বসে থেকে সিগারেট খেল। এখন দেখলে মনে হবে মানুষটা খাবার জন্য আসে নি, বুঁদ হয়ে বসে থাকার জন্য এসেছে। সে চতুর্থ পেগের বেলায় বেশ সময় নিয়ে শেষ করল। তারপর বয় এল। সে দাঁড়াল। দেখল দাঁড়াতে পারছে কিনা। সে মাসুদি সাবের মত কবে হতে পারবে। মাসুদি সাব চুপচাপ সাত আট পেগ শেষ করে নির্বিকার থাকেন। আর ওর কেন চার পাঁচে এমন হয়! নড়তে পারে না। চলতে পারে না। হাত পা শক্ত শক্ত ঠেকে। চোখের দৃষ্টি কমে আসে। ঘোলা ঘোলা অন্ধকারময় জগৎ—সে চারিদিকে হাতড়াতে থাকল—বয় বিল লেয়াও।

বয় বিল নিয়ে এলে সুভাষ খানিকক্ষণ খালি গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সাদা রঙের গ্লাসটাতে ফুলের ছবি আঁকা। সে গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে এনে ফুল দেখল। বয় ডাকল, স্যার।

—আওর এক পেগ দে না।

—জী সাব। বয় চলে যাচ্ছিল। সে এবার খালি গ্লাসটা রেখে রেকর্ড প্লেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শহরে নূতন একটা ইংরেজী ছবি এসেছে। অনেকদিন থেকে চলছে। ছবিটার কিছু প্রিয় গান সে মনে করার চেষ্টা করল। যেন একটা গানের কলি ওর মনে এখনও বেশ তাজা গন্ধ নিয়ে ভেসে আছে—ইউ আর সিকস্‌টিন, গোইং অন সেভেনটিন বেবী, ইটস্ টাইম টু থিংক। সে নুয়ে টাইপ করা কাগজে খুঁজে খুঁজে সেই গানটা অনুসন্ধানের চেষ্টা করল। কিন্তু কি অদ্ভুত যতবার সে নীচ থেকে ওপরে পড়ে পড়ে শেষ করছে তত মনে হয় সে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, সে নুয়ে থাকতে পারছে না।

সেই গানটা, সুইট সিকস্‌টিনের গানটা সে কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারল না।

বয় এলে বলল, সে গানটা···। বলে হাতে এবং পায়ে তাল দিয়ে গাইতে লাগল।

বয় বোতাম টিপে দিলে সে নিজের আসনে ফিরে এল। গানটার কি এক যাদু আছে। সারাদিন সুভাষ যে পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরেছিল এখন এই গান সেই পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। সে দেখল এক কিশোরী বালিকা নাচছে গাইছে। সবুজ প্রান্তর। বসন্তের ফুল ফুটে আছে। সামনে এক পাহাড়ী নদী ঝরনার মত নেমে যাচ্ছিল। দুপারে সব বন ঝোপ। আর পাহাড়ের মাথায় একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ, নীচে ডান দিকে পলাশ ফুলের গাছ। সাদা এবং লাল ফুল। পাহাড়ময়, মাঠময় নিরন্তর সব ফুল ফুটে ঝরে যাচ্ছে। আর সেই বালিকা ছুটছে। গায়ে উজ্জ্বল সাদা রঙের ফ্রক। চুলে রিবন বাঁধা। সাদা মোজা পায়ে। মেয়েটা ছুটছে। এমন সবুজ পাহাড় শ্রেণী, এবং পাইনের অন্ধকার শুধু ছবিতেই সম্ভব। সে প্রায় বসে বসে গোটা ছবির দৃশ্যটা দেখে ফেলল।

আর শেষ পেগের শেষটুকু গলায় ঢেলে দিলে মনে হল কুয়াশার মত সেই ছবির দৃশ্যে তার অনু, ভালবাসার অনু নদী অথবা মাঠ ফেলে ফুলের সন্ধানে চলে যাচ্ছে। সে ডাকল, অনু। ওর ওক দেবার ইচ্ছা হল। কথা গলা থেকে বের হল না। কেবল বলল, বয় আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে।

কিন্তু বয় গাড়ি ডেকে দিলে বলল, অ হো! নো নো! ট্যাকসিতে আমি যাব কি করে। আমার একটা গাড়ি আছে। বলে পকেট থেকে একশটাকার একটা নোট বের করে বলল, ষোল আউন্সের বোতল গাড়িতে তুলে দাও। সে এই পাঁচটা শব্দ বলতে তিনবার ওক দিল।

গাড়িটা রাস্তার ওপাশে। তাকে রাস্তা পার হতে হবে। সে

কোনরকমে দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াল। পা টলুক সে কিছুতেই চাইছিল না। সে যে নেশা করেছে রাস্তার লোকজন তা টের পেয়ে—শালা মদ খেয়ে মাতলামি করছে বলে চলে যাক সে তা মনে মনে চাইছিল না। কোনরকমে রাস্তাটা পার হতে পারলেই হল। তারপর গাড়ির ভিতর বসতে পারলে প্রায় বাড়ির মত। তখন কোন্ শালা রা করে। সে দেখল পুলিশটা সেই যে হাত উঁচিয়ে রেখেছে কিছুতেই নামাচ্ছে না। লোকটা কি ধাতুর তৈরী সে মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। লোকটা কি পাথর হয়ে আছে। সে জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বের করার চেষ্টা করছিল। তারপর হাতটা নামাতেই সে বোঁ করে দৌড় দিতে গিয়ে রাস্তার ওপরেই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। আর কি আশ্চর্য চার পাশে গাড়ি ঘোড়াগুলো ওকে লাট্টুর মত ঘুরিয়ে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, উত্তরে দক্ষিণে চলে যেতে থাকল। সে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ি ঘোড়া ফেলে প্রায় নদী সাঁতরে পার হবার মত ওপারে উঠে গাড়িটা খুঁজতে গিয়ে দেখল—গাড়ির পাশে এক সুন্দরী যুবতী। সে বলল, তুমি! বয় বলল, জী স্যার। আপনি পড়ে গিয়েছিলেন।

সে এবার চোখ মুছল, সাদা চোখে সে এখন প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। বিচিত্র অনুভূতি ওর কাজ করছে। এক ধোঁয়াটে সংসার। যেখানে সে গাড়ির অন্য কোন অবস্থানের কথা চিন্তা করতে পারছে না। এবং মনে হল মাথাটা এবার যথার্থই হাতির মাথা হয়ে গেছে। জরদগব পাখির মত সিটের ভিতর শুয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সে বয়কে চিনতে পারছিল না। মেয়ে না পুরুষ চিনতে পারছিল না। সে কে এবং চারপাশে কারা ঘোরাফেরা করছে বুঝতে পারছিল না। প্রায় অপরিচিত সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। অতিকায় হাঙরের মত মুখ হাঁ করে তাকে কারা নিরন্তর গিলতে আসছে। সে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে গাড়ির ভিতর ঢুকে চারপাশের কাচ তুলে বসে থাকল। দরজা লক করে দিল। কোন

ভয় নেই আর। বুঝি সে সংসারের শত অমঙ্গল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছিল এভাবে।

এভাবে সে কতক্ষণ বসেছিল মনে নেই। এক সময় দেখল রাস্তায় আর লোকজন নেই। বড় বাড়ির নীল বিজ্ঞাপনের আলোটা নিভে গেছে। কিছু কুকুরের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। রাস্তায় এবং ফুটপাতে ইতস্তত গৃহহীন মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে। ওরা যেন এই রাতের শহরে কি খুঁজতে বের হয়ে পড়েছে।

সুভাষ এক সময় ষ্টিয়ারিং হুইল থেকে মাথা তুলে গাড়িটা ছেড়ে দিল। একবারে ফাঁকা পথ। কোন ভয় ডর ছিল না। ওর শরীর আর তেমন ভারি ভারি মনে হচ্ছে না। সে প্রায় নিশ্চিন্তে রাস্তা অতিক্রম করে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে যাবার মুখে দেখল প্রিয় ভৃত্য রামচরণ জেগে বসে আছে।

সে রামচরণকে ছুটি দিয়ে দিল। ভিতরে ঢুকলে মনে হল, বোতলটা সে গাড়িতেই ফেলে এসেছে। আবার সিঁড়ি ধরে নামতে হবে—রামচরণ চলে গেছে, আর রামচরণ থাকলেও সে এসব ব্যাপারে তার সাহায্য নেয় না। বরং রামচরণের কাছে যতটা পারা যায় সে ব্যাপারটাকে গোপনীয় রাখতে চাইছে। সে হেঁটে নামছিল। সে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। উঁচু লম্বা ফ্ল্যাট বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সামনে ফুলের সব গাছ। কোন্ অপরিচিত ফুলের গন্ধ আসছে। উপরে শুধু একটা জানালা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া এখন কে বলবে এই ফ্ল্যাট বাড়ির বারোটা ফ্ল্যাট আছে। বারো জোড়া দম্পতি আছে, ওরা এখন কি করছে, কি করতে পারে ভাবলে সেই এক দৃশ্য মাথার ভিতরে ফুটে ওঠে। সুভাষ তাড়াতাড়ি বোতলটা নিয়ে প্রায় ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সব জানালা খুলে দিল। বাড়ির যত আলো আছে সব জ্বেলে দিল। দিয়ে খাটে সটান শুয়ে পড়ল। তার কেন জানি আর মদ খেতে ইচ্ছা হল না।

বস্তুত সুভাষ এই মদের ভিতর অস্থিরচিত্ত হতে চাইছিল। কিন্তু দেখল আজ সারাদিন সে যা করতে চেয়েছে, করতে পারেনি। সে উল্টোপাল্টা সব কাজ করেছে। সে অসীমকে হত্যা করবে ভেবেছিল। সে এজন্য পয়েন্ট ৩৮ বোরের রিভলবার সংগ্রহ করেছে। সে এবার উঠে গিয়ে মোড়কটা খুলল। চকচকে নূতন আমদানি। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ছ'টা গুলি—এক দুই তিন। সেটা নিজের গলায় কাছে নিয়ে এল। তারপর ফের খেলাচ্ছলে সেটা ছুঁড়ে দিতেই বুঝি পটকার মত শব্দ হবে, ভেবে কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রীতি কি করছে এখন। এই প্রীতি সব নষ্টের মূলে। বরং প্রীতিকে হত্যা করার বাসনা জাগল। সবই তো হত্যা করার সামিল। প্রীতি, যুবতী প্রীতি অনুর বান্ধবী সেজে এসে জলের নীচে যে এনজেল মাছের সন্ধানে ছিল, যে যুবতী তাকে সব পরিকল্পনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে—এবং যে যুবতী অনায়াসে রাতে নিজের দরজায় সাদা গরদ পরে মহিমময়ী সেজে বসে থাকছে—তাকেই হত্যা করা চলে।

সুতরাং তাকে হত্যা করার কথা মনে রাখতে হলে ফের মদ্য পান করতে হয়। সে ঢক ঢক করে মদ ঢেলে দিল গলায়। গলাটা পুড়ে যাচ্ছিল। সে গলাটা চেপে ধরল। অনুর মুখ ফের মনে পড়ছে—অনু তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রী কথাটা সে দুবার তিনবার প্রায় লক্ষবার যেন বীজমন্ত্রের মত উচ্চারণ করল। আমি আজ, অনু আর অসীমকে হত্যা করব বলে বের হয়েছিলাম। সে হত্যা কথাটাও বীজমন্ত্রের মত উচ্চারণ করল।

তারপর সব মিলে কি দাঁড়াল আর একবার ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু কি অদ্ভুত সে কিছুতেই কিছু স্পষ্ট মনে করতে পারছে না এখন। সেই আদিম গহ্বরের মুখ কেবল উঁকি দিচ্ছে। যতবার সে ভোরে কি দেখে অসীমকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল মনে করার চেষ্টা করছে তত যেন সেই এক গহ্বর, যেখানে আবহমানকাল

এক শিশু শুয়ে থাকে এবং সে কিছুতেই মনে করতে পারল না অনু এবং অসীমের যুগল ছবি তাকে নরহত্যার দায়ে লিপ্ত করতে চেয়েছিল কেন? সে স্বাভাবিক থাকার জন্য একটা গাড়ি করে শহর দেখতে বের হয়েছিল। এবং যাতে উৎফুল্ল দেখায় অন্য অনেক দিনের মত সেজন্য সে প্রীতিকে নিমন্ত্রণ করেছিল। প্রীতির সঙ্গে একসাথে খাওয়া তারপর বের হওয়া। রাত আটটার পর হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সুতরাং দুজনে বেড়ালে মন্দ হয় না। প্রীতি প্রথম এই তাকে তার বাড়ির ভেতরে যেখানে সে নানা রকমের মাছ পুষে রেখেছিল সেখানে নিয়ে গেল এবং তার সুরক্ষিত এনজেল মাছটা খোলাখুলি দেখিয়ে সুভাষকে প্রায় পাগল করে দিল। তারপর যখন মনে হল আটটা বেজে গেছে, এখন না গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তখন প্রীতির দেহের গন্ধ এবং মদির আলস্য সুভাষকে কেমন ঘুম কাতুরে করে দিয়েছিল—সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না সারাদিনের এমন নিবিষ্ট ইচ্ছাকে প্রীতি গলা টিপে কি করে মেরেছে। সব গোলমাল হয়ে গেল। সে কি মনে করার চেষ্টায় টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল প্রীতির নরক, পূতিগন্ধময় নরক, চটচটে পিচ্ছিল নরম মাংসের আস্বাদ—ওর ভীষণ জোরে ওক উঠে এল। আর তারপর হড় হড় করে মেঝেতে বমি করে দু পা ছড়িয়ে বসে থাকল। ওর মুখ দেখলে বোঝাই যায় না সে এখন হাসছে কি কাঁদছে।

কি ভেবে আজ অনু বিকেলের দিকে বেশ সাজগোজ করল। কতদিন সাজগোজ করেনি। কতদিন শরীরে এবং মুখে প্রসাধন জাতীয় দ্রব্য মাখেনি। হিসাব করলে প্রায় বুঝি সুভাষের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দিনটির কথা মনে পড়বে। এরপর অনু কবে কখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর এবং সবল মুখ দেখেছে মনে

করতে পারেনা। সে আজ খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। সিল্কের শাড়ি পরেছে। পেটের নীচু অংশ গর্ভবতী হলে সামান্য উঁচু হতে থাকে ক্রমশ—অনুর পেটের নীচু অংশ যে উঁচু হচ্ছে তা সে আর কোন রকমে সামলাতে পারছে না। অনেক কৌশল করে কাপড় পরেছে। কড়া মাড় দেওয়া কাপড় পরেছে। এবং ঢিলেঢালা ভাবে পোশাক পরেও সে যে পেটের ভিতর ছানা লুকিয়ে রেখেছে তা যেন ঢাকতে পারছে না। তবু অনু যতটা পারল নিজেকে সতেজ রাখল। গোল বড় ইয়ারিং পরেছে। মাথায় সিঁদুর দিয়েছে প্রবলভাবে। এমন সিঁদুর দিয়েছে যে দেখে মনে হয় কপালে ভোরের সূর্য উঠেছে, মাথায় সূর্যের আলো পড়ে গা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে।

বিকালে অসীম ফোন করেছে। অসীম এবং তার মামাবাবু আসবেন। মামাবাবু স্ক্রিপ্ট সঙ্গে আনবেন। স্ক্রিপ্টে কিছু অদল বদল হয়েছে। আজ গোটা স্ক্রিপ্টটা পড়া হবে। এবং এই থেকে জেনে নেবে অনু, তাকে কি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে? কিভাবে করলে সেই চরিত্রের মূলে সে প্রবেশ করতে পারবে। সুতরাং অনু প্রায় নায়িকাসুলভ ভঙ্গীতে আজ চলা ফেরা করতে থাকল। বাবা এবং মা বিস্মিত হলেন। কতদিন পর ফের যেন অনু ভোরের সূর্যের মত পরিচ্ছন্ন আকাশে উঠে এসেছে! সে বৈঠকখানার সব পর্দা সরিয়ে নূতন পর্দা ঝুলিয়ে দিল, কার্পেট বদলে অন্য কার্পেট বিছাল। ডিভানে সব সবুজ রঙের সিল্ক কাপড়ের ঢাকনা। দেওয়ালের রঙ সবুজ। সবুজ রঙের কাপড় পরেছে অনু। এবং যে সব ফুল রেখেছে ভাসে—যেমন গুচ্ছ গুচ্ছ গন্ধরাজ ফুল, রজনীগন্ধা এবং অন্য কি সব ফুল যা দেখলে প্রায় প্লাস্টিকের ফুল বলে মনে হয় সে সব ফুলের রঙেও সবুজ আভা। এত সবুজ রঙ চারিদিকে তখন অনুর মনেও বুঝি সবুজ এক রঙ লেগেছে। উচ্চাশা থাকলে মানুষের মনে এইসব সবুজ রঙ ফুটে ওঠে—বর্ষার দিনে এক সবুজ মাঠ পার হতে ইচ্ছা হয়—চারিদিকে শুধু শস্য শ্যামলা মাঠ, বনভূমি, সেইসব বনভূমিতে

হারিয়ে গিয়ে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসতে ইচ্ছা হয়। নদীর জলে নৌকায় বুঝি এখন অসীম আসছে এবং তার মামাবাবু আসছেন। সুভাষ, যে সুভাষ প্রাণের চেয়েও একদা মূল্যবান মনে হয়েছে, সেই সুভাষের মুখ আদৌ সে স্মরণ করতে পারল না। সে রেলীঙে উঁকি দেবে ভাবল, ওরা যেন দেরি করে ফেলছে—ঠিক তক্ষুনি গাড়ির হর্ণ। নীচে সদর দরজায় গাড়ি থামার শব্দ। অনু প্রায় যেন উড়ে উড়ে নীচে নেমে গেল। সদর খুলে দিল নিজে। মা, মণিমাসী অথবা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করল না। অসীমের মামাবাবুটি অনুকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করল। অনু কবে একবার গিয়েছিল। তখন প্রথম সাক্ষাৎ তার, তিনি তাঁর বইয়ের জন্য নায়িকা খুঁজছেন, অসীম অনুর নাম করেছে, অসীম নিজেই একদিন অনুকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে স্ক্রিপ্টের কিছু কিছু অংশ সেদিন শুনিয়েছিলেন। সুভাষকে সে এসে বলেছিল, অসীমের মামাবাবু বই করবেন, সে সেখানে নায়িকার অভিনয় করবে। এমন বই আর হবেনা। মানুষটি বিশ বছরের ওপর ফরাসী দেশে ছিলেন—কি এক আন্দোলন, বুঝি নুভেল ভাগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তিনি বই করবেন—সেই শুনেই না ও ক্ষেপে গেল এবং সেই কারণে বুঝি সুভাষ ভেবেছিল অনু নামক যুবতীর নির্মল জলে অন্য মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। সুভাষ রাগে দুঃখে অথবা এও হতে পারে অবিশ্বাসের জন্য, আমার বধূ আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া, কি দিয়া কি না দিয়া কি হৈয়া যায় কেউ জানে না—পূর্ববঙ্গের সুভাষ অবিশ্বাসের দায়ভাগে ভুগে অনুকে অজ্ঞাতে গর্ভবতী করে দিল। অনু, তুমি আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী, আমি এক ভয়ঙ্কর কুৎসিত যুবক, লম্বা, ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে। তুমি আমায় ছেড়ে অন্যত্র নৃত্য করে বেড়াবে তা চলবে না। তুমি আমার সন্তানের জননী হলে তুমি আমি এক সুতোয় বাঁধা থাকব। অবিশ্বাস এবং জ্বালা সুভাষকে বড় ছোট করে দিচ্ছিল। অনু যত ভেবেছিল ওদের অভ্যর্থনা করার সময়

সুভাষ নামক যুবকের কথা ভাববেনা—তত দেখল সুভাষই সব নষ্টের মূলে—সে অসীমের মামাবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। সুভাষ কেবল যেন, কোন অদৃশ্য লোক থেকে ওকে তাড়া করছে।

মামাবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, বেশ গন্ধ আসছে মনে হয়? কি ফুলের গন্ধ!

—বাতাবী ফুলের গন্ধ।

—আঃ কি সুন্দর! এমন গন্ধ ফুলের হয়, একেবারেই ভুলে গেছি। বাতাবী লেবুর গাছ আমাদের দেশের বাড়ীতে একটা ছিল। বর্ষাকাল এলেই আমাদের একটা কাচারি বাড়ি ছিল সেখানে বল খেলতাম। বাবা খুব বকতেন। চুরি করে আমরা লেবু সংগ্রহ করতাম। কি যে রোমান্স চুরি করাতে—বুঝলে অনু, সে এখন তোমাকে বোঝাতে পারব না। বাড়ির গাছে ফল ফলেছে, চুরি করে অন্য বন্ধুকে দিয়েছি, তাতেই কি আনন্দ।

অসীম বলল, মামাবাবু, নীচের ঘর দুটোতে গানের স্কুল খুলেছেন অনুদি।

—তাই বুঝি! দেখি দেখি! বলে তিনি দু লাফে সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে বললেন, বা, বেশ ঘর দুটি তো! তারপর তিনি কথা বললেন না আর। বুঝি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তিনি পরিচালক মানুষ। তিনি চুরুট ধরালেন, কারণ তিনি জানতেন মুখে চুরুট রাখলে তাঁকে খুব চিন্তাশীল দেখায়! এবং মানুষ হিসাবে তিনি যে কত বড় এবং মহৎ এই চুরুট ঠোঁটে রাখলে তা বুঝি টের পাওয়া যায়। তিনি দেয়ালের সব ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। বিখ্যাত সব সঙ্গীতবিদদের ছবি। কোথাও জলছবির মত নির্মল নদীর পাশে বন-উপবনের ছায়া। তিনি দেখতে দেখতে একসময় বললেন, অনু আজ আমরা আবার স্ক্রীপ্টটা পড়ব। আমাদের খেতে নিশ্চয়ই দেরি হবে। ততক্ষণে আমরা পড়ে ফেলতে পারব।

কথা ছিল অনু যাবে। কিন্তু এসময়ে অনুর বেশী ছোটাছুটি যুক্তিযুক্ত নয়, এই ভেবে অসীম মামাবাবুকে অনুদের বাড়িতে আসতে রাজী করিয়েছে। অনু এই ফাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করে ফেলল। ভোজের উৎসব। কতদিন এ-বাড়িতে কোন আত্মীয়স্বজনদের মুখ দেখা যাচ্ছে না, বিশেষ করে সুভাষ কতকাল হল আর এ-বাড়ি মাড়াচ্ছে না, সকলেই কেমন অনুকে এড়িয়ে চলছে—এমন সময় এই ভোজের উৎসব সবার মনেই বেশ উল্লাস সৃষ্টি করছিল বোধহয়।

ওরা পার্লারে বসেছিল! মা এবং মণিমাসিকে অসীম প্রথম পরিচয় করিয়ে দিল। মামাবাবু মানুষটি কথা কম বলেন। দেখলে মনে হয় তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। সব সময়ই যেন তিনি কি ভাবেন। চোখে মুখে তাঁর একটা অদৃশ্য চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। বয়স আর কত মামাবাবুর। ঠিক যুবক বলা চলে না, প্রৌঢ় বলাও চলে না। মাঝবয়সী মানুষ। লম্বা। তিনি সময় হাতে কম বলে খুব তাড়াতাড়ি গোটা গল্পটা বলতে চাইলেন অনুকে। অসীমের ইচ্ছা ছিল অনুদি প্রথম একটা গান ধরুক। একটা গান গেয়ে শোনাক—কিন্তু মামাবাবুর তাড়াতাড়িতে সে কিছু বলতে পারল না।

অনু যে কাপড়টা পরেছিল—তার রঙ সবুজ, পাড়ের রঙ লাল। অনুর পায়ের কাছে পাড়ের লাল রঙ প্রায় গোলা আলতার মত আভা দিচ্ছিল। মামাবাবু অনুর পা দেখছেন কি ওর কাপড়ের পাড় দেখছেন বোঝা যাচ্ছে না। নিবিষ্ট মনে অনুর সুন্দর পা এবং কাপড়ের পাড়, আর এই ঘরের সবুজ রঙ দেখতে দেখতে চোখে শুধু এক জলাশয়ের ছবি ভেসে উঠল—জলাশয়ের দুধারে সব নারকেল গাছ। গাছে গাছে ফল, সরস ফলের মত এই মায়ের চোখে মুখে লাবণ্য। মামাবাবু গলার টাইটা ঠিক করে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন: আমরা সবাই কম বেশী সরস ফলের সন্ধানে আছি।

মামাবাবু ফের বললেন—জানো, আমি ভেবেছি ছবিটার নাম রাখব লাল কমল, নীল কমল। গল্পের পটভূমি যে কোন দেশ হতে

পারে। কিন্তু ঘটনাটা হবে মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে —তার ওপরই ছবির কাহিনী ঠিক করা আছে। ছবিতে কিছু মণ্টাজ ব্যবহার করার চেষ্টা করব—নায়িকার স্বগতোক্তি মণ্টাজের বিষয় বস্তু হবে। 'এখন আমার জানালায় কাঁচের শার্শিতে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে নিঃসঙ্গ পাইনের বন। বনে একদল উন্মত্ত যুবক যুবতী ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ কাচের জানালায় শুধু নিঃসঙ্গতা। আমি আর পারছি না। স্যার ফিলিপ সিডনীর কথা মনে হল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেই সৈনিকটি বরফের কুচিতে শুয়ে আছে। বড় তৃষ্ণার্ত। জানালায় নীল পর্দাতে কিছু কারুকার্য করা। নিচে পথ। ল্যাম্প-পোষ্টে জোনাকির মত আলো।' এবার মামাবাবু চোখ তুললেন, বুঝলে অনু, আমি একটা টিউলিপ গাছ রাখব। মণ্টাজে এমন সব দৃশ্য থাকবে।

—বাংলাদেশে তো টিউলিপ ফুল ফোটে না।

—আন্তর্জাতিক ছবিতে এসব দেশজ ধর্মাধর্ম বিচার করতে নেই। বুঝলে, একটা কাঠের সিঁড়ি থাকবে! সেই সিঁড়ি থেকে কিছু দূরে টিউলিপ গাছটা। সব সময় দেখা যাবে একটা মানুষের ছায়া গাছটার নীচে পায়চারী করছে। আমি মানুষটার মুখ দেখাব না। শুধু তার লম্বা শরীর দেখাব। সে কত লম্বা এবং সবল তাই দেখাব। সিঁড়ির উপরে সেই ঘর থাকবে। সেখানে নায়িকা প্রসাধনে ব্যস্ত। সেখানে হাজার হাজার মানুষ তাকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে একটা কথা বলার জন্য ফোনে সংযোগ করার চেষ্টা করছে। মনে রাখবে টিউলিপ গাছটার নীচে যে হাঁটছে সে যুবতীর ভালবাসার মানুষ। ভয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসতে পারছে না।

—ঘরের ভিতর থাকবে দামী সব কার্পেটের টুকরো সব ছবি। এক দুই করে আমি ঘণ্টা বাজাব। কারণ ঘরের ভিতর জার্মাণ যুদ্ধের অবয়বে এক ঘড়ি আছে। আর থাকবে একটা রঙিন পাখি। পাখিটার

বুকের অংশ ঠিক তোমার কাপড়ের পাড়ের মত লাল থাকবে। বলেই তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি রবিন পাখি দেখেছ?

—আজ্ঞে না।

—রবিন পাখির বুকের দিকটা বড় লাল।

—আপনি দেখেছেন?

—আরে লোত্রেকের দক্ষিণ দিকে ছোট একটা হ্রদ আছে। শীতকালে যখন ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে খুব বরফ পড়তে থাকে তখন ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। আমি ওদের জন্য নানা রকম খাবার তৈরি করে রাখতাম।

—আপনার পোষার সখ হয়নি! অন্নু খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল!

—পাখি পোষার সখ আমার কোনদিন ছিল না। বরং পাখিরা আকাশে খুশীমত উড়ে বেড়াক, যখন খুশি পাখিকে ইচ্ছা ডেকে নিমন্ত্রণ করো, আহার করাও, শীতের দিনে উত্তাপ দাও—বেশ সুখের ব্যাপার। তা না তুমি পাখি পুষবে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দেবে না, পায়ে শেকল বেঁধে রেখে দেবে—সে বড় কুৎসিত।

অন্নু এবার মনে করতে পারল মামাবাবুটি ব্যাচেলার মানুষ। ব্রহ্মচর্য পালন করছেন কি না, রবিন পাখী কতবার কত ভাবে আকাশে উড়িয়েছেন জানার ইচ্ছা হল। কিন্তু মানুষটি নিজেই এত বলছে যে অন্নু কিছুতেই আর প্রশ্ন করে জানতে পারল না—যদি আপনাকে এখন একটা রবিন পাখী ধরে দেওয়া যায় তবে পোষ মানাবেন কিনা, না ওড়াপাখী ধরায় সখ আপনার। ধরে তাকে আহার করানোর সখ আপনার, সখ-আহ্লাদ মিটে গেলে ছেড়ে দেবার সখ আপনার। বস্তুত অন্নু কিছুই বলতে পারলনা। মনে মনে শুধু কথাগুলো নাড়াচাড়া করল।

—রবিন পাখীর বুকটা এত লাল কেন জান? বলে তিনি খুব বিজ্ঞের মত ছাইটা ছাইদানীতে বেশ টিপেটিপে ঝাড়লেন। এবং

কিছুতেই তিনি অনুর দিকে সহজ ভাবে তাকাতে পারছেন না। চেষ্টার ত্রুটি নেই—খুব সহজ সরল হবার, খুব পরিচিত ভঙ্গীতে তাকাবার—কিন্তু কেন জানি হয়ে ওঠে না—বুঝি এই যুবতীর চোখে এক অসামান্য তেজ অথবা গাঢ় রঙ আছে, বুঝি বড় বড় চোখে যখন তাকায় মনে হয় কেবল শীতের শিশির টুপটাপ ঝরছে অথবা বড় তুই আঁখিপল্লব চোখ মেলে তাকালে প্রায় পদ্মফুল ফোটার মত। তিনি অনুকে এবার দেখলেন না, দেয়ালের দিকে মুখ করে বললেন—খ্রীষ্টের জন্মের দিন কি শীত! শোনা যায় সারারাত রবিন পাখিটা আস্তাবলে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। তু পাখাতে হাওয়া দিয়ে আগুন নিভতে দেয়নি। সারা রাতের উত্তাপে পাখির বুকটা এমন লাল হয়ে গেল।

—এসব নিশ্চয়ই উপকথা। অসীম মামাবাবুর কথার জবাবে বলল।

—সব কথাই সময় পার হলে উপকথা হয়ে যায়। সুতরাং বুঝলে অনু, ছবিতে একটা রবিন পাখিও রাখতে চাইছি। নায়িকার ঘরে পাখিটা খাঁচার ভিতর থাকবে। খাঁচার ভিতর থেকে আকাশে উড়তে চাইবে। জানালা খোলা থাকলে দূরের বন-উপবন দেখা যাবে। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই চোখে পড়বে। একটা গীর্জায় টাওয়ার এবং বড় একটা ঘড়ি থাকবে টাওয়ারে। এক একটা একসান শেষে ঘণ্টা বাজবে এক তুই তিন। ঠিক পর পর ঘণ্টা বাজবে।

অনু খুব মন দিয়ে শুনছিল। চরিত্রটা কেমন হবে, কোথায় কোথায় পরিচালক এক্‌সান সৃষ্টি করতে চান এবং যুবতীর মনে কি অসামান্য তুঃখ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল মামাবাবুর কথা থেকে সে তা ধরার চেষ্টা করছে।

—যেমন, ধর যেদিন সে আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করে ফেলল, সেদিন সে একা এক ঘরে। বড় হলঘর। দামী কার্পেটে বাঘ ভাল্লুকের ছবি আঁকা। এক পা ভাল্লুকের মাথায়, অন্য পা বাঘের

মাথায়। পাশাপাশি ঘরগুলোতে আর কেউ থাকবে না। নীচের ঘরে থাকবে নায়িকার পাচক এবং তার স্ত্রী। সেই জার্মান বৃদ্ধের অবয়বে যে ঘড়িটা টেবিলের ওপর থাকবে—সেখানে দেখা যাবে দশটা বেজে গেছে। নরম বিছানার প্রান্তে, হীরকের মত উজ্জ্বল আয়না থাকবে একটা। সোনালি গাউন থাকবে। স্লিপিং গাউন। নীচে কোন বাস থাকবে না। দর্পণে সোজা দাঁড়িয়ে সব বাস খুলে বিদ্যুতের চেয়েও ত্বরিতে সে নিজের অবয়ব দেখতে দেখতে হাহাকার করে উঠবে। শরীরের প্রতিটি ভাঁজে হাল আমলের ঈশ্বরদের উলঙ্গ নৃত্য রাখার ইচ্ছা আছে। তবে সেটা শিল্পসম্মত ভাবে দেখাতে হবে। কি ভাবে দেখানো যায় চিন্তা করছি।

অনু এখন প্রায় নড়ছিল না। সে তার পায়ের উপর পা রেখে শুনছে। প্রবল ঘাম হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। দৃশ্যটা সে ফের মনের ভিতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। জীবনের স্বপ্ন ছবিতে অভিনয়। এমন একটা ছবি—কি যেন বলে নুভেল বাগ, অথবা আরো বর্তমানের শিল্পকলা অতিক্রম করে বরং খালি গা হতে পারলে সব ভাগই নুভেল ভাগ, অনুর কপালে যথার্থই এবারে ঘাম দেখা দিল।

অনুর কপালে ঘাম দেখে মামাবাবু সামান্য বিচলিত হলেন। এই সামান্য যৌন প্রসঙ্গেই অনু ঘামতে শুরু করেছে। এখনও সেই দুর্লভ সব ঘটনার কথা খুলে বলাই হয়নি। অথচ এসব বইয়ে এমন নায়িকার প্রয়োজন, সবকিছুই যারা সহজভাবে নিতে পারবে। মামাবাবু ভেবেছিলেন, অনু যখন নাটকে অসামান্য অভিনয় করছে, গলা যখন কোমল এবং নরম আর শরীরের রঙে গঠনে মহিমময় ঈশ্বর যখন কোন অযত্নের ছাপ রাখেন নি, তখন এই একমাত্র যুবতী, যার মুখ, চোখ এবং লম্বা গড়ন ছবির অর্ধেক নগ্নতা ঢেকে দেবে! এমন নিষ্পাপ চোখ দেখে কে না অসহায় বোধ করবে। চোখের পল্লবে সামান্য জলের ধারা নেমে এলে কার এমন সাধ্য আছে বিচলিত না হয়। সুতরাং বুঝলে অনু, তোমার চুলের রঙ কালো রাখবনা। নীল

আভা থাকবে চুলের রঙে এবং একটা সোনার প্রজাপতি—দুই ডানাতে তার হীরক বসানো ক্লিপ দেখে মনে হবে প্রজাপতিটা সব সময় তোমার চারপাশে উড়তে উড়তে সহসা বসে গেছে।

এবার মামাবাবুটি অসীমের দিকে তাকালেন।—আচ্ছা অসীম, তুমি কোনদিন বিরাট এক মাঠের শেষে রেল লাইন দেখেছ? রেল লাইনটা বেঁকে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি অবস্থায় থাকবে। ট্রেনটা পুলের ওপর উঠে ধীরে ধীরে নেমে যাবে এবং রাতের বেলা সব সারি সারি আলো—আর মনে হবে গুম গুম শব্দ, মনে হবে পৃথিবীটা কেমন কাঁপছে। আমি প্রথমেই এই শব্দের সঙ্গে জলপ্রপাতের শব্দ মিশিয়ে দেব। বইয়ের প্রথম দিকটাতে কোন সঙ্গীত থাকবেনা, শুধু মিক্স্ড্ শব্দ ব্যবহারে উচ্চাশার এফেক্ট আনার চেষ্টা করব।

অনু বলল, গল্পের বক্তব্য কি তবে উচ্চাশা সম্পর্কে?

সোনালী চুলে প্রজাপতি ক্লিপে কত বিচিত্র রঙ এবং বিচিত্র করুণা এই জীবনধারণে। মামাবাবুটি এমন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। নায়িকা আমার নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে মিসিসিপির পাশে কখনও নায়গ্রা প্রপাতের মাঝে অথবা সেই গঙ্গানদীর কোন এক পারে ছোট্ট এক আশ্রমে হাজির। আমার নায়িকা কখনও কমলালেবুর বাগানে কোন পাখি আবিষ্কার করে ভেবেছে—এই আমার নীলকণ্ঠ পাখি, এই আমি চেয়েছি—কিন্তু তারপর মনে হয়েছে—না ভুল, আরো দূরে যেতে হবে পাখির জন্য—সে আবার হেঁটেছে—কোথাও একদল মেষপালককে দেখে বলেছে—কোথায় সেই পথ—যে পথে গেলে আমি আমার নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে পাব। উচ্চাশার প্রতীক এই নীলকণ্ঠ পাখি। বলে মামাবাবুটি সামান্য হাসলেন।—উচ্চাশা সম্পর্কে তোমার কি মত?

—ঠিক ভাল বুঝিনা। তবে এটুকু বুঝি ওতে লাইফ আছে। উচ্চাশা না থাকলে জীবনের থাকল কি?

—তবে কিছুই থাকল না!

—তবে মরা মানুষে তাজা মানুষে তফাৎ কি!

—তা হলে দেখছি তুমি খুব বোল্ড এসব ব্যাপারে।

—বোল্ড না হলে চলবে কেন? এসময় কি অনু সুভাষের কুৎসিত মুখ স্মরণ করে নিজের একগুঁয়ে জিদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে! অনু হাঁটুর ওপর পা দোলাচ্ছে। কপালের ঘাম শুষে গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে মুখ তুলে বলল, আমার দিক থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যখন বলছেন ছবি শুধু ছবি থাকবেনা, শিল্প হয়ে উঠবে—এবং এমন এক আন্দোলন আপনি এই শিল্পের মাধ্যমে আনছেন যা প্রায় ইতিহাসের মত অথবা বিস্ময়ের মত তখন অনুকে যেকোন কাজে আপনি আপনার শিল্পের ব্যবহারে লাগাতে পারেন।

—গুড্। এমন না হলে হয়। প্রথম ভেবেছিলাম লাইনের কোন বিখ্যাত নায়িকাকে নিয়ে আরম্ভ করব। কারণ এমন বোল্ড হওয়া বাঙালী যুবতীদের পক্ষে প্রথম প্রথম কষ্টকর। তাদের সমাজ আছে। যা কোনদিন হয়নি, হবেনা—তেমন এক শিল্পে মনের মত মানুষ খুঁজে পাওয়া বড় কষ্টকর। বলে তিনি থামলেন। দেয়ালে দুটো ল্যাণ্ডস্কেপ এবং দুপাশে দামী সব ইংরেজী বই, ডানদিকে পিয়ানোর ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এবং কোথাও বুঝি ধূপদীপের গন্ধ ছিল। ঘরে এমন সুপ্রাচীন সব গন্ধ যে শিল্প সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় নেই।

মামাবাবুটি উঠে দাঁড়ালেন। জানালায় দাঁড়ালেই পাশে বড় বাড়ি। এক বড় গীর্জা এবং সেই সব প্রাচীন বৃক্ষের নীচে সন্ন্যাসিনীদের মুখ। খুব স্তিমিত আলো জ্বলছে গাছগুলোর পাশে। কিছু বালক-বালিকার কলরব তিনি শুনতে পেলেন। তারপর তিনি জানালা থেকে মুখ তুলে বললেন—বুঝলে অনু, মূল চরিত্রে রূপ দিতে তোমার কষ্ট হবে না। নায়িকার কিছু সলিলকির কথা বলি শোন।—নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে মিসিসিপির জলে, কখনও নায়গ্রা প্রপাতের মাঝে এবং মিমোসা ফুলের ছায়ায় অথবা দক্ষিণদেশের কমলালেবুর

বাগানে এই শরীর, এই রঙ নিয়ে হেঁটেছি! এবং একদা কোন প্রান্তরে একদল মেষপালকের মত আকাশের কোন গভীরতায় ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার মত নীলকণ্ঠ পাখিকেও যেন আবিষ্কার করেছি। করতাম। তারপর……তারপর কোথায় যেন সে হারিয়ে যেত আরও যেতে হবে পথ মাড়িয়ে, কৃষকের গম ক্ষেত অতিক্রম করে, ঘাসের ওপর পায়ের ছাপ রেখে দূরে, দূরে হেঁটে যেতে হবে। দূরে কোন প্রজাপতির দেশে সেই নীলকণ্ঠ পাখির আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে।

সলিলকির কথা অনু খুব নিবিষ্ট মনে শুনছে। মামাবাবু পায়চারি করছেন। অসীমের এই মামাবাবুটির চেহারাতে কোথায় যেন যাদু আছে। খুব অল্প আয়াসে নিজের সম্পর্কে অন্যের মনে বড় ধারণা সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন। বস্তুতঃ অনু এত নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে যে ওর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। কি আবেগ এবং দরদ দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। যেন সেই এক পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় বরফ পড়ছে এবং বরফের মাথায় মামাবাবুটি প্রায় ঈশ্বরের পুত্রতুল্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনু, নিজের যে সামান্য ভালমন্দ বোঝার দায় দায়িত্ব আছে তা পর্যন্ত ভুলে গেছে। সে পাহাড়ের নীচে বুঝি অঞ্জলিতে জল নিয়ে অর্ঘ্যদানের নিমিত্ত অপেক্ষা করছে।

তিনি তখনও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সলিলকির কথা বলে চলেছেন—শোবার আগে প্রতিদিন যেমন আমি প্রার্থনা করেছি, করতাম, আজও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। যেমন প্রতিদিন সোনালি রঙের স্লিপিঙ গাউনটি গায়ে জড়িয়ে ঘুরে ফিরে দেয়ালে টাঙানো পৃথিবীর সব সচ্চরিত্র যুবকদের ছবি দেখতাম আজও দেখলাম। সেইসব বীর যুবাদের দেখে আজ হাসলাম। আমার মত নীলকণ্ঠপাখি খুঁজতে গিয়ে ওরা কতবার মুখ থুবড়ে পড়েছে জানার ইচ্ছা হল! কিন্তু এমন ঠাণ্ডা রাতে, যখন বরফের কুচি ঘরে ঢুকছিল, আমার শীত শীত করছে

তখন কেন জানি আর ওদের ব্যঙ্গ করতে সাহস পেলাম না। সুতরাং বালিশে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে স্মৃতিতে এই প্রথম শিশু বয়সের কিছু দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা মনে করে সামান্য শান্তি পাচ্ছিলাম। বলার ইচ্ছা হল, হা ঈশ্বর, আমি আবার সেখানে ফিরে যেতে পারি না। আমার ক্রমশ ঘুম এসে গেল।

মামাবাবুটি এইটুকু বলেই কেমন পায়ের ওপর সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন। এখানে সামান্য ফ্ল্যাসব্যাক থাকবে। চৌদ্দ পনের ঠিক হবে না—আরও কম। শীতের দেশ হলে চৌদ্দ পনের দেখানো যেত। আমাদের দেশে মেয়েরা চৌদ্দ পনেরতে গিন্নি হয়ে যায়। সুতরাং ভেবেছি বয়সটা দশ বার রাখবে। এবং ডায়ালগ থাকবে। ছাখ কেমন শোনায়। বলে তিনি একটা কাগজ বের করলেন, তারপর পড়তে থাকলেন।

আনি তুমি সকাল সকাল কোথায় যাও? বরফ পড়ছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছ। এস না কোথাও বসে একটু কফি খাই।

—ওদের দেশ হলে আমি মিষ্টার কথাটা ব্যবহার করতাম। মিষ্টার কথাটা ব্যবহারের পক্ষপাতি আমি; কিন্তু কিছু ধূরন্ধর বাঙ্গালী সমালোচক আছেন, তাঁরা দেশজ শব্দের পক্ষপাতি। সুতরাং তোমার নীচের ডায়লগটাতে 'মিষ্টার' ব্যবহার না করে 'বাবু' কথাটা ব্যবহার করলাম। ছাখো কেমন শোনায়। বলে তিনি পড়তে থাকলেন—বাবু, আমার তো সময় নেই। দয়া করে ক্ষমা করবেন।

অনুর দিকে সোজা তাকালেন তিনি। অসীম আলস্য নিয়ে শুনছে। সে কেমন চোখ বুজে পড়েছিল।—অনু, তোমার কি মনে হয় আনির যথার্থই কফি খাবার ইচ্ছা নেই।

—ঠিক বুঝতে পারছি না!

—না এসব বুঝতে হবে, না বুঝলে চলবে কি করে। মুখেও বলতে হয়, বলেছে—না বাবু, আমার তো সময় নেই—কিন্তু মনে মনে কি বলছে শোন, আহা এ-শীতে এক পেয়ালা গরম কফি! গৃহকর্ত্রীর

ভয়ঙ্কর চেহারার কথা মনে হল—সঙ্গে সঙ্গে আনির ইচ্ছা বরফের মত শক্ত হয়ে গেল, পরে মানুষটার দিকে আনি এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল যে মনে হয় ছুঁলেই সে বরফ গলে জল হয়ে যাবে। যাকে আমি এ-চরিত্রে অভিনয় করাব তার সে বোধ না থাকলে সব চেষ্টা আমার মাঠে মারা যাবে।

—তা ঠিক। কে করবে?

—এখনও খুঁজে পাই নি। তবে আমাদের খোঁজার শেষ নেই।

—অসীম—অসীম। তুমি ঘুমোচ্ছ!

—না না। সব শুনছি।

—তুমি যে বলেছিলে মিসেস পালিত তাঁর মেয়েকে দিতে রাজী আছেন!

—না, ওকে দিয়ে হবে না। ওর চোখ ছোট। চিবুক নেই বললেই হয়। নাকটা বসানো। অনুদির সঙ্গে কিছু মিল নেই।

মামাবাবু হতাশ গলায় বললেন, এই আমাদের এক মুশকিল। কাষ্টিং করতেই ছ্যাখো কত সময় পার হয়ে যায়। যাই হোক—যা বলছিলাম, মেয়েটির গায়ে লম্বা ফ্রক থাকবে। ছেঁড়া উলের জামা, হাতের দস্তানাটা ছেঁড়া এবং লাল রঙের। লোকেশান দার্জিলিং অথবা অন্য কোন শীতের শহরে। পায়ের মোজা পাতলা। মেয়েটির মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। দেখে মনে হবে সে শীতে জমে যাচ্ছিল। সুতরাং সদাশয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির অফার সে ফেলতে পারল না। তিনি ফের বললেন, এস, ঘরে এস। কফি খাবে।

—মেয়েটি মনে মনে কি বলছে শোন!—গৃহকর্ত্রীর ভয়ঙ্কর মুখ এবং ডিকেণ্টার ছুঁড়ে মারার অভ্যাসও প্রচণ্ড শীতে আমাকে প্রলোভন থেকে নিরস্ত করতে পারল না। সেদিন সেই প্রৌঢ় কেবিনের ভিতর বসে আমাকে কত রকমের প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা?'

'তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন! তাঁর কথা আমার মনে নেই।'

'কতদিন থেকে তুমি সুজানের বাড়িতে আছ?'

'তাও জানি না। বড় হয়ে দেখছি ওদের বাড়িতেই আমার কাজ। ওরা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়।'

'খুব দুঃখের ব্যাপার।'

এখানে মামাবাবু থামলেন। তিনি ফিরে এসে সোফায় বসলেন। গীর্জার ভিতর মনে হল কারা প্রার্থনা করছে। তিনি প্রার্থনা সঙ্গীত শুনতে শুনতে কেমন চোখ বুজে বলতে থাকলেন, বালিকা আনির চোখ এবং লম্বা গড়ন সেই বিপত্নীক প্রৌঢ় মানুষটিকে প্রলুব্ধ করেছিল—খেলাচ্ছলে সব কাজগুলো করা! সেই মানুষের ক্ষমতা সীমিত—সে আর কতটুকু এগুবে, তবু মনে মনে আনি বলত আমার শরীর ভয়ঙ্কর রকমের বাড় বাড়ন্ত এবং পরে জেনেছি মহিমময় ঈশ্বর প্রদত্ত এই শরীর খুব সহজে যৌন উত্তেজনা সঞ্চার করতে পারে। অথচ কি আশ্চর্য সে বয়সে কেমন একটা সুখ সুখ ভাব পোষণ করলেও আমার আসলে যৌন সুখের স্বাদ অথবা বোধের জন্মই হয়নি। কে বা কারা যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেমন ছাইচাপা আগুন ফুঁ দিতে দিতে এক সময় জ্বলে ওঠে আমি তেমনি জ্বলে উঠলাম! সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি সামান্য প্রলোভনের বিনিময়ে কাঠের আগুনে ফুঁ দিতে থাকলেন।

মনিমাসি এ-সময় কফি এবং এক টুকরো করে কেক রেখে গেল। মামাবাবু চোখ খুলে দেখেছেন না। দু হাত কোলের ওপর নিয়ে বসে কি আর বলা যায় এমন সব বুঝি ভাবছেন। পরের ঘটনাটুকু ভাল করে না বলতে পারলে অনুর মনে দাগ কাটবে না। তিনি মনে করার ভঙ্গীতে উঠে বসতেই অনু বলল, কফি এসেছে। কফি খেয়ে নিন।

—বেশ গরম পড়েছে আজ, কি বল?

—বোধ হয় বৃষ্টি হবে। অসীম বলল।

—না, ঝড় হতে পারে। অনু জানালা দিয়ে উঁকি দেবার মত মুখ বাড়িয়ে কথাটা বলল।

—ঝড় বৃষ্টি হলে মন্দ হয় না। গুমোট ভাবটা অন্তত কাটে!

—এবার বোধহয় কেটে যাবে।

এবার কফিতে মুখ রাখলেন মামাবাবু। কফি খাচ্ছেন কি জলের অতলে ডুবে যাচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না।— শোন, যা বলছিলাম। পাত্রপাত্রীর নাম কোন দেশ কাল পাত্রের স্বাক্ষর বহন করবে না। যেমন ধর, চরিত্রগুলোর নাম আনি হতে পারে, মলি হতে পারে, ফ্রেডী হতে পারে, কাদম্বিনী হতে পারে আবার শিক্ কাবাব হলেও বিস্মত হবার কারণ নেই।

—বা! এ আবার নাম হল নাকি!

—তুমি রজনীগন্ধা বললে, আমি বাটার কাপ বলব।

অনু বলল, যা খুশি তা বললে চলবে কেন?

—আমি সল্ট লেক বলব, তুমি লবণ হ্রদ বলবে।

—সে তো ইংরেজী বাংলার কথা।

— তুমি যুবতী বলবে, আমি চেঙ্গেরিতা বলব।

সে আবার কি।

—এটা স্প্যানীস শব্দ। শব্দার্থ না জানলেই মনে হয় কেবল শিক কাবাব শুনছি। সুতরাং যা বলছিলাম শোন। দেশ-কাল-পাত্র থাকবে না। কোন ফুলের নাম থাকবে না। নদীর নাম থাকবে না। স্থানের নাম থাকবে না। পোশাক যখন যা খুশি পরতে পার। পোশাক এমন থাকবে বা থাকবে না—যাতে করে কোন দেশের অথবা দশের বলে চিহ্নিত করা যায়। ছবি শেষে আমরা একটা কালো বিড়ালের মুখ দেখাব। বেড়ালের দুটো চোখে দুই হীরক জ্বলবে।

—আমি অত বুঝতে পারি না মামাবাবু।

—একে একে সব বুঝবে। এখন তোমাকে আমি অ্যানি না বলে মেরী বলতে পারি।

—তা পারেন।

—এখন তুমি আর অনু নও।

—তা যখন ভেবেছেন।

—এখন তুমি আর সুভাষবাবুর স্ত্রী নও।

—তা যখন বলেছেন।

—এখন তুমি শুধু মনে রাখবে বিধবা যুবতী, পেটে তোমার জারজ সন্তান। ভিতরে ভিতরে অনু কেমন কেঁপে উঠল।

তবু এক পাখি উড়ে বেড়ায়, উচ্চাশার পাখি। পাখি ঝড় জল মানে না, উত্তর দক্ষিণ চেনে না, পাখি উড়ে উড়ে মরীচিকার দেশে চলে যেতে চায়। যত দুর দেশ তত রহস্যময় মনে হয়। অনু সোজা হতে পারল না আর। রহস্যময় এক জগৎ, গান এবং নাচের জগৎ, অভিনয়ের জগৎ তাকে প্রলোভনে মত্ত করল। অনু চুপচাপ বসে বাকি গল্পটুকু শুনল।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন, 'বিকেলে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হয় না!

'হয়! কিন্তু সুজানের ছেলেকে হাওয়া খাওয়ার জন্য পার্কে অথবা ময়দানে ঘুরতে হয়।'

'আমাকে সঙ্গে নিও। তোমাকে সাহায্য করতে পারব। তোমার সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াব। গল্প করব।'

'আমি জানি না, আমার স্মৃতিশক্তিতে ভেসে উঠছে না'—আনি সহসা তার নিজের ঘরে ছুটে বেড়াতে থাকল, মৃত্যুর রাত এটা, সে আত্মহত্যা করবে এই রাতে—তার সব কিছু মনে করা চাই। সেই বালিকা বয়সে তার ফ্রেডীকে কেন ভাল লেগে গেল—সে জানালায় এসে দাঁড়াল—দূরের পাহাড় দেখল, গীর্জার মাথায় ক্রস দেখল এবং মেঘলা আকাশে পর্যন্ত ইতস্ততঃ নক্ষত্র দেখতে পেল, কিন্তু ফ্রেডিকে ভাল লেগে গেল কেন মনে করতে পারল না। সে জানালাতে হাত

রেখে এক সময় বুঝি মনে করতে পারল, সুজানের তিরস্কার এবং প্রবল খাটুনির পর এই প্রৌঢ় মানুষটির সদাশয় আচরণ তাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে মনে উচ্চারণ করল আনি, 'বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কৃত এই জীবনে তাঁর সুন্দর এবং সরল আমন্ত্রণ আমাকে আপ্লুত করল। বললাম, বিকেলে এস ফ্রেডি। আমরা দুজনে পার্কে, ঘুরব। ফ্রেডি আমাকে প্রথম বিকেলেই কিছু বাটার কাপ ফুল দিয়েছিল এবং বলেছিল, তুমি খুব সুন্দর।'

'সে রাতে আমার কেন জানি ঘুম হয়নি। চুরি করে বার বার নিজেকে আয়নায় দেখেছি। চুরি করে যাতে সুজান না দেখতে পায়, আতর মেখেছি, প্রসাধন করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাক, চোখ, মুখ দেখলাম। মনে হল চোখ আমার বড়, চোখের পল্লবে কাজলের কালো অন্ধকারে অতল জলের মত আহ্বান, সারা মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ এবং নিতম্বে হাত দিতেই মনে হল—ক্রমে এক নদীর মোহনার মত আমি সমুদ্রে পৌঁছে গেছি। সেদিনই আমার একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখার সখ হল। সুজানের ঘর ভাল লাগল না। বড় অপ্রশস্ত এই ঘর, মনে হল ওর জারজ সন্তান বড় বেশী চীৎকার করে এবং সুজানের অত্যাচার অসহনীয়। পালাতে চাইলাম! সুজান টের পেল, সে টের পেয়ে একদিন ডিকেণ্টার ছুঁড়ে মারল। সেই ডিকেণ্টার গালে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। আরোগ্য হলে সেই ক্ষতস্থানটুকু আমার গালে সামান্য কুঞ্চনের সৃষ্টি করল। আর কি আশ্চর্য সেই ক্ষতস্থান আমাকে আরো বেশী সুন্দরী করে তুলল। আমি যে ভাবেই কথা বলিনা কেন, মুখে, চোখে সেই আহত স্থানটুকুর জন্য অসামান্য লাবণ্য, এক অসামান্য লোভ লালসা আমার শরীরের প্রতি অথবা বলা যেতে পারে আমি আগুনের মত নিজের ভিতর নিজেই জ্বলছিলাম।'

'বিকালে সুজানের জারজ পুত্রকে প্যারামবুলেটরে শুইয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেছি। বিকেলে তুষার পড়ছে না, রোদের রঙ বার্চগাছের

মাথায়। পথ পিচ্ছিল অথবা কর্দমাক্ত নয়। পাব এবং রেঁস্তোরা-গুলোতে প্রচণ্ড রকমের ভিড়। বড়দিনের পোশাক পরে আমি আয়নায় দাঁড়াতেই মনে পড়ল যেন এক ফোটা ফুল আমি। আমাকে কেউ তুলে নিক এমন ইচ্ছা হল। আমার পায়ে হাল্কা রঙের মোজা ছিল। সেদিন প্রথম সন্তর্পণে পালিয়ে ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সে আমাকে বড় দিনের উৎসব দেখাবে। ছোট্ট ঝোপ অতিক্রম করে উইলো গাছের নীচে আমরা দাঁড়ালাম। বললাম, 'ফ্রেডি, তুমি কি কর?'

'থিয়েটারে বেহালা বাজাই।'

'আমাকে একদিন থিয়েটারে নিয়ে যাবে?'

'তুমি যাবে! চল। কবে যাবে তুমি?'

'আমরা তুজনে টুলে বসলাম। সামনে ঝিল। ছোট স্কীপে ইতস্তত: যুবক যুবতীরা ভেসে যাচ্ছে। ঝিলের তুপাশে সব বড় বড় গাছ, মনে হয় এই গাছসকল কতকাল থেকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। এবং প্রায় যেন গাছগুলো নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করেছে। তখন আলো জ্বলছিল পার্কে। লাল নীল আলো। বড়দিনের উৎসবে আতসবাজী পুড়ছে। কোথাও নীল রঙের গাধার ছবিতে ঈশ্বর তুল্য মানবশিশুকে দেখা যাচ্ছে। আমর কেন জানি তু'হাত তুলে বলতে ইচ্ছা হল— ফ্রেডি তুমি আমাকে পেট ভরে প্যাস্ট্রি খাওয়াবে আজ। বলে মুখ তুলতেই দেখলাম—ওর সেই পিতৃতুল্য মুখ আর নেই। চোখে-মুখে কুৎসিত প্রলোভন। সে আমার তুহাতে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে। বললাম— ফ্রেডি, আমার ভাল লাগছে না। আমার ভয় করছে।

'এস তবে আজ উঠি।' ফ্রেডি এই বলে উঠে পড়ল।

'আমাকে নাটক দেখাতে কবে নিয়ে যাবে?'

'নেব। ভাল বই হোক, তোমাকে নিয়ে যাব।'

'ফ্রেডি, তুমি আমাকে বড়দিনের উৎসব দেখাবে বলেছ।'

'চল দেখাব।'

'আমি পেট ভরে প্যাস্ট্রি খাব।'

'চল খাবে।'

'সেদিন ফ্রেডি আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। কেন জানি মনে হল আমি অনাথিনী নই। মনে হল আর নয়। এভাবে সুজানের ঘরে আর পড়ে থাকব না! এবং সেদিনই ব্যালেতে নাচ শেখার স্পৃহা জন্মাল।

'পরদিন ফ্রেডিকে বললাম, ইচ্ছা হয় ব্যালে শিখি। ব্যালেরিনা হই। ফ্রেডী তুমি আমাকে ব্যালেরিনা হতে সাহায্য করবে?'

'চল।'

'বিকেলে ঘরে ফিরতে একটু দেরি হল। নাচ শিখতে দেরি হয়ে গিয়েছিল! রাত করে ফিরতে দেখে সুজান মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। পরে অনেকক্ষণ দরজায় মাথা ঠুকলাম। শপথ উচ্চারণ করলাম অথচ সুজান আমার কোন কথায় কান দিলনা। নচ্ছার বদমাস মেয়ে, পথে ঘাটে মানুষ ডেকে টাকা রোজগার করছি, আমি থাকলে ওর জারজ সন্তানের অমঙ্গল হবে—সুতরাং বন্ধ দরজা আর খুলে ধরল না। রাত গভীর। পথ নির্জন—দূরে পুলিশের বুটের শব্দ—আমি সব উপেক্ষা করে ফ্রেডির আশ্রয়ে হাজির হলাম। ফ্রেডি খুব খুশী। ভিন্ন ঘরে সে আমায় থাকতে দিল। ঘরে সে একা। অন্য কেউ নেই। সে তার স্ত্রীকে সহ্য করতে পারতনা। স্ত্রী তার কোথায় চেষ্টারফিল্ডের খামারে কার ক্যাশ আগলাত।

'ফ্রেডির ঘরে দিন দুই বেশ সুখে ছিলাম। বিকেলে নাচ শিখতে যাই, ফ্রেডি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং একদিন রাতে দুজনেই খেতে বসেছি, ফ্রেডিকে সামান্য উত্তেজিত দেখাচ্ছে। সে অন্যদিনের মত ধীর স্থির ভাবে খেল না। খুব তাড়াতাড়ি খেল। অন্যদিনের তুলনায় সে বেশী মদ্যপান করল। যেন সে সাহস সঞ্চয় করছে এমন ভাবে হাঁটা-চলা করছিল। আমার ফের ভয় ধরে গেল। ওর সেই ভয়ঙ্কর মুখ দেখে তাড়াতাড়ি খাবারটুকু শেষ করে দরজা দিতে যাব—

ফ্রেডি বলল, লক্ষ্মী আনি, তুমি আমাকে হতাশ করনা। বলে সে আমাকে এতটুকু সময় দিল না। কেমন সে নেকড়ে বাঘের মত আমার কোমল মাংস কামড়ে ধরল। প্রথম সেই দানবিক প্রবেশ-প্রস্থান এখন এত বেশী হাস্যকর মনে হয় যে, ফ্রেডি বেঁচে থাকলে বলতাম, বুঝি তবু তুমি সময় নিয়ে হাত করেছিলে—কিন্তু হাল আমলের যুবকেরা আমাকে সে সময়টুকু পর্যন্ত দিতে রাজী থাকে না। কেবল এক ভাব, খাব খাব ভাব।'

'প্রখ্যাত ব্যালেরিনা হবার দিনটি পর্যন্ত ফ্রেডির গৃহে শুধু কিছুক্ষণের জন্য নষ্টামির বিনিময়ে সযত্নে লালিত হয়েছি। এবং প্রতিদিন জানালা খুলে জীবনের নীলকণ্ঠ পাখিকে আকাশের কল্পিত অবয়বে উড়তে দেখেছি। কখনও জানালায় ঝড় অথবা বৃষ্টি—কখনও সোনালী রোদে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে কোন যুবকের হাত ধরে শিম্ফনির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হ্রদের তীরে, পাহাড়ের পাদদেশে, সবুজ ঘাসের মাঠে কিংবা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে দূরে চলে গেছি। শেষে একদা যখন ফ্রেডি নষ্টামির শেষ সীমাটুকু অতিক্রম করল, যখন সে আমাকে গর্ভবতী করার স্পৃহাতে কাঁকড়ার দু ঠ্যাঙ বাড়িয়ে ধরল, আমি··· আমি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলাম—ফ্রেডি আমার মুখ দেখে তোমার কষ্ট হয় না! ফ্রেডি আর কত আমায় যন্ত্রণা দেবে!

'এ সময়েই ঈশ্বর আমাকে যুবতী করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকলেন। শরীরে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। স্নানের ঘরের মেঝেতে জল পড়ে থাকলে আয়নার মত দেখাত, জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতাম। নগ্ন হয়ে বসে সেই ছায়াতে যেন কি এক গভীর কৌতূহল ছিল, নিজেকে নিজে আবিষ্কার করে তন্ময় হয়ে যেতাম। শরীরকে পরিপুষ্ট ভাবে ফলবতী করার জন্য এ সময়ে সুপুরুষ খেলোয়াড়কে সঙ্গী হিসাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মাল।

'যে নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধান ফ্রেডি আমাকে দিয়েছিল, এখন আমি তার উৎসে যাবার মুখে। আমি এবার প্রেমিকের সন্ধানে থাকলাম।

কোন এক খেলোয়াড় যুবক আমায় প্রেম নিবেদন করল। ওর ভালবাসা আমাকে অভিভূত করল। যুবকের প্রেম প্রীতি স্নেহ, আর কি অসীম ভালবাসা—জীবনে আর কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে মনে থাকল না। এই মানুষই যেন আমার শেষ শান্তির আশ্রয়,—আমার শেষ ডাঙ্গা অথবা শেষ বন্দর। আমি এখন আর জাহাজ হয়ে নিরুদ্দেশে ভেসে চলব না। বাতিঘরের মত অশান্ত ঝড়ে অন্য জাহাজকে পথ দেখাব।'

এইটুকু শুনে অনু বলে উঠল—বেচারা!

অসীম বলে উঠল—যাক তবে একটা ঘর পেল।

মামাবাবু বললেন, কোথায় ঘর কোথায় বর আমরা তার কিছুই জানি না। বস্তুত সবই নিয়তি। আনির বুঝি এই নিয়তি ছিল। অনু বলল, এবার তবে খাবার দিতে বলি।

—আরে না না। বলে তিনি হাতঘড়ি দেখলেন।—জীবন এত সহজে শেষ হয় না। হলে তবে আত্মহত্যা করবে কেন?

—আত্মহত্যার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। অনু বলতে গিয়ে লজ্জা পেল।

চুরুট শেষ হয়ে আসছে। তিনি ছাইদানিতে চুরুটের শেষ অংশটুকু ঘসে ঘসে নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু নিভতে চাচ্ছে না। তিনি চুরুটের দিকে তাকিয়ে বললেন, একবার আগুন ধরে গেলে তাকে আর সহজে নেভানো যায় না। আনি তখন বোষ্টনের সমুদ্রের তীরে ঘর বেঁধেছে। ঘন বার্চের অন্ধকারে সে প্রায়ই কোন না কোন যুবকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হত। যে ইচ্ছার তাড়নায় ফ্রেডি শরীরে তার দগদগে ঘা করার স্পৃহাতে কাঁকড়ার মত হেঁটে আসছিল, তেমন ইচ্ছায় নিজের যুবকের কাছে ক্ষত বিক্ষত হতে গিয়ে দেখল তার নিজের মানুষ বড় শান্ত শিষ্ট—তার সঙ্গে কামনা-বাসনাতে পেরে উঠেছে না যুবক, যুবকের পাণ্ডুর চোখ দেখে সে বমি করতে চাইল মুখের ওপর।

—জানলার কাচে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে তখনও। দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতর আনির ছায়া। একবার লম্বা হচ্ছে অন্যবার ছোট হয়ে যাচ্ছে। ওর যথার্থ ভালবাসার মানুষ টিউলিপ গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অথচ সাহসে কুলাচ্ছে না, কারণ আনির জীবনে সব কিছুর স্পৃহা শেষ।

আনি এবার দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল। একবার পাখির খাঁচার নীচে, অন্যবার শিল্পীদের আঁকা ছবির তলায়। দেয়ালে কত মূল্যবান ছবি। সে যেখানে সুটিঙ করতে গেছে, যে দেশে যখন প্রমোদ ভ্রমণে গেছে—সে দেশের দুর্লভ সব ছবি সংগ্রহ করে এনেছে। সে পায়চারি করতে করতে শেষ বারের মত যেন ছবিগুলোর নাম পড়ল—প্রিজ্‌নার, দি কাউ বয়, ফ্রণ্ট, গীর্জা এবং মৃত্যু, অবৈধ সঙ্গমের একটা ছবি আছে, অস্পষ্ট রেখায় সেই ছবি আঁকা। দূর থেকে এমন কি খুব কাছে গিয়েও দেখলে মনে হবে ওটা বুঝি কোন ঈশ্বরের মুখ এবং চোখ। মূলতঃ চোখ অথবা মুখ নয়। কাছাকাছি গেলে যুবতী, যুবক থাকে পাশাপাশি, সংলগ্ন হলে যুবক থাকে না, যুবতী থাকে না, শুধু সঙ্গম থাকে। এমন এক রঙে ছবি আঁকা, যার পাতলা আবরণ ঠেলে দিলে সেই দৃশ্যটা চোখে পড়বে শুধু।

—দৃশ্যটা কি? অসীম আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—দৃশ্যটা সহবাসের।

অনু দু'কানে আঙ্গুল দিতে চাইল এবার।

কিন্তু মামাবাবু বলে যাচ্ছেন—তিনি সাধু সন্তের মত মুখ চোখ করে রেখেছেন—তার কাছে যেন সহবাস কথাটা আচার অথবা টক ঝাল মিষ্টি বড় সুস্বাদু, এই সহবাস কথার আর তেমন কি মানে হয়! কারণ তিনি পরে যা বললেন, তার অর্থ আরো অশালীন—অথবা তিনি যেন বলতে চাইছেন, অশালীনতার কি আছে—সবই জীবনের জন্য, যৌবনের জন্য, ভোগের জন্য। সুতরাং তিনি বললেন,

আনি চীৎকার করে উঠল—সুখ নেই, কোথাও সুখ নেই। অবৈধ সঙ্গমে সুখ নেই। তখন পীয়ের বলে এক ধনীর সন্তান আনিকে গ্রাস করছে। সে তার রবিন পাখির খাঁচাটা তুলিয়ে দিল। পাখিটা ভয়ে উড়তে থাকল ভিতরে। পাখির খাঁচায় আর পাখি থাকল না। মুখ সেই পীয়ের নামক যুবকের। খাঁচার ভিতরে রবিন পাখি পীয়ের হয়ে গেল। পীয়ের এখন যেন মল পায়ে দিয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

আনি বলল—'পীয়ের, তুমি তো এমন ছিলে না! ভালবাসাবাসিতে তুমি কত ভদ্র ছিলে। যেন লেবুর খোসাটি ছিঁড়ে খেতে জান না। ভাবলাম, তুমি বুঝি এমন মানুষ, আর যাই হোক সরল হবে, আমি যা বলব শুনবে—শুনবে—কিন্তু কেমন করে তুমি পাল্টে গেলে! তোমাকে আর পীয়ের বলে চেনাই গেল না।'

মামাবাবু অনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে অনু, পীয়ের আনির শেষ ডাঙ্গাও নয়, শেষ বন্দরও নয়। পীয়ের অযথা শরীরে উত্তাপ সঞ্চার করে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি দিত। আনিকে পেলেই জলের নীচে ডুব দিতে চাইত। যৌন জীবনে পীয়ের শিল্পীর মত উদ্যমশীল হলো না, হতে পারল না! আনি দুঃখ করে বলতো, আমায় ঘুমোতে দাও পীয়ের, পীয়ের শরীরটাই সব তোমার কাছে। আমার কাছে তোমার অন্য কি কিছু প্রাপ্য নেই—প্রেম-প্রীতি-স্নেহ। তুমি আমায় পাহাড়ের নির্জনতায় নিয়ে চল, ঘাস মাড়িয়ে নদীর উৎসে চল, দুজনে পা ডুবিয়ে বসব জলে, মুখোমুখী বসে গল্প করব।

—অনু, জীবনের বিচিত্র বিস্ময় এই মেরিলিন মনরো। যার জীবনটাই আমার ছবির ঘটনাবস্তু। আমি যার নাম এখন আনি রেখেছি। সে কি ভালবাসত বোঝা দায়। প্রথমে সে অধিক সঙ্গমলীন হতে ভালবাসত, পরে সে আদৌ যেন তা চাইত না—অন্য কিছু চাইল। সারা দিনরাত হাত পা ঢুকিয়ে বসে থাকা কত আর ভাল লাগে।

'হাত পা ঢুকিয়ে বসে থাকা' কথাটাতে অন্নুর কান গরম হয়ে গেল। মানুষটি কত সহজে নিদারুণ সব কথা অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে। সে ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে উঠে পড়ল। বলল, আসছি। সে তাড়াতাড়ি বারান্দা পার হয়ে গেল। ছুটো পরপর ঘর। একটা ঘরে বাবা বসে লিখছেন, অন্য ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়ে মা পাঁচালী পড়ছেন। তারপরের ঘরটাতে মণিমাসী ঠাকুর চাকর নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত এবং তারপরই বাথরুম। অন্নু দরজা ঠেলে প্রায় ঝড়ের বেগে ঢুকে বমি করতে থাকল। বেসিনে কিছু জল এবং গলা থেকে আঙ্গুলে তুলে যা কিছু ছিল, কীটপতঙ্গ সব ফেলে দিয়ে কেমন হাল্কা বোধ করল। ঠোঁটের নীচে জলের দাগ। সে আলতোভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রায় সেই যুবতী—যার জীবন তাকে অভিনয় করতে হবে, যার বৈধব্য জীবনের জারজ সন্তান পেটে নিয়ে ঘোরাঘুরি, এবং রহস্যময় এক হাতছানি সবসময় —কে যেন তাকে ক্রমে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অন্নু সোজা নিজের ঘরে গিয়ে সুভাষের ফটোটা তুলে রাখল। কাল আর এ ফটো এ-ঘরে সে রাখবে না। একেবারে ভিতরে, অন্য কোনখানে —যেখানে সুভাষ নামক কোন মানুষের স্মৃতি থাকবে না, তেমন স্থানে বনবাসী করে চলে আসবে।

সে একবার মণিমাসির জন্য দরজায় দাঁড়াল! আর কত দেরি বলার ইচ্ছা হল মাসিকে। কিন্তু বলার আগেই মণিমাসি বললেন, চোখ মুখ এমন শুকনো কেন!

—বড় ভয় করছে।

—ভয় কি। হাজার লোক তো করছে।

মণিমাসি এমন ভাবে কথাটা বললেন, যে এটা এমন কিছু নয়, তুমি জননী হতে যাচ্ছ, তোমার পেটে এখন সুভাষের জাতক, তুমি কি জান না বল, তুমি তো সব জান, সন্তান কিসে হয়, কেন হয়— তুমি সব জান অন্নু। ভয়ের কি আছে—কারণ, মানুষ ভালবাসাকে

বেশী দূরে নিয়ে যায় না। শুধু সন্তান উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দুতে অহরহ ঘুরে বেড়ায়।

অনু যেতে উদ্যত হলে বললেন, তোমাদের হলে বল, আমার হয়ে গেছে। খেতে বসলেই গরম গরম দিয়ে দেব।

—আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে খাচ্ছি না। বাবা এবং ওদের দু জনকে এক সঙ্গে দেবে।

—সুভাষ থাকলে কত আনন্দ হত বল।

—তুমি না মাসি, যা হবে না. তার জন্যে কেঁদে কেটে বেড়াবে।

অনু খুব সহজ সরলভাবে কথাটা বলল। যেন সুভাষ তার কেউ নয়, সে এমনি এক মানুষ, কোন মেলায় অথবা উৎসবে সহসা সাক্ষাৎ হয়ে গেছে. সামান্য পরিচয় সুভাষের সঙ্গে, পথের মানুষ পথেই রেখে এসেছে—সুতরাং অনু হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। মণিমাসি ভাবলেন আরও কিছু বলবেন, কিন্তু এমন এক চোখ তার, যা দুবার দেখলে মনে হয় দ্বিতীয়বার ওর মনের বিরুদ্ধে কিছু বললে সে শুধু কেঁদে ফেলবে। আর কিছু বলবে না। ভয়ঙ্কর যার জিদ, যে নিজের কাছে নিজেই হেরে গেছে তাকে সুভাষ সম্পর্কে বলে আর কি লাভ।

অনুর দেরি দেখে অসীম পর্যন্ত বের হয়ে এল —কি অনুদি এতক্ষণ কিসে লাগে?

—যাচ্ছি। হ্যাঁ অসীম, আজ উনি সবটা শেষ করতে পারবেন তো?

—কি জানি, ওর কি মনে আছে কে জানে। ওর ধারণা আপনাকে সব খুলে না বললে, পরে বেঁকে বসতে পারেন। সবটা তিনি খুলে বলতে পারলে তিনিও হাল্কা হবেন। তাঁর যে কি ইচ্ছা! বলে সুভাষ, যেমন ভগবৎ তুল্য মানুষ সম্পর্কে ভক্তরা বলে কয়ে মুখ ব্যাঙের মত হাবাগোবা করে রাখে, সেও তেমনি মামাবাবু এক অপার বিস্ময়, তার বিস্ময়ের তুলনা নেই, তার করুণার তুলনা

নেই—তিনি যাকে ছোঁবেন তার আর দেখতে হবে না, রাতারাতি যশের চূড়ায় উঠে একেবারে বরফ বনে যাবে, এমন এক মুখ করে রাখল।

অনু কানে কানে বলল, এখন তিনি কি করছেন ভিতরে?

—পায়চারি করছেন।

—বড় বেশী পায়চারি করেন!

—পায়চারি করলে নাকি বুদ্ধি বাড়ে। নানারকমের শিল্প সম্ভাবনার কথা মাথায় আসে। তিনি পায়চারি করতে করতে কখন কি আবিষ্কার করে ফেলেন তিনি নিজেও জানেন না।

অনু বলল, জান অসীম, আজ আবার অম্বল হয়েছে।

—এ-সময় একটু হয়ে থাকে। খুব বিজ্ঞের মত কথাটা বলে সিগারেট ধরাল। সে এই ফাঁকে একটু ফুঁকে যেতে পারছে বলে মনে মনে অনুদির উপর খুব খুশী। অনুদির অম্বল না হলে সেও বের হয়ে আসতে পারত না।

অনু ভিতরে ঢুকে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল।

—তোমার বাবাকে দেখলাম না!

তিনি এ-সময় একটু নিজের কাজ করেন।

—অঃ। বলে তিনি প্যাকেট থেকে নূতন একটা নীল রঙের চুরুট বের করলেন। তিনি সিলোফেন পেপারটা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। চুরুটের খয়েরি রঙটা এবার তীব্র দেখাল। তিনি আগুন জ্বেলে মুখের কাছে রাখবার সময় বুঝি বার দুই চোখ তুলে কেমন চুরি করে দেখার মত অনুকে দেখলেন। অনু এতক্ষণ বাইরে কি করেছে! কোথায় কি কারণে উঠে গেল, কানের আশেপাশে এখনও বুঝি বিন্দু বিন্দু জল লেগে রয়েছে, না কি সব ঘামের চিহ্ন! সে কি ভিতরে ভিতরে যথার্থ ঘেমে গেছে। চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আমেরিকাতে আপ্পালাচিয়ান বলে একটা দেশ আছে। সে দেশে প্রচুর গম হয়। গমের রঙ কি?

অনু বলল, মেটে রঙ।

—আসলে গমের রঙ সোনালী। আপ্পালাচিয়ান প্রদেশের গমের রঙ সোনালী। পিয়েরের পরিচালক বন্ধু আর্থার তখন আপ্পালাচিয়ান প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় বড় সব কলকারখানা, শহর অতিক্রম করে কোন হোটেলে দিন যাপনের সময় আর্থারকে আনির প্রেরণা দিতে হত। আর্থার সে তার প্রথম বইয়ে ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করেছে। সে, বন্ধু স্ত্রী আনিকে দ্বিতীয় বইয়ে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর্থার ভিতরের বিশ্বাস যখন হারিয়ে ফেলেছিল, আনি নানাভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে বলেছে—আর্থার আমি প্রাণ দিয়ে অভিনয় করব, আমি বড় হব আর্থার। ফ্রেডি আমাকে বড় হবার প্রেরণা দিয়েছে। পিয়ের আমাকে আমার স্বপ্নের জগতে পৌঁছে দিয়েছে। এখন আমার প্রাণ দিয়ে অভিনয়, আর তোমার দক্ষ পরিচালনা, আর্থার বিশ্বাস কর, তুমি আমার স্বপ্নের স্বর্গ। তুমি আমাকে গড়ে দিতে পার। আমি তবে অনায়াসে নীলকণ্ঠপাখি খাঁচার পুরে ফেলব। তুমি যে কি আমার—আর্থার তুমি জান না, তুমি যে কোথায়, কতদূর আমাকে নিয়ে যেত পার তুমি জান না—আর্থার আমি তোমার জন্য সব করব।

—কিন্তু! বলে তিনি বেশ সময় নিলেন বাকিটুকু বলতে। ফ্রেডির সেই পাখির খোঁজে যতবার ভেবেছেন আনি—এই তার নীলকণ্ঠ পাখি, এখানেই শেষ, এখানেই নোঙর করা যাক ততবার দেখেছে একটি আবদ্ধ ঘরে তাকে সকলে ব্যভিচারের সামগ্রী করে রাখতে চায়! সে হতাশায় তখন ছটফট করত। অনু, সেই হতাশা অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে আমার সব গেল।

অনু কোন জবাব দিল না। অসীম অনুর দিকে তাকাল। তার ইচ্ছা অনু জবাব দিক, বলুক, আমি প্রাণ দিয়ে অভিনয় করব। যদিও অসীম জানত, অনুদির অভিনয়ে ফাঁকি নেই, কারণ ওদের নাট্য সংসদের নাটক যতবার হয়েছে, রেডিওতে ওরা দুজনে যতবার নাটক

করেছে—প্রচুর বাহবা এবং হাততালি পেয়েছে, কারণ অনুদি অভিনয়ের সময় বড় চতুর এবং সাবলীল। সকলকে টেক্কা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার স্বভাব অনুদির। সেই অনুদি চুপ করে থাকলে অসীম অনুর হয়ে জবাব দিল, মামাবাবু, অনুদি অভিনয়ের সময় অন্য মানুষ।

—সে বিশ্বাস অনুর ওপর আমার আছে। বলে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের জানালাতে কি দেখলেন। পিছনে তাকালেই সেই গীর্জা, গীর্জায় এখন আর প্রার্থনা সঙ্গীত হচ্ছে না। গীর্জার দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু সদর দরজায় বড় আলো জ্বলছিল। গীর্জার মাঠ এবং সামান্য যে সব জায়গায় ঝোপ জঙ্গল আছে সেখানে বিন্দুবিন্দু আলো। তিনি তেমন দৃশ্য রাখবেন কিনা একবার ভাবলেন। কারণ এখন অন্ধকারে যেমন গীর্জার চূড়ায় পাখি বসে থাকার কথা নয়, বসে থাকলেও টের পাওয়ার কথা নয়, তেমনি মনের ভেতর অনুর ব্যভিচারিণী হবার কতটা সখ আছে, ইচ্ছা আছে, কি আদৌ ইচ্ছা নেই, না বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবতীর মত স্বামী সোহাগিনী, ধরা যাচ্ছে না।

—বুঝলে অনু, তিনি জানালা থেকে চোখ তুলে এনে অনুর ওপর স্থাপন করলেন, আর্থারের ইচ্ছা আনি ওর বইয়ে বেশ্যা মেয়ের ভূমিকাতে অভিনয় করুক। আর্থারের ইচ্ছা এইসব দৃশ্যে আনি অভিনয় করবে—যেমন বেশ্যা মেয়েটি এক যুবককে রাতের খদ্দেরদের থেকে আলাদা করে ভালবাসল। তারপর ভালভাবে জীবন কাটাতে এসে দেখল সেই যুবক সামান্য কারণে ওকে অবিশ্বাস করছে, অবিশ্বাস করে মদে ডুবে যাচ্ছে, অন্য যুবতী পেলে ঘোড়া গরুর মত ছুটে যাচ্ছে। বেশ্যা মেয়েটি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আর পুরানো বৃত্তিতে ফিরে যেতে পারল না। এই সুন্দর সহজ জীবনের স্বাদ তাকে আরও মহৎ করে তুলল এবং সে একদিন সমুদ্রে অবগাহন

করতে গিয়ে দেখল বনে বনে ফুল ফুটেছে, পাখিরা ডাকছে, এবং সুর্যের আলো এক প্রাচীন স্তোত্রের মত এই ধরণীর সর্বত্র শান্তির জল ছিটিয়ে যাচ্ছে। জীবন ধারণে এই ধরণীর এমন একটি শান্ত ভূমিকা আছে টের পেয়ে বেশ্যা মেয়েটি সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল। আর্থারের তখন দিন ছিলনা, রাত ছিলনা। আনিকে সেই ভূমিকাতে অনুপ্রাণিত করার জন্য কতভাবে চেষ্টা করেছে, কতভাবে সে মনের ভিতর একটা বেশ্যামেয়ের চিন্তা গেঁথে দিতে চেয়েছে। তারপর যখন সন্ন্যাসিনীর অভিনয়, আহা কি কোমল ও করুণ অভিনয়। তোমার মুখে অনু এখন সেইসব মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ। আনির সেই আকুলতা—যেখানে আনি বলছে আর্থার অন্য ঘরে চল, নাচঘর আমার ভাল লাগছে না। কোন পার্কে অথবা রেঁস্তোরায়, আজ আকণ্ঠ প্যান করব। আকণ্ঠ পান করে কৌরিপাইনের ছায়ায় তুমি এবং আমি বসে নূতনভাবে বাঁচতে চেষ্টা করব।

—অসীম, এখানে তুমি ভাল করে লক্ষ্য রাখবে। আর্থারের ভূমিকায় তুমি অভিনয় করছ। আনি, আর্থারকে বলছে, তুমি অযথা চিন্তা করে দুঃখ পাবেনা। পিয়েরকে যেমন ভালবেসেছিলাম, পিয়েরকে যেমন স্নেহ করেছি তেমন স্নেহ, প্রেম, অন্য কোন পুরুষকে দিতে পারব কিনা জানিনা, কিন্তু পিয়েরকে শুধু ঘৃণা করতে শিখেছি—ওর কিছু আর ভাল লাগেনা, বড় কামুক মনে হয়, বড় উৎপীড়ন করে বেড়ায়—আমাকে বিশ্বাস করে না, তুমি আর্থার আমার মাথায় হাত রাখ! মানুষের এই কোলাহল আমার ভাল লাগছে না। ওদের চোখ ভাল লাগছে না! এই জনতার ভিড় শুধু আমার মুখ দেখছে না, এক নটীকে দেখছে, অথবা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখছে—ওদের মুখে ছুঁড়ে দিলে ওরা আমায় খাবলে খুবলে খেয়ে ফেলবে। ওরা আমার ফ্যান শুধু নয়। ওরা আমার প্রতিবিম্ব নিয়ে বাঁচে। আর্থার, কোন কোন মহাকাব্যে সোনার

হরিণের উল্লেখ আছে—সোনার হরিণ ছুটছে, ছুটছে···আমরা ছুটছি, ছুটছি। সকলে ছুটছে। তুমি আমি, এই ধরণীর ঘাস ফুল পাখি সব। আজ এই দিনে, বর্ষার দিনে ঘরের রবিন পাখিটি কিছু খেতে চাইছে না। শরীর ভাল নেই, অথবা গৃহকর্ত্রীর মেজাজ ভাল নয় এই ভেবে হয়ত। সুতরাং জানালা খুলে দিলাম। বৃষ্টি ধরে এসেছে। মেঘের পাতলা আবরণটুকু আকাশের দেয়াল থেকে ক্রমে সরে গেল—জানালা থেকে নীল আকাশ দেখলাম—দূরে গীর্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে। এখনও এ-রাতে পার্কের হেমলক গাছের নীচে যুবক যুবতীরা অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। আহা অবৈধ প্রেম ব্যতিরেকে সুখ নেই। যতবার এই অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়েছি, যতবার আর্থার থেকে প্যাসী, পরে উইলিয়াম এবং আরও পরে ঈশ্বরের মত মুখ করে যে পুরুষ আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল তাকেও দুঃখ এবং হতাশায় রুগ্ন উটের মত মরুভূমির বুকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখেছি। বস্তুত দুঃখ এবং সুখ উভয়ের ফারাক ক্রমশ বিলীন হয়ে গেল। এত অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি আমার ভাল লাগছে না। অর্থে বুঝি সুখ নেই, প্রেমে সুখ নেই, অবৈধ সঙ্গমে সুখ নেই। সবই মনে হচ্ছিল ঈশ্বরের অসহ্য করুণা। সব ভোজ্য দ্রব্য আমার হাতের নাগালে। দুর্লভ কথাটি জীবনের অভিধান থেকে ফুরিয়ে গেল। বিচিত্র এই পৃথিবী এবং বিচিত্র দেশের সব দেয়ালে আমার নগ্ন ছবির দাম কোটি টাকার বিনিময়ে···আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব, দীর্ঘদিন নগ্ন ঈশ্বরী হয়ে বেঁচে থাকব। এবং ইহকালের সর্বত্র নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজেছি। অর্থে নীলকণ্ঠ পাখি, প্রেমে, প্রীতিতে—অথচ নেই। কোথাও তাকে আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে কেন বাঁচব। তবে কেন দীর্ঘ দিন, মাস, কাল, বৎসর গুণে শরীরকে ভয় করে বাঁচব। মনে হল সেই পুরানো গৃহকর্ত্রীকে যিনি ডিকেণ্টার ছুঁড়ে গালে কুঞ্চন সৃষ্টিতে সহায় হয়েছিলেন—তিনি বেঁচে নেই। বড়দিনের উৎসবে তার

দেওয়া অল্প দামের ফ্রকটির স্মৃতি, শহরের আলো, উৎসব, পানাহারের অভাব, তবু কেকে অল্প মুরগীর ডিমের গন্ধ, সব শেষে গৃহকর্ত্রীর একটি পেনী প্রদানে যে দুর্লভ আনন্দ, দুর্লভ সুখ…মহিমময় ঈশ্বর আমাকে অভাব দাও, আমাকে বাঁচতে দাও। আনি বিছানায় শুয়ে কাঁদল।

—আনি জানালা খুলে আজ তার প্রিয় রবিন পাখিটাকে ছেড়ে দিল। পাখিটা উড়তে পারছে না, দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে পাখিটা দেয়াল থেকে কার্নিসে ঠোক্কর খেতে খেতে সামনের টিউলিপ গাছটায় আশ্রয় নিল। আনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবল রবিন পাখিটার পক্ষে এই ঘর এবং দেয়ালই আশ্রয়স্থল। পাখিটার উড়তে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। অথচ আনির ইচ্ছা হল পাখিটা এখন নীল আকাশের নীচে উড়ে কোন সবুজ প্রান্তরে অথবা হ্রদের তীরে আশ্রয় নিক। আনি আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল এবং চাঁদের আলো দেখল। শুধু আলো, আলো। আনি জানালাটা বন্ধ করে দিল। সেই জার্মান বৃদ্ধের অবয়বের আকারে ঘড়িটাতে দুটো বাজার শব্দ। আনি বিছানায় এসে শু'ল। কালো মসলিন দিয়ে মুখ ঢেকে দেবার আগে এক দুই তিন গুনে গুনে বিশটা সোনারিল খেল। সোনালি রঙের শ্লিপিঙ গাউনের বোতাম খুলে দিল। নীচে কোন বাস রাখল না। রমণসুলভ ভঙ্গীতে দুপা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শু'ল! কালো মসলিনে মুখ ঢেকে টেলিফোন কানের কাছে রেখে মহিমময় ঈশ্বরকে ফোনে শুধু জানাল, ড্যাড আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

মামাবাবুটি প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বললেন—শেষ দৃশ্যটা হবে—সেই রবিন পাখি বেশীদূর উড়ে যেতে পারেনি। ফিরে এসে পাখার ঝাপটা দিয়ে কাচ এবং জানালা খুলে দেবার জন্য ঠোকরাচ্ছে। কালো বিড়ালের মুখ দেখানোর আগে পাখিটাকে দেখাব। ভোর রাতের দিকে পাখিটার মৃত্যু হবে। জীবন ধারণে আমাদের এক কালো বিড়ালের মুখ উঁকি দিয়ে আছে সেটাই বোঝানো হবে।

ঘরে এখন আর কোন শব্দ নেই। মামাবাবু দেয়ালের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখছেন। অসীম একটি সাময়িক কাগজের পাতা উল্টে পাল্টে বিজ্ঞাপন দেখছে। অনু চুপচাপ। সে টেবিলের ঢাকনা সরে গেছে ভেবে টেনে টেনে সব ঠিক করছে বস্তুত এই গল্পের পর ওরা পরস্পর বুঝি কোন কালো বিড়ালের মুখ দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠেছে।

মামাবাবুই কিছুক্ষণ পর প্রায় যেন সব ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বুঝলে অনু, উচ্চাশা মানেই জীবনে সব সময় কালো বেড়ালের মুখের জন্য অপেক্ষা করে থাকা।

অনু বলল, মামাবাবু একটা কথা বলব ?

--বল।

—উচ্চাশা ছিল বলে আনিকে নিয়ে আমরা ছবি করব ভাবছি। না থাকলে কে জানত, কে কোন এক আনি, রোজ তো কত এমন আনি জন্মাচ্ছে, মরছে। কে কার খোঁজ রাখে বলুন।

--বড় যাদু আছে। যাকগে শোন আগামী কাল ভোরেই আমরা রওনা হব। লোকেশান ঠিক করে এসেছি। আমাদের শিয়ালদহ পাঠানকোটে যেতে হবে। অন্যান্যরা মোটরে যাবে। আমরা হাজারিবাগ রোডের এদিকে একটা স্টেশনে নেমে পড়ব।

অসীম বলল, অনুদি কলকাতার বাইরে আমরা বের হতে চাই না --কিন্তু কি জানেন, একটু ট্রেনে করে গেলেই মনে হয় ছবির মতো আমাদেরও অনেক বেড়ানোর জায়গা আছে।

মামাবাবু বললেন, পাশেই বরাকর নদী। এখন গরমের সময় বলে জল কম, দুধারে বালি, তরমুজ অথবা ফুটির খেত দেখতে পাবে, কিছু পাহাড়ী মেয়ের জল বয়ে নেওয়া—পাশে ছোট পাহাড়, দূরে রেল স্টেশন, এবং রেল বাবুদের কলোনি। রাতে লাল নীল বাতি জ্বলবে।

তারপর খাওয়া দাওয়া। ওরা তিনজন একসঙ্গে খেতে বসল। অনু দেখল বাবা আজ বড় বেশী চুপচাপ। তিনি অন্যদিন খেতে

বসে নানারকমের গল্পে সকলকে মাতিয়ে রাখেন। আজ কেবল নির্লোভ পুরুষের মত, খেতে রুচি নেই, কেবল ওরা খাচ্ছে কিনা ঠিকমত লক্ষ্য করছেন। অনু বলল, বাবা তোমাকে আর দুটো ভাত দি। তুমি আজ কিছুই খেলে না।

মামাবাবু বললেন, একবার আমাদের দিকে বেড়াতে আসুন।

প্রৌঢ় মানুষটি সামান্য হাসলেন, কোথাও আর এখন বের হই না। যদি বের হই নিশ্চয়ই যাব।

ওরা চলে গেলে অনু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। এই ঘরে এসে বসতে পারলে ওর যেন কোন দুঃখ থাকে না। এখন সে আর অন্য কোন যুবকের নয়, সে এখন একেবারে নিজের। সে দরজা বন্ধ করে দিল। মণিমাসি একগ্লাস জল রেখে গেছে টিপয়ে। কিছুটা জল খেল ঢক ঢক করে, বাকিটা রেখে দিল। সুভাষের সেই ছবি দেয়ালে ঝুলছে, সে আজ হোক কাল হোক এই ছবিকে বনবাসী করবে। সুভাষ, তুমি এখন কি করছ, প্রীতি এখন কি করছে, সে নিজের ভিতর এক আগুনের জ্বালায় জ্বলতে থাকলে। এতদিন এতসময় সে বেশ ছিল, কিন্তু সেদিন সে দেখল প্রীতিকে নিয়ে কোথায় গেছে সুভাষ, সুভাষের ফ্ল্যাটে ডাঃ প্রীতির ষ্টেথিস্কোপ দেয়ালে ঝুলছে। প্রীতি তুই এটা কি করলি! কেন এমন করলি। তোকে ডেকেছিলাম, তুই আমার বাল্যের সঙ্গী, তুই কি না করেছিস, তুই কুমারী বয়সে সন্তান ধারণ করেছিস, তোর ভালবাসার মানুষ তোকে ছেড়ে চলে গেল---কেন তুই এমন জলের নীচে ডুব দেবার জন্য আমার মানুষকে প্রলোভন দেখাচ্ছিস।

সে শুয়ে পড়ল। সামান্য আলো এখন এই ঘরে। নীলচে রঙের আলো। মরা মানুষকে কিংবদন্তি করে রাখতে চাইলে অথবা ধুপধুনো দিয়ে নীল আলো দিলে যে রঙ হয় ঘরের, যে পবিত্র মৃত্যুর ছবি ভেসে ওঠে এখন যেন এই ঘরে তেমন একটা ভাব। সে শুয়ে পড়ল। সে, যা নিত্য নৈমিত্তিকের অভ্যাস, সায়া ব্লাউজ আলগা করে

দেওয়া, না করে দিলে কেমন হাঁসফাঁস লাগে, ঘুম আসে না—অনু সব আলগা করে দিয়ে নীল আলোর ভিতর সাদা চোখ নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কি দেখছে এখন বোঝা যাচ্ছে না, সে দেয়াল দেখছে, না ছাদ দেখছে, না সুভাষের ছবি দেখছে, কি দেখছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যেন এক দূরাগত চিন্তা অথবা ভাষা এবং স্বপ্ন ওকে ধীরে ধীরে আকুল করে দিচ্ছে। এমন এক ছবির নায়িকা সে—কত সুখ কত স্বপ্ন এবং কত অবহেলা সুভাষের —সব অবহেলার সে যেন প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে এবার নিজের পেটে হাত রাখল। নীচের দিকটা কেমন ঢিবির মত উঁচু দেখাচ্ছে। সুভাষের জাতক পেটে। এখন আর মনেই হয় না অনুর, অসময়ে এই সন্তানের জন্য সে সুভাষকে ধিক্কৃত করেছিল। মনেই হয় না অনুর এই জাতক ওদের ভিতর ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। অথচ সামান্য এক কারণে যে মান অভিমান চলছিল—আজ তা পর্বত প্রমাণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বার বার অনু ফিরে এসেছে সুভাষের কাছ থেকে—সব সময় এক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে—সুভাষ নাকি সময় পেলেই প্রীতির এনজেল মাছ দেখতে যায়, প্রীতি আলো জ্বেলে বসে থাকে। সুভাষ নিরীহ গোবেচারা মানুষ। এনজেল মাছটা জলের ভিতর ফুটকরি কাটে, জলের ওপর ভেসে ওঠে এবং শ্যাওলা পেলে, জলজ ঘাস পেলে তো কথাই নেই, ঘাসের ভিতর মাছটা তখন লুকোচুরি খেলতে থাকে। মানুষটা তখন নিরীহ, গোবেচারা মানুষ, যেমনটি খেলবে মাছ সে তেমনটি দাঁত বের করে হাসবে।

অনু এবার পাশ ফিরে শুল। পাশ ফিরে শুলে পেটের ভারি ভারি ভাবটা একটু হাল্কা লাগে। দেয়ালের দক্ষিণের আয়নায় সে যে কেমন অসহায়ের মত শুয়ে আছে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখলে তা ধরা যাচ্ছে। তাকে এই অসহায় অবস্থাতেই অভিনয় করতে হচ্ছে। কাল এগারটায় ট্রেন। মণিমাসি সব ঠিক করে রাখবে। ওর শুধু

এখন পড়ে পড়ে ঘুমনো। কিছু স্ক্রিপ্টের অংশ ওকে দিয়ে গেছে। সে পড়ে পড়ে মুখস্থ করবে। যেন ভুল না হয়। সব একশানগুলো যথাযথ হওয়া চাই। তুদিন সেখানে ক্রমান্বয়ে সুটিং। একটু চাপ পড়বে। অথচ কি আশ্চর্য, এতক্ষণে অনু মনে করতে পারল—মামাবাবুর গোটা গল্পটাতে আনি কখন জারজ সন্তান পেটে নিয়ে দর্পণে মুখ দেখছিল তা নেই। জারজ সন্তানের জন্য অবমাননার কথা নেই। বৈধব্যের ছবি কি ভাবে দেখানো হবে—কবে ওর কোন স্বামী মারা গেল, গল্পে তিনি তা পর্যন্ত বলেন নি, তবে কি তিনি গল্পের অংশ এক ভাবে বলে গেলেন, এবং লোকেশানে গিয়ে অন্য ভাবে ছবি তোলা হবে। তিনি শুনেছি মাথায় কিছু রাখেন না। সুটিং চলাকালীন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন করে দেন পাত্র পাত্রীদের। তবে তিনি অনুকে আসল ভূমিকা কি হবে ইচ্ছা করেই না বলে চলে গেছেন। ভাবতেই অনুর কখন ঘুম এসে গেল। সেই ঘুমের ভিতর সে একটা নীল স্বপ্ন দেখল—এক স্বর্ণ পালঙ্কে সে শুয়ে আছে! কত হাজার সব যুবক এসেছে দূর দেশ থেকে—তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজপুত্র। সকলে নীচে অপেক্ষা করছে সামান্য দর্শনের আশায়। অনু আয়নায় কেবল নিজেকে দেখছে। সারা অঙ্গে সুবর্ণ বাস, কটিতে সামান্য মুক্তোর পাসি এবং নীচে সেই সবুজ ঘন জলজ ঘাসের ভিতর এক উজ্জ্বল লাল রঙের এনজেল মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল লাল রঙের এনজেল মাছটা ক্রমে মেটে হলুদ রঙের হয়ে গেল। সবুজ জলজ ঘাসের ভিতর মাছটা শুধু এখন মুখ বের করে রেখেছে এবং জল টানার জন্য মুখটা ছোট বড় করছে। নীচে সেই হাজার দর্শক, হাজার রাজপুত্র পরস্পর মারামারি করছিল, উঁকি দিয়ে দেখার জন্য ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। সামান্য মাছ দেখাতেই এমন। কালো বেড়ালের মুখ দেখালে কি না জানি হবে! ঘুমের ভিতর অনু পাগলের মত হেসে উঠল।

অনু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে থাকল কিছুক্ষণ। রাতের স্বপ্ন কি যেন এক স্বপ্ন সে বার বার মনে করার চেষ্টা করল। কেবল মনে পড়েছে সে হা হা করে হেসে উঠেছিল। কি কারণে, অথবা কি স্বপ্ন দেখে—এমন কি রহস্য ছিল স্বপ্নে, যা দেখে সে হা হা করে হেসে উঠতে পারে। জানলা খোলা, ভোরের সূর্য এবার বাতাবী লেবুর গাছটার ফাঁক দিয়ে উঠে আসবে। গীর্জাতে ঢং ঢং করে যেমন রোজ কে ঘণ্টা পেটায়—আজও তেমন ঘণ্টা পেটানোর শব্দ। এখনও গ্রীষ্ম শেষ হয়নি। কালবৈশাখী মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। গতকাল মেঘ করেছিল আকাশে, অনু ভেবেছিল ঝড় বৃষ্টি দুই হবে। কিন্তু হায় কিছুই হল না, না ঝড়, না বৃষ্টি, এখন আকাশ একেবারে নির্মল। সূর্য উঠছে বলে পুবের আকাশটা কেমন সোনালী লাল হয়ে আছে। সোনালী লাল দেখেই ওর মনে হল যেন এক স্বর্ণ পালঙ্কে সে শুয়ে আছে। তারপর সে কি দেখেছিল। বস্তুত অনু নিজের ভিতর ডুবে স্বপ্ন রহস্য আবিষ্কারের সময়ই শুনল টেলিফোন বাজছে। কেউ ধরছে না। মণিমাসি সাধারণত টেলিফোনে প্রথম কথা বলেন। তিনিও ধরেছেন না। বাবা ছুটে যাচ্ছেন বারান্দা পার হয়ে। তিনি টেলিফোন ধরতে যাচ্ছেন। এই দেখে অনু সেই সব রাজপুত্রদের ছোটার ছবিটা মনে করতে পারল। বাবাকে দেখে সোনালী লাল রঙ দেখে আকাশের এবং স্বর্ণ পালঙ্কের কথা স্মরণ করার সঙ্গে বাকিটুকু মনে করে কেমন গুম হয়ে গেল—সে তো তেমন মেয়ে নয়। কালো বেড়ালের মুখ দেখানোর স্বভাব তার নয়। তবে কেন সে এমন একটা স্বপ্ন দেখে ফেলল!

বাবা যেমন ছুটে গিয়েছিলেন তেমনি ছুটে এসে অনুর দরজায় ধাক্কা দিতে থাকলেন। ডাকলেন, অনু, অনু শীগগির ওঠ। রামচরণ ফোন করছে।

সুভাষ এবং অনুর গৃহভৃত্য রামচরণের ফোন শুনেই ওর বুকটা

কেমন কেঁপে উঠল। সে কিছু বলতে পারল না। সে কেমন স্থবির হয়ে বসে থাকল।

বাবা বললেন, অনু, সুভাষ অজ্ঞানের মত হয়ে আছে। সারা ঘরে বমি, ঘর তছনছ করা!

অনু এমন কি উঠল না, সে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল।

বাবা বললেন, প্রীতি ছুটে এসেছে। সে ফোনে বলল, ভয় নেই। বোধহয় অত্যধিক মদ্যপানে এমন হয়েছে।

বাবা কেমন সরল বালকের মত বললেন। এমন এক সহজ মানুষ ছিল সুভাষ, যে সিগারেট চা খেত না, আদর্শ ছিল জীবনে, সৎ মানুষ হয়ে বাঁচবে এবং যার ইচ্ছা ছিল ছোট্ট গৃহকোণে বাজে গ্রামোফোন—অনুকে নিয়ে এবং সন্তান সন্ততি নিয়ে সুন্দর এক সাজানো পরিবার যার স্বপ্ন ছিল সেই মানুষ কি এক নচ্ছার মানুষ হয়ে গেল।

প্রীতির কথা শুনেই অনু ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল। প্রীতি কি তবে বাবাকে ইচ্ছা করেই সুভাষের মদ্যপানের কথা জানিয়ে দিল। সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, সুভাষ মদ্য পান করে এমন একটা কাণ্ড ঘটাবে। প্রীতির কি ইচ্ছা! তুই প্রীতি এমন নিষ্ঠুর হলি কি করে! তোর লজ্জা করল না বলতে। তুই তোর বাবাকে বলতে পারতিস্—তোর স্বামী যদি মদ খেয়ে ফিরত তবে তুই তার দোষ লুকিয়ে রাখতিস না? তুই সুভাষকে ছোট করে কতটা বড় হলি। তুই আমাকে ছোট করে দিলি। সে আরও হয়তো কিছু ভাবত। কিন্তু বাবা বললেন, তোমার একবার ও বাড়িতে যাওয়া দরকার অনু।

—আমি কোথায় যাব। ও যা তা করে বেড়াবে···

—তবু তোমার যাওয়া উচিত।

—আমার যে কি হবে না! মনে মনে অনু এইটুকু বলে উঠে দাঁড়াল। কখন যাই বলত! এগারটায় গাড়ি, আমার স্নান খাওয়া নেই। আমার গোছগাছ নেই!

এ-সব কথা যথার্থ কথা নয়। এটা একটা অজুহাত মাত্র। ক্রমশ ওদের ব্যবধান যত বেড়ে উঠছে তত দুই নদী উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দুই বিপরীতমুখী স্রোত পাল্লা দেবার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কে কোথায় কতটা যেতে পারে।

বাবা বললেন, সম্পর্কটা যখন আছে, তখন একবার গিয়ে দেখে এলে ক্ষতি ছিল না।

অনু বলতে পারল না, প্রীতি এখন সেখানে আছে। আমার ঘর, আমার বর, প্রীতি এখন আগলাচ্ছে। আমি কি করে সেখানে যাই বাবা! সে কিছু না বলে দরজা খুলে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকল। কে এক সুভাষ, কি পরিচয় তার, অথচ বলা চলে শিশু বয়েস থেকে সে এই মানুষ চিনে রেখেছিল। তখন আর কত বয়স—ছোট পিসিমার সঙ্গে সুভাষ এসেছিল ঢাকার বাড়িতে। সদর ঘাটের কামান দেখতে গিয়ে সুভাষ হারিয়ে গিয়েছিল—সুভাষ কোথায়। সুভাষকে পাওয়া গেল রমজান মিঞার আস্তাবলের পাশে। সে বড় ঘোড়া দেখতে দেখতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—কি কান্না সুভাষের, অসহায় বালক দাঁড়িয়ে পথে কাঁদছিল। অনু দেখে বলেছিল, অ—মা—তুমি! ঐ দেখ আমাদের বাড়ি। দক্ষিণের দিকে তাকালেই চিলে কোঠা। সুভাষকে যেন সব সময়ই অনু পথ চিনিয়ে এনেছে। বিশেষ করে সুভাষ যে নাটক সম্পর্কে ভাল বোঝে, ইচ্ছা করলে সুভাষ নাট্য সাহিত্যে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠতে পারে এবং মানুষ হিসাবে সুভাষের যে তুলনা হয়না—সবটা অনুরই সৃষ্টি। অনু ওর প্রেরণা, অনু ওর প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। সেই মানুষ বিয়ের পর কেমন হয়ে গেল। স্বার্থপর মানুষ। অনুকে আর তেমন বিশ্বাস করতে পারছিল না। অনু যেন দ্রুত ধাবমান অশ্বের মত কেবল ছুটছে। সুভাষ সেই অশ্বের মুখে লাগাম পরাবার জন্য কি না করেছে স্বার্থপর মানুষের মত। অনু ভাবল কেউ শুনছেনা ত! অনু বলল, সুভাষ তুমি আমায় নাচ

গান বন্ধ করে দেবার জন্য প্রায় ইতরের সামিল ব্যবহার করলে! তুমি আমার অজ্ঞাতে পরিবার পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে গর্ভবতী করে ফেললে। তোমাকে আর বিশ্বাস করি কি করে! অথচ কি আশ্চর্য ছ্যাখো তোমার জাতক আমার পেটে। তার ভালবাসা আমার রক্তে। কাল রাতে এক সোনার পালঙ্ক স্বপ্ন দেখে ফেললাম। আমার শরীরে সামান্য বাস ছিল—আমার কি যে ইচ্ছা বুঝিনা। হাজার রাজপুত্রের মুখ দেখলাম। কত খুঁজেছি আমার সুভাষ কোথায়, আমার সেই সুভাষ, যে একদিন আস্তাবলের মাঠে হারিয়ে গিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল সেই সুভাষ—কিন্তু হায় অন্য এক সুভাষের মুখ কেবল দেখতে পেলাম—জঘন্য লালসা মুখে—আমার ছিন্ন কটিবাসের দিকে কেবল নজর তার। কিন্তু কিছু বলতে পারলনা। একবার ভাবল দরজা থেকেই সুভাষকে দেখে চলে আসবে। এ বাড়ির সে এখন আর কে। তবু কেমন যেন এক মাদকতা আছে, রহস্য আছে, এবং গোপনে সে কি এক অসীম ভালবাসা পুষে রেখেছে সুভাষের জন্য যা তাকে সুভাষের হাজার অপমান দূরে সরিয়ে দিতে পারছেনা, বার বার সে এই ঘরে ফিরে আসতে চেয়েছে, অসম্মান, নিন্দা সব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সুভাষের মন থেকে সংশয় দূর করার জন্য মনের সঙ্গে সংগোপনে কিনা লড়াই। কি যে আমরা লুকিয়ে রেখেছি, গোপনে কি যে এত, যেন সব সময় সাত রাজার ধন এক মানিক আমাদের কাছে গোপন আছে, তুলে দিলেই মুখে তোমাদের লালসার জল গড়াতে থাকে। অনু ডাকল, মনিমাসি মনিমাসি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলত।

অনু যে পোষাক পরে বিছানায় শুয়েছিল সেই পোষাকে নেমে গেল। কেমন পাগল প্রায় দেখাচ্ছে অনুকে। সে নেমে যেতে যেতে বলল, আমার ঘরে তুমি পাখি ওড়াবে, আমার ঘরে তুমি প্রজাপতি সেজে বসে থাকবে সে হবে না প্রীতি। আমি যাচ্ছি।

এই বলে অনু প্রায় ছুটে নেমে গেল এবং ট্যাকসিতে উঠে রাস্তার নাম এবং নম্বর বলে চুপচাপ বসে থাকল।

আর অনু সিঁড়ি ধরে……, হায় কতকাল এমন এক প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সিঁড়িতে সে যেন পা রাখেনি—সে মনে মনে কত কি ভাবল, সুভাষকে সে কেমন দেখবে, হয়ত ঘর দোর রামচরণ এখন আর তেমন ঝকঝকে রাখছে না, ওর প্রিয় ফুলদানিতে হয়ত আর কোন রজনীগন্ধার গুচ্ছ বাজার থেকে রামচরণ এনে রাখেনা, হয়ত সন্ধ্যায় ধূপদীপ জ্বালেনা, গৃহস্থ মানুষ সুভাষ, ওর মঙ্গলের জন্য কেউ এখন আর শঙ্খ বাজায় না। সে উঠে কি দেখবে, কি না দেখবে এইসব ভাবতে ভাবতে কেমন হাঁসফাঁস করছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই স্তম্ভিত। প্রীতি দু'হাতে ঘরের মেঝে থেকে বমি সাফ করছে। রামচরণ জল এনে ঝাঁটা দিয়ে সব পরিষ্কার করছে। জানালাগুলো সব খুলে দেওয়া হয়েছে। সুভাষ খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে বোঝা যাচ্ছে না। প্রীতি লক্ষ্যই করছে না পর্দার ওপাশে সামান্য পর্দা ফাঁক করে কে উঁকি দিয়ে আছে। নিজের মানুষ এই সুভাষ, কত আগ্রহ এবং ভালবাসায় দু হাতে সব নোংরা তুলে নিচ্ছে। গোটা ঘরে সে কি তবে গত রাতে তাণ্ডব নৃত্য করেছিল। তবে কি রোদের মত এই মানুষ আর নির্মল নেই। সত্যই সে মদ্যপান করে বেলেল্লাপনা করতে শিখে গেছে।

অনু সব দাঁড়িয়ে দেখল। ঘরে জল ঢেলে, ওডিকোলনের শিশি থেকে ওডিকোলন ঢেলে ঘরময় এখন সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে প্রীতি। এক অসুস্থ মানুষকে প্রীতি দু'হাতে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে নিরাময় করে দিচ্ছে।

প্রথম রামচরণই দেখতে পেল অনুকে।

—অ মা-মণি আমার!

প্রীতি মুখ তুলে তাকাতেই দেখল অনু। সে সহজ সরল গলায় বলল, তোরা দেখালি বটে অনু!

অনু কথার কোন জবাব দিল না।

রামচরণ হৈ চৈ করতে থাকলে প্রীতি নিষেধ করল। —এখন মানুষটা ঘুমোচ্ছে। আস্তে রামচরণ।

রামচরণ জোঁকের মুখে নুন দিলে যেমন হয় তেমনি গুটিয়ে গেল। কোন হৈ চৈ করল না। ওর যেন কত বলার আছে মা-মণিকে, সে কিছু বলতে পারছে না। ওরা সকলেই প্রায় পা টিপে টিপে ঘরে হাঁটছে।

অনু এবার ডাকল, প্রীতি। দৃঢ় গলায় ডাকতে চাইল।

কিন্তু প্রীতি চোখ তুলে ঠোঁটে আঙ্গুল দিল। অর্থাৎ জোরে নয়। খুব আস্তে কথা বল। জোরে কথা বললে মানুষটা জেগে গেলেই ওক দিতে থাকবে ঘরময়। ফের সেই অসুখের গন্ধ ছুটবে। তখন তুমি আমি কিছু করতে পারব না।

অনু এ-বাড়ির অতিথির মত চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। সে ঘড়ি দেখল। এখন ছটা ত্রিশ। ওর পায়ের কাছে এসে সামান্য রোদ পড়েছে। পাশে সুভাষ। সে সুভাষের চুলে খুব আস্তে আস্তে বিলি কাটতে থাকল। মুখে এখনও মদের গন্ধ। এবং প্রায় অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রায় নেশাখোরের মত ওর নাকে মুখে দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ উঠছে। অনু আস্তে আস্তে নুয়ে সুভাষের মুখ দেখল। কেমন রোগা হয়ে গেছে মানুষটা। ওর চোখে মুখে কি এক বিষণ্ণতার ছাপ এবং অসহায় শিশুর মত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অনু প্রীতির দিকে তাকাল। প্রীতি একটানা কাজ করে যাচ্ছে। ঘর দোর সব উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঘর মেঝে ঘষে তকতকে ঝকঝকে করে ফেলেছে। কে বলবে এখন, সারারাত একটা মানুষ প্রায় দানবের মত বমি করে ঘর ভাসিয়েছিল। কে বলবে এই মানুষ খুব ভোরে উঠে অসীম এবং অনুর যুগলে ছবি পত্রিকায় দেখে সারাদিন শহরে পাগলের

মত ঘুরছিল! কে বলবে গতকাল সুভ, যে মানুষ আস্তাবলের মাঠে হারিয়ে গিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিল, সেই মানুষ সারাদিন অস্থিরচিত্ত হয়ে এই কলকাতা মহানগরীর সব পথ ঘাট ফেলে দূরের এক নির্জন মাঠে গিয়ে কাঞ্চন ফুলের গাছের নীচে চিৎপাৎ হয়ে শুয়েছিল। এবং আত্মহত্যার কথা অথবা হত্যার কথা চিন্তা করতে করতে সে একটা রিভলভার সংগ্রহ করে 'আমিও নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে দেখতে পারি' এইসব ভেবে সে আততায়ীর মত সংগোপনে, নিজেকে অস্থির চিত্ত না দেখানোর জন্য ঢক ঢক করে মদ খেয়েছে! আর কি করেছে! সে প্রীতির বাড়িতে রাত আটটা বাজার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে দেখল—প্রীতি তার এনজেল মাছ খুলে দেখাতে চায়। সুভাষ রাত আটটার কথা ভুলে গেল। রাত আটটায় অনুর বাড়িতে অসীম আসবে এবং ওর মামাবাবু আসবে, সে দরজার নীচে দাঁড়িয়ে মাত্র সামান্য শব্দ তুলে হত্যা তারপর নিরুদ্দেশ—কত কি সব ভেবে সে অপেক্ষা করছিল—আর তখন সেই এনজেল মাছ নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল নীল জলের ভিতর। প্রীতি এনজেল মাছের খেলা দেখিয়ে সুভকে খুনের কথা ভুলিয়ে দিল।

প্রীতি বলল, খুব আস্তে আস্তে বলল, পাঁচটার সময় রামচরণের ফোন। প্রীতি দিদিমণি, দাদাবাবু নীচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! এসে দেখি তোর সারা ঘরময় বমি, যেন কে সুভাষকে এই ঘরের ভিতর টানা হ্যাচড়া করেছে।

অনু নিশ্বাস না ফেলে শুনছিল।

—আর অবাক জানিস ওর হাতে একটা রিভলভার। খুব ভয় ধরে গেল! শক্ত হয়ে নেই তো। নাড়ী দেখলাম,। বুকে জল এল।

প্রীতি সামান্য থামল এ-সময়। রামচরণ রজনীগন্ধা ফুল নিয়ে এসেছে। সেইসব ফুলদানীতে রাখার সময় বলল—তাড়াতাড়ি ওটা তুলে রাখি।

অনু সংক্ষেপে বলল, ওটা কোথায়?

প্রীতি ড্রয়ার টেনে বের করে দেখাল।

—দেখি।

প্রীতি ওটা অনুর হাতে দিল।

অনু দুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, খুব দামী জিনিস মনে হচ্ছে। বলে সে তার বটুয়াতে পুরে রাখল।

প্রীতি বলল, এবার মান-অভিমানের পালা ভেঙ্গে চলে আয়।

—কোথায়?

—কেন এখানে! তুই যেন আকাশ থেকে পড়লি।

—অঃ। অনু এক গ্লাস জল চাইল।

রামচরণ জল এনে দেবার সময় বলল, মা-মণি চা করছি। ডিম ভেজে দিচ্ছি। সব ঠিক আছে। করে দেব?

অনু হাসল। দুঃখের কি সুখের অথবা মনে এক অসহায় নারীর মুখ ধরা পড়ে গেল বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল অনু এখন কিছু খাবে না।

প্রীতি বলল, আমি যাচ্ছি রামচরণ। দরকার পড়লে পরে ডাকবে। আমি যাচ্ছিরে অনু!

অনু বলতে চাইল, প্রীতি, রামচরণ আগে, না আমি আগে! সংসারে কে আগে, কে পরে তাও তুমি ভুলে গেছ! কিন্তু সে কিছু বলল না। তার মুখে বিষাদ, মনে জ্বালা। কত সব বিচিত্র কীট-পতঙ্গ মনের সেই বন্ধ দরজায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সে প্রীতিকে আবার আসিস বলে সম্ভাষণ করতে পারল না। প্রীতি আধভেজা জামা-কাপড়েই নীচে নেমে গেল। রামচরণকে ট্যাক্সি ডেকে দিতে পর্যন্ত বলল না।

অনু বটুয়ার ভিতর থেকে কালো রঙের বস্তুটি বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সে কি তবে আজকাল আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছে। সে কি তবে জীবন যাপন সম্পর্কে অনাসক্ত হয়ে পড়ছে। অনু ট্রিগারে হাত রাখল। টিপে দিলে কি গুলি বের হবে। সে

উঠে দাঁড়াল। দূরে নিক্ষেপ করতে গিয়ে মনে হল কিছু বের হচ্ছে না। বস্তুটি গর্জন করছে না। বস্তুটি লক্ করা আছে, অনু এইসব বস্তুর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয়। সে এবার বস্তুটিকে ফের বটুয়াতে রেখে পা তুলে খাটের উপর বসল। এবং মনে হল বিড় বিড় করে সুভাষ কি যেন বলছে। কান পাতলে বোধহয় শোনা যাবে। সে তাড়াতাড়ি একটু নুয়ে যেমন জননী প্রথম সন্তানের মুখ চোখ চুরি করে দেখার প্রলোভনে সন্তর্পণে নুয়ে থাকে—অনুকে দেখলে এখন মনে হবে যেন সে তার প্রথম সন্তানের মুখ চুরি করে দেখছে।

সুভাষ চোখ বুজে আছে। বিড় বিড় করে বকছে—প্রীতি তুমি কোথায়? জিভে জড়ানো কথা অস্পষ্ট এবং ভারি ভারি শোনাচ্ছে। অনু সুভাষের মুখে প্রীতির নাম শুনেই কেমন শক্ত হয়ে গেল। এই সংসার সুখের এমন আর মনে হল না। বন্দুকের নল থেকে গুলি ছুঁড়ে সংসারের সব আবর্জনা নিক্ষেপ করে দেবে। সব ক্লেদ দূর করে দেবে। ঈশ্বরের সামিল এই সুভাষকে মাথায় করে সব উচ্চাশার পাখি খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়ে সে হাল্কা বোধ করবে। সে এসব ভেবে পা তুলে সুভাষের মাথার কাছে বসে—এই সুভাষ, আমার সুভাষ, সুভ তুমি কতকালের, আর তুমি কত ভালবাসার সুভাষ, তুমি ছেলেমানুষের মত অভিমান করেছিলে, তুমি কেন জোর করে নিয়ে আসনি। আমি তো এক অবোধ যুবতী, যার মাত্রাজ্ঞান কম, তুমি কেন সুভাষ এতদিন আমাকে অবহেলা দেখালে। তোমার অবহেলা আমার মৃত্যুতুল্য—এইসব ভেবে সে নিজের ঘরে, নিজের বরের কাছে সুখ সুখ খেলা খেলবে আশা করেছিল আর তখন কিনা সুভাষ প্রীতির জন্য হাত বাড়াচ্ছে।

অনু বলল, এই যে আমি। বলে হাতটা সুভাষের কপালে রাখল।

—প্রীতি তুমি আমার, যে কি-না!

অনু বলল, তুমি ঘুমোও !

—আমি ঘুমোচ্ছি। বলে, মনে হল যেমন সে দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করছিল নেশার ঘোরে, ঠিক তেমনি নিঃশব্দে ফের নেশার সমুদ্রে ডুবে গেল। মনেই হচ্ছে না এই মানুষ এই মাত্র কথা বলেছে। মৃতপ্রায় শুয়ে আছে। চোখ বোজা। মাথার নীচে হাত। কাপড়টা ছাড়িয়েছে প্রীতি। এবং কাপড় পরিয়ে দিয়েছে প্রীতি। পাট ভাঙ্গা কাপড়ে আতরের গন্ধ। জামার ভাঁজ পর্যন্ত ভাল করে ভাঙ্গে নি। যুবক এই সুভ রাজপুত্রের মত শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর মাথায় রূপোর কাঠি, পায়ে সোনার কাঠি থাকলে ভাল হত বুঝি। কাঠি বদলালে সে ফের কথা বলত, সেই কথার ভিতর একবার কি ভুলেও সে অনুর নাম উচ্চারণ করবে না। যে বালিকা তাকে আস্তাবলের মাঠ থেকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়েছিল, ভুলেও কি সে একবার সেই নাম উচ্চারণ করবে না। অনু, নিজের নাম সুভর মুখে শোনার জন্য কেমন আকুল হতে থাকল।

আকুল হলেই যুবতীদের এক কান্না বুক বেয়ে সারা মুখে ভেসে ওঠে। ঠোঁট কাঁপতে থাকে। থর থর করে অনুর ঠোঁট কাঁপছিল। সুভ, আমি অনু, আমি তোমার ভালবাসার স্ত্রী, আমি প্রীতি নই। এসব দু হাত তুলে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল তার। সুভ, তুমি অন্ততঃ একবার তোমার সেই স্বপ্নের জগৎ থেকে আমাকে ছাখো। আমি শুধু উচ্চাশার পাখি উড়িয়েছি, আমি কোন প্রজাপতি ধরি নি। তুমি তোমার স্বপ্নের জগৎ থেকে একবার শুধু বল, অনু আমার অনিমা।

সুভাষ যে-ভাবে শুয়েছিল সে ভাবেই শুয়ে থাকল। অনু সুভাষের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। জানালা অতিক্রম করলে সামনে এক পার্ক, পার্কে সেই দেবদারু গাছ। নীচে ছোট ছোট লনে সবুজ দ্বীপের মত বাগিচা। কিছু লাল সাদা ফুল ফুটে আছে। অনু উঠে জানলায় দাঁড়াতেই সব দেখতে পেল। ঘরের আসবাবপত্র

যেমন ছিল তেমনি আছে। ওর বড় আলমারিটা যে-ভাবে সে বন্ধ করে এবং যে ভাবে সে ভেলভেটের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। যদি কিছু বদল হয় দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির জন্য তা ধরতে পারছে না। শুধু বসার ঘরে সামান্য পরিবর্তন। এই ঘর তার, এই বর তার। তবু কোন এক অন্তর্যামী পুরুষ পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সুভ এখন শুধু প্রীতিময় হয়ে আছে। বুকের ভিতর ঠেলে ঠেলে কান্নাটা উঠে আসছে। সে শক্ত হয়ে ছিল। কিছুতেই যেন তার দুর্বলতা চোখে ধরা না পড়ে। অন্ততঃ রামচরণ যেন টের না পায় মা-মণি জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সে শক্ত করে টেবিলের একটা পাশ ধরে রেখে মুখ ফিরিয়ে রাখল। এখন মনে হচ্ছে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—শুধু এক মাঠ, রমজান মিঞার আস্তাবলের মাঠ—সেখানে ছোট এক বালক, দুই গণ্ডে যার জলের ধারা—কি অসহায় সেই সুভ, সুভ তুমি এটা কি করলে! তুমি প্রীতিকে এটা কি করলে। অনু বুঝি সেই অসংলগ্ন কথা থেকে টের পেয়েছে গত রাতে সুভ, প্রীতিকে নিয়ে সারারাত জলে ডুব সাঁতার কেটেছে। আমার আর কি থাকল তবে। সুভাষ, তুমি অতল জলে ডুব সাঁতার দিলে আমি কি করব। সে যেন নিজে কি বলছে বুঝতে পারছে না। সে কি বলছে নিজেই শুনতে পাচ্ছে না। চারিদিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন মুখ এসে ওর চারপাশে সহসা সহসা উদয় হচ্ছে। তারপর মুখগুলো ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক চক্রাকারে ঘুরতে থাকল—কত মুখ, শৈশবে যত সে কল্যাণময় ঘটনা দেখেছে, যত সে শস্যক্ষেত্র দেখেছে, যত সে নদী দেখেছে সব যেন এক সঙ্গে এসে হাজির। আর সুভ তার প্রিয় সুভ সেই সব শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নদী পার হয়ে কোথায় কেবল চলে যাচ্ছে। আর কত মুখ চারপাশে, কাদের মুখ, সে একটা মুখও চিনতে পারছে না। সব অলৌকিক ভূতের মত মুখ এসে হাসছে গান গাইছে এবং কলরব করে বলছে, আমায় দ্যাখো, তুমি আমায় দ্যাখো। চারিদিকে ঢাক ঢোল বাজছে, চারিদিকে

করতাল বাজছে। তাকে কারা যেন আনন্দ করে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে, সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। বোধহয় টলে নীচে পড়ে যাবে, বোধহয় ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলবে। অনু সব কিছু অন্ধকার দেখতে থাকল। সে টেবিলে মাথা রেখে পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার্থে মুখ ঢেকে শুধু রামচরণকে বলল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দে রাম। সুভকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি আর পারছি না সুভ! আর কিছু বলল না। যতক্ষণ রাম ট্যাক্সি ডেকে না আনল ততক্ষণ সে টেবিলে মাথা রেখে পড়ে থাকল।

ট্যাক্সি এলে নিঃশব্দে নেমে গেল অনু। রামচরণ সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। সে মা-মণির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, সব ছারখার করে চলে যাচ্ছেন মা!

অনু নিজের কথা কিছু বলল না। সে শুধু বলল, প্রীতিকে বলিস আমি চলে গেছি। বলে দ্রুত সে ট্যাক্সির দিকে ছুটে গেল। সে এতটুকু আর দেরি করল না। দেরি করলেই বুঝি সে আর নিজের সম্মানটুকু বাঁচাতে পারবে না। পাগলের মত কেঁদে কেটে সুভকে কামড়ে খিমচে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার করে বসত। তার চেয়ে বরং নীরবে সে যেমন এসেছিল, তেমনি নীরবে সে চলে যাচ্ছে।

এই আত্মদহন যুবতী অনুকে ক্রমে একগুঁয়ে করে ফেলল। ছবিতে যে কালো বেড়ালের মুখ দেখানো হবে—অনুর আর তাতে আপত্তি থাকল না। সে ঘরে ফিরে সোজা স্নানের ঘরে চলে গেল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আর সময় হাতে নেই। মা ছুটে এসে বললেন, অনু সুভ কেমন আছে!

—ভাল আছে, মা।

—কেমন দেখলি।

স্নানের ঘরে সে তখন ঝরনার জল ছেড়ে দিয়েছে। জলটা সারা গায়ে কি এক যাদুর মত, কি এক শান্তির জল যেন—যেন সে এক অপার বিষণ্ণ নদীতে অবগাহন করে মৃত্যু সৌরভ মেখে সামনের

মরুভূমির মত পথে পা বাড়াচ্ছে। সে তার গালে মুখে জল পড়তে দিল। বড় আয়না পিছনে, দামী সাবানের ফেনা মুখে, পরিচ্ছন্ন মুখ এনে সে দর্পণে নিজের ছবি দেখল। এই মুখ চলচ্চিত্রে ভেসে বেড়াবে সব সময়। যৌবন আর কতকাল, আয়নায় সে চোখ টেনে চিবুক টেনে নিজেকে দেখার সময়—যৌবন আর কতকাল, এবং কত মাস কাল বৎসর সে এই শরীরে কালো বেড়ালের মুখ দুর্লভ আকাঙ্ক্ষার মত আর কতকাল ফোটাতে পারবে ভাবতেই মনে হল কারা যেন ও-পাশ থেকে নানা রকম প্রশ্ন করে যাচ্ছে। কেমন দেখলি সুভকে, কি হয়েছে তার? কেন সে মদ্য পান করেছে? কি, তুই উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

সে তার সেই জলের ঝরনায় মুখ রেখে বলল, মা-মাগো, আমাকে আর তোমরা কোন প্রশ্ন কর না। আমি ভাল আছি মা। হাতে এখন আমার আছে শুধু নীলকণ্ঠ পাখি। আমার সুভ গেছে, আমার শৈশবের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, সেই সব নদী মাঠে আর তেমন ফুল ফুটতে দেখি না এখন—আছে শুধু এই নীলকণ্ঠ পাখি। ওকে ছেড়ে দিলে আমার আর কি থাকল! মা মাগো, আমি ভাল আছি। সুভ কেমন আছে সে আমি বলতে পারব না।

সারাটা পথ অঞ্জুর কেমন আলস্যে কেটে গেল। অসীম মাঝে মাঝে এসে ওর কম্পার্টমেণ্টে খোঁজ নিয়ে গেছে। কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না, কিছু লাগবে কি না। প্রথম শ্রেণীর একটা কুপে অঞ্জুদি যাচ্ছে। তার শরীর ভাল না। শরীর ভাল না বললে, ভুল হবে, এ-সময়টাতে শরীর সাধারণত এমনই থাকে। মামাবাবুর কি যে মর্জি বোঝা দায়। এ-সময় আউটডোরে শুটিং না করে, ক'টা মাস বাদ দিয়ে অথবা বছর বাদ দিলেই ক্ষতির কি ছিল—যখন সব

ঠিকঠাক, নায়ক-নায়িকা মনের মত মিলে গেছে, তখন সময় বুঝে সব দিক সুস্থ রেখে কাজ আরম্ভ করে দিলে এতটা ঝক্কি পোহাতে হত না।

মামাবাবু নিজের সিটে বসে সেই যে স্ক্রিপ্টে চোখ রেখেছেন, আর চোখ তুলছেন না। ট্রেন, গ্রাম মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। নদী পার হয়ে যাচ্ছে। শহর গঞ্জ পার হয়ে সন্ধ্যায় এক ছোট্ট পাহাড়ী স্টেসনে ভিড়ে গেল। গাড়ি ঠিক ছিল, পথ জানা ছিল—দুটো জিপ এসে হাজির। ইউনিটের লোকেরা আগে এসে গেছে। ওদের কেউ কেউ স্টেসনে এসেছে।. প্রায় অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে ওরা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকল। মামাবাবু এবার জানালা দিয়ে ছোট্ট স্টেসনটা ভাল করে দেখলেন। একবার মুখ মুছলেন এবং এখন সূর্যের আলো মরে আসছে। এবার নদী থেকে গ্রাম্য বিহারী মেয়েরা জল নিয়ে ফিরে যাবে। এখন আকাশে শুধু নীল রঙ থাকবে, পাহাড়ী নদীর জলে পাখিদের প্রতিবিম্ব ভাসবে এখন, এমন সব ভাবতে ভাবতে তিনি স্টেসনে নেমে গেলেন।

তিনি চুরুট খাচ্ছিলেন এবং ধোঁয়া ওপরে উঠে যাচ্ছিল। যাত্রী বেশী নেই, কেমন ফাঁকা জায়গাটা। দূরে পাহাড় এবং পাহাড়ের মাথায় সূর্য সহসা ডুবে গেলে মামাবাবুর হুঁশ হল—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেতে যেতে দু পাশের গ্রাম মাঠ দেখা যাবে না। শুধু চারিদিকে সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। জ্যোৎস্নার ভিতর মানুষকে স্পষ্ট চেনা যায় না। পথ-ঘাট কেমন রহস্যময় মনে হয়। আর তখনই ধীরে ধীরে অনু নেমে আসছে কুপ থেকে। অসীম পেছনে। সাদা আলো ফ্লোরেসেণ্ট বাতির এবং বোধহয় কোথাও বড় একটা অশ্বথগাছ আছে, গাছ থেকে কিছু বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে সেই সব বাদুড় উড়ে গেলে মনে হল আকাশটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মামাবাবু দেখলেন সেইসব অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অনু ওঁর দিকে হেঁটে আসছে। অনুকে বড় ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

মামাবাবু চুরুট হাতে নিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অনুকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে পারি নি। একই বাড়িতে থাকতে হবে। পাশাপাশি ঘরে। লোকেশন থেকে বাড়িটা বেশী দূরে নয়। পাহাড়ের ওপর কোন বড়লোকের রেস্ট-হাউস। বাড়িটার চারপাশে গড় কাটা। নানারকম ফুল-ফলের গাছ আছে। কিছু কিছু সুটিং ভেবেছি বাড়িতেই সেরে ফেলব। একটু থেমে গাড়িতে ওঠার সময় বললেন, কোন অসুবিধা হবে না তো?

অনু হেসে বলল, না, অসুবিধা হবে কেন?

—অসুবিধা হলে বলবে। না হয় তোমাকে আমরা একটা সহরের বাড়িতে রেখে যাব। রোজ গাড়ি আসবে, গাড়িতে যাবে।

অনু কোন উত্তর করল না বলে তিনি ফের বললেন, তবে অতদূরে গিয়ে তোমার ক্লান্তি আসবে। রোজ রোজ সহর থেকে পঞ্চাশ মাইলের মত পথ তোমাকে পাড়ি দিতে হবে। তোমার এ-অবস্থায় বেশী ছুটোছুটি ভাল না বলে সেই রেস্ট-হাউসই আমার পক্ষে প্রশস্ত মনে হয়েছে। এখন তোমার ইচ্ছা।

—আপনি যা ভাল ভেবেছেন···

—আরে না না, আমি তেমন মানুষ নই।

অর্থাৎ মানুষটি যেন বোঝাতে চাইলেন, তিনি পরিচালক হিসেবে যেমন নতুন কিছু করার চেষ্টায় আছেন, তেমনি শিল্পীদের সুখ-সুবিধার প্রতিও সমান নজর। তাদের স্বাধীনতায় তিনি হাত দিতে চান না। নিজের কিছু খরচ বাঁচবে বলে তিনি শিল্পীদের ব্যক্তিগত রুচি এবং মর্জির প্রতি অবহেলা দেখাতে চান না।

অনুর প্রথম আবির্ভাব, সুতরাং সে সব সময়ই ভয়ে ভয়ে ছিল। কোথায় থাকা হবে, এবং কেমন জায়গা হবে। অন্য কোন মেয়ে নেই। সে একা এসেছে। যা কিছু সুটিং ওকে এবং অসীমকে নিয়ে। আর কিছু গ্রাম্য মেয়ের ছবি নেওয়া হবে। মাঠ-ভরা ফসলের ছবি থাকলে ভাল হয়। মাসটা আষাঢ় মাস। সুতরাং ধানের

চারা অথবা নদীর জলে নৌকা ভাসতে দেখা গেলে তার ছবি, যেন মামাবাবুটি এইসব অঞ্চলের জীবন্ত ছবি নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

অনু বলল, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। একা থাকলে সময় কিছুতে কাটবে না।

সুতরাং ওরা নিরিবিলি ইঁট-সুরকির পথ ধরে প্রায় উড়ে যেতে থাকল। মাঝে মাঝে মনে হয় অনুর, ওর জাতক পেটে দাপাদাপি করছে। সে সকলের অলক্ষ্যে পেটের একটা দিকে হাত রাখল। চারিদিকে মাঠ। কোথাও জলাশয় পাশে, কোথাও দূরে গ্রামের ভিতর আলো দেখা যাচ্ছে। উঁচু-নীচু পথ। খুব ঝাঁকুনি লাগছিল পেটে। সারাদিন ট্রেনে শুধু সুভাষের মুখ মনে পড়ছিল। সুভাষ এবং প্রীতির সম্পর্কের কথা মনে পড়ছিল। এই জাতক পেটে আসার পর থেকেই সুভাষের সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে গেল। এখন মনে হয় এই তিক্ততার মূলে সে নিজে। এতটা পথ আসার একমাত্র কারণ সেই সোনার ঈগল—কেবল কোথাও তার উড়ে যাবার বাসনা। সে এমন নিবিষ্ট ছিল যে মাঠে যে এখন সাদা জ্যোৎস্না এবং অসীম যে গান গাইছিল উচ্চস্বরে—'আলোক ঝরা রাতে' তা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল না। জীবনে এই প্রথম সে তার বাবা-মাকে ছেড়ে, স্বামী ছেড়ে অন্য মানুষের সঙ্গে যেন নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছে। কতদূর এবং কখন পৌঁছাব এসব সে অসীমকে প্রশ্ন করতে পারত। কিন্তু কেন জানি কিছুই শুধাতে ভাল লাগছে না। একসময়ে না একসময়ে ওরা পৌঁছে যাবে এবং যথার্থই তারা এখন অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে থাকল। পাহাড়ের মাথায় একটা আলো জ্বলছিল। লাল আলো। নীচ থেকে মনে হল অনুর এই লাল আলো নিয়ে তার জন্য কারা যেন জেগে আছে।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা জায়গা সমতল। বড় বড় পাথর এবং ছোট ছোট কাঁটাঝোপ। কিছু গাছ-গাছালি, তারপর সরু একটা

পথ। মালি, হ্যারিকেনের আলোতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগে মামাবাবু, মাঝে অনু এবং পিছনে অসীম। ইউনিটের লোকদের নীচে তাঁবুতে রাখা হয়েছে। ওরা একসঙ্গে সেখানে থাকবে। ওদের কেউ কেউ সঙ্গে এসেছে। ম্যানেজার সঙ্গে ছিল। সে এই রেস্ট-রুমের কোথায় কি আছে, কোনদিকে অন্ধকারে যেতে নেই—এই যে জ্যোৎস্না মাথার ওপর উঠেছে, বেশীক্ষণ সেই জ্যোৎস্না মাথার ওপর থাকবে না, কিছু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, অন্ধকার হলে কেউ যেন একা, পাহাড়ের পেছনের দিকটাতে না যায়, গেলে একেবারে নীচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এবং কিছু মৃত্যু-সংবাদ, আত্মহত্যাও হতে পারে, যেতে যেতে তিনি ওদের সেইসব গল্প শোনালেন।

ওরা দুটো মরা কাঠের সেতু পার হয়ে এল। চারিদিকে গড়ের মত। মাঝে তিন কামরার রেস্ট-রুম! ইটের নয়। দেয়াল মাটিরও নয়। কেমন পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে দেয়াল। এবং কিছু কিছু ফোকর আছে। ঘরের সামনে আলো জ্বললে সেইসব ফোকর ধরা যায় না। যখন অনু ঘরে ঢুকল—তখন তিন ঘরেই আলো আছে। কোন ঘরে আলো নিভে গেলেই অন্য ঘর থেকে আলোর রশ্মি দেখা যায়।

ঘরে ঢুকে অনু প্রথম বসল, অনুর ঘরে ওরা সকলেই প্রথম বসল। প্রত্যেক ঘরেই বসবার জায়গা আছে। ফ্লাস্ক্ থেকে চা এবং কিছু চিপস্ একটা কাগজে বিছিয়ে ওরা বসে গেল। তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, এবং কিছু সময় মামাবাবু, অনু এবং অসীমকে নিয়ে বসবেন। কাল সুটিং হবে দশটায়। তার আগে যা যা করণীয় সব বুঝিয়ে দেবেন। কি কি অভিনয় হবে, কি কি কথার আগে কেমন অ্যাকশান হবে এবং তখন ক্যামেরাম্যান থাকলে ভাল হয়। তিনি ক্যামেরা-ম্যানকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। এখন রাত আটটা বাজে। সকলেরই হাত-মুখ ধুতে হবে। একটু বিশ্রাম করে ফের একসঙ্গে বসা।

এইসব স্যুটিংয়ে যত চটপট কাজ সেরে ফেলা যাবে ততই খরচের বহর কমে যাবে। তিনি সময় এতটুকু নষ্ট হতে দিতে চান না। যার জন্য অনুর সময়-অসময় পর্যন্ত শুনতে চাইলেন না। যে মানুষটা অর্থ লগ্নী করছে, দুমাস পরে তার কি মর্জি হবে কে জানে। একবার খরচের ভিতর নামিয়ে দিতে পারলে—পরে বাছাধন পিছপা হতে পারবে না। সুতরাং এমন অসময়ে তিনি অনুকে নিয়ে এই পাহাড়ী জায়গায় চলে এসেছেন। অনুর স্বামীর সঙ্গে কি একটা মনান্তর চলছে তিনি জানতেন, আরও শুনেছেন—কি করে যে এ-সব খবর খুব সহজে দুকান হয়ে যায় বোঝা দায়। অনুর স্বামী নাকি গতরাতে সারারাত্র মদ খেয়েছে, এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, এইসব সত্ত্বেও অনু যে এসেছে, তার ভাগ্য বলতে হবে। কাল দশটাতে ফোন করলে, তিনি বাড়ির চাকরের মুখে, চাকর-বাকরেরা কি যে হয়েছে আজকাল, বাড়ির কোন গুপ্ত খবরই আর গুপ্ত রাখতে দিচ্ছে না, জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলেন। অনুর প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়, ওর প্রথম চলচ্চিত্রে নূতন রীতির কাজ। সকলকে অবাক বিস্ময়ে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি সোনার ঈগল আকাশে উড়িয়ে দিতে চান। চোখ বুজলেই কেবল মনে হয় সোনার ঈগলটা বড় সমুদ্রে যাবার জন্য নক্ষত্র থেকে অমৃতসুধা পান করে আসছে। তিনি অনুকে অমৃত পান করাতে এনেছেন। সারাজীবনের স্বপ্ন অনুর। এমন কি বৈধব্য জীবনে জারজ সন্তান পেটে ধারণ এবং তার অভিনয়—তিনি এখন এই পাহাড়ে সেই ভূমিকাটুকু অভিনয় করিয়ে নেবেন। এই ভেবে অনুর মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল অনুর চোখে ভীষণ এক অসহায় যুবতীর মুখ ভাসছে। তিনি ভাবলেন এই, এই মুখই তিনি ক্যামেরাতে ধরে রাখতে চান।

অনু, ওরা সকলে যে যার পোশাক-বদলের জন্য উঠে গেলে নিজের ঘরটা ভাল করে দেখল। পিছন দিকে একটা জানালা আছে। জানালাটা খুলে দিল অনু। দূরের মাঠ নিঃশব্দ। হাওয়া এসে

ঘর থেকে কিছু কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম এবং বেসিন। পাশে কল খুলে দিলে ঠাণ্ডা জল। সে ঘরে ঢুকে সারাদিনের ক্লান্তি মুছে দেবার জন্য আয়নায় মুখ দেখল। বড় আলো, ঠিক হ্যারিকেন বলা চলে না। সাদা চিমনি বাতির। সাদা আলো ঘরে। বাথরুমের আলোটা উসকে দিল। এবং সাদা-শাড়ি শরীর থেকে আলগা করে দেবার সময় আজ সহসা কেন জানি মনে হল দীর্ঘদিন এই শরীর মনি-মুক্তোর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। এত যে ক্লান্তি শরীরে, নিঝুম পাহাড়ের মাথায় কেবল একটা লাল আলো দেখলে বোঝা যায় মনের ভিতর সে ক্রমে কত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। সে সুভাষের জন্য কতকাল শরীরের দরজা-জানালা সব খুলে রেখেছিল, কাল কোন দৈনিক কাগজে অসীম এবং অনুর যুগলে ছবি ওকে মাতাল করে দিয়েছিল। অনুদের বাড়িতে সে ছুটে আসেনি। কারণ সুভাষের সঙ্গে তিক্ততা বাড়লে সেই যে সে বাড়ি ছেড়ে চলে এল আর সুভাষ এল না। সে প্রীতির কাছে ছুটে গেল। প্রীতি অনুর বান্ধবী। আয়নায় মুখ দেখায় সময়, সে যেন মনে মনে বলল, প্রীতি তুই আমার মানুষকে পর করে দিলি। কতকাল তার জন্য আমি আমার দরজা-জানালা খুলে বসে আছি—কতকাল, কতকাল। অনুর এমন সব মনে হলেই কান্না পায়। কাল প্রথম ওর মুখ-চোখ ছবিতে ধরা পড়বে। ওর বুক কাঁপছিল। কাল সে সুজলা সুফলা বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে যাবে। মন থেকে সে সুভাষের কথা জোর করে দূর করে দিতে চাইল। সারাটা ট্রেনেও সে দূর করার চেষ্টা করেছে—পারে নি। বার বার মামাবাবুটি বলেছেন, শুধু সব সময় তুমি মনে রাখবে, পেটে তোমার জারজ সন্তান, তুমি বিধবা। সব সময় তোমার মুখে অপরাধের ছবি ভেসে থাকবে। সব সময় তুমি সে ছবি মুখ থেকে মুছে দেবার চেষ্টায় থাকবে। তুমি জোরে জোরে হাসবে, গান গাইবে এবং গান গাইতে গাইতে তুমি সহসা কেঁদে ফেলবে।

অথবা পাহাড়ের ওপর সেই সমতল ভূমি। পেটে তোমার জারজ সন্তান বুঝতেই দিচ্ছ না। তুমি ছুটছ, কেবল ছুটছ। তুমি অলীক স্বপ্নের ভিতর এক রেলগাড়িতে উঠে যাবার জন্য প্রেমের মানুষটিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছ। সে তোমায় তুলে নেবে বলে কায়দা করে করে হাতটা ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেড়ে দিল। যেন তুমি ওকে ধরতে পারলে না। তুমি তোমার ভুলের জন্য গাড়ির তলায় পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে।

অনু তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফেলল। ঘসে ঘসে মুখ থেকে ক্লান্তির ছাপ তুলে দিতে চাইল। কেমন নিঃশব্দ এক ভাব। অসীমের ঘরে শুধু টুকটাক শব্দ। ও বোধহয় রাতে দাড়ি কামায়। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। না, কান পাতলে সে আরও শব্দ শুনতে পেল। পরিচালক মানুষটি এখন নিজের ঘরে কিছু করছেন। ওর উঁকি দেবার বাসনা হল। তারপর মনে হল জানালা দিয়ে একটা সাদা আলো ঘরে ঢুকতে চাইছে। সে সেখানে মুখ তুলতেই দেখল পরিচালক মানুষটি সাদা জ্যোৎস্নার ভিতর দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছেন। সে তাড়াতাড়ি একটু জানালাটা ঠেলে দিল। ওর বসন-ভূষণে এখনও সামান্য আলগা আলগা ভাব আছে। সে এখনও ঠিকমত শরীর সেজে-গুজে কমনীয় করে তোলেনি। কোন শব্দ নেই বলে, দূরে কোথাও কোন শব্দ উঠছে কিনা লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। এবার যেন মনে হল অজস্র শব্দ। পাখ-পাখালির শব্দ, ঝরনার শব্দ, এবং দ্রুততালে মাঠ দিয়ে একটা আগুনের গাড়ি ছুটে যেতে দেখল। ওর ভয়ে বুকটা কেমন ধড়ফড় করছিল। সে দ্রুত জানালা বন্ধ করে বসে থাকল। মনে হল মাঠের জ্যোৎস্না এতক্ষণে মরে গেছে।

পরিচালক মানুষটি এক সময় ওঁর ঘর থেকেই বললেন, কি, ভয় লাগছে অনু?

—না, ভয় কি। সে তার ঘর থেকে জবাব দিল।

—পাশের জানালাটা খুলে শুতে পার। কোন ভয় নেই। জানালা বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে। রাত্রে ভাল ঘুম হবে না।

—শোবার আগে খুলে দেব। সে কিছু কাগজপত্র বের করল। একটা প্রেসক্রিপশান বের হয়ে এল। কিছু ওষুধ। একটা ট্যাবলেট সে জল দিয়ে গিলে ফেলবার সময় বলল, কত দেরি খাবার দিতে?

—এক্ষুনি চলে আসছে। আজ আর আমরা বসব না, বুঝলে। খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। ভোর হলে দেখা যাবে।

অনু আলগা করে জল খেল। সুন্দর মুখের ভিতর একটু সাজ-গোজ থাকলেই লাবণ্য ঝরে পড়ে। মনেই হয় না দেখে এই অনু সারাদিন ট্রেনজার্নি করেছে। ঘাড় গলা কি মসৃণ! কি কোমল নরম মুখ! গলার নীচে প্রশস্ত বুকের ভিতর সদ্য উচ্চাশার পাখি বাস করছে। সেই পাখির ডাক অনুর সঙ্গে একটু কথা বললেই শোনা যায়।

খেতে বসে অনু বলল, আর দুটো মাছ খান মামাবাবু।

—তুমি খাও। মেয়েরা মাছ খেতে ভালবাসে।

অসীম ঠাট্টা করে বলল, মাছ-মাংস দুই খেতে ভালবাসে। আমাদের অনুদি এক সময় খুব খেতে ভালবাসতেন।

—তোমাকে বলেছে!

—কেন, দিল্লীতে আপনি যেবারে আমাদের নাট্য সংসদের হিরোইন হয়ে গেলেন, মাছ কে ক'টা খেতে পারে পাল্লা চলছিল, আপনি বেশী খেলেন মেয়েদের ভিতর।

—সে এক সময় গেছে। এখন আর কিছুই খেতে ইচ্ছা হয় না।

—মিথ্যা কথা। অসীম বলল, অনুদি আজকাল আপনি খুব মিথ্যা কথা বলতে শিখে গেছেন।

—অসীম, মেয়েরা সামান্য মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে। ওদের ওটা লাইসেন্স দেয়া থাকে। বলে মামাবাবুটি চামচের ডগায় এক টুকরো মাংস তুলে ঠোঁটের সামনে রাখতে গিয়ে মনে হল, অনু মনে

মনে কষ্ট হয়েছে। মামাবাবু বললেন, অনু, তুমি তো মেয়ে, তোমার সাদা জ্যোৎস্না দেখলে বেড়াতে ইচ্ছা হয় না?

—হয়। হবে না কেন। ইচ্ছা হয় না বললে ভুল হবে। মিথ্যা কথা বলা হবে।

—পাহাড়ের ওপর কোনদিন সাদা জ্যোৎস্নায় একা একা বসে আকাশের নক্ষত্র গুনেছ?

—না, গুনিনি।

—একদিন আমরা তিনজনে গুনব।

—কি হবে?

—দেখবে তখন আমরা আমাদের জীবনের পুরানো কথা সব ভুলে যাব।

মামাবাবুটি মাঝে মাঝে বড় রহস্য মিশিয়ে কথা বলেন। তিনি বললেন, এই পাহাড়ের একটা বদনাম আছে।

—কি বদনাম?

—পাহাড়ের ওপাশটায়, তোমার জানালাটা খুললে যে দিকটা দেখা যায় সেখানে সোজা হেঁটে গেল খাদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। পাহাড়ে ওঠার আগেই খবরটা সকলকে দিয়ে দেয়া হয়। যারাই বেড়াতে আসে, অথবা পাহাড়ের মাথায় যে মন্দিরটা আছে, সেখানে তুমি উঁকি দিলেই লালবাতি জ্বলতে দেখবে। সেখানে উঠে যাবার সময় সবাই গল্পটা শুনে হাসে। ভোরবেলা কিন্তু কথাটা অনেক সময়েই সত্য হয়ে দেখা দেয়! কেউ না কেউ পড়ে মরে থাকে। কোন একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয়ই।

অসীম বলল, পাহাড়ের মাথায় রাতের বেলা গ্রামের মানুষেরা সেজন্য উঠে আসে না।

অনু বলল, এসব বলে আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

—না, ভয় নয়। আমরা এ যুগের মানুষ। আমাদের তো বৈজ্ঞানিক মন। আমরা ভয় পাব কেন?

রাতে কিন্তু অনু আলো জ্বালিয়ে রাখল ঘরে। এমনিতে ওর আলো জ্বালিয়ে রাখলে ঘুম হয় না। কিন্তু এই অপরিচিত জায়গায় সে আলো নিভিয়ে ঘুমাতে পারল না। কেবল মনে হচ্ছিল জানালাটা নড়ছে। সে দুবার উঠে জল খেল। জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর যেখানে পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। এবার জ্যোৎস্না মনে হয় মরে যাবে। অন্য ঘরে মনে হয় সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুর রাত হলে সে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে, তখন পাহাড়ের মাথায় শিব-মন্দিরে মহানিশার পুজো হয়।

মামাবাবুটিও ঘুমোতে পারছিলেন না। তিনি সেই ফোকরে চোখ রেখেছেন। অনুর মুখ দেখে কেমন ভয় হয়ে গেছে। অনুকে এমন একটা জায়গায় না নিয়ে এলেই হত। অনু এত বেশী পায়চারি করছে কেন? ওর তো এখন ঘুমিয়ে পড়ার কথা। সে শুয়ে পড়লে নিশ্চয়ই আলো নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আলো জ্বেলে শুল কেন? পা দুটোর ওপরে শাড়ি উঠে গেছে। সে পাশ ফিরে শুল। ওর পিঠের সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে। সে গরমে বোধহয় হাঁসফাস করছিল। সে পেটের নীচু অংশটায় হাত দিল। অনু সারাটা পথ একটা চাদর গায়ে জড়িয়েছিল। ওর মাতৃত্ব কত প্রখর বোঝা যাচ্ছিল না। এখন যে অনু জননী সেটা সবই টের পাওয়া যাচ্ছে। মামাবাবুটি ভিতরে ভিতরে কেমন অমানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সারাদিন কিন্তু এমনটি হয় নি। সামান্য মদ্যপানে কিছু হবার কথা নয়। বরং মন খুব উদ্বিগ্ন থাকবার কথা। প্রথম কাজ, এবং প্রথম তিনি হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বসে বসে চুরুট খেলেন। আর সেই ফোকরে চোখ রেখে সারাক্ষণ বসে থাকলেন। সারাদিন মামাবাবুটিকে মনেই হয়নি তিনি অনুর শরীর সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন। যেন এই শরীর কিছু নয়, অনু কিছু নয়, শিল্প সৃষ্টিই সব। বাইরের সাদা জ্যোৎস্না তাকে মাতাল করে দিয়েছে।

অসীম ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু সারাদিন সে অনুকে বড় উদাসীন দেখেছে। ওর ঘর থেকে অনুর ঘরের কিছুই দেখা যায় না। দেখলে যেন ভাল হত। অন্তত পাহারা দেওয়া যেত। সুভাষ এবং অনুদির ভিতর মনোমালিন্য বড় কুৎসিত রূপ নিয়েছে। এমন একটা রূপ নেবে সে যেন ভাবতেই পারেনি। মানুষটা এত ছোট ভাবতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

সুতরাং দরজা খোলার শব্দ হয় কি না, অনুর সাদা জ্যোৎস্নায় বের হবার ইচ্ছা হয় কিনা, এবং খাদের পাশে চলে যাবার জন্য সে হাঁটতে থাকে কিনা দেখার জন্য দরজা খুলে রাখল। দরজা খুলে রেখেও কোন আশ্বাস পেল না যেন। জায়গাটা কোথায় দেখার বাসনা হল। সে হাঁটতে থাকল। দুটো কাঞ্চনফুলের গাছ হবে, গাছে সাদা সব ফুল ফুটে আছে, গাছের নীচ দিয়ে সেই খাদের দিকে হাঁটার সময় মনে হল জানালা দিয়ে বাইরে এসে আলো পড়েছে। তবে কি অনুদি ঘুমোয়নি? সে অনুদির যেদিকে জানালা, সেদিকে হাঁটতে থাকল এবং জানালার পাশে দাঁড়াতেই দেখতে পেল অনুদি ঘুমিয়ে পড়েছে। মনেই হয় না এই অনুদির স্বামী সুভাষ গত রাতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, মনেই হয় না এমন সুন্দর মানুষের মনে একটা চরম অশান্তি ভিতরে ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছে। অসীমের ভাল লাগছিল না। অনুদিকে ওর আজ যথার্থই ভালবাসতে ইচ্ছা হল। সাদা জ্যোৎস্নায় অনুদিকে নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল। সে অপলক জানালায় দাঁড়িয়ে অনুদির ফুলের মত শরীর দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল। সাদা জ্যোৎস্না সহসা কেন জানি মানুষকে পাগল করে দেয়।

সকালবেলা অনু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠল। ভোর রাতের দিকে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল একবার। মনে হয়েছিল জানালা অথবা

দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। বলছে, অমু ওঠ। সময় হয়ে গেছে। কে ডাকল এবং কার গলার স্বর ভাববার সময় সে একটু জল তেষ্টা বোধ করল। জানালা খোলা। সূর্যের আলো প্রথম জানালাতেই নেমে আসবে মনে হল। গতকাল সন্ধ্যায় সে এই পাহাড়ে উঠে দিক ঠিক করতে পারেনি। সব সময়ই মনে হয়েছে—জানালাটা যে দিকে আছে সেটা পুব দিক। সে জল খেতে খেতে ঘড়িটা দেখল। কি কারণে ঘড়িটা উলটে আছে এবং বন্ধ হয়ে আছে বুঝতে পারল না। সে কি গতকাল ঘড়িতে দম দেয়নি! না কি অন্য কিছু কারণ। সে কার গলার স্বর শুনতে পেয়েছে আর একবার ভাববার চেষ্টা করতেই মনে হল—সে একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটা অদ্ভুত। এমন স্বপ্ন দেখার কি মানে! সুভাষ ওর শিয়রে বসে আছে, প্রথম এমন একটা ছবি দেখতে পেল। সুভাষ ওর কপালে হাত রেখেছে। চুলে বিলি কেটে আদর করছে। সে প্রীতিকে দেখতে পেল পর্দার ও-পাশে। প্রীতি কেমন ছেঁড়া থান পরে ঘোরাফেরা করছে। তারপর ভোজবাজির মত কেমন সব ঘোলা জলের রঙ নিতে নিতে চোখের সামনে এক প্রকাণ্ড বালুবেলা ভেসে উঠল। সুভাষ শক্ত কাঠ কাঁধে করে বালুবেলাতে নামাচ্ছে। পারে একটা বড় কাঠের গোলাঘর। সুভাষ কেবল সেখান থেকে কাঠ বহন করে আনছে। তারপর যেন, সে যেমন ইংরেজী বইয়ে প্রাচীন ইতিহাসের ছবি দেখেছে, কিছু বীরযোদ্ধা সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতে মেষ অথবা মহিষের মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে তেমনি সুভাষ নদীর ঢালুতে একটা ছোট জীবকে পোড়াচ্ছে। নীচে আগুন জ্বলছিল। কিছু শক্ত কাঠের আগুন। ওর বান্ধবী প্রীতি অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার রাত্রি। শুধু কাঠের আগুনে যতটুকু মুখ দেখা যায় ততটুকু দেখা যাচ্ছিল। ওরা কি উলঙ্গ ছিল! ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা সে এই ভাবতে ভাবতে ভোর করে ফেলল। আর ভোর হলে যেদিকে সূর্য ওঠার কথা, সেদিকে উঠল না। ঠিক

দরজার মুখে সূর্য উঠল। সকলে ওঠার আগে সে দরজা খুলে দিল। স্টোভ জ্বেলে কফি করে মামাবাবু এবং অসীমকে ডেকে ডেকে তুলল। মামাবাবুকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে। তিনি যেন ধমক দিলেন অনুকে, এসব কি হচ্ছে অনু! তোমাকে এ-সব কে করতে বলেছে! লোকজন কি আমাদের নেই?

—থাকবে না কেন! বলে, অনু হাসার চেষ্টা করল।

মামাবাবু এবং অন্যান্য সকলেই সকাল থেকে ব্যস্ত থাকল। এবং সারাটা দিন লোকেশনেই কেটে গেল। খাবার দাবার সব সেখানেই সার্ভ করা হল এবং রাত্রির দিকে শুধু অসীম এবং অনু ফিরে এল রেস্ট হাউসে। আজব এই মানুষ মামাবাবু। বিকালের দিকে তিনি কিছু লোক নিয়ে আবার কোথায় জায়গা ঠিক করতে বের হয়ে গেছেন। গ্রামের দিকে যাবার কথা ছিল। গ্রাম খুব দূরে। দুটো জিপ গাড়ি পাহাড়ের ঢালুতে। এত উঁচু থেকে শুধু অসীম এবং অনু দাঁড়িয়ে দেখল অনেক দূরে জিপ দুটোর আলো দেখা যাচ্ছে। ওরা বোধ হয় ফিরে আসছে।

অসীম বলল, তিনদিনের একদিন কেটে গেল।

একজন লোক ওদের ফরমাস খাটার জন্য রয়েছে। লোকটা স্থানীয় নয়। ইউনিটের সঙ্গে এসেছে। কাল কি কারণে ওকে দূরের শহরে থাকতে হয়েছিল। সুতরাং রাতে ওরা লোক পায়নি। আজ লোকটা এখানেই থাকবে। রাতে পাহারা দেবে। রাতে মামাবাবু ফিরবেন না। তিনি ওদিকেই থেকে যাবেন। বোধ হয় এখন জীপে অন্য লোক ফিরছে।

অসীম বলল, অনুদি এই নতুন জীবন কেমন লাগছে?

—তোমার কেমন লাগছে বল!

—আমার তো ভাল লাগারই কথা।

আমার খারাপ লাগার কথা কেন!

অসীম বুঝি এ-সময় সুভাষের কথা ভাবছিল। বলতে পারত,

আপনার স্বামী সুভাষবাবু দিন দিন কি হয়ে গেল! তাকে নিয়ে আপনার বড় অশান্তি। আপনার বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমি সব বুঝতে পারি।

অনু বলল, মামাবাবু আজ কোথায় গেলেন! তোমাকে কিছু বলে গেছেন ?

—কিছু বলে যাননি।

—কাল কি তবে স্যুটিং বন্ধ!

—না বোধ হয়। হলে তিনি যাবার আগে নিশ্চয়ই বলে যেতেন।

লোকটার নাম ধনঞ্জয়। অনু ধনঞ্জয়কে বারান্দায় চেয়ার বের করে দিতে বলল। বাথরুম থেকে সে ভালভাবে গা ধুয়ে এবং শরীরে অনেকক্ষণ জল ঢেলে বের হয়েছে। বেশ সতেজ এবং স্নিগ্ধ বোধ হচ্ছিল। বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার এনে দিল ধনঞ্জয়। নীচে তাঁবু টানিয়ে ইউনিটের অন্য লোকেরা রয়েছে। ওখানেই রান্না হচ্ছে। খেতে খেতে অনেক রাত হয়ে যাবার কথা। মামাবাবু নেই, সুতরাং ওদের বোধ হয় স্বরাজ মিলে গেছে। কখন খাবার পাঠাবে কে জানে। একটু রাত করে পাঠালেই ভাল হয়। কারণ এই জ্যোৎস্না রাতে কেমন পাহাড়ের ঢালুতে একটু পায়চারি করতে ইচ্ছা হল। সে একা নেমে এল বারান্দা থেকে। ধনঞ্জয়কে বলল, অসীমবাবু আমার খোঁজ করলে বলবে, একটু মন্দিরের দিকে গেছি!

ধনঞ্জয় বলল, একা যাবেন না দিদিমণি।

—কেন ?

—সাপের ভয় আছে। পথ চিনতে পারবেন না।

—ঐ তো সামনে।

—মনে হয় খুব সামনে। কিন্তু অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

অনু আর যেতে সাহস পেল না। অসীমকে নিয়ে গেলে হয়। এতক্ষণ একা বসে বসে কাটানো যেন দায়। অসীম ঘরে বসে কি

করছে! স্নানের জন্য এতক্ষণ সময় দরকার হয় না। সে এলে বেশ দু'জনে এই পাহাড়ের মাথায় ঘুরে বেড়াতে পারত। সে একবার ডাকল, অসীম কি করছ?

—এই যে অনুদি। হয়ে গেছে।

—একটু যাবে না কি?

সে ঘর থেকে উত্তর করল, কোথায়?

—মন্দিরের দিকে।

—যাব। বলে, সে কালো রঙের একটা প্যাণ্ট এবং লাল রঙের গেঞ্জী গায়ে বের হয়ে এল। খুব সপ্রতিভ দেখাচ্ছে অসীমকে। সে বারান্দায় বের হয়ে এলে দেখতে পেল দূরে কারা যেন উঠে আসছে। ওদের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। একবার একটা মোরগ ডেকে উঠল। অনু কিছুই লক্ষ্য করল না। সে শুধু জ্যোৎস্নায় একা দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকের এমন রহস্যময় জ্যোৎস্না দেখে সে বলল, জানো অসীম আমার কেন জানি কেবল আজ গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে।

অসীম বলল, সেতো হবেই। মামাবাবু খুব খুশি। আপনার প্রত্যেকটা 'শট'ই এত সাকসেসফুল যে মামাবাবু বলেছেন, অনু একটা জিনিয়াস। তবে আপনার গান গাইতে ইচ্ছা হবে না তো, কার ইচ্ছা হবে।

—তুমি ভুল করছ অসীম। আমার সেজন্য আদৌ গান গাইবার ইচ্ছা হচ্ছে না। বলতে কি মামাবাবুর প্রশংসার কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। কি জানো এমন জ্যোৎস্না দেখলে মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কেবল যেন বলছে আনন্দ কর, আনন্দ কর।

—তা ঠিক।

—আমি তোমাকে বলতে পারি এই জ্যোৎস্নায় তুমি যতটা হাঁটতে পারবে, আমি ঠিক ততটা হাঁটতে পারব।

অসীম বলল, কারা যেন এদিকে উঠে আসছে।

এবার অনু লক্ষ্য করল। কিছু কিছু কথাবার্তার শব্দ এবং ইতস্তত কোথাও মোরগ ডেকে উঠছে। এই পাহাড়ের মাথায় মোরগের ডাক শুনে অনু কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল। কারণ কাছে কোথাও লোকালয় নেই। শুধু পাহাড়ের মাথায় এক মন্দির। মন্দিরের মাথায় লাল বাতিটা দপ দপ করে জ্বলছে। কারা উঠে আসছে? মনে মনে অনু আন্দাজ করার চেষ্টা করল। যারা নীচের তাঁবু থেকে খাবার দিতে আসবে, তাদের এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়। তবে কে! মামাবাবু ফিরছেন না! তবে কারা! সতীশবাবু কি! ক্যামেরাম্যান সতীশবাবু আসতে পারেন। কিন্তু একজন তো মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিন-চারজন। এবং দূরে জ্যোৎস্নার ভিতর অস্পষ্ট বলে ক'জন উঠে আসছে ধরা যাচ্ছে না।

সুতরাং অনু এবং অসীমকে যারা রেস্ট হাউসের দিকে উঠে আসছে এবং যে সব মোরগেরা ডাকছিল, তাদের জন্য প্রতীক্ষা করতে হল। যেন একদল লোক গ্রামের হাট থেকে সওদা করে ফিরছে। যেন দেশবাড়ির গল্প জোতজমির গল্প করতে করতে উঠে আসছে। পাহাড়ের ওপর ওদের ঘর আছে এমন বোঝা যাচ্ছিল। অনু বেতের চেয়ারে বসে আছে। পাশে অসীম দাঁড়িয়ে আছে। অনু বলছিল, অসীম তোমাকে আমার অনেক কথা বলার ছিল। রাত হলে আমার ভয় করে।

অসীম বলল, প্রথম প্রথম এমন হবে।

—রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল, আমি যে কি করি!

অসীম ভাবল, এমন কি স্বপ্ন দেখেছে অনুদি! অনুদি কি রাতে সুভাষবাবুর স্বপ্ন দেখেছে! সুভাষবাবু ওকে কি খুন করতে আসছে?

অনু অসীমকে কোন প্রশ্ন করতে না দেখে বলল, আমরা যে কি চাই বুঝি না।

—এক সময় মনে হত অসীম, আমি ভাল গান গাইব, সবাই আমার গান শুনে খুশি হবে। কিন্তু এখন যত গানে আমার সুনাম বাড়ছে, তত অন্য আকর্ষণ আমার।

অসীম বলল, অনুদি এই জ্যোৎস্নায় বরং খারাপ কিছু না ভেবে আসুন একটু গান গাই। বেশ ভাল লাগবে।

অনু বলল, ছাখো কারা আসছে।

কাছে এলে ওরা দেখতে পেল একটা লোক এক কাঁদি ডাব মাথায় করে এনেছে। একটা লোক ঝুড়িতে কিছু নিয়ে এসেছে। অনু উঠে গেল দেখতে, ঝুড়িতে কি এসেছে। সে উঁকি দিতে গেলেই দেখল মামাবাবু প্রায় শিকারী মানুষের মত পোশাকে উঠে এসেছেন। অসীমের এই মামাবাবুটিকে সহসা বড় রসিক জন বলে মনে হল। বলে এক কথা, করে আর এক কাজ। কথা ছিল কোথায় যাবেন, ফিরবেন না, এখন অনু দেখছে মানুষটি ঝুড়ি থেকে মোরগ দুটোকে টেনে একেবারে অনুর চোখের সামনে তুলে ধরল, কেমন কিনে এনেছি ছাখো।

—আপনি কি তা হলে গ্রামের দিকে মুরগি কিনতে গেছিলেন !

—না গিয়ে উপায় কি বল? দু'দিন যা খাওয়াল, একেবারে অরুচি ধরে গেছে।

—কেন কাল রাতে বললেন গ্র্যাণ্ড খাবার।

আরে বলতে হয় ও। না বললে আজ হয়তো খেতেই দিত না। বলে তিনি মুরগি দুটোকে চিৎ করে ফেললেন, কি পুষ্ট ছাখ। মুরগির নরম পেটটা টিপে দিলেন, যেন পেটের ভিতর ডিম আছে কি না দেখলেন। অনু কেমন ভিতরে শিউরে উঠল, ওর পেটে সুভাষের জাতক—মামাবাবু যেন এখন মুরগির পেট টিপছেন না, অনুর পেটে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। অনু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে একটু দূরে সরে যেতে চাইলে মামাবাবু বললেন, অনু যাচ্ছ কোথায়! একটু হাত লাগাও।

—বা আপনি বেশ মানুষ তো। অনু দু'দিনে মামাবাবুকে কিছুটা কাছের মানুষ করে ফেলেছে। আগে যতটা সমীহ করত, এখন যেন ততটা করছে না। তবু তিনি যখন হাত লাগাতে বলছেন, তখন কিছু করতে হয়। সে বলল, কি করতে হবে বলুন।

—তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু একটু পাহারা দেবে, আমি জামা কাপড় ছেড়ে আসছি।

ধনঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। কি এমন জিনিস যে পাহারা দিতে হবে! মুরগির ঠ্যাং বাঁধা আছে, সুতরাং মুরগি উড়ে যেতে পারবে না। এক কাঁদি ডাব, ডাব দিয়ে কি হবে! অসীম দূরে দাঁড়িয়ে কেন, সে এদিকে আসছে না কেন। সে ডাকল, অসীম ছাখো মামাবাবু কেমন ভাল দুটো মুরগি কিনে এনেছেন।

অসীম জানত, মামাবাবু আজ আবার আকণ্ঠ মদ্যপান করবেন। দু'একবার অসীমকে নিয়ে বসেছেন, আজ হয়তো অনুদিকে অনুরোধ করবেন একটু বসতে। তার আজ অনুদির অভিনয়, সরল অনাড়ম্বর অভিনয় এবং চোখের ভাঁজে অকপট ভালবাসার ছবি খুব ভাল লেগেছে। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমন আন্তরিক অভিনয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল হবে তিনি যেন আজ তা স্থির জেনেছেন। তিনি অন্যদিন রাতে পরিমিত পান করেন, আজ একটু বেশী খাবেন। সে সেজন্য প্রথম থেকেই এসব পরিহার করে চলছিল।

তিনি জামা কাপড় ছেড়ে একটা হাফশার্ট এবং পাজামা পরে বের হয়ে ধনঞ্জয়কে বললেন, গরম জল করতে।

অনু বলল, মামাবাবু আপনার বাবুর্চি আছে, তাকে দিয়ে রান্না করিয়ে আনলেই পারেন।

—পারলে কি নিজে গ্রামে চলে গেছি মুরগি আনতে। বেটারা সব চোর।

অসীম অবশ্য বলতে পারত অন্যকথা। এই মামাবাবুর মাঝে মাঝে

এমন হয়। যেদিন তিনি খুব স্বপ্ন দেখবেন সেদিনটি একেবারে অন্য মানুষ। তিনি নিজে রান্না করবেন, মশলার পরিমাণ ঠিক করে দেবেন। একটু ভিনিগার, ভিনিগার না থাকলে টমেটোর রস চিপে দিয়ে দেবেন। মাংসটা ভাজা ভাজা হবে। কাঁচা লঙ্কার কুচি থাকবে। কাঁচালঙ্কা তিনি নিজে কাটবেন। আদাকুচি তিনি নিজে হাতে ছড়িয়ে দেবেন। তারপর মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন, একটা ছুটো কাঁচা লঙ্কার টুকরো জিবে ঘসে দেবেন।

অনু বলল, আমি দেখাশোনা করছি। আপনি বলুন—কি কি ভাবে করলে আপনি খেতে ভালবাসেন, সব করে দিচ্ছি।

মামাবাবু বললেন, ধনঞ্জয় কোথায়?

—ওকে যে গরম জল করতে বললেন।

ধনঞ্জয় গরম জল করে আনলে মুরগি ছুটোকে ডুবিয়ে দিলেন। মামাবাবু নিজের হাতে বালতির ভিতর তাজা মুরগি ছুটোকে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে দেবার আগে চুরুট ধরালেন। মুরগি ছুটো ডুবে যাবার আগে শেষবারের মত কঁক্ কঁক্ করে উঠল। অনু এইসব নিষ্ঠুর ঘটনা দেখতে পারে না। সে একটু দূরে সরে গেল। ওর শরীরটা আবার গুলিয়ে উঠল। মুরগির চোখ ছুটো এখন জানি কেমন দেখাচ্ছে। গরম জলের ভিতর এই প্রাণ ডুবে গেল। সে এই সব নিষ্ঠুর হত্যা দেখলে অনেকদিন আর মাংস খেতে পারে না। ভোর রাতের দিকে সে যে স্বপ্নটা দেখেছিল, তাতে সুভাষ-ও এমন একটা নিষ্ঠুর ঘটনা নিয়ে মেতে উঠেছিল। এতক্ষণে সে যেন স্বপ্নটা স্পষ্ট মনে করতে পারছে। সুভাষ এবং অনু ঝরনার পাশে বসে গাছ ফুল ফল পাখি দেখছিল। গান গাইছিল। হরিণেরা জল খেয়ে ঝরণা থেকে চলে গেল। ছোট একটা হরিণ-শিশু ওর পায়ের কাছে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। হরিণ-শিশুটি কেন জানি এমন নিবিষ্ট ছু'জন প্রেমিক মানুষকে দেখে পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছিল। অনু আপেল খাচ্ছিল, হরিণ-শিশুর দিকে আপেল ছুঁড়ে দিচ্ছিল। হরিণ-শিশুটা

লাফাচ্ছিল, লাফাতে লাফাতে একবার একেবারে অনুর কোলের কাছে চলে এল। অনু যেন হরিণ-শিশুকে ভালবেসে ফেলেছে। সুভাষের ভাল লাগছিল না। অনুর এই হরিণ শিশু নিয়ে অন্যমনস্কতা ভাল লাগছিল না। সে খপ করে সেই হরিণ-শিশু ধরে ফেলল তারপর ছুটতে থাকল, যেমন করে বাঘ মেষশাবক নিয়ে দৌড়য় তেমনি সে দৌড়ে নদীর ঢালুতে নেমে এসে দাঁড়াল। তখন আর সুভাষ নেই, প্রাচীন মানবের মতো মুখ। অনু আর অনু নেই, প্রাচীন মানবীর মত মুখ। তারপর সুভাষ সারাক্ষণ কাঠ বয়ে এনেছে, নদীর ঢালুতে কাঠ নামিয়ে এনেছে। দুটো কাঠ লম্বা করে পুঁতে দিয়েছে। একটা কাঠের ভিতর হরিণ-শিশুটাকে গেঁথে দিয়ে আগুন জ্বেলেছে। কখন সেই মাংস রোস্ট হবে তার প্রতীক্ষাতে অন্ধকারে আগুনের দু'পাশে দুই মানব মানবী বসে মাঝে মাঝে সেই সরু কাঠটা ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। আর হরিণ-শিশুটি ঘুরে ঘুরে পুড়ে যাচ্ছিল। এবং এমন সুন্দর হরিণ-শিশুটি কুঁকড়ে কি কুৎসিত হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছিল। নদীর জলে মাছের শব্দ। মাঝে মাঝে আগুনের হলকা নদীর চর আলোকিত করছিল। সুভাষের সেই ভয়াবহ প্রাচীন মানবের মুখ এ-সময়ে অনু কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর অনু কি করে সুভাষের চোখে, হায় কেবল বার বার প্রীতি হয়ে যাচ্ছে। সে সুভাষের সেই নিষ্ঠুর মুখ মনে করতে পেরে ভাবল একটু মদ খাবে। সে শুনেছে, মদ খেলে মানুষ তার কষ্ট ভুলে যায়। দুঃখ থাকে না। সে সামান্য খেলেই দুঃখ অথবা প্রাচীন মানবের মুখে যে নিষ্ঠুরতা দেখতে পেয়েছে তা ভুলে যাবে। সে ভাবল, মামাবাবুর কাছ থেকে সে সামান্য মদ চুরি করে খাবে।

মামাবাবু খুব তরিবৎ করে রান্নার আয়োজন করলেন। মাংসটাকে সামান্য ভিনিগার দিয়ে ভিজিয়ে রাখলেন। তারপর আদা এবং পেঁয়াজ, সামান্য রসুন দিয়ে মাংসটা মেখে নিলেন। সরষের তেল তেজপাতা কিছু লবঙ্গ এবং এলাচের গন্ধ রাখলেন।

মাংসটাকে একটা প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে সেদ্ধ করলেন। তারপর মাখনে ভেজে নিলেন। মুরগির কলিজা থেকে সামান্য মাংস প্লেটে তুলে ডাকলেন, অনু খাও তো। বলো, কেমন হয়েছে?

অনু একটা রোলেক্সের বেনারসী পরেছে। বড় ঝলমল করছিল। মুখ মন শরীর দেখলে মনে হয় এক পরান কাইন্দা মরে পদ্মাপারের লাইগ্যা। সে তার মনের দুঃখটা কিছুতেই কাউকে ধরতে দেয় না। মনের ভিতর সেই দুঃখটা কেউ টের না পাক, সুভাষ প্রীতিকে নিয়ে রাত যাপন করছে, সহবাস করেছে, ওর সোনার ঈগল উড়তে দেখে সুভাষ কেমন মাতাল হয়েছে। সুভাষ সারারাত মদ্যপান করেছে। তুমি সুভাষ মদ্যপান করবে, প্রীতির সঙ্গে সহবাস করবে, আমি পারি না, আমি কি পারি না ছাখো। সে সেই মাংসের টুকরো জিবে ঠেকাল। বলল, গ্র্যাণ্ড।

ঘরের ভিতর ছোট ছোট তিনটে বেতের চেয়ার। মাঝে গোল টেবিল। সাদা চাদর। ডাব কেটে রাখার জন্য দা। ধনঞ্জয় দা নিয়ে বসে রয়েছে। মামাবাবু স্নানের ঘরে ঢুকে গেছেন। খুব পরিপাটি করে সব করা হচ্ছে। তিনি এখন পরিপাটি করে স্নান করছেন। অনু বারান্দায় বসে আছে। অসীম এখন নীচে একা একা পায়চারি করছে। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল কেবল পাহাড়ের ঢালুতে নেমে যেতে। একবার যাবে না কি, কিন্তু মামাবাবু যদি কিছু ভাবেন! তিনিই সব বলতে। সেজন্য কি ভেবে বারান্দায় বসে থাকল। কখন মামাবাবু খেতে খেতে বেহুঁস হবে, তখন সামান্য মদ খেলে যে দুঃখটা প্রীতি এবং সুভাষকে দেখার পর থেকে কাজ করছে, সেটা মরে কি না দেখবে।

মামাবাবু এবার ডাকলেন, তোমরা গেলে কোথায়? এস।

অসীম কাছে ছিল না। সে শুনতে পায়নি। অনু উঠে গিয়ে দরজায় উঁকি দিল।—ডাকছেন?

—এস।

অনু লজ্জা পেল।

—অসীম কোথায়?

—ডাকব অসীমকে?

—ডাকো। ছোঁড়ার খুব লজ্জা। বেটার মামাবাবু আমি নামে মাত্র। কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এমন ভাব দেখায় যেন আমি ওর মা'র সত্যিকারের ভাই। এস, এস।

—আমি!

—ক্ষতি কি!

—আমি তো খাই না!

—খেতে কে বলেছে। ডাবের জলতো খাও!

—তা খাই।

—তুমি ডাবের জল খাবে। একটু একটু করে মাংস খাবে।

—আপনার অসুবিধা হবে।

—তুমি পাগল। তুমি থাকলে বরং বলা যায়, জমবে ভাল। সাদা জ্যোৎস্না বাইরে, পাহাড়ের মাথায় মহানিশার পূজা আরম্ভ হবে। কোথাও কোন পাখি ডাকতে পারে। ঢালু পথে হাটের মানুষেরা। পাহাড়ের মাথায় কারা গল্প করতে করতে উঠে যাচ্ছে।

—মদ না খেতেই মানুষটা কেমন নেশার কথা বলছে। সে শুনেছে যারা মদ খায় তাদের ভয় নেই। তারা বড় ভাল মানুষ হয়। যারা মদ খায় না, অথচ এক আধদিন খায় তারা বড় ভয়াবহ। তারা বড় হিসেবী মানুষ। সে বলল, বেশ আমি ডাবের জলই খাব।

—শুধু ডাবের জল খেতে বলছি তুমি বলছ বলে, যদি খেতে চাও খেতে পারো।

—খারাপ হবে না তো কিছু?

—বেশী খেলে খারাপ হবে। পরিমিত খাও, দেখবে ভালো লাগবে। আশার আলো মনের ভিতর থাকলে তা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলবে।

—অসীমকে ডাকব?

অনুর মনে হল যেন ওর আর জীবনে শান্তি নেই। সে এবার মামাবাবুকে বলল, আমি একটু খাব। খুব কম দেবেন।

—তুমি আমাকে এত ভয় পাও কেন?

—না, ভয় নয়। বেশী খেলে যদি খারাপ হয়।

—মনে রেখ তুমি আমার এখন সব। ছবির জীবন মরণ। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, তোমার একটু সর্দি হলে আমি ঘামতে থাকব। রাতে আমার ভাল ঘুম হবে না।

ওরা এবার তিনজন খেতে বসে গেল। সামান্য মদ ঢেলে দিলেন মামাবাবু। ঢেলে তিনি কেমন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। গ্লাসটা তুলে চোখের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর ডাবের জল মিশিয়ে দিলেন। হাফ পেগের মতো হবে। তিনি বললেন, এক ঘণ্টা সময় নেবে খেতে। জিভের ডগায় ঠেকাবে শুধু। ঝাঁঝ মনে হলে জল আরও মিশিয়ে নিতে পার। তারপর যদি মনে হয় তোমার বেশ ভাল লাগছে, দেব। না লাগলে তুমি গিয়ে শুয়ে পড়বে।

—খাব না!

—খেতে আর ভাল লাগবে না। মাংস আর রুটি থাকল। ধনঞ্জয়কে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, আমরা কেউ খাব না। তোমার খিদে না মরলে মাংস রুটি খাবে।

অসীম এসে কোন কথা না বলেই বসে গেল। এবং সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। অনুদিকে পাকড়েছে। সে অনুদির দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। যেন এটা ঠিক হচ্ছে না অনুদি, এমন বলার ইচ্ছা। কিন্তু মামাবাবু সব লক্ষ্য রাখছেন। তিনি প্রথম কিছুটা শুধু মদ গিলে ফেললেন। তারপর এক টুকরো মাংস জিভে ফেলে চাটতে চাটতে জিভে যে বিস্বাদটুকু লেগেছিল তা মেরে চুরুট টানতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে। এবং এ-সময়ই তিনি তাঁর শৈশবের গল্প করেন। মায়ের মৃত্যুর কথা, বাবার নিরুদ্দেশ হবার কথা, কবে আত্মহত্যা করার বাসনা হয়েছিল তার কথা, এবং মাঝে মাঝে অনুকে

উসকে দিচ্ছিলেন, তোমার কোন ইতিহাস নেই? শৈশবের ইতিহাস। বাকিটুকু বললেন না, বললে যেন এমন শোনাত, যৌবনের ইতিহাস, স্বপ্নের ইতিহাস, ভালবাসার ইতিহাস। সব কিছুই বুজরুকি, কিছু নেই, আছে যৌবন, আছে স্বপ্ন এবং শুধু এক সোনার ঈগলের পিছনে ছোটা। কিসে কি হয় জানি না, তবু বার বার যখন মনে হয়, এই বুঝি হয়ে গেল, মিলে গেল তখন তুমি আমি কেউ জানি না, না এটাই শেষ নয়। কিছু বাকি রয়ে গেল। বাকিটুকু যে কি তুমি আমি কেউ তা বলতে পারি না।

অনু খেতে খেতে কি করে সবটা খেয়ে ফেলল, তারপর শরীরের ভিতর যে গ্লানিটা ছিল, দেখল কি ভাবে তা ক্রমে মরে আসছে। মাথাটা ভারি লাগল। সে মামাবাবুর দিকে তাকাল না। সে গ্লাসে ঢেলে দিতে গেলে মামাবাবু খপ করে হাত ধরে ফেললেন। তারপর যেমন ডাক্তার রুগীর চোখ মুখ দেখে পথ্যের নির্দেশ দেন, তিনি তেমনি আর কতটা খাওয়া উচিত হবে চোখ মুখ দেখে ধরতে চাইলেন। মেয়েমানুষ। জীবনে যা স্পর্শ করেনি, প্রথম খেতে এসে কেলেঙ্কারি ঘটালে সব গেল। তিনি ফের গ্লাসে একটু ঢেলে সে-ও হাফ পেগের মতো হবে, নিজেই কিছুটা ডাবের জল দিয়ে হাতে তুলে দিলেন।

অনু দেখল চোখের সামনে ক্রমে সেই হরিণ-শিশু বড় হচ্ছে। ক্রমে কে যেন ওকে কেবল নদীর ঢালুতে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তুলে আনছে। কে যেন সেই ঢালুতে ফের আগুন জ্বেলে দিচ্ছে। হরিণ-শিশুরা খেলা করে বেড়াচ্ছিল। জ্যোৎস্না বেলাভূমিতে। দুটো কাঠ পোঁতা, আগুনের ছাই পড়ে আছে। মানুষের পায়ের চিহ্ন আঁকা। কারা সেই কবে এই বেলাভূমি হেঁটে হেঁটে পার হয়ে গেছে। সে কে? এই মুহূর্তে মনে হল শুধু সে কে! সে কি সেই হরিণ-শিশুর মত পুড়ে পুড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে! কিসের দাহ এই। কেন সে ক্রমান্বয়ে সোনার ঈগলের পিছনে উড়তে উড়তে পাখি হয়ে যাচ্ছে।

অসীম বুঝতে পারল, অনুদি বেসামাল হয়ে গেছে। সে অনুদিকে তুলে নিল, এবং ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

গভীর রাতে সেই পাহাড়ের মাথায় লাল বাতিটা দপ করে নিভে গেল। নিশীথে কে যেন এই পাহাড়ময় কেঁদে বেড়াচ্ছে, নিশীথে সকলেই একটা গভীর কান্নার ধ্বনি শুনতে পেল। নির্জন নিঃশব্দ এই পৃথিবীতে কেবল ক্রমে কি করে যেন এক ছোট্ট হরিণ-শিশুকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। অনু সারারাত ঘুমোতে পারল না। সকালে সূর্য উঠলে গতকালের সব ঘটনার কথা ওর শুধু অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল।

সকালে দেরি করে ঘুম ভাঙল অনুর। কেমন অন্যমনস্কভাবে শুয়ে থাকল। প্রথম সে বুঝতে পারল না কোথায় সে এখন আছে। ওরা যে এখানে সুটিঙ করতে এসেছে, ওদের যে দুদিন হয়ে গেল এবং আগামীকাল, যদি আগামীকাল কাজ শেষ করে উঠতে পারেন মামাবাবু তবে নিদেন পক্ষে পরশুদিন পর্যন্ত এখানে থাকছেন, এবং তারপর দিন ওরা চলে যাবে—অথচ অনু মনে করতে পারল না সে এখন কোথায় আছে। ঘুম ঘুম চোখে ওর মনে হল সে কলকাতার সেই চির পরিচিত রাস্তায় বড় বড় বাড়ির দোতালার ডান দিকের কামরাতেই আছে। ও পাশে রেডিও বাজছে—গানের গলা ভেসে আসছে—কে গাইছে, সুমিত্রা গাইছে। অনেকদিন পর যেন সে সুমিত্রার মুখ মনে করতে পারল। বেশ গাইছে আজকাল সুমিত্রা। ওর এই গান শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে গেল— চরণ রেখা তব। গানটার ভিতর সুদূরে চলে যাবার অথবা নিজের ভিতরে ডুবে যাবার কেমন একটা বেদনা থেকে থেকে কাজ করছিল।

সে উঠেই দরজা জানালা খুলে দিল। পাখ পাখালির ডাক শুনতে পেল। মামাবাবু এবং অসীম বারান্দায় বসে একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছেন। ওরা খুব ভোরে হয়ত উঠেছে, অথচ অনুকে ডাকেনি। ওরা খুব নিবিষ্ট, অনু যে দরজা খুলেছে, জানালা খুলে দিয়েছে এবং সে যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে গাছ ফুল ফল, এবং পাখিদের কলরব শুনছে তা পর্যন্ত লক্ষ্য করল না। অনু ওদের একবার ডেকে, ওকে ডাকা হয়নি কেন, এত বেলা হয়ে গেছে, সে এখন তাড়াতাড়ি সব করে উঠতে পারবে কিনা, কখন বের হতে হবে জানার ইচ্ছা হল, কিন্তু ওদের নিবিষ্ট থাকতে দেখে সে ফের ঘরে ঢুকে চোখে মুখে জল দিল। আয়নায় নিজের মুখ দেখল। চোখের নীচটা ফোলা ফোলা কেন। সে কি রাতে ভাল ঘুময়নি। কিংবা সারা রাত জেগে রয়েছে, শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়েছে, কি কারণে সে রাতে ঘুমতে পারেনি মনে করার চেষ্টা করল। কিছুতেই কারণটা মনে আসছে না।

আবার মনে হল, না, ঠিক ঘুম নয়, কেমন আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল। ঘুম ছিল না। সারা শরীরে ব্যথা এবং বার বার মনে হচ্ছিল কারা যেন চার পাশে ওর নৃত্য করছে। কেমন সব লম্বা লম্বা হাত, সরু সরু পা এবং খড়ম পায়ে হেঁটে গেলে, পাথরের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে হেঁটে গেলে যেমন খট খট শব্দ হয় তেমনি খট খট শব্দ। এক দুই নয়, হাজার হবে শব্দ কানের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওর স্মৃতি এত দুর্বল সে ভেবে পেল না! না কি সে এখনও ঠিক ভাবতে পারছে না, শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। সে চোখে মুখে জল দিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। একটা ভয়ঙ্কর অবসাদ শরীরে। স্নান করলে ভাল লাগতে পারে। সে এই ভেবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে থাকল। এমন সুন্দর মুখ অনুর, অনুর এই মুখ চোখ ফুলে থাকলে বিশ্রী দেখায়। এমন একটা ছবি ক্যামেরাতে ধরে রাখতে পারলে মামাবাবুর কৃতিত্ব বাড়বে। এখন

সুটিঙের স্ক্রিপ্ট যেন সে এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। স্ক্রীপ্টে কি আছে—সে এখন সব মনে করার চেষ্টা করতেই গত রাতের ঘটনা স্মরণ করতে পারল। গত রাতে সে মদ খেয়েছে। প্রথম এবং প্রায় অভিমান অথবা জিদের বশে মদ খেয়েছে। সে এই মদ খাওয়ার কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে এত বেশী জেদী এবং একগুঁয়ে হয়ে পড়েছিল, কেন সে যা জীবনে খায়নি, খায়নি বললে ভুল হবে, যেমন দশটা মধ্যবিত্ত মেয়ে মদ সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করে, মদ খেলে মানুষ অমানুষ হতে বাকি থাকে না, ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাসের চেয়েও অপরাধ এমন একটা ভীতি ওকে পেয়ে বসল। মামাবাবুকে মনে মনে গাল মন্দ করবে ভাবল। কিন্তু তিনি তাকে কি ভাবে সিডিউস করছিলেন! মনে মনে অনু সিডিউস কথাটাই ব্যবহার করল। কারণ যেন মদ খাওয়ার সঙ্গে এই সিডিউস কথাটার একটা সম্পর্ক আছে।

চুল খুলে দিলে এখন মাথাটা আরও বড় দেখাচ্ছে অনুর। সে ঘাড়ে গলায় হাত দিয়ে শরীরের মসৃণতাটুকু পরীক্ষা করল। বালা দুটো সে একটু ওপরে তুলে হাতে তেল নিল সামান্য। তেলটা মাথার তালুতে মাখার সময় মনে হল ওর শরীরটা কাঁপছে। সে তাড়াতাড়ি একটা কাঠের চেয়ার বাথরুমে টেনে নিল এবং বসল। চুলের গোড়ায় গোড়ায় তেল দিল। গতকাল চুলে স্যাম্পু দেওয়ায় চুলগুলো ফেঁপে আছে। এমনিতেই একমাথা চুল। এত চুল যে মুখ শরীর একটু অন্যমনস্ক হলেই যেন ঢেকে যায়। সে বার বার আজ কি অভিনয় করতে হবে কি সব বলতে হবে, প্রায় মুখস্থ করে রাখার মত ভাব। সে মনে মনে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে সেইসব অভিনয়ের কিছু কিছু অংশ উচ্চারণ করল। বস্তুত গত-রাতের মদ খাওয়া সম্পর্কে অনু এখন নিজের ওপরই বিরক্ত। বিরক্তি এলে মুখে এবং মনে একটা বিস্বাদ জেগে থাকে শুধু। কিছু ভাল লাগে না। এতটা সে না করলেও পারত। কেমন সে যেন নিজেকে

ঘৃণা করতে শিখে যাচ্ছে। ফলে সে আর আয়নায় মুখ তুলে নিজের মুখ দেখতে পারল না। কে যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এমন হবে অনু, আমি জানতাম। আমার ব্যাপারটা তোমার অজুহাত মাত্র। তুমি প্রীতির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ভেবে মদ খেয়েছ, এটা তোমার অজুহাত। বস্তুত মনে মনে তুমি অনেকদিন আগেই নীচে নেমে গেছ, এখন শুধু সুযোগ এবং সময়ের জন্য অপেক্ষা করছ। অনু কিছুতেই মুখ তুলতে পারল না, তুললেই আয়নায় স্বপ্নের মুখ ভেসে উঠবে। সুভাষ খিল খিল করে হাসবে— অনু, আমার অনু মাতাল হয়ে গায়ের শায়া শাড়ি ঠিক রাখতে পারেনি।

যত ভেবেছে অনু সুভাষের ছবি মন থেকে উপড়ে ফেলবে, তত যেন মানুষটা ওকে তাড়া করছে। যখনই খুব অসহায় মনে হয় নিজেকে তখনই অনুর স্বভাব কলের জল খুলে দিয়ে নিচে বসে থাকা। অনুর মাথায় এখনও সেই জল ঝর ঝর করে পড়ছে। ওর যেন হুঁস ছিল না। কেমন একটা আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন ভাব। কলের জল মাথায় পড়তে থাকলে আচ্ছন্ন ভাবটা ক্রমে যেন কেটে যাচ্ছিল। আর এতক্ষণে সে মনে করতে পারল সারারাতই সে ঘুমোয়নি। আচ্ছন্নভাব নিয়ে পড়ে ছিল শুধু।

যখন অসীম এসে তাড়া দিল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। মামাবাবু আগে আগে নেমে গেছেন পাহাড়ের ঢালুতে। আজ একটা বড় লম্বা দৌড়ের সট্ আছে অসীমের। অনুদির পিছনে পিছনে ছুটবে। গায়ে যতটা পারা যায় হাল্কা পোশাকে থাকার কথা। কিছু কথোপকথন আছে, অনুদির তা মুখস্থ আছে কিনা জানা নেই, তবু অসীম জানে এ-সব ব্যাপারে অনুদি বড় সিরিয়াস। কাল রাতে জোর করে ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একটু খেয়েই কেমন মাতলামিতে পেয়ে বসেছিল অনুদিকে। এই পাহাড় শীর্ষে সুটিং করতে এসে অনুদি কেমন দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। এমন একটা

সময়ে কোথায় অনুদি উৎফুল্ল থাকবে, কোথায় হর্ষে তার দিন কেটে যাবে, তা না কেবল যতক্ষণ লোকেসানে থাকে ততক্ষণ একেবারে অন্য মানুষ। যেন সংসারের কথা ভুলে গেছে, মা-বাবার কথা মনে নেই, স্বামী সুভাষবাবু পর্যন্ত সেসময় মনের ভিতর আঁস্তাকুড় হয়ে যান। তা না হলে এমন অভিনয় কে করতে পারে। এমন শিল্পসৃষ্টি এবং অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে যেন যথার্থই অনুদির পেটে এক জারজ সন্তান—বৈধব্যে অনুদি কাতর, অভিনয়ে সব ফুটিয়ে তোলার সময় পাগলের মত হা হা করে হাসতে থাকেন।

সে দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু আঘাত করল। ডাকল, অনুদি উঠুন। কত আর ঘুমোবেন।

অসীম ভোরবেলাতে দরজার শেকল খুলে দিয়েছে। সে একবার দরজাটা সামান্য ফাঁক করে দেখেছে, না অনুদি এখনও বিছানা ছাড়েনি। গোপনে সে উঁকি দিয়েছিল এবং দরজায় শেকল তোলা ছিল, সে ইচ্ছা করলে ঘরে ঢুকে ডাকতে পারত, কিন্তু কেমন সংকোচ লাগছিল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে এবার না ডেকে পারল না—অনুদি, মামাবাবু কিন্তু পাহাড়ের ঢালুতে নেমে গেছে!

অনু ভেজানো দরজা খুলে দিল। এবং স্মিতহাসি মুখে। স্নান শেষ। মৃদু সৌরভ শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল—তোমরা খেয়েছ অসীম?

—কখন! আপনার জন্য ধনঞ্জয় অপেক্ষা করছে।

—আপনি স্নান সেরে নিলেন? একটু থেমে অসীম এমন বলল।

—কি করি বল! বারান্দায় বের হয়ে দেখলাম মামাবাবু আর তুমি কি নিয়ে যেন ব্যস্ত। একেবারে হুস্ নেই। ফাঁকে স্নানটা সেরে নিলাম।

—ভাল করেছেন।

ধনঞ্জয় ডিমের পোচ, মাখন টোষ্ট এবং এক কাপ কফি রেখে গেল।

অসীম বলল, টোষ্ট অথবা পোচ লাগলে বলতে পারেন।

—আর কিচ্ছু লাগবে না। অনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে থাকল।

অসীম বলল, কাল রাতের কথা মনে পড়ছে।

খেতে খেতেই অনু বলল, কিছু কিছু।

—সবটা নয়?

—না। সবটা মনে পড়ছে না।

—না মনে পড়া ভাল। বলে অসীম হাতঘড়ি দেখল। তারপর যেখানে লালমতো বড় পাথরটা পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে সেদিকে তাকিয়ে বলল, আজ অনেক দূর হাঁটতে হবে।

—হাঁটব।

—চোখ মুখ কিন্তু বলছে বেশীদূর আপনি হাঁটতে পারবেন না।

—তুমি আমার চোখ মুখ দেখে তবে সব টের পাচ্ছ আজকাল।

—কিছু কিছু।

—সবটা নয়?

—না। সবটা পারি না।

—সবটা না পারলে বলোনা। কিছু জানা, কিছু অজানা অর্থাৎ আন্দাজের ওপর কোন এভিডেন্সই দাঁড়ায় না। আমি যে কি পারি, আর পারি না আমি নিজেই তা বলতে পারি না।

—কেন এমন কথা বলছেন?

—সব কথা এত শোনার আগ্রহ কেন।

—অসুবিধা থাকলে বলবেন না।

—সুবিধা থাকলেই কি সব কথা সকলকে বলা যায়? না বলা উচিত?

অসীম বলতে পারত, অনুদি আমি সব খবর রাখি। আমি বলতে পারি স্রোতের মুখে আপনি এখন ভেসে যাচ্ছেন। সমুদ্রে যাবার বড় বাসনা আপনার। দেখুন মামাবাবু আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারে কিনা, তবু দোহাই না, একটু খুলে বলাই ভাল।

সে বলল, আপনি আর মদ খাবেন না। প্রায় যেন অসীম আদেশ করছে।

—আদেশ? না অনুরোধ।

—আদেশ করতে পারলে ভাল হত।

—তুমিত দেখছি ছোকরা খুব পাকা হয়ে যাচ্ছ।

—আপনি কিন্তু অনুদি আমাকে সব সময় খুব ছোট ভাবেন।

—ছোট ভাবলে তুমি আমার ভালবাসার জনের অভিনয় করছ কি করে?

অসীম কি ভেবে চুপ করে গেল। অনুদির কি তবে আচ্ছন্নতা কাটে নি, কেমন শক্ত শক্ত কথা বলছে। অনুদি নিরীহ স্বভাবের মানুষ। ভিতরে ভিতরে জিদ বজায় রাখে। কাউকে কোনদিন সে শক্ত কথা বলতে দেখেনি। শুধু ওর উচ্চাশার এক পাখি চোখের ওপর নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। অসীম এবার ইচ্ছা করেই অন্য কথায় এল।

—ঠিক আছে এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন।

অনু কিন্তু তাড়াতাড়ি করল না। সে যেমন ধীরে ধীরে খাচ্ছিল, ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে ওর সেই কথার রেশ টেনে অসীমকে বলছে, কাল যখন খাব বলে বসলাম তখনত কিছু বললে না। তখনত বলতে পারতে অনুদি আপনি খাবেন না। নিজে খাচ্ছ, মামাবাবু খাচ্ছেন, আর আমি খেলে যত দোষ।

অসীম দেখল উত্তরটা না দিলে অনুদি ওকে অন্যভাবে নেবে। সে বলল, মামাবাবু আপনাকে বসতে অনুরোধ করেছে। আমরা এখন উভয়ে ওর হাতে। ওকে সন্তুষ্ট রাখাই আমাদের কাজ। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অন্তত আপনি কোন অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করবেন।

অনু ওর দিকে মুখ তুলে কি যেন দেখল মুখে। কিছু বলল না। কাপে শেষবারের মত চুমুক দিল। অসীম সে সব লক্ষ্য করতে

বলল, অবশ্য আমার একবার মনে হয়েছিল, টেবিলে তিনি আপনাকে একটু একমপেনি দিতে ডাকতে পারেন। তখনই উচিত ছিল আপনাকে ডেকে সাবধান করে দেওয়া, তারপর যেন কি করে সব ভুলে গেলাম।

—তুমি আমার জন্য এত চিন্তা কর অসীম!

—চিন্তা নয় অনুদি। আপনি মা হতে যাচ্ছেন। আপনি সুভাষবাবুর স্ত্রী। এ কথাটা সব সময় মনে হয়। সামান্য যা মান অভিমানের পালা চলছে, বই রিলিজ হলে সব কেটে যাবে। তখনত একটা নামই ঘুরবে মুখে মুখে। অনিমা দেবী, সুভাষ বাবুর অনু।

অনু হাসল। তুমি খুব বোকা, বলতে পারত। তুমি খুব আহাম্মক। তুমি জান না, যত আমার সোনার হরিণ ছুটবে তত মানুষটা পাগল বনে যাবে। সে এমন সব ভাবতেই ফের বিষণ্ণতা এসে ওকে ঢেকে দিল। ফের প্রীতির মুখ মনে পড়তে থাকল। প্রীতির সরল অনাড়ম্বর পোষাক, কি সুন্দর করে প্রীতি গোটা ঘরময় ওডিকলোন ছড়িয়ে সুভাষের পায়ের কাছে বসেছিল। অসুস্থ সুভাষের জন্য অনুর মনটা এখন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। হিংসা এবং অস্থিরতা ওকে গ্রাস করছে। প্রীতি ওর ঘর বর কেড়ে নিচ্ছে।

অসীম বলল, কি চলুন!

—হ্যাঁ চল।

যাবার আগে সে আর একবার আয়নায় নিজের মুখ দেখল। অসীম খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। অনুদির জন্য সে গাছপালা পাখি দেখতে দেখতে হাঁটছে। পাহাড়ের মাথায় ওরা দুজন হাঁটছে। নীচে দু একজন চাষী পরিবার এবং ইতস্তত গরু বাছুর চরে বেড়াচ্ছে। ওদের মাটির পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। কি যেন এই সব গাছ, সব নাম জানা নেই, বনলতা এবং ফুল ফলের ভিতর দিয়ে ওরা

পাথর থেকে পাথরে নেমে যাচ্ছে। অনু অন্য সময় হলে লাফিয়ে পার হত, কিন্তু এখন এ সময়ে লাফ দিতে নেই। সে সন্তর্পণে হাঁটছে, যেখানে লাফ দেবার কথা, লাফ দিয়ে অন্য পথটায় পড়লেই পথ সহজ এবং সংক্ষিপ্ত সেখানে সে ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে।

ওরা ঢালুতে নেমে দেখল মামাবাবু নেই। ইউনিটের লোকেরা যে যার কাজ নিয়ে প্রস্তুত। মামাবাবু নেই দেখে কেমন একটা রিলিফ অনুভব করল। ওদের দেরি দেখে তিনি নিশ্চয়ই চেঁচামেচি সুরু করে দিতেন। তিনি কোথায়? কে যেন বলল, উনি পাহাড়ের ওদিকটায় গেছেন। এখানে সব ঠিক, হঠাৎ কি মনে হতেই বলে গেছেন, না এখানে হবে না। তিনি ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে নীচের দিকটা দেখার জন্য ঘুরতে গেছেন।

অনু এ-সময় অসীমের দিকে তাকাল।

অসীম বলল, কিছু বলবেন?

—জানো অসীম মাঝে মাঝে আমার শার্লির মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ইচ্ছা হয়।

অসীম বলল, কথা ছিল পাহাড়কে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে শট টেক হবে। এখন তিনি যে আবার কোথায় গেলেন!

অনু, ওর কথায় অসীম গুরুত্ব দিল না বলে মনে মনে একটু রুষ্ট হল। সে আর কথা বলতে উৎসাহবোধ করল না। সে চুপচাপ একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে মাথায় কাপড় দিয়ে বসে থাকল। রোদটা মুখে এসে পড়েছে। অসীম বলল, দৃশ্যটা আসুন আমরা একবার মকশো করে দেখি।

অনু কোন উৎসাহ দেখাল না। অসীম বুঝি অন্য কাউকে বলছে এমনভাবে সে টেকনিসিয়ানদের ছুটোছুটি দেখছিল।

অসীম বলল, দেখছেন ঢালু পথটা। যেখানে পাথর আছে, সেখানে ছুটে গিয়ে আপনাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। আমি আপনাকে খুঁজে বের করব।

অনু কেমন ক্ষেপে গেল।—অসীম তুমি আমাকে খুব ছোট ভাবছ!

—কেন এ-কথা বলছেন। অসীম প্রায় জিবে কামড় দেবার মত ভঙ্গী করল।

—নয়ত এক কথা ক'বার বোঝাবে। মামাবাবুও মনে হয় একজন কচি খুকীকে বোঝাচ্ছেন। আমি সব বুঝি। তুমি তোমারটা বুঝে নাও।

অসীম আদৌ রুষ্ট হল না। সে সহাস্যে বলল, অনুদি ভোর থেকেই আপনি আমার ওপর রাগ করে আছেন।

—রাগ করব কেন? তোমার ওপর রাগ করব কেন?

—কেন আমার ওপর রাগ করলে আপনার চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

—জানি না যাও।

কি মেকাপ হবে, কেমন মেকাপ হবে, কখন হবে সব জানা থাকার কথা। মামাবাবু কেমন পাগলাটে মানুষ, না কি অস্থিরচিত্ত এক পুরুষ তিনি, নিজেও জানেন না কি করছেন। কাহিনী আপন মহিমায় এগিয়ে যাক, যেমন খুশি পাত্রপাত্রীরা অভিনয় করবে, শুধু তিনি ঘটনাটা বুঝিয়ে দেন। এখন আনি সে, অনু নয়। আনির অভিনয় করতে হবে। আনি সেই এক যুবতী—যার জীবন অনুকে অভিনয় করতে হবে। যার বৈধব্য জীবনে জারজ সন্তান পেটে নিয়ে ঘোরাঘুরি এবং রহস্যময় এক হাতছানি সব সময়—কে যেন তাকে ক্রমে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! অনু আজ ক'দিন থেকেই আনির জীবন ফুটিয়ে তুলবে বলে কেমন বিষণ্ণ একঘেয়ে একাকী এবং কিছুই ভাল লাগছে না তার, অনু এমন সব ভাবতে ভাবতে মাথার ঘোমটা ফেলে দিল। মামাবাবু উঠে আসছেন। অনুকে তাঁবুর ভিতর ঢুকে যেতে হল। লম্বা চোখ এঁকে দেবে, চুল ববকাটা করা হবে, পোশাক মিহি এবং পাতলা এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে

আগুন জ্বালিয়ে যখন সেই ঢালু উপত্যকাতে নেমে এল তখন যেন এক পলাশ ফুলের গাছ জীবন পেয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটেছে। হাজার ফুল দুঃখ এবং হতাশার প্রতীক চিহ্ন হয়ে ঝরে পড়ছে উপত্যকাময়। ক্যামেরাতে এক দুই করে হাজার ছবি উঠে যাচ্ছে।

অনু এই শরীর নিয়ে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটছে! না না এতটা না ছুটলেও চলবে। শরীরে আগুন জ্বালিয়ে ছুটছে। তুমিত এখন পীয়ের অসীম। তোমার কিসের অভিনয়? তোমার মাথায় ফেল্ট ক্যাপটা এখন বাতাসে উড়ে যাবে, তোমার পায়ে হরিণের শব্দ থাকবে, তুমি এক হরিণীর পিছনে ছুটছ মনে রাখবে। অভিনয়ে তোমরা এখন পলাতক হরিণ হরিণী হয়ে যাবে। অথবা আনি তোমার সেইসব অভিনয়ের দৃশ্যগুলি মনে থাকবে না! তুমি তখন সমুদ্রতীরে ঘর বেঁধেছ। ঘন বার্চের অন্ধকারে তুমি কোন না কোন যুবকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে—কারা যেন তখন তোমার চারপাশে কাঁকড়ার মত হেঁটে এসে ঘিরে ধরছিল—তুমি ক্ষত বিক্ষত হতে হতে সন্ন্যাসিনী হবার জন্য সমুদ্রে ডুব দিতে চাইলে।

মামাবাবু চীৎকার করে উঠলেন, সাবাস। গ্র্যাণ্ড। সি ই'জ সো···ও···ও না···ই···স। সো বিউটিফুল।

অসীম প্রায় পায়ের কাছে পড়ে আছে। ফিস ফিস করে বলল, অনুদি আপনি নিজেকে দেখুন।

অনু বলল, আমি আমাকে বড় বেশী ভালবাসি অসীম।

—এত ভালোবাসা ভালো নয়।

—আমি আমাকে কেন এত বেশী ভালবাসি!

মামাবাবু বললেন, কাট।

অনু এবং অসীম উঠে এল। কোথাও যেন এখন পাখিরা ডাকছে। তাদের কূজন ধরা পড়ছে। যবে হরিণ ছুটছিল হরিণীর

পিছনে পায়ে পায়ে শব্দ। কারা যেন বনে বনে কূজন করে বেড়াচ্ছে। এই সব শব্দ ধরা আছে কিনা কে জানে! অনু এবং অসীম ফেরার সময় কথাটা ভাবল।

অসীম বলল, অনুদি আমাদের বড় দূরে যাবার বাসনা।

অসীম বলল, অনেক দূরে চলে যেতে ভালোবাসি। বড় ভালোবাসি গাছ ফুল পাখি দেখতে।

অসীম বলল, দেখুন, দেখুন।

অনু চোখ তুলে তাকাল। পাহাড়ে কি সব ফুল ফুটে আছে, লাল নীল হলুদ রঙের ফুল। এক ঝাঁক পাখি সেদিকে উড়ে যাচ্ছে। ওরা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন পর্দায় ছবি চলতে চলতে স্টিল হয়ে গেছে। ওরা পরস্পর বড় কাছাকাছি, অথচ বড় দূরে চলে যাবার বাসনা। সেই নির্জন নিঃশব্দ পাহাড়ে কেবল ওদের এখন ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা হল। অথচ ওরা নড়তে পারছে না। কেমন ক্রমে পরস্পর পাথর হয়ে যাচ্ছে। পাথরের মানুষ হয়ে এই পাহাড়ের এক গোপন গুহার ভিতর ঢুকে আবহমানকাল বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু দূরের পাহাড়ে বিচিত্র সব ফুল ফলের গাছ দেখে ওরা যথার্থই আর নড়তে পারল না। পাহাড়ের মাথায় পাথরের মানুষ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকল। এখন দেখলে মনে হবে ওরা পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ঝর্ণার জল পড়তে দেখছে অথবা তার শব্দ কান পেতে শুনছে। ওদের আর কিছুতেই মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না।

সুভাষ আজ খুব সকাল সকাল উঠল। হাতে তার অনেক কাজ। সে উঠেই দরজা জানালা খুলে দিল। ব্যালকনিতে কিছু

দুর্লভ ফুলের গাছ আছে টবে। সে অন্যদিন সকালে উঠেই টবে জল দিত। আজ মনে হল জল দিয়ে আর কি হবে। গাছগুলো সে রামকে দিয়ে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু রাম নিয়ে রাখবে কোথায়। একটা কাঁটা জাতীয় গাছ টবে, সে দেখল, একটা সাদা রঙের ফুল। এই গাছটায় সে অনেকদিন থেকে ফুল ফোটাতে চেয়েছে, বিশেষ করে অন্নু চলে যাবার পর থেকে তার যখন কিছুই ভালো লাগত না, তখন ব্যালকনিতে বসে সে এই ছোট্ট লতানে ফণিমনসার মতো গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকত, কেবল মনে হত গাছটায় এখুনি ফুল ফুটবে অথবা সে বার বার উঁকি দিয়ে দেখেছে ফুলের কোন কলি বের হয়েছে কিনা, এইসব কাঁটা জাতীয় গাছে কদাচিৎ ফুল ফোটে, সে মনে মনে ভেবেছিল, আজ হোক কাল হোক গাছটাতে ফুল ফুটবে। অনেকদিন সকাল বেলাতে দরজা খুলেই ওর চোখ এই টবটার ওপর পড়ত, পড়লেই সে খুঁজত, কোন ফুল ফুটেছে কিনা।

আজ সে অবাক। যখন সব ছেড়ে ছুড়ে সে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছে তখন গাছটা একটা ফুল ফুটিয়েছে। সে গাছটার পাশে বসল, কি যেন নাম, এইসব গাছের নাম প্রীতির মুখস্থ। সে এই গাছটা এনেছিল, মাসুদি সাবের বাগান থেকে। মাসুদি সাব বলেছিলেন, গাছটা সুদূর ইথোপিয়া থেকে সে আনিয়েছে। গাছটার বৈশিষ্ট্য, ওর যে কোন পাতা, ডাল অথবা মূল রোপণ করলেই সে জন্মায়। গাছটা নীল রঙের। পাতাগুলো লাল. রঙের। কাঁটাগুলোর হলুদ বর্ণ। সাদা রঙের ফুলটা এত সুন্দর লাগছিল যে সে কিছুক্ষণ টবটার পাশে উবু হয়ে বসে থাকল। মনে থাকল না, কিছুক্ষণ পর নীচে একটা ট্রাক এসে দাঁড়াবে। সে তার সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছে। অন্নুর কোন চিহ্ন নিয়ে সে যাচ্ছে না। এমন কি সে যে আজ চলে যাচ্ছে, রাম যে তার বিশ্বস্ত মানুষ, প্রীতি যে তার সব দিয়ে অন্নুর দুঃখ ভুলিয়ে রাখার

চেষ্টা করছে—তারা পর্যন্ত জানে না। আজ জানবে। রাম যখন এসে দেখবে, বড় ট্রাক এসেছে একটা, খাট, আলমারি, এবং অন্য সব তৈজসপত্র গাড়িতে তোলা হচ্ছে তখন রাম অবাকের চেয়ে বেশী আঘাত পাবে। সে, প্রথম কিছু বলতে পারবে না। পরে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেবে। অনুর বাবাকে ফোনে জানাবে না, কারণ রাম জানে সুভাষের এই চলে যাওয়া, অথবা সুভাষ কি করছে, রাত করে বাড়ি ফিরলে, মদ্যপান করে বেহুঁস হলে পর্যন্ত সে চায়না ও-বাড়ির মানুষেরা তার সম্পর্কে কিছু জানুক। আর যখন দেখবে সবাইকে না জানিয়ে, না বলে এমন একটা কাজ করেছে সুভাষ, তখন সে কেবলমাত্র প্রীতিকে ফোন করতে সাহস পাবে। প্রীতি এসে একটা সিন ক্রিয়েট করতে পারে ভাবতেই মনে হল সাদা রঙের ফুলটা কেমন নীল রঙ ধারণ করেছে।

বস্তুত এই ফুলটা, যদি ফুল কোনদিন ফোটে, মাসুদি সাব বলেছিলেন ফুলের কোন নিজস্ব রঙ নেই চ্যাটার্জী। সকাল থেকে যত রোদ বাড়বে ফুলটা তত রঙ ক্রমে পাল্টাবে। পাল্টাতে পাল্টাতে ঠিক সূর্য অস্ত গেলে রঙটা আবার সাদা হয়ে যাবে। সারা রাত আশ্চর্য সাদা রঙ নিয়ে ফুলটা ফুটে থাকবে। মনেই হবে না খুব সকালে, ফুলটা ঝরে যাবে। ফুলের আয়ু একদিনের। এই একদিনেই সে নানারকমের রঙ নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। ফুলটা ঝরে গেলে গাছটাও মরে যাবে।

এই একটা ফুল ফোটাবার জন্য গাছটা এতদিন বেঁচে থাকে মনে হতেই সুভাষের মুখটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। অনুর পেটে ওর জাতক! অনু চলে গেছে কোন ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশনে, সেখানে ওর স্যুটিঙ শেষ হবার মুখে প্রীতি বলেছিল, অনু ওর শিয়রে এসে বসেছিল, তারপর সে কি বিড় বিড় করে বকতে থাকলে অনু উঠে চলে গেল। সুভাষ কি তবে স্বপ্নের ভিতরেও প্রীতির কথা বলেছে! প্রীতির সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে কথা বলেছে।

সুভাষ ভাবল, না তা নয়, বস্তুত অনু ছল খুঁজছে। এই ছল সে চিরদিন খুঁজে আসছে। ওর মদ্যপান, বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকা, এবং এমন সরল মানুষের ভিতর এক অসামান্য অভিমান ক্রমে আগুনের মতো অথবা পাহাড়ের মতো বড় হয়ে উঠলে সে স্থির থাকতে পারে না— সে যা তা করে ফেলে। অনুর এ সব বোঝা উচিত। সে উঠে দাঁড়াল। রাম এক্ষুনি চলে আসবে। এসেই বাজার থেকে কি আসবে, ফর্দ চাইবে।

সুভাষ ঘরে ঢুকে আজ শেষবারের মতো সব কিছু দেখল। অনুর ঘর। অনু নিজের মতো সাজিয়েছে। ওর বসার ঘরটাতে এসে দেখল, রেডিওর ওপর সেই ঢাকনাটা তেমনি আছে, লতাপাতা দিয়ে একটা আশ্চর্য রকমের ঝালর তৈরী করেছিল অনু। অনু নিজে পছন্দ করে ছোট্ট এই টেবিলটা কিনেছে, টেবিলটা এত পালিস করা যে সুভ প্রায়ই যেন ওর মুখ দেখতে পায়। দেয়ালে ওদের ছবি, নানা বয়সের এবং নানা জায়গার। কোন পাহাড় শীর্ষে অথবা নদীর পারে, অথবা কোন মাঠের পাশে এক চাষী মানুষ, তার স্ত্রী এসেছে নাস্তা নিয়ে। সে সব্বাইকে নিয়ে ছবি তুলেছে। সবচেয়ে সেই দামী ছবিটা, বিয়ের সময় যে ছবি তুলে একটা মানুষ ভরপেট খেয়ে গেল এবং পুরো একশো টাকা বখশিস নিয়ে গেল। চোখে মুখে ভালবাসার তৃষ্ণা ধরা ছিল। অনুর চোখে স্বপ্ন। অনু যেন সুভাষকে দেখে চোখ খুলতে পারছে না। মাতাল অথবা বলা চলে চোখে মুখে আবেশ। এত বেশী আবেশ ছিল চোখে মুখে যে সুভাষ, বিয়ের রাতেই পাগল হয়ে গেছিল। একটা কিছু করে ফেলত, কিন্তু অনু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যেন বলা শুভরাত্রি না এলে কিছু করতে নেই। ফুলের ভিতর ডুবে যাব, ডুবে গিয়ে জলপান করব। সুভাষ সেই ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। যেন এই ছবিতে অনু ওকে দেখছে। দেখে দেখে বলছে, সুভাষ কি দেখছ আমার চোখে, আমি কতদূরে যেতে পারি দেখছ! বলেই যেন মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

সুভাষ বলল, আমি তোমাকে দেখছি অনু, তুমি আমার অনু। আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানিনা। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। প্রীতিকে নিয়ে বেশ ছিলাম। কিন্তু কেন জানি যতই প্রীতি আমাকে সব দিক, আমার কেন জানি সব সময় এসব ভাল লাগে না। প্রীতি এত বড় এবং কুৎসিত…এমন যেন বলার ইচ্ছা হল। পরে আবার কি ভেবে বলল, না অনু, প্রীতির মতো মেয়ে হয় না। আমি জানি, আমি এই সহর ছেড়ে চলে গেলে প্রীতি কেন জানি ভেবে নিয়েছে, আমি তার, তোমার নয়। প্রীতিকে দেখলে এখন তোমারও কষ্ট হবে। প্রীতি আমাকে সব দিয়েও যেন কিছু দিতে পারেনি।

ছবির মুখটা এবার মুচকি হাসল।—আমি বেশ আছি। পেটে আমার তোমার জাতক। আমার বড় বড় ছবি কাগজগুলোতে আর দুদিন বাদে বের হবে, তুমি সহ্য করতে পারবে না বলে এই সহর ছেড়ে নিরিবিলি জায়গায় চলে যাচ্ছ। তুমি ভীতু, তুমি কাপুরুষ।

রাম এসে সব কিছু দেখে শুনে কেমন বোকা বনে গেল। ট্রাকে সব উঠে যাচ্ছে। কোত্থেকে সব লোকজন এসেছে, ওরা ঘর থেকে সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাবু বারান্দায় চুপচাপ বসে আছেন। একটা পত্রিকাতে মুখ ডুবিয়ে রেখেছেন। সে একবার ভাবল বলবে, এ সব কি হচ্ছে। কিন্তু মুখের দিকে তাকাতেই দেখল কেমন দুঃখে বনবাসী হবার মতো মুখ। সে ডাকতে পারল না। পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

সুভাষ টের পেয়েছে, রাম এসে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিনের এই সঙ্গী মানুষটা যে আশ্চর্য হয়ে গেছে, আশ্চর্য হয়েছে বললে ভুল হবে, কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে, পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে সুভাষ কেমন সামান্য পুলক বোধ করল, কি দেখছিস রাম, তোর মা মণির সব নিয়ে চলে

যাচ্ছে, আমি কোন স্মৃতি রাখতে দিচ্ছি না। তুই কি রাম শিয়ালদার মোড়ে বড় একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিস, কেমন তোর মা মণি হাল্কা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দর মুখে, কি লাবণ্য! ওপরে একটা পাইন জাতীয় গাছ, গাছের নীচে সেই যুবক অসীম, চোখে ভালবাসার আবেগ। ওরা মনে হয় যেন কোন পাহাড়ের মাথায় ছুটে বেড়াচ্ছিল —এমন এক ছবি, তুই দেখিসনি। সুভাষ বড় বড় বিজ্ঞাপনে অন্নুর ছবি দেখে কেমন পাগল হয়ে যাচ্ছে। যেন সারা শহরময়, সে যেখানে আছে চোখ তুলে তাকালেই অন্নু বিজ্ঞাপনের ভিতর থেকে মুখ তুলে হাসছে।

রাম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সাত আটজন লোক বড় আলমারিটা বের করবার জন্য টানছে। এমন কি নীল পর্দাগুলো ওরা ভাঁজ করে রাখলে। খাট টেনে নিয়ে নিচে নামিয়েছে। ওয়ার্ডরেব বাইরে বের করে রেখেছে। নানা রকমের কাচের বাসন প্রিয় ছিল অন্নুর, সে সবও নিচে নিয়ে গেছে। একটা কাচের বাসন ভেঙ্গে বাড়িময় কেমন হাহাকার শব্দ তুলে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। রাম দুহাতে কান বন্ধ করল, পারলে সে চোখ বন্ধ করে রাখতে চায়। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-সব আর দেখতে পারছে না। সে ডাকছে, বাবু।

—বল। সুভাষ কেমন ক্লান্ত গলায় উত্তর করল।

—সব বিক্রি করে দিলেন।

—বিক্রি করে দিলাম। তোর কষ্ট হবে জানি।

—এ বাড়ি ছেড়ে দেবেন?

—কাল থেকে আমরা আর এ-বাড়িতে থাকছি না।

—কোথায় যাবেন।

—কোনদিকে চলে যাব। তোকে কিছু টাকা দিয়ে যাব। ঐ দিয়ে যা হয় কিছু একটা করতে পারবি। চায়ের দোকান টোকান দিবি। আর গোলামি করিস না।

পুরে গাড়িতে উঠে বসল। সোজা সুভাষের বাসায় চলে এল। এবং সিঁড়ি ভাঙার সময় মনে হল কোথাও যেন কাচ ভাঙার শব্দ। কে যেন ছুটে যাচ্ছে। দরজা জানালা বন্ধ হচ্ছে। প্রীতি, দ্রুত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে উঠে গেল। আশ্চর্য এখনও রাম ফেরে নি। ট্রাকটা চলে যাচ্ছে। ঘরের ভিতর ঢুকে সে দেখল সব খালি। কোথাও কিছু নেই। শুধু একটা সতরঞ্চির ওপর স্যুটকেশ এবং রেডিও। জানলার পাশে সুভাষ দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ! প্রীতির জুতোর শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছে না। কেবল ব্যালকনিতে টবের ভিতর সেই একটা নীল রঙের ফুল, যখন যে রঙ থাকার কথা তেমনি রঙে ফুটে থাকছে।

প্রীতি বলল, এসব কি আরম্ভ করেছেন?

মানুষটা জানালা থেকে মুখ তুলল না। ঘরে প্রীতি এসে গেছে, প্রীতি আসবে সে জানত। কারণ রাম আর কাউকে খবর না দিক, প্রীতিকে দেবেই। তবু মনে মনে সে প্রীতির উপস্থিতি চায় নি। প্রীতি এলে সে দুর্বল বোধ করবে। এই ঘরে অনুর মতো এখন প্রীতি। তার কাছে সব সে পাচ্ছে। শরীরের সুখ দুঃখ এবং আশা আকাঙ্ক্ষা অথবা বলা যেতে পারে প্রীতি অতি অমায়িক খচ্চর, আর কি বলা যায়, রাগ হলে বলা যায় যেন তুমি প্রীতি আমাকে সেই এক, বার বার এনজেল মাছ দেখিয়ে কাবু করতে চাও, তুমি আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চাও, তুমি এলে আমি আর অনুর মুখ মনে আনতে পারি না। বস্তুত প্রীতি, আমার বলতে কি দোষ, আমি জানি, অনু আমার সব চুরি করে নিয়ে গেছে, তুমি প্রীতি কি আর দিতে পার!

প্রীতি কাছে গেল না। সে পিছন থেকে কেবল মানুষটাকে দেখছে। দুপাশের দরজা জানালা বন্ধ। রাম নেই। রাম এলে সিঁড়িতে শব্দ হবে। মানুষটা কত লম্বা! আর চোখ মুখ কেমন দেখাচ্ছে এসব ভাবল। মানুষটা এখন যাবে কোথায়, কি ভেবে এমন পাগলের মতো একাকী দাঁড়িয়ে সকালের সূর্য দেখছে! সে ডাকল, কী, আমি যে কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন না?

সুভাষ এবারেও মুখ তুলল না। বস্তুত সুভাষ মুখ ফেরালেই যেন প্রীতির কাছে ধরা পড়ে যাবে। ওর চোখে মুখে নিদারুণ কষ্টের ছাপ। নিদারুণ হতাশা। এই বড় শহর ওকে পাগল করে দিচ্ছে। কোন নির্জন পল্লীতে অথবা নদী পার হলে এক পাহাড়, ছোট্ট পাহাড় ঘেঁষা গ্রাম, গ্রামের কি নাম সে জানে না, তার মনে থাকে না, ওর নোট বইয়ে ঠিকানা লেখা আছে, শহর থেকে অনেক দূরে, এক অপরিচিত জায়গায় সে চলে যাচ্ছে। সামান্য শিক্ষকতার কাজ। সে সেখানে গেলেই বুঝি এইসব বড় বড় বিজ্ঞাপনের ছবি তাকে তাড়া করতে পারবে না। গ্রামের মানুষ একটা হাইস্কুল করেছে। শিক্ষকের বড় অভাব। দারিদ্র্য গ্রামে ভীষণ। পাহাড় পার হলে হ্রদ আছে। ছোট্ট এক শিবের মন্দির। পাশে বড় রাস্তা চলে গেছে। সে মনে মনে তেমন এক জগতের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। প্রীতির কথায় তার কোন সাড়া দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

প্রীতি বুঝল মানুষটাকে নানা রকমের প্রশ্ন করে বিব্রত করে লাভ নেই। সে এ ক'মাসেই যেন মানুষটাকে চিনে ফেলেছে। বড় একগুঁয়ে। অনুর একটু বুঝে চলা উচিত সে এখন ভাবল। ক্রমে পরস্পর ওরা দূরে সরে যাচ্ছে। সে একটা চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু সুভাষবাবু ওর শরীরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। যখন সূর্য অস্ত যায়, বর্ষা নামে, এবং একা একা ভাল লাগে না, ছুটি, কাজ থেকে ছুটি, বাবা মা উপাসনার জন্য মন্দিরে গেছেন, বাড়ির ভিতর রেকর্ড প্লেয়ারে নানা রকমের উদ্দীপক গান বাজনা, তখন প্রীতি স্থির থাকতে পারে না। ভিতরটা পাগল পাগল লাগে। নিভৃতে সে ফোনে জানায়, কি সুভাষবাবু এমন বর্ষার দিনে একটু নদী পার হলে হয় না! নদী পার হবার খবরে সুভাষের জ্ঞান গম্যি থাকে না। সুন্দর করে সাজ পোশাক, একেবারে রাজপুত্র হয়ে সে প্রীতির গলার কাছে মুখ নিয়ে ধীরে ধীরে তারপর কি যে করতে থাকে ঠিক যেন এক অতিকায় বাঘ শিকার নিয়ে খেলা করতে থাকে,

সুভাষ প্রীতিকে নিয়ে তেমনি খেলায় মেতে যায়। আর খেলা সাঙ্গ হলে সুভাষ ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ। সে সোফাতে বসে কেমন এক অসহায় যুবকের মতো বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে থাকে। প্রীতি বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে এলে বড় কষ্ট হয়। ভিতরে সেই ভালবাসা, ওর শরীর দিয়ে, এবং ভালবাসা দিয়ে মানুষটাকে অনুর কথা কিছুতেই ভুলিয়ে দিতে পারল না। এবং যখন এই সুন্দর বিকেল, অথবা সাঁজবেলা যার শরীর কানায় কানায় ভরে ওঠে তখনই কেবল সুভাষকে মনে হয়। সিংহের মতো, শক্ত সমর্থ মানুষ। অনু না হলে জীবনে তার কিছু আসে যায় না—কিন্তু পরে প্রীতি দেখেছে, মানুষটা যেন বালিয়াড়িতে কি হারিয়ে ফেলেছে, তন্ন তন্ন করে তা আর খুঁজে পাচ্ছে না। কেবল বিষণ্ণ চোখে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রীতির আর সামর্থ্য নেই।—তুই অনু, মানুষটাকে ছেড়ে থাকিস না। তুই অনু তোর ঈগল পাখিকে এবার হাওয়ায় উড়িয়ে দে। ফিরে আয়। মানুষটি তোর ভালবাসাতে মরে গেল।

প্রীতি ধীরে ধীরে ডাকল, সুভাষ বাবু। খুব আপনজনের মতো স্নেহের গলায় ডাকল।

সুভাষ এবার ঘুরে দাঁড়াল। চোখ মুখ থম থম করছে। যেন এই মাত্র মানুষটি জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। বলল, কিছু বলছেন?

—আপনি চলে যাচ্ছেন?

—যাচ্ছি।

—একবার জানতে পারলাম না।

—আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমি জানি আপনি কষ্ট পাবেন।

—আপনি থেকে যেতে পারেন না।

—কি হবে?

—আমরা এক সঙ্গে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব।

—হয় না।

—ইচ্ছা করলেই হয়।

—আমরা, সব ইচ্ছা করলেই পারি না প্রীতি। আমার কিসের অভাব বলুন প্রীতি। আপনি তো অন্নুর যাবতীয় কর্তব্য করে যাচ্ছেন, তবু কেন এই সব গাছপালা পাখির ভিতর, রাস্তার ওপরে, দেয়ালে এবং বড় বড় ফ্রেমে অন্নু এবং অসীমের বিজ্ঞাপন দেখলে কেন আমি পাগল হয়ে যাই, কেন আমি স্থির থাকতে পারি না বলতে পারেন! বলেই সে কেমন যেন ভাবল, বক্তৃতা দিয়ে ফেলছে। উচ্ছ্বাসে সে এত কথা বলে যাচ্ছে। বস্তুত সেই সিন ক্রিয়েট করছে। সে বলল, এবার ভাবছি ভারতবর্ষ দেখব।

—তার মানে আপনি ভ্রমণে বের হচ্ছেন।

সে এড়িয়ে গেল, সে কোথায় যাচ্ছে এড়িয়ে গিয়ে এই যেন সময় বলার, হ্যাঁ প্রীতি একটু ঘুরে বেড়াব। এই শহর বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। কবে ফিরব ঠিক নেই। তাই এ-সব বিক্রি করে দিলাম। আদৌ ফিরব কিনা তাও জানি না।

—ও-বাড়িতে খবর দিয়েছেন?

—ওরা তো আমার খবর নেয় না প্রীতি। ওদের খবর দিয়ে কি হবে। খবর দিলে শুধু একটা নাটক হতে পারে।

—সুভাষবাবু, এইটুকু বলে সে বেডিংটার উপর বসে পড়ল।

সুভাষ তাকাল। প্রীতির চোখ ছলছল করছে।

—কবে ফিরবেন।

—ঠিক নেই প্রীতি। শেষে বলেছিল, প্রীতি, আদৌ ফিরব কিনা ঠিক নেই।

—আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

—কি লাভ বলুন।

—লাভ কি জানি না। তবু এখন মনে হচ্ছে আমার, কেন জানি মনে হয়, আপনার জন্য অপেক্ষা করতে ভাল লাগবে।

—আমি আপনাকে বাধা দেব না। তবে অনু যদি ফিরে এসে বলে, আপনি কোথায়, কি বলব ?

—কোনদিন সে আর এসে বলবে না।

—তবে আপনি কার ওপর অভিমান করে তীর্থযাত্রায় বের হচ্ছেন !

—আমার জানা নেই প্রীতি, আমি যে কার ওপর অভিমান করে চলে যাচ্ছি সে যেন নিজেও বুঝতে পারছি না। আমার বস মাসুদি সাব বললেন, তোমরা বড় সেন্টিমেণ্টাল জাত। তোমার বাপু বাঙ্গালিদের কিছু হবে না। কিন্তু আমি জানি, এই সংসারে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

ঠিকই বলেছেন। আপনার উচিত এখন খুব খুশী থাকা।

—তা হলে যে অভিনয় হবে প্রীতি।

—না হলে অন্য কি উপায় বলুন। অনু এলে যখন শুনবে আপনি কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন, কোন কিছু ঠিকানা রেখে যাননি তখন সে মনে মনে আপনাকে করুণা করবে। বলেই প্রীতি কেমন অবাক হয়ে গেল। যেন নিজেকে ছোট করে দিল সুভাষের কাছে। এমন বললে সুভাষ আরও অনুর প্রতি অধিক জিদ পোষণ করবে। সে এতক্ষণে বুঝতে পারল ভিতরে ভিতরে ওরও এক প্রতিহিংসা পরায়ণ মন এই মানুষের সামনে জেগে উঠছে। তার সব দিয়েও মানুষটাকে আটকে রাখতে পারছে না। সে এবার সহজ হবার ভঙ্গীতে বলল, সুভাষবাবু, যেখানেই থাকবেন, কথা দিন চিঠি দেবেন ! সে ইচ্ছা করেই আর অনুর প্রসঙ্গ টেনে আনল না।

সুভাষ রামকে ডেকে কিছু টাকা দিল। ওকে বলল, রান্না বান্না করার দরকার নেই রাম। আমি বরং হোটেলে খেয়ে নেব।

প্রীতি বলল, হোটেলে কেন আমি থাকতে।

—এ-অসময়ে আপনাকে জ্বালাতন করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

—এ-দিনটা যত খুশী আপনি আমাকে কষ্ট দিন সুভাষবাবু।

আমি আপনাকে অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু কিছুই বলব না। কারণ আমার ধরে রাখার শক্তি অথবা অধিকার বলতে পারেন, কানাকড়িও নেই। অনুর ওপর আমার রাগ হচ্ছে। আরও যেন ওর কত কিছু বলার ইচ্ছা। কিন্তু কিছু বলতে গেলেই গলা ভারি হয়ে উঠছে। খুব একটা অনুনয় বিনয় করলে, কিংবা সে ভেঙ্গে পড়লে মানুষটা ওর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে, এমন কি থেকেও যেতে পারে, কিন্তু এই মানুষ এই শহরে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। দিন দিন সে কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। অনু এবং অসীমের ছবি, আশ্চর্য সেই মামাবাবু অসীমের, পরিচালক মানুষ তিনি, প্রায় দুমাসে সব কাজ সেরে ফেলেছেন। গিয়েছিলেন পাহাড়ী অঞ্চলে তিনদিনের সুটিঙ হবে বলে, তারপর মানুষটার পটভূমি এত ভাল লেগে গেছে যে প্রায় কাজ সেরেই ফিরছেন। তারপর আবার কিছুদিনের জন্য ওরা কোথায় গেছে, সেও এক পাহাড়ী জায়গায়। বোধহয় ইতিমধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলবে। বড় বড় বিজ্ঞাপন পড়ছে হোর্ডিং-এ। রাস্তায় চলা যাচ্ছে না। অনু এত হাল্কা পোশাক ব্যবহার করেছে যে তাকানো যায় না। এত বেশি আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আছে যে সুভাষ দেখলেই কেমন অস্থির হয়ে যায়। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, সে যেন পারলে হত্যা করার জন্য তখন ছোটে। আমার রিভলবারটা কোথায় প্রীতি? এমন প্রশ্নও সে ইতিমধ্যে দু একবার করেছে। রিভলবারটা যে সুভাষের অজ্ঞান অবস্থায়, অর্থাৎ সুভাষ যদি এমন বেহুঁস হয়ে না পড়ে থাকত তবে রিভলবার হাতছাড়া হত না। প্রীতিরও ইচ্ছা ছিল, ওটা হাতছাড়া হওয়াই ভাল। সুতরাং প্রীতি যেন এমনই চাইল, সুভাষ কিছুদিন দূরে গিয়ে বসবাস করুক। এমন ছবি সেখানে থাকবে না, সে অন্তত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

প্রীতির সঙ্গে সুভাষ দুপুরটা কাটাল। প্রীতি সুন্দর করে আজ একটা সাদা গরদ পরেছে। পরিবেশন করার সময় এত আন্তরিক

ছিল যে সুভাষ মাঝে মাঝে প্রীতির দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে। থাকতে থাকতে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠেছে, আর জন্মে প্রীতি আপনি আমার টুকটুকে বৌ ছিলেন, আপনার চোখ দেখলে কেবল এমন মনে হয়।

প্রীতি কোন জবাব দিল না। ভিতরে ভিতরে যে সে মানুষটাকে এত বেশী ভালবেসে ফেলেছে এই যেন প্রথম অনুভব করতে পারল। সে যে এমন অসহায় আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। মানুষটা কত বড় চাকরি করত, কত সুনাম তার, সেই মানুষ সব ফেলে চলে যাচ্ছে। প্রীতির আজ কেন জানি কোন চপলতা প্রকাশ পেল না। খেতে বসে শুধু বলল, সুভাষবাবু আমি যাব ট্রেনে তুলে দিতে?

—চলুন। কিন্তু দোহাই চোখে জলটল থাকবে না। ও-সব আমি একেবারে দেখতে পারি না।

—সত্যি বলছি, চোখে জলটল থাকবে না।

—সত্যি যদি বলে থাকেন তবে যাবেন।

বস্তুত প্রীতি খেয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। এবং যতটা পারল জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে শক্ত করে রাখল। এই ক'মাসে মানুষটা যে তার নয়, অন্যের, সে যে মানুষটার ওপর এ ক'মাস নিজের মানুষের মতো ব্যবহার করতে গিয়ে খুবই ভুল করে ফেলেছে—এখন যেন সে তা ধরতে পারছে। জানালার ও-পাশে পথ, এবং পথ পার হলে পার্ক, নীল রঙের গাড়ি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, সূর্য মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে, বর্ষার দিন এলে সূর্য ঢেকে যায়, এবং এক অন্ধকার থাকে শুধু। প্রীতি এই নির্জন নিঃসঙ্গ জানালায় দাঁড়িয়ে সামান্য সময়ের জন্য ছেলেমানুষের মতো কাঁদল। সে নিজেকে কিছুতেই শক্ত করে রাখতে পারল না!

সুভাষ সহসা ঘরে ঢুকে সব দেখে ফেলল।—এই মেয়ে এসব কি হচ্ছে!

—কি হচ্ছে আবার?

—সব যে দেখে ফেললাম।

—যা কি দেখলেন! বলে প্রীতি চোখের ওপর শাড়ির আঁচল চাপা দিল।

—প্রীতি। সুভাষ কোমল গলায় ডাকল।

—বলুন।

—সংসারে আমরা যে কি চাই বুঝিনা।

প্রীতি উত্তর করল না।

—আপনি একজন ভাল মানুষকে ভালবাসুন।

প্রীতি এবারও নীরব থাকল।

—আমার মতো বাউণ্ডুলে মানুষ হয় না প্রীতি।

প্রীতি এবার চোখ তুলে তাকাল।

—বলুন কবে হচ্ছে।

—আপনি যবে বলবেন।

—ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে। খুব বড় ভোজ দিতে হবে।

—আপনার যদি এমন ইচ্ছা থাকে তবে তাই হবে।

সুভাষ এবার বলল, খুব লোভ হচ্ছে।

প্রীতি বুঝেও নীরব থাকল! সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিন্তু সুভাষের কেন জানি মনে হল, না আর না। এ-ভাবেই ভিতরে দুর্বলতা আসে। সে বলল, এবারে যাব প্রীতি।

ওরা একসঙ্গে গাড়িতে পথে বের হয়ে এল। প্রীতিই গাড়ি চালাচ্ছে।

সুভাষ বলল, আপনাকে একটা ফুল দিয়ে যাব। বলে সেই ফুলটা, ফুলটা এখন নীল রঙের, হাতে নীল রঙ দিয়ে বলল, গাছটা আপনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন। ফুলটার সঙ্গে আমার জীবনের একটা কোথায় যেন মিল আছে প্রীতি। ভেবেছিলাম সেই অর্কিডে কোনদিন ফুল ফুটবে না। কিন্তু আজ যাবার সময় দেখছি ফুল ফুটেছে। টবটা এনে এবার আপনার বাগানে রাখুন। প্রতীক্ষা করে দেখুন

ফুল ফের ফোটে কিনা। ফুটলে আমাকে একটা চিঠি দেবেন। তখন আমি চলে আসব।

রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। সুভাষ ট্রেনে জানালার ধারে বসেছিল। নিয়োগপত্র এবং সঙ্গে একটা চিঠি। কোন স্টেশনে নামতে হবে, তখন কটা বাজবে, কোন গাছটার নিচে ওর জন্যে একটা বয়েলের গাড়ি থাকবে, সব ঠিকঠাক লেখা। সুতরাং বার ছুই রাতে সে তার সিটে বসেই যেন সেই রাস্তার গাছপালা এবং যে পথ ধরে ওকে যেতে হবে সব হুবহু দেখতে পাচ্ছিল। তারপর কখন ঘুম এসে গেছিল সে টের পায়নি। যখন জাগল ভিতরে একটা ভয়। বুঝি ট্রেন ওকে নির্দিষ্ট স্টেশন ফেলে দূরে নিয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। জানালা খুলে দিল। এখনও রাত এই বর্ষার মাঠে চুপচাপ জেগে আছে। সে বুঝল, ট্রেন এখনও ওর গন্তব্য স্থলে পৌঁছয় নি। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছনো মাত্রই সূর্য উঠে যাবে এমনি বুঝি লেখা ছিল চিঠিটাতে।

বেশ সময় মতো এই ট্রেন ওকে একটা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। রেল লাইনের এ পাশে গ্রাম। ও-পাশে বড় বিল। কতদূর চলে গেছে কে জানে। বিলের নাম কি, এতবড় বিলের পাশে তাকে আজীবন কাটাতে হবে ভাবতেই প্রথম কেমন একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। ছু একজন যাত্রী নেমেছে। খুব ছোট্ট স্টেশন। ও পাশে একটা বট গাছ, ছুটো আম গাছ, এবং একটা পাতকুয়ো। সড়ক চলে গেছে মাঠের ওপর দিয়ে। একপাশে রেলবাবুদের কোয়ার্টার এবং ঝুপসি মতো সর্বত্র গাছের জঙ্গল। অনেক দিন পর সুভাষ এমন একটা নিরিবিলি স্টেশনে নেমে যেন সে বনবাসে চলে এসেছে। এই বনবাস বুঝি ওর জীবনে নির্ধারিত ছিল। সে বিলের জল দেখতে দেখতে এমন সব ভাবল। বিলের জলে সামান্য ঢেউ আছে। কিছু জেলে নৌকা

চলে যাচ্ছে। ওরা এই গাড়িতে কিছু মাছ সহরের জন্য তুলে দিয়ে গেল। আর কিছু পাখি উড়ছিল বিলের জলে। রোদ ছিল। বৃষ্টির পরে রোদ। রোদে এই মাঠ, গাছপালা এবং বিলের জল আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ। গাছপালা সবুজ, এত সবুজ যে একটা গন্ধ উঠে আসছে। সবুজ গন্ধ।

রেলবাবু বললেন, স্যার আপনি সূর্যগাঁ যাবেন। আপনার গাড়ি হুই। বলে বাবুটি হাত তুলে দেখিয়ে দিল।

সুভাষ ভাবল, এই মানুষ তাকে কলকাতার মানুষ ভেবে ফেলেছে। আপাতত সে স্কুলের প্রধান হিসেবে থাকবে। অস্থায়ী। ট্রেনিং প্রাপ্ত হলে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আজন্মকাল এই তাকে করে যেতে হবে। ট্রেন থেকে নামা মাত্র এই মানুষ তাকে চিনে ফেলেছে! এমন অজ পাড়াগাঁয়ে কলকাতার মানুষ আসে এই বুঝি মানুষটার বিস্ময়। সে সুভাষকে টিকিট নেবার ফাঁকে ফাঁকে দেখছিল।

সুভাষকে এই স্টেশনের প্রতিটি মানুষ লক্ষ্য করছিল। রেলবাবুর গায়ে কালো কোট। একজন পানি পাঁড়ে, হাতে খালি টিন, সে নীলরঙের একটা জামা গায়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় যেন গিলে ফেলবে ভাব, এ-কোন দেশ থেকে এল, এমন দেশে কার বাড়ি সে যাবে, তারপর যেই শুনল সূর্যগাঁয়ের মাস্টার তখন ফিক করে হেসে দিল।—অ বাবু আপনার লাগি একটা গাড়ি লেইগে আছে যান। বলে সেও গাছটার নীচে যে গাড়িটা ছিল, যে লোক ছুটো রাত থেকে অপেক্ষা করে আছে, সেদিকে হাত তুলে দিল। সঙ্গে একজন মানুষ যেন, সেই মানুষ এতক্ষণে নেমে এসে বলল, আসুন স্যার। আমি বলাই বাবু, শ্রীবলাই চন্দ্র দাস। ইস্কুলের ক্লার্ক। হেড-পণ্ডিত। মাঝে মধ্যে হিষ্ট্রিটাও স্যার চালিয়ে নিই। যখন শিক্ষক থাকে না স্যার তখন বলাই দাস সব কাজ করে বেড়ায়। বলেই বলাইচন্দ্র

একটা ঢোঁক গিলে বলল, কোন অসুবিধা হয়নি তো স্যার। রাস্তা ঘাট আজকাল যা হয়েছে!

—না, সুভাষ বলাই বাবুকে অনুসরণ করল। গাড়িটার সামনে একটা হ্যারিকেন বোধহয়, সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল, কেউ খেয়াল করে নি আলোটা নেভাতে হবে, তেল নেই, আলোটা ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। সুভাষ ওটার দিকে তাকিয়ে বলল, বলাইবাবু, হ্যারিকেনটা এই আলোতে জ্বালিয়ে রেখে কি লাভ।

বলাইবাবু জিভে কামড় দিল।—এই ছাখুন স্যার। বলেই সে এক ধমক দিল গাড়োয়ানকে। অলিমদ্দিন বসে বসে তামাক খাচ্ছিল। সে বলল, যাই বাবু।

—আরে ব্যাটা যাই না। রোদের ভিতর বসে আলো জ্বাললে যে সূর্য লজ্জা পায়।

—তা বটেক বাবু। কি বুঝল, কি বুঝল না বোঝা গেল না। অলিমদ্দি ঘাড় নাড়ল।

বলাই দাস বলল, স্যার অনেকটা পথ। কিছু খেয়ে নিলে হত।

—এখন এই সকালে!

—এই চা টা।

—আমরা কখন পৌঁছব?

—তা বারোটা হয়ে যাবে। জলে ডাঙ্গায় পথ। বর্ষার দিন। বাকিটা আর বলল না বলাই দাস। সুভাষ না বললেও যেন টের পায় এই পথ পাঁচ ক্রোশ চলে গেছে। দুপাশে বন। মাঠ আছে বড় ছুটো। তারপর হিজলে ডাঙ্গায় চলে যাবে। বড় বড় বাঁওড় পড়বে। প্রায় যেন এক দেশ, বহু যোজন দূরে, আলো নেই হাওয়া নেই, কেমন এক দ্বীপের ভিতর সে চলে এসেছে। সুভাষের সেই আবেগ কাজ করছিল, প্রাচীন কলকাতার পথ ঘাট, সর্বত্র অনুর ছবি, সে এমন এক দেশে চলে যাবে, যেখানে রাতে কেবল ঝিঁঝি পোকা থাকে, ভাহুকের শব্দ শোনা যায় এবং খুব গভীর রাত্রিতে নদীতে

কোন মাঝির গান শুনতে পাবে—নদীরে তোর উজানী স্রোতে আমারে ভাসাও। এখানে অন্তত সেই ছবি, অন্নু এবং অসীমের যুগলে ছবি, সে দেখতে পাবে না। সে কি যেন দেখতে পাচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে এত দূর এসেও সেই কষ্ট। অন্নুর জয়গান সে এই সকালের রোদে কোথাও দেখতে পাবে ভেবে মনে মনে খুশী থাকার চেষ্টা করল। খুব খুশী খুশী গলায় বলল, বেশ জায়গাটা! আমার খুব ভাল লাগছে বলাইবাবু। বস্তুত এত দূরে এসেও অন্নুর ছবি তাকে তাড়া করছে ভাবতে গিয়ে সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—কিছু খেয়ে নিন স্যার।

—চলুন।

একটা খুপড়ি মত ঘর। কিছু পাকা কলা। একটা কড়াইয়ে বাসি রসগোল্লা কত দিনের। কিছু জিলিপি, তাও বাসি। গরম কিছু তেলেভাজা। খাদ্য বলতে এই। সুভাষ বলল, আমি শুধু একটু চা খাব বলাইবাবু।

—রসগোল্লা খান।

—এখন কিছু খাব না।

—আপনি না খেলে স্যার···

অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা বলাইবাবুর, আপনি না খেলে স্যার আমি খাই কি করে। সুভাষ মনে মনে ধরতে পেরে বলল, আপনি খান। আপনি রসগোল্লা নিন!

—আপনি স্যার ভাববেন না। খুব ভালো। ফটিক ওর নাম। ওর বাবা জটিলার হাতে রসগোল্লা কাটোয়ার বাবুরা, ধন্নু বাবু রস বাবু বলতে একেবারে অজ্ঞান। পূজা পার্বনে জটিলা, উৎসবে ব্যসনে জটিলা। বাকিটা যেন সুভাষের বলার ইচ্ছা, কারণ কেন জানি বলাইবাবুকে দেখলেই একটু রসিকতার ঝোঁক হয়। এমনটা কিন্তু ওর কোনদিন হতো না। শ্মশানে রাজদ্বারে···এইসব বলে

রসিকতা করার স্পৃহা। কিন্তু কোনরকমে সংবরণ করে বলল, আপনি খান।

—আপনি খাবেন না স্যার! পরে যেন ওর সহসা মনে পড়ে গেল, এই মানুষ এসেছে কলকাতা থেকে। আবেদনপত্রে ওর ডিগ্রী এবং ভালো ফল লাভের কথা সকলে জানে, আর এমন হীরের টুকরো ছেলে যে গ্রামে এমন একটা সামান্য কাজ নিয়ে আসছে—সে এ-অঞ্চলের মহা-পুণ্যের ফল। কিন্তু বলাই বাবু একমাত্র মানুষ, যিনি রহস্য খুঁজে পান সব ব্যাপারে। খুঁজে খুঁজে কোথায় সেই রহস্যের মূল, কেন এমন মানুষ শহর ফেলে দূরে চলে এসেছে—তার একটা যেন অনুসন্ধান চাই। সুতরাং বলাইবাবু আর কিছু না বলে, কিছু রসগোল্লা গব গব করে খেয়ে ফেলল।

সুভাষ টাকা বের করে দিল। ওর চায়ের দাম এবং বলাই বাবুর রসগোল্লার দাম।

বলাই বাবু হা হা করে উঠল, স্যার এটা আপনি কি করছেন!

—খেলে দাম দিতে হবে না!

—সব জায়গায় দাম দিতে নেই স্যার। বলে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে এল সুভাষকে।

—গরীব মানুষ···

—স্কুলে ওর একাউণ্ট আছে।

—পাঁচ ক্রোশ দূরে মানুষটা থাকে।

—হ্যাঁ স্যার।

—রোজ আসে যায়।

—না। মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে যায়।

বয়েলের গাড়িতে সুভাষ এই প্রথম উঠতে গিয়ে ছেলেমানুষের মত ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। বলাইবাবু সামনে বসলেন। গাড়িটা—লাইনের ধারে ধারে চলতে থাকল। মাঠে শস্য বলতে

কিছু নেই। শুধু চারিদিকে ধানের জমি। কতদূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। কতকাল পর সে একটা নতুন পৃথিবীতে চলে এসেছে। ওপরে—আকাশ নীল। লাইনের ও-পাশে বিলের জল, জলে কিছু জলপিপি উড়ছে! কিছু পানকৌড়ি ডুবছিল ভাসছিল। কোথা থেকে সব পাখিরা উড়ে এসে বিলের ও-পারে যাচ্ছে। রেলের এ-পারে সব ক্ষেতে চাষীরা আপন মনে কাজ করছে। কোন ত্বরা নাই কিছুতে। কিছু হিজলের গাছে। গাছে এখন ফুল নেই। ফল ধরেছে। জলের রাস্তায় এবং সর্বত্র সেইসব ফল হরতকির মত ছড়িয়ে আছে দেখতে পেল।

বলাইবাবু বলল, স্যার কেমন দেখছেন ?

—খুব ভালো। খুব ভালো লাগছে।

—আমরা পাঁচ ক্রোশ পথ ভাঙব। ঐ যে দেখলেন, ওটা হচ্ছে আতুর গাঁ। এখানে ছোট্ট একজন মেয়ের গল্প বলল বলাই বাবু। মেয়ের নাম আতুর—সে মেয়ে আতুর গায়ে এই হিজলের বনে চলে আসত। হিজলের গোটা কোচর ভরে নিয়ে যেত খেলা করতে। অথবা ওর এক জগৎ ছিল, যেখানে এ-সব ফলের দাম অনেক। মেয়েটা আসত, মাঠ পার হয়ে আসত, কি বর্ষায় কি শীতে, কি বসন্তে এই মেয়ে লাইনের ধারে ধারে কচু বন থেকে কচু, বিলের জল থেকে শাপলা, রাস্তা থেকে গোবর এবং সবই মহা-মূল্যের মত এই মেয়ে তার দুঃখী মায়ের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। সেই মেয়ে ফ্রক গায়ে দিত না। কেবল আতুর গায়ে ওই মাটিতে, গাছ পালা পাখির ভিতর ছুটে বেড়াতে ভালবাসত। তারপর একদিন যেন এক নিয়তি এই মেয়েকে জলের নিচে নিয়ে গেল, নতুন আর এক দেশ, সবুজ দেশ, শ্যাওলা জমি, সূর্যের আলো সেখানে সবুজ কেবল, সবুজের পাহাড়ে জলের ভিতর মেয়েটা শাপলা তুলতে গিয়ে মাছ হয়ে গেল। বলাইবাবু এমনই যেন সেই মেয়ের নামে বলতে চাইল। কত লোক এল, খোঁজার পালা, কে হারিয়েছে,

সেই মেয়ে হারিয়েছে, আতুর গাঁয়ে যে মেয়েটি সারা মাঠে ঘুরত সেই মেয়ে হারিয়েছে। তারপর মেয়েটাকে আর কেউ দেখতে পেল না। শীতের রাতে অথবা বর্ষায় এক রূপালি মাছ জলে উঠতে দেখছে সেই বিলে। মাছটা পাড়ে এসে যেন ডাকত, আমি দুঃখী মায়ের জন্য এখানে বসে আছি। অনেকে হাট ফেরত অথবা গঞ্জ থেকে ফিরে আসার সময় এমন শুনেছে। আতুর গাঁয়ে মেয়ে যেন শীতে কাঁপছে। সে কবেকার কথা। বলাইবাবু বলল, মেয়েটাকে আমরা দেখিনি, আমাদের পিতামহের আমলের গল্প। সেই মেয়ের নামে নাম শুনেছি যারা খুঁজতে এসেছিল, কেউ কেউ আর ফিরে গেল না। উঁচু জমিতে ওরা ঘর বাঁধল। ওর দুঃখী মা বললে, আতুর গাঁয়ে এলে একটু গাছের নীচে জল দিতে হয়। বিলের জল। আসুন আমরা গাছটার নীচে একটু জল দিই। বড় প্রকাণ্ড হিজল গাছ, নীচে পাথর কালো রঙের। পথ ধরে যাবার সময় জল, পয়সা যা তোমার আছে, তুমি দাও। সুভাষ নেমে জল দিল।

সুভাষ বলল, মাছটাকে আপনারা দেখেছেন বলাইবাবু?

দেখিনি স্যার। তবে অনেকে দেখেছে। খুব জ্যান্ত দেবতা।

সুভাষ চুপ করে থাকল। এমন একটা নির্জন জায়গায় এসে যখন চারিদিকে শুধু প্রান্তর আর বিলের জল, ক্বচিৎ দু একজন চাষী মানুষের মুখ, গাছে গাছে কি সব নানা রঙের পাখি ডাকছে, আর মনে হয় কোথাও এই নির্জন সকালের রোদে শালিখ অথবা চড়ুই শস্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তখন গাছের নীচে যে দেবতা বসবাস করবে বিচিত্র কি। সুভাষ তার শৈশবের কথা যেন স্মরণ করতে পারে—শৈশবের কথা মনে হয়। যেন সে এক নিরিবিলি আশ্রয়ে মায়ের পাশে রাতে ঘুম যাচ্ছে। পরীদের গল্প বলতেন মা। সুন্দরী বালিকা এবং শিশু দেখলে পরীরা সব হরণ করে নিয়ে চলে যেত। ওর মনে হত তখন তাকেও একদিন কেউ হরণ করে নিয়ে যাবে। তারপর পরীদের সেই যে বলে না, নিয়ে গিয়ে এক বরফের পাহাড়ে, অথবা

পাহাড় পার হয়ে কোন এক যক্ষ রাজার দেশে, কি সব সোনার ফুল, রূপোর পাতা, মুক্তোর ফল, ফুলে ফলে ভরা দেশে নিয়ে ছেড়ে দিত। তারপর পরীদের কাজ শেষ হলে, ঘরের চালে, গম ক্ষেতের ভিতর, অথবা নদীর চরে ফেলে দিয়ে চলে যেত। পরীতে পেলে মেয়েদের চোখ নীল হয়ে যায়। যেদিকে তাকাবে সব মরুভূমি হয়ে যাবে। সুতরাং আগুন জ্বেলে ওকে খুন করা—এখন সব গল্প ছেলেবেলাতে সে শুনে শুনে কবে এক কলকাতা নগরীতে এসে কেমন বুদ্ধিমান হয়ে গেল। অনু নামক এক যুবতীকে ভালবেসে বিবাহ। ভালবাসা কথাটার সে দুটো অর্থ খুঁজতে চাইল। ভালবাসা পরীর মত, অথবা এই যে মেয়ে আতুর গায়ে মাঠে অথবা বিলের জলে ভেসে বেড়াত, ভালবাসত সব কিছু, নীল আকাশ অথবা মাঠের শস্যক্ষেত্র চাষীদের বাড়ি ফেরা গরু নিয়ে, সন্ধ্যায় গ্রামে আলো জ্বলে উঠলে শাঁখ অথবা কাঁসির শব্দ, (যেন ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সন্ধ্যায় সূর্য আমাদের বনবাসে রেখে চলে গেছে, এখন আমরা ঘণ্টা বাজিয়ে ঈশ্বরকে আমাদের পাহারাদার নিযুক্ত করছি) এবং সেই শব্দ পার হয়ে আতুর গায়ে ছোট্ট এক বালিকা নিরন্তর ছুটছে। ওর ভালবাসার সাম্রাজ্য এই সব মাঠ, শস্যক্ষেত্র। আতুর গায়ে সেই মেয়ের মত ভালবাসা না হয়ে পরীর মত ভালবাসা অনুর। আপন স্বার্থে অনু তাকে ভালবেসে কেমন এক নিদারুণ ভোগের নিমিত্ত এখন ওর কাছে পরী হয়ে গেল। সুভাষ কেন জানি অনুর জন্য কোন দুঃখ অথবা বেদনা বহন করতে পারছে না এখন। এই যেন তার ভাল হল, সে এক আতুর গাঁতে হাজির। এখানে কেউ ওকে বলবে না, আপনার স্ত্রী সিনেমাতে অভিনয় করছে! বড় মারাত্মক অভিনয়। অথবা অনুর বিচিত্র লীলা, সে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে কিছুই এই এমন এক স্থানে পৌঁছে গেলে আর জানা যাবে না। সে নিজেকে বস্তুত, এই সব নির্জন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে নূতন ভাবে বাঁচতে চাইল।

বলাইবাবু বলল, আপনি কলকাতায় মানুষ। দুদিনে হাঁপিয়ে উঠবেন।

—হাঁপিয়ে উঠব কেন?

—এখানে স্যার কি আছে বলুন!

—কি নেই বলুন।

—ও স্যার প্রথম প্রথম সবাই এমন বলে—কি গ্র্যাণ্ড। তারপর এসে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়।

সুভাষ এবারও উত্তর করল না। ওর ঘুম পাচ্ছিল। কারণ বেশ দুলছে গাড়িটা। রোদ এসে পায়ের কাছে পড়েছে। দু একজন চাষী মানুষ কে যায় এই গাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। বলাইবাবু সুভাষের পরিচয়, এবং কখন স্টেশনে এসে বসে আছে সব বিস্তারিত বলছে।

সুভাষ বলল, এ-গাঁয়ের কি নাম।

বলাইবাবু বলল, সূর্য হাট। বলেই আর একটা গল্প বলতে গেলে সুভাষ বলল, আমাদেরও কিছু পথ নৌকোয় যেতে হবে।

—সামনের বট গাছটা দেখছেন, পাশে মসজিদ এবং তারপর এক ঘাট পাবেন। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।

—আমার মনে হয় দুপুরের ভিতর পৌঁছতে পারব না।

—তা পারা যাবে।

একটা কাক ছইয়ের ওপর এসে বসেছে। কাকটা দুবার কা-কা করে ডাকল। এখন প্রীতি কি করছে? প্রীতিকে সে দুবার দুটো ফুল দেবে ভেবেছিল। প্রীতি যদি ওর ফুলের অপেক্ষাতে বসে থাকে। বরং অনুর চেয়ে ওর প্রীতিকে বেশী মনে পড়ছে। এমন ভিন্ন দেশে সে যথার্থ নিঃসঙ্গ। প্রীতিকে যদি সে এখানে নিয়ে আসে। প্রীতি, ডাক্তার মানুষ। এমন অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে প্রীতিকে সকলে দেবীর মত দেখবে। সে শেষ সময়টুকু—যখন প্রীতি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল, বলেছিল সুভাষ, সুভাষের এখন মনে পড়ছে, আপনি

কি হেসে আমাকে বিদায় দেবেন! চোখে মুখে কোন বিষণ্ণতা থাকে আমি চাই না। প্রীতি কথা ঠিক রেখেছে। সে এতটুকু বিষণ্ণ হয় নি। সে বেশ রুমাল উড়িয়ে, যেন সে তার বন্ধুকে বিদায় জানাতে এসেছে, দুদিন পরই আবার কোনো সমুদ্র তীরে বুঝি দেখা হবে এমন চোখ মুখ করে রেখেছিল প্রীতি। কিন্তু সুভাষ জানত, প্রীতির সঙ্গে দেখা হবার আর সম্ভাবনা নেই। সে বড় একগুঁয়ে মানুষ। ভেতরে ভেতরে যা একবার ঠিক করে ফেলে সেখান থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারে না। সে নিজেই একটা ব্যূহ তৈরি করছে। যার সে শুধু প্রবেশ পথটা জানে, বের হবার পথ যেন তার জানা থাকে না। সে অসহায়। ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় প্রীতির দিকে চোখ তুলে নিজেই আর তাকাতে পারে নি। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। সে পুরুষ মানুষ। দুর্বলতা ধরা পড়লে সে খুব ছোট হয়ে যাবে।

বলাই বাবু বলল, দ্যাখুন স্যার ঈশ্বরের কি অপার মহিমা!

সুভাষ ভাবল, এত ঈশ্বর ঈশ্বর করছে কেন লোকটা!

—কি মহিমা বলাই বাবু?

—এই যে দ্যাখুন না, একটু বর্ষা পেলেই গাছ গাছালিগুলো কেমন সজীব হয়ে যায়। যেন ওরা ঈশ্বরের কাছে এই সামান্য বর্ষনের জন্য প্রার্থনা জানায়। সবুজ মাঠের দিকে তাকালে এমন মনে হয় না আপনার?

আমি অনেকদিন পর শহর ছেড়ে এসেছি, গ্রামের কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম অথচ দেখুন কি আশ্চর্য, জন্ম আমার গ্রামে। আমাদের পুকুর পাড়ে বড় বড় শিমুল গাছ ছিল, নীচে গোপাট, সেই গোপাটে অজস্র মাদার গাছ, পলাশ গাছ, বসন্তে সেই যে লাল রঙ, লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে মাঠ ঘাট, আমি সব মনে করতে পারি। লাল আভা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম— আমারও তখন, ঈশ্বরের মহিমার কথা মনে হত। কিন্তু পরে

ভেবেছি, বড় হওয়ার সঙ্গে, বিশেষ করে যখন বড় শহরে চলে এলাম, অনু এল জীবনে, মিথ্যা অহমিকা নিয়ে অভিমান করে থাকলাম, অনুর জীবনে ফুল ফুটুক এমন আর বলতে পারলাম না তখন ঈশ্বরকে আমার সব সময় কেন জানি একটা কুকুরে তাড়া করা বাঁদরের মত মনে হত। এসব বলার ইচ্ছা হল সুভাষের। কিন্তু না বলে অন্য কথায় এল। কারণ লোকটা জানে না, সে এখানে কেন পালিয়ে এসেছে। জানলে সেও ওকে করুণা করবে। সে বলল, গ্রামে মাঠে ঈশ্বরকে যতটা ধরা যায়, শহরে তেমন আমরা তাকে ধরতে পারি না। মহৎ ঈশ্বরকে খুব মেকি মনে হয়। বলাই বাবু আপনার এত বড় মাঠ দেখে আমার ঈশ্বর নতুন ভাবে যদি কথা বলে বলুক না। তাকে দেখি ফের আমি ভালবাসতে পারি কি না।

বলাই বাবু যেন সুভাষের অসংলগ্ন কথা থেকে কিছু ধরতে পারল না। শুধু বলল, তবে কী জানেন স্যার, আপনাকে আমি একটা বন দেখাব। আমাদের গ্রাম পার হলে একটা নদী পড়বে। নদী পার হয়ে সেই বনে ঢুকে যেতে হয়। একবার যদি সেই বনে প্রবেশ করেন, তবে দেখবেন কি ঘন সব লতাপাতা, নানা রকমের গাছ, কত বিচিত্র বর্ণের পাখি, কত রকমের ফুল ফল। একবার ঢুকে গেলে আর বের হতে ইচ্ছা হয় না। যেন শেষ নেই অরণ্যের। বনের রহস্য ধরে ফেলতে পারলে আর এই দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না।

সুভাষ যেন মনে মনে বলল, আমি তেমন একটা জায়গার সন্ধানে চলে এসেছি বলাই বাবু। তেমন সন্ধান পেলে আর কোথাও যাব না। আপনি আমাকে সেখানে ঠিক নিয়ে যাবেনত!

বলাই বাবু বলল, কেন নিয়ে যাব না বলুন।

সুভাষের যেন বলার ইচ্ছা হল, আমি এক রহস্যের ভিতর এতদিন ডুবে ছিলাম, সে শরীরের রহস্য। এখানে এসে, এই শস্যময়

মাঠ, ঘাট দেখে ফুল ফল দেখে সে রহস্যের কথা ভুলে যাচ্ছি। যদি অন্য রহস্যের সন্ধান দিতে পারেন আমি নিশ্চয়ই আর কোথাও যাব না। মনে মনে আমিও অন্য এক শরীরের রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক রহস্য দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না।

—এই ঘাট, নামুন স্যার।

সুভাষ বিলের জলে নৌকায় উঠে ভেসে গেল। স্ত্রী অনু, প্রীতি, অথবা সেই হোর্ডিংএ স্ত্রীর অভিনয়ের ছবি চোখে ভেসে উঠল না। সে বিলের জল দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। সূর্য মাথার ওপরে ছিল, মনে হল মাথার ওপর কিছু পাখি, হলুদ তাদের রঙ। পাখিরা বিলের জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুভাষ এবার যেন মনে মনে বলল, আমরা ইচ্ছা করলেই বনে ঢুকে যেতে পারি না, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

তখনই যেন বিলের জলে ঢেউ উঠল। পালে বাতাস লাগল। নৌকা জলের ওপর তর তর করে ভেসে চলছে। যেন অনন্ত যাত্রা। এই বিল শেষ হবে না। বিলের জলে ছায়া পড়ে না। ঘোলা জল। রেল লাইন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সুভাষ, সেই জল, হাওয়া এবং রোদের ভিতর ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পেল। যেন সেই ঢেউ চুপি চুপি সুভাষকে বলছে, রাজা যায় বনবাসে, রাজার প্রাণে ভয়। সব ছেড়ে পালায় রাজা। কোথায় সে পালাচ্ছে! সে তো পালায় নি। সে এবার মনে মনে বলল, আমি কার কাছ থেকে পালাব? আমি তো ইচ্ছা করলেই জোরজার করে অনুকে ধরে আনতে পারি, প্রীতিকে বেঁধে রাখতে পারি, আমি পালাব কেন?

মনের ভিতর থেকে কে যেন জবাব দিল, বাপু তুমি নিজের কাছ থেকে পালাচ্ছ। সংসার তোমার ছিন্ন ভিন্ন। বস্তুত তুমি তোমার পাগলা গারদ তৈরি করে রেখেছ। তুমি যতই দূরে চলে যাও, যতই ভাব বনবাসী হলে তোমার ভালবাসার অনু কি করে বেড়াচ্ছে, তুমি জানবে না, মনে শান্তি আসবে, এটা ঠিক না সুভ। এ ভাবে পালালে

সংসার তোমাকে কাপুরুষ বলবে। এবং এ-সময় কেন জানি সুভাষের বার বার প্রীতির চোখ ভেসে উঠল। ওর বারান্দায় যে অর্কিড ছিল, সারা জীবন ধরে যেখানে সে এত জল ঢেলেও ফুল ফোটাতে পারল না, আসবার সময় কি আশ্চর্য সেখানে একটা ফুল ফুটে থাকল। ফুলটা সে প্রীতিকে উপহার দিয়ে এসেছে। একমাত্র প্রীতিই জানে সে নিরুদ্দেশে চলে এসেছে। সুটিঙ সেরে অনু কলকাতায় ফিরে এসে দেখবে, যদি সুভাষের খোঁজে আর একবার আসে—তা ছাড়া দোসর রামচন্দ্র আছে, সেই তার মা-মণিকে জানিয়ে দেবে, মা-মণি বাবু নিরুদ্দেশে চলে গেছে—অনু হয়ত সামান্য সময়ের জন্য লোক দেখানো কান্না-কাটি করবে। এই লোক দেখানো সব কিছু, মনের ভিতর আবার একটা মন আছে, সেই মনটা তাকে এমন সব বলতে চাইছে।

বলাইবাবু বলল, স্যার এত চুপচাপ কি ভাবছেন।

—কিছু না।

—নামুন। আমরা এসে গেছি।

সুভাষের যেন ঘুম ভেঙে গেল। সত্যি, এই দেশ একটা আলাদা দেশ। কি সবুজ এবং গাছপালা বৃক্ষে একেবারে জড়াজড়ি করে আছে। একটা বড় পথ ইট সুরকির। পাশে রেল-লাইন। রেল-লাইন বেঁকে এ গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে। পাশে নদী। নদীর পারে সেই বন দেখতে পেল। স্কুল বাড়ি ইটের। সামনে সবুজ ঘাসের লন। প্রায় আশ্রমের মত দেখতে। প্রধান শিক্ষকের নিবাস ডান দিকে। ওর সংলগ্ন, এই বলাই বাবু বিঘেখানেক জমি নিয়ে বসবাস করেন। একটা বড় আমলকি গাছের নীচে বলাই বাবু মাঠ-কোঠা বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন।

সে নামতেই গ্রামের মাতব্বর মানুষেরা সুভাষকে অভ্যর্থনা করল। ওরা নিবাসে নিয়ে এল ওকে। সুভাষ দেখল, নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। পাঁচিলের ধারে ধারে নারকেল গাছ। বর্ষাকাল

বলে কিছু জিনিয়া ফুল নীল হলুদ রঙের। সে বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে চুপচাপ বসল। সভ্য পৃথিবী থেকে সে যেন কত দূরে চলে এসেছে। নির্জন নিরিবিলি এই জগৎ। সে কলকাতায় থাকলে এখন কোন শোতে অথবা প্রীতিকে নিয়ে ঘোরা, এবং সন্ধ্যা হলেই জিরো জিরো সেভেনে চুপচাপ একা একা বসে মদ্যপান, যেন জীবন থেকে সব হারিয়ে গেলে যে নিঃসঙ্গতা জন্মায়, সুভাষের ভিতরে তেমনি এক নিঃসঙ্গ ভাব। ওর কান্না পায় তখন। এই নির্জন পৃথিবীতে বসে ওর কেমন সেই শহর কলকাতার জন্য আবেগ বোধ করল।

কিন্তু রাত হতেই চারিদিকে অন্ধকার খাঁ খাঁ করতে থাকল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। দপ্তরি ঘরের ভিতর আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে। নিশুতি রাত। মনে হয় দূরের সব গাছ পালা বৃক্ষ এক অন্ধকারময় জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। সে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের ছুটি বলে দু এক জন গ্রামের মাতব্বর মানুষ বাদে ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। কাল হয়ত অনেকে আসবে। ওর মনে হয়েছে কেউ কেউ দূর থেকে দেখেই চলে গেছে। রাতে বলাই বাবু ওর বাড়িতে খেতে বলেছে। একমাত্র এই বাড়িটাই ওর আবাসের কাছাকাছি। এমন কি চুপচাপ বসে থাকলে বলাই বাবুর কথা শুনতে পাওয়া যায়। কাঁটা তারের বেড়া পার হলেই বড় আমলকি গাছটা, গাছটার নীচে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল, বলাই বাবু অন্ধকারে টর্চ মেরে এদিকে আসছে। ওর বারান্দায় উঠে এল।—আপনি স্যার একা একা বসে আছেন। তবে বেশ ভাল লাগে। অন্ধকারে বসে থাকলে নিজেকে চেনা যায়। আমি মাঝে মাঝে স্যার, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকি। সেই কবে যেন এই পৃথিবীতে এসেছি মনে করতে পারি না। বাবাকে তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, কি করে যেন কি সব নিয়ে বড় হয়েছিলাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে হচ্ছে, ঠিক

পেঁয়াজের খোসার মত। যত খোসা যাবে তত নিঃশেষ হয়ে আসবে।

সুভাষের জানার ইচ্ছা হল, এই মানুষের সংসারে আর কে আছে। সে বুঝতে পারল, প্রতিবেশী বলতে এই মানুষ তারপরে মাঠ এবং শস্যক্ষেত্র। তারপর গ্রাম। সুতরাং বিদ্যালয়, ফুল ফল পাখি আর পাশের বড় আমলকি গাছটার নীচে সুভাষকে বাকি জীবন কোনরকমে শরীরের খোসা ছাড়িয়ে বাঁচতে হবে। তারপর শূন্য অন্তহীন এক সমুদ্র। সেখানে কে কার! অনু কে তার! প্রীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক তার! সকলেই তখন বুড়োবুড়ি সেজে যেন বনে গরু হারিয়ে গেছে এমন মুখ নিয়ে বসে থাকবে। এ-সব ভাবলেই সুভাষের ভিতর এক দুষ্টু প্রকৃতির মানুষ হেসে ওঠে। হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপনে অনু এবং অসীমের ছবি তখন কালো কুৎসিত বেড়ালের মুখ মনে হয়।

খেতে বসে সুভাষের বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না। সে মুখ তুলে একবার মাত্র তাকিয়েছিল। আর পারেনি।

বলাইবাবু বলল, আমার মেয়ে। বড় মেয়ে।

সুভাষ কিছু বলল না। একটা বড় অরণ্যের ছবি, হাতি ঘোড়ার ছবি এবং বাঘের ছবি কেবল চোখের ওপর ভেসে বেড়াতে থাকল।

ভাত ডাল মাছ রেখে গেলে বলল, আপনার প্রাইমারি সেকসানে কাজ করে। হেড টিচার হয়ে আছে। দুজনের আয়ে কোনরকমে চলে যায়।

দরজার ও-পাশে প্রায় সাত আট জনের মুখ। ওরা খুব ফিস ফিস করে কথা বলছে। বলাইবাবু নিশ্চয়ই আরও খবর দেবেন। সে চুপচাপ খেতে থাকল।

বলাইবাবু বললেন, এখানে এসেছিলাম স্যার দুজন। সে তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। দিয়ে গেল এইসব অপোগণ্ড। মেয়েটা আছে বলে রক্ষে।

এমন পাড়াগাঁয়ে এক নদী জলের মতো মেয়ের লাবণ্য সামান্য লণ্ঠনের আলোতে ঝলসে উঠেছিল, যার দিকে সুভাষের মত শক্ত সমর্থ মানুষ পর্যন্ত তাকাতে পারে নি, বলাইবাবু খুব নিশ্চিন্তে বড় বড় গ্রাসে এখন খাচ্ছে, বাপের চোখে তো ঘুম থাকার কথা নয়। লুটে পুটে নিয়ে যাবে—তারপর বিলের জলে সাঁতার কাটা অথচ এই মানুষ কি নির্বিঘ্নে বলছে, ছাখো ছাখো কি মানুষ নিয়ে এলাম, কত বড় পণ্ডিত মানুষ তোরা জানিস না। এবার স্কুল দেখবি কি হয়! যেন এমন এক মানুষ বলাই বাবু ধরে এনেছে যার কাছে মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান—সতীকে বলাইবাবু মহাভারতের পাঠ শোনাতে থাকল।

লণ্ঠনের আলো নিয়ে সতী এসেছিল। সঙ্গে ছোট একটি ভাই। ওর ঘরে জল, বিছানা এবং অন্য সব সামগ্রী ঠিক করে দিয়ে যাবে। সতী চুপচাপ কাজ করছিল। জানালা দিয়ে দেখা যায়। এই নির্জন পৃথিবী কেন জানি আবার সুভাষের কাছে বড় সহর হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়ের কোমল মুখ ওকে বড় বেশী বিষন্ন করে দিচ্ছিল, কি আলোক উজ্জ্বল এক বাতি ঘরের স্বপ্ন মেয়ের মুখে। কেবল মনে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া—এক সমুদ্রের অন্ধকারে সে সামান্য নাবিক, জাহাজের সব আলো নিভে গেছে। সে এখন দূরবর্তী বাতি ঘরের প্রতীক্ষাতে বসে আছে। সতী এই প্রথম কথা বলল, স্যার আপনার বিছানা করে দিয়েছি। আপনি আর জেগে থাকবেন না। এতটা পথ এসেছেন। এখন শুয়ে পড়ুন। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সুভাষ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলে বলল, ডানদিকের টিপয়টাতে জল আছে। আলোটা শিয়রে রাখবেন। একেবারে অন্ধকার করে দিলে ভয়ে আপনার ঘুম নাও আসতে পারে।

তারপর সতী চলে গেল। সে আলোটা নিবু নিবু করে বসে থাকল বিছানাতে। এমন আকর্ষণ কেন! সারাটা পথ সে কেবল

অন্নু এবং প্রীতির কথা ভেবেছে। তার আর কিছু মনে হয়নি। অথচ এখন এই বনবাসে পঞ্চবটির মতো এক আশ্রমে এসে সে আরেক সোনার হরিণ আবিষ্কার করে কিছুক্ষণের জন্য কেমন জড়বৎ হয়ে গেল। তার অন্ধকারের কথা মনে থাকল না, এই নির্জন পৃথিবীর কথা মনে থাকল না, কেবল থেকে থেকে দূরে এক ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। এই ঘণ্টাধ্বনি তাকে আজীবন ছুটিয়ে মারছে।

—চলুন স্যার, সেই বনটা দেখবেন বলেছিলেন, দেখিয়ে আনি।

সুভাষের এখন হাতে কোন কাজ নেই, বরং বলা যায় এসময় ওর সময় কাটানো দায়। বলাইবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। এতক্ষণ যেন এই স্কুল এবং মাঠ, কোলাহলে মত্ত ছিল। এখন খালি খালি। শুধু গাছগুলি একা দাঁড়িয়ে মাঠের। এক পাশে ছোট্ট একটা কাঠগোলাপ গাছ। গাছে ফুল ফুটে আছে। সামনে ধানের মাঠ। তারপর সেই রেল-লাইন। এবং হিজলের বিল। বিলে জল বাড়ছে। কিছু পালতোলা নৌকা। ওরা রনগাঁ যাবে। ও-সব নৌকা এই কুলে যারা আসে তাদের। অনেক দূর থেকে ছাত্ররা আসে। এতক্ষণ যেন সুভাষ প্রায়ই এই ছাত্র এবং শিক্ষকদের ভিতর ডুবে ছিল। এই প্রথম দিনটা কি করে এত তাড়াতাড়ি কেটে গেল সে বুঝতে পারল না। এখন শুধু মনে হচ্ছে এমন নির্জন পরিবেশে তার ভাল লাগার কথা নয়। সে চুপচাপ বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে কারুর প্রত্যাশায় যেন বসে ছিল। এমন সময়ে এল বলাইবাবু। বলল, স্যার চলুন, দেখিয়ে আনি।

সুভাষ চটি গলিয়ে বের হয়ে পড়ল। সরু, পায়ে হাঁটা পথ।

সামনে গ্রাম। সে গ্রামের ভিতর ঢুকলে কিছু মানুষ জড় হল, কিছু মানুষ ওর সঙ্গে পরিচয় করল, এটা ওটা বলতে থাকল। এই যে সামনে স্যার বাড়ি দেখছেন, ওটা চট্টরাজদের বাড়ি। এ-অঞ্চলের জমিদার। এখন আর ওদের সেই রবরবা নেই। তারপর এই হল ঘোষ পাড়া। সব গোয়ালারা এখানে থাকে। হিজলের বিলে ওদের বাথান আছে। এক সময় ওরা হিজলের ডাকাত ছিল! এখন স্যার উদ্বাস্তু এসেছে গাদা গাদা, ওরা বিলের ভিতর সমস্ত জমি কিনে মাটি ভরাট করে নতুন সব গ্রাম তৈরী করেছে। সেখানে একদিন আপনাকে নিয়ে যাব। গোয়ালাদের বাথান আর এখন তেমন নাই।

—তারপর, যে নদীটার নাম করলেন।

—হ্যাঁ নদীর নাম সরজু। আমরা সরজু বলি, রনগাঁর লোকেরা বলে, দ্বারকা। অঞ্চলে অঞ্চলে নদীর নাম বদলে গেছে। এই নদীর জন্ম ছোটনাগপুরের পাহাড়ে। দামোদরের খাড়ি নদী কেউ কেউ বলে থাকে। আচ্ছা এখানে দাঁড়ালে নদীটাকে খাড়ি নদী বোঝা যায়?

—তা বোঝা যায় না।

—তবে! কত বড় নদী। এখন জেলেরা এখানে ইলিশ মাছ ধরতে চলে আসবে।

—তবে এখানে ইলিশ মাছও পাওয়া যায়?

—তাজা ইলিশ।

—কখন ওরা ধরে আনে?

—এই সকালের দিকে। আর ঐ দেখছেন বন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে না?

—তা দেখাচ্ছে।

—ওটা আগে নীলকুঠি ছিল।

—তাই বুঝি!

—নীলের চাষ উঠে যাবার পর রেশমের চাষ। সেও স্যার, বেশীদিন থাকল না। এ-অঞ্চলের যারা তাঁতি ছিল, ওরা ক্রমে হেজে

মজে গেল। জমি সরকার ইজারা নিয়ে নিল। নদী ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছিল বলে সরকার ওখানে একটা বন তৈরী করেন।

—তা হল এই বন তেমন প্রাচীন নয়।

—কি যে বলেন স্যার! সেদিনের বন। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো বড় হয়েছে।

—ওরা কি গাছ। দূর থেকে ধরা যাচ্ছে না।

—সব শাল গাছ। কাছে গেলে দেখবেন কি সব কুচলতা। বর্ষার জলে একেবারে লাবণ্য ঝরে পড়ছে।

এই লাবণ্যর কথা মনে হলেই সতীর কথা মনে হয়। সুভাষ স্কুলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু একবার সতীকে দেখেছে। সতী ওর বারান্দার নীচ দিয়ে দু' তিনবার গেছে, মুখ তুলে দেখেনি। সতীকে দেখলেই মনে হয় সারাক্ষণ যেন ও কি ভাবে। বলাই বাবুর মেয়ে সতী—এ কথাটা বিশ্বাস করতে সুভাষের কেমন কষ্ট হয়। বলাইবাবু স্কুলের ক্লার্ক। তার মেয়ে এই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বলাইবাবুর চেহারার ভিতর একটা দাসানুদাস ভাব আছে। কিন্তু সতীকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের মনে হয়। কেমন এক অহঙ্কার পুষে রাখে সতী। কাল সতী ওর বিছানা করে দিয়ে গেছে। স্কুলের কোয়ার্টার পার হলেই বলাইবাবু ঘর করে বসবাস করছে। যেন সতী সুভাষ আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা শোনার ভারটা নিয়েছে। সুভাষ সারাদিন পর ভেবেছিল, সতী এবার আসবে। হাতে এক কাপ চা থাকবে। কিন্তু তার আগেই বলাইবাবু চলে এসেছে। তাকে নিয়ে বের হয়েছে গ্রাম মাঠ নদী বন দেখাবে বলে।

এই প্রত্যাশা কেন? ও-পারের বন দেখতে দেখতে সুভাষের এমন মনে হল। সতী তার কে! সতীর চোখে মুখে সরল এক গ্রাম্য ছায়া সব সময় ভাসে। তাকে দেখলে টের পাওয়া যায় সতী বলাইবাবুর সংসারের হাল ধরে রেখেছে। ছোট ছোট ভাই বোনদের

দেখাশোনা থেকে সংসার আগলানো, বাপকে সময়মত স্কুলে পাঠানো সব দায় তার। এখন আর একজন উটকো লোকের দায় তার উপরে বর্তেছে। সতি সম্পর্কে সামান্য দুর্বলতা জাগতেই, সুভাষ বলল, নদীতে কোন নৌকা দেখছি না।

—বিকেলের দিকে জেলে নৌকা থাকে না। সন্ধ্যার পর জেলে নৌকা ভেসে আসবে। ইলিশ মাছের নৌকা।

—নদী পারাপার হবার নৌকা কোনদিকে ?

—এটা এখন পাবেন না। ডানদিকে যে ঢিবি দেখছেন, ওটা পার হলে বারুইদের আম বাগান, কিছু ভিটা জমি, জমি পার হলে স্যার এ অঞ্চলের শ্মশান। শ্মশান পার হয়ে যেতে হবে। কুমোরদের পাড়াতে খেয়া আছে।

—আপনাদের এই গ্রামে কত ঘর লোক আছে ?

—দেখলে খুব ছোট মনে হয় গ্রামটা। কিন্তু ঘুরে বেড়ালে দেখবেন বেশ গ্রাম।

সুভাষ হাঁটতে হাঁটতে দেখল, ওরা নদীর একটা খাড়া জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। জলে স্রোত ভয়ানক। কিছু মরা ডাল এবং কাঠ কুটো ভেসে যাচ্ছে। স্রোতের মুখে পড়ে কাঠ কুটো ভেসে কেমন আবর্ত সৃষ্টি করে ডুবে গেল। এই অঞ্চলে সে একটা কাঠ কুটোর মত ভেসে এসেছে কি মরা ডালের মতো ভেবে পেল না। যেন অজ্ঞাত বনবাসে সে চলে এসেছে। কেবল নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন। সে তো এটাই চেয়েছে। তবে কেন দুদিনেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে। দুদিনের ভিতর সে কি কি কাজ করেছে একবার ভেবে দেখল, দেখল তেমন কাজ সে কিছুই করেনি। কেবল স্কুলের কাজে ডুবে থাকার চেষ্টা করেছে। ফাইল পত্র দেখেছে। সরকারি বৃত্তি এবং গ্র্যাণ্ট কি আর পাওনা আছে, আদায় পত্র কেমন, স্কুলের রেজাল্ট, এসব দেখেছে। দেখতে দেখতে তার হাই উঠেছে। হাই ওঠা যাতে অন্য কেউ দেখে না ফেলে—সেজন্য সে উঠে পায়চারি

করার সময়—এক লম্বা বারান্দা, এই বারান্দায় দাঁড়ালেই ধানের মাঠ দেখা যায়, রেল-লাইন দেখা যায়, লাইন অথবা ধানের মাঠ দেখতে দেখতে হাই ওঠা বন্ধ করেছে।

বলাইবাবু বললেন, আর আমাদের স্যার বেশী কষ্ট করতে হবে না। ঐ যে গাছটা দেখছেন, গাছটা কেটে ফেলা হবে, কারণ একটা বড় সড়ক তৈরি হচ্ছে। রাস্তাটা আসছে বহরমপুর থেকে। ওটা এলেই আমাদের গ্রামে শহরের মানুষ আসতে সুরু করবে।

—তার মানে ?

—স্যার কি অজ পাড়াগাঁ। একটা দৈনিক কাগজ আসে না। চট্টরাজের মেজ ছেলে মাসে একবার আসে, ওর একটা জিপ গাড়ি আছে, সে এলে দৈনিক কাগজ নিয়ে আসে। আমরা সভ্য জগত থেকে নির্বাসনে আছি।

—এইত ভাল।

—তবে আর এত কষ্ট করে জুনিয়র স্কুলকে আমরা হাই করলাম কেন। আপনার মত এত বড় পাস করা মানুষই বা নিয়ে এলাম কেন !

সুভাষ এবার মনে মনে হাসল। এটা যে সত্যি সে বনবাসে এসেছে এ কথা কেউ জানে না। কেবল সে, হ্যাঁ সে বাদে আর কেউ জানে না। আর একজন অবশ্য জানে, সে প্রীতি। প্রীতি সবটা জানে না। শুধু জানে সুভাষ কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছে। ওর এত বড় চাকুরি ছেড়ে দিচ্ছে। সুভাষ কি পাগল হয়ে গেল ! আসার সময় প্রীতির চোখ দেখে সে স্থির থাকতে পারেনি। তবু জানে এ-ভাবেই দিন চলে যাবে। এইত হয়, অনু নিশ্চয়ই এসে খোঁজ করবে। প্রীতি শুধু বলতে পারবে, মানুষটাকে আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি। কোথায় যাবে, বলে যায়নি, কেন চলে যাচ্ছে শুধু এটুকু জানি।

অনু, কেন চলে গেছে এমন প্রশ্ন করতে পারে, আবার নাও

করতে পারে। একমাত্র রামচরণ, সে খবর দিতে পারে অনুকে। মা-মণি কি বলব, কথা নেই বার্তা নেই, বাবু কলকাতার বাস তুলে দিল। যাবার সময় বাবু আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গেছে, এই টাকায় আমি যে কি করি! মা-মণি এত টাকা তো আমি একসঙ্গে জীবনে দেখিনি।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সুভাষ অনুর মুখ, এমন সব খবরে কি রকম দেখাবে ভাববার চেষ্টা করল। অথবা যদি প্রীতির কাছে ছুটে আসে, প্রীতি তুই বল, আমার মানুষ এখন কোথায়? প্রীতি যত বলবে, আমি জানি না কোথায় তোর মানুষ গেছে, আমি কি করে জানব, তত অনু মরিয়া হয়ে উঠবে। অনু কি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, আমার মানুষ নিরুদ্দেশে চলে গেছে বলে, বিজ্ঞাপন দেবে, সাত ফুট হাইট, রঙ কালো, চোখ ভাসা ভাসা, মুখের অবয়ব সুদৃঢ় এবং প্রায় সিংহের মত বলিষ্ঠ। এ-সব বিজ্ঞাপণ দিতে পারে। অনু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে, পাগলের মত খুঁজবে অনু। সুভাষ এমন ভাবতেই কেমন পাগলের মত চারিদিকে তাকাতে থাকল। এত দূরে সে চলে এসেছে। নিরুদ্দেশে এসে কেন সেই অনুর ভাবনা। অনুকে আর দেখতে না হয়, ওর ছায়া পর্যন্ত সুভাষের কাছে অসহ্য, অথচ এত দূরে এসে সেই এক ভাবনা থেকে থেকে মনের ভিতর কাজ করছে।

প্রীতিকে অনু তীক্ষ্ণ গালাগাল পর্যন্ত করতে পারে।—তুমি সব জানো প্রীতি।

প্রীতি হয়ত বলবে, এটা কি বলছিস তুই! আমি কিছু জানি না।

—জানিস না তো গাড়িতে তুলে দিয়ে এলি কেন।

—মানুষটা একা, কোথায় যাবে জানা নেই। তোর আর ওর মন কষাকষি এতটা দাঁড়াবে জানতাম না। ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে ওর মনটা যদি একটু হাল্কা হয়। এমন একজন অন্তত আছে, তুই

বাদে, যে ওর শুভ হোক এমন চায়—এটুকু প্রীতি বলবে না, কিন্তু অনু, প্রীতির মুখ দেখলে তা ধরতে পারবে।

—আচ্ছা বলাইবাবু, সতীর আপনি বিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?

এমন আচমকা এবং অযাচিত প্রশ্নে বলাইবাবু কেমন বিব্রত বোধ করল। খুবই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। কিন্তু এই মানুষের ব্যবহারে, বলাইবাবু বড় আপনার জনের স্পর্শ পায়। তুদিনেই মানুষটা কেমন বলাইবাবুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ এই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এমন প্রশ্ন ! মানুষটা কি জানে, কি করেই বা জানবে, সতী কি কিছু বলেছে, বলেছে আমার কপাল মন্দ স্যার ! সতী কি একদিনের পরিচয়ে এমন বলতে পারে। বলাইবাবু ভাবছিলেন, কি উত্তর দেবেন।

সুভাষ বলল, অসুবিধা থাকলে থাক।

—না না······এই মানে !

—আমার খুব আশ্চর্য লাগছে, আপনি গ্রামের মানুষ, সতী এখানেই বড় হয়েছে। এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না দিয়ে আছেন।

বলাইবাবু অন্য কথায় আসার জন্যে বললেন, স্যার ঐ নৌকা আসছে। ডাকব। ও-পারে নিয়ে যাবে। আমরা বনের ভিতর ঢুকে যাব।

এখন সূর্যাস্তের সময়। বনের ওপরে লাল আলো। বর্ষার বন ঠিক সবুজ হয়ে আছে। আর এই সূর্যাস্তের সময়ে লাল আলো সবুজ বনকে অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলেছে। সুভাষ বলল, দূর থেকেই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর রঙ। কত বিচিত্র রঙ ফুটে উঠছে। আপনি এই বনের ভিতর, ঢুকে গেলে কি আর দেখতে পাবেন। বরং এখানে দাঁড়িয়ে দেখুন। ভিতরে ঢুকে গেলে এই যে রহস্য জেগে উঠেছে গাছপালা পাখির ভিতর সব ধরা পড়ে যাবে। কিছুই আর আমাদের তখন ভাল লাগবে না।

সুভাষের দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছিল। বিদ্যালয়ের সঙ্গেই কোয়ার্টার বলে সব সময় এই স্কুলেই সে থাকতে পায়। স্কুলের মাঠে এখন সবুজ ঘাস। সামনে ফুল-ফলের গাছ। নানারকমের পাখি উড়ে আসে। সুভাষ এই সব পাখির নাম জানে না। মাঝে মাঝে সতী, চা, জলখাবার অথবা বিদ্যালয়ে যাবার মুখে অফিসে এলে সে পাখিদের নাম জিজ্ঞাসা করে।

--এ-পাখির কি নাম সতী?

—ফুল-বাউড়ি।

—বেশ পাখিটা। দেখতে চড়াই পাখির মত।

—ঠিক চড়াইয়ের মত নয়। চড়াইয়ের বুকের দিকটা সাদা, ওর বুকের রঙ লাল। ঠোঁটে গোঁফ আছে দেখবেন।

—তুমি এত লক্ষ্য রাখো সতী।

—মাঠে যত পাখি আসে আমি সব তাদের চিনি।

—তুমি আমাকে পাখি চিনিয়ে দেবে?

সতী হাসে! কোন কথা বলে না। চক, ডাষ্টার নিয়ে তার স্কুলে চলে যায়। সেখানে তার নীচে যারা কাজ করেন, গুণে গুণে চক ডাষ্টার দেয়। ক'টা চক লাগল, তার একটা হিসাব বলাইবাবুকে বিকাল হলে দিতে হয়।

সুভাষ বলল, বলাইবাবু আপনার কাজ আমার ভালো লাগে না।

—কেন স্যার। বলাইবাবুকে কেমন ভীত দেখাল।

—এই যে আপনি প্রাথমিক সেকসানে কটা করে চক পেনসিল দিচ্ছেন তার হিসাব রাখছেন।

—তা না হলে স্যার কথা উঠবে।

সুভাষ বলল, ষ্টক রেজিষ্টারে এবার কখন দেখব, ক' গ্লাস জল খরচ হয়েছে তারও একটা হিসাব থাকবে।

—থাকলে ভাল হয় স্যার, গ্রামে কিসে যে কথা উঠে যায় !

সুভাষের বলার ইচ্ছা হল, এই যে মেয়ে আপনার, স্থির অকপট, দেখলেই মনে হয় সতীকে সে যেন এক জগতে বসবাস করছে, যেখানে আমাদের মত মানুষ কেবল দূরের মাঠ দিয়ে হেঁটে যায়, কাছে কে আছে তার, টের পাওয়া যায় না। কি যে মেয়ে আপনার মশাই, এতটুকু সংকোচ নেই। যেন এই মেয়ের সঙ্গে কতকালের পরিচয়, এমন কিন্তু আমি দেখিনি! মেয়েতো নয়, একেবারে নদীর নীচে ইলিশ মাছটির মত। উজান পেলেই লেজ নেড়ে খেলা করছে, উজানে উঠে যেতে চাইছে। বস্তুত সুভাষের মনে সতীকে দেখলেই গভীর জলে, রূপোলী রঙের একটা ইলিশ মাছের ছবি ভেসে উঠে। কি সুন্দর সেই মাছ, চিকচিক করছে, নির্মল জল, সুভাষ যেন জলের ওপরে উঁকি দিলে গভীর জলে একটা রূপোলী ইলিশ দেখতে পায়। মাছটা টের পাচ্ছে না, জলের ওপরে দুই চোখ, ঠিক যেন দুই নক্ষত্র, মাছের খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। সুভাষ যেন বলতে চাইছে, মশাই জলের হিসাব রাখছেন, মেয়ের হিসাব রাখছেন না! ফুর ফুর করে মেয়ে আপনার যে উড়তে চায়।

যখন সন্ধ্যা নেমে আসে, সূর্য নদীর পাড়ে অস্ত যায়, তখন এই স্কুল কেমন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। এদিকে গ্রামের পথ নয় বলে, কেউ বড় এদিকটাতে আসে না। যারা বিলে নৌকা নিয়ে যায়, তারা খালের ওপারে যে পথ আছে সে পথে গ্রামে উঠে যায়। লাইনের ধারে যে সব রাখালেরা গরু নিয়ে আসে তারা সন্ধ্যার আগেই গাঁয়ে উঠে আসে। সুতরাং সন্ধ্যা হলে থাকে এই বিদ্যালয়, এই বড় বারান্দা, ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলে, দপ্তরি আদিনাথ লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাড়ি চলে যায়, আর এদিকটাতে কেউ আসে না। তখন থাকে শুধু বলাইবাবুর ঘর। এই কোয়ার্টারে অন্ধকারে বসে থাকলে, বলাইবাবুর ছেলে মেয়েদের কণ্ঠ ভেসে আসে। সতীর

শাসনের গলা শোনা যায়। নিরিবিলি বসে সতীর কথা শুনতে ওর কেমন ভাল লাগে। সতী ওর ভাইবোনদের এ-সময়টায় পড়াতে বসে।

এক হাতে এই মেয়ে এত করছে। বাপের সংসার আগলাচ্ছে। বলাইবাবুর সামান্য মাইনে। সংসারে সংকুলান হয় না। সন্ধ্যা হলেই তিনি একটা লণ্ঠন হাতে গাঁয়ে উঠে যান। যাবার সময় বলে যান, স্যার ওরা থাকছে, আমি টিউসানিটা সেরে আসি।

সুভাষের একদিন বলার ইচ্ছা হল, আচ্ছা সতী, তোমার বাবা যখন টিউসানিতে যান, আমাকে লক্ষ্য রাখতে বলেন। এর আগে কে তোমাদের লক্ষ্য রাখত। এত বড় মাঠের ভিতর স্কুল, তোমরা এই ক'জন ভাইবোন। তোমাদের ভয় পাবারই কথা।

সতী হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল, ওটা বাবার স্বভাব। আপনি না থেকে যদি আদিনাথ থাকত, তাকেও বাবা বলে যেতেন, দেখিস রে। অনাদিনাথ তো সন্ধ্যা হলেই বাড়ি! আসবে রাত বারোটার পর। ও নামেই নাইট গার্ড। এই সম্পত্তি এমনি পড়ে থাকে।

—তোমার ভয় করে না সতী! সুভাষ কি ভাবে যে আপনি থেকে তুমিতে এসে গেছিল টের পায় নি। বস্তুত এই মেয়ের এক অদ্ভুত স্বভাব আছে। এমন আত্মীয়ের মত ব্যবহার এক গ্রাম্য মেয়ের কাছে পাবে আশাই করতে পারে নি। কি নিঃসঙ্কোচে সে তার ছোট ভাই সুহাসের সঙ্গে আসে, বিছানা পরিপাটি করে বিছিয়ে দেয়, জল রাখে, লণ্ঠনের আলো মৃদু রেখে চলে যাবার সময় রোজ একবার করে বলে যাওয়া, এই যে বড় মাঠ দেখছেন স্যার, এখানে রাতে জ্যোৎস্না নামলে একধরনের পাখি আপনার সেই বন থেকে উড়ে আসে। আপনার সহসা মনে হবে অনেকগুলি যুবতী মেয়ে কলরব করছে। পাখিদের কিচির মিচির শব্দ তেমন মনে হবে। মনে হবে আপনার, মাঠে কত সব যুবতী মেয়েরা এসে জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথবা কোন কোনদিন, সতী বলে,

রেল-লাইন পার হলে যে বিল, বিলের জল কার্তিক শেষ না হতেই সরে যাবে। তখন মনে হবে শুকনো মাঠ। কেবল খানা-খন্দে জল থাকে। তখন সেই মাঠের জ্যোৎস্না এক বিস্ময় সকলের কাছে। এই গ্রামের বৈকুণ্ঠ সাহার মেয়ে সেই মাঠে সাদা জ্যোৎস্নায় হারিয়ে গিয়েছিল। ওকে পাওয়া যায় ভোরের দিকে, সে একটা কদম গাছের নীচে চুপচাপ বসেছিল। সকলে বলাবলি করছিল, এমন কেন হয়। বড় মাঠে সাদা জ্যোৎস্না থাকলে যুবতীর প্রাণে এক ব্যথা জাগে। সে স্থির থাকতে পারে না। কিসের সন্ধানে সে নিরুদ্দেশে চলে যেতে চায়! আপনাকে একদিন জ্যোৎস্না দেখাতে নিয়ে যাব।

সেটা কবে, সুভাষের জানার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সতীর, পরদিন ঠিক অন্য কথা, স্যার বাবার যা কাণ্ড না!

—কি কাণ্ড!

—বাবা রাতে বিলে তিতির ধরতে গেছিল।

—তিতির!

—হ্যাঁ তিতির। আপনি তিতিরের মাংস খাননি!

—নাতো।

—বা রে কি সুন্দর মাংস। আপনি খাননি—তাহলে আর কি খেলেন! যে লোকটা তিতির দিয়ে যায় এ-সময়, সে লোকটা এবার মরে গেছে। আর আসবে না। বাবা বললেন, বছরকার জিনিস তোরা খাবি না। বলে নিজেই জাল বুনে তিতির ধরতে গেছেন।

—আমাকে নিয়ে গেলে পারত।

—আপনি যেতেন স্যার?

—বা রে যেতাম না। তিতির ধরার বাসনা যে আমার অনেক দিনের।

—আপনি কলকাতার মানুষ। কলকাতার মানুষেরা তিতির ধরতে যাবে কেন?

—তা সত্যি বলছ।

—আমার খুব ইচ্ছা হত স্যার একবার কলকাতা যাব।

—এতদিন যাওনি কেন?

—গেলে কোথায় উঠব তাই ভাবনা ছিল। এবার আর ভাবনা থাকবে না। আপনার বাসায় উঠব।

—আমার তো সেখানে বাসা নেই।

—বা বৌদি! তিনি কোথায়! সতী অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল। সুভাষের মুখ দেখার বাসনা। কিন্তু ম্লান জ্যোৎস্নায় সুভাষের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সে এ সময়টাতে অন্যদিন পায়চারি করে মাঠে। চারিদিকে কাটাতাঁরের বেড়া। শুধু হাটবারে কিছু লোক এই পথে দূরের গঞ্জে যায়। অন্যথা কোন মানুষের শব্দ কানে আসে না। এ-সময় সতী এসেছে। ওর ভাই বোনেরা পড়ছে। সতী গল্প করতে আসে। আজকাল আর সতীর তেমন জড়তা নেই। অনেকটা আপনজনের মত ব্যবহার। সে বারান্দায় সতীকে লণ্ঠন হাতে উঠে আসতে দেখেই আর ঘরের বার হয়নি। দুটো চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে গেছে।

সুভাষ বলল, বলাই বাবু কখন ফিরবেন।

—আজ রাতে অন্ততঃ ফিরছেন না।

—একলা তোমরা থাকতে পার।

—পারি, না পেরে উপায় কি বলুন। বাবাকে স্কুলের কাজে প্রায়ই শহরে যেতে হয়। শহরে গেলে বাবা আর সেদিন ফিরতে পারেন না। নাইট গার্ড আদিনাথের ওপর বাবার ভরসা।

—তা হলে তোমার সাহস আছে বলতে হবে।

—লোকে এটা অবশ্য বলে।

—তুমি কতদিন এ-স্কুলে চাকরি করছ?

—তা চার বছর হবে। গত বছর বেসিক ট্রেনিং দিয়ে এসেছি।

—তোমার ভাল লাগে এ-কাজ?

—খুব ভাল লাগে।

—এ-জায়গাটা ?

—অন্য কোন জায়গার কথা ভাবতেই পারি না।

—বিয়ে হলে তো অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। কষ্ট হবেনা তখন ?

সতী কেন জানি চুপ করে গেল। —আজ একটু তাড়াতাড়ি আপনাকে খেতে হবে।

— কেন বল তো।

—বাবা ফিরছেন না। অন্যদিন বাবার জন্য বসে থাকি।

—তা হবেখন। আজ বাবা নেই। শুধু আমার জন্য রাত জাগতে তোমার ভাল লাগছেনা।

সতীর মুখে ভরা চোখ, লণ্ঠনের আলো নিবু নিবু। মাঠে ঘাসে ঘাসে শিশির পড়ছে। রেল লাইন পার হলে নীল আলো। বোধ হয় একটা ট্রেন আসছে। ঘুন্টিঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে ঘুন্টিম্যান নির্জন এক মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। সুভাষের কথা বলতে বলতে সেই আলো দেখার ইচ্ছা হল। অথবা মনে হল যেন সতী এখানে এসেছে সেই দূরের নীল আলো দেখার জন্য। জ্যোৎস্নায় অনেক দূরে, কিছু গাছগাছালির ফাঁকে নীল আলোটা অদ্ভুত একটা শব্দহীন প্রতিধ্বনি তুলেছে, সুভাষ এবং সতী অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। সতী সুভাষের কথার কোন জবাব দিল না।

সতী জবাব দিল না বলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল সুভাষ। —তুমি বরং এক কাজ করবে সতী, খাবারটা আমার ঘরে রেখে দিও। সময়মত খেয়ে নেব।

—স্যার একটা কথা বলব ?

—বলো।

—এটুকু সময় জেগে থাকার অভ্যাস আছে। আমি তার জন্য বলিনি স্যার। বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন। এটা হেমন্তকাল, খিচুরি

রান্না হয়েছে। গরম গরম আপনার খেতে ভাল লাগবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে আপনার কষ্ট হবে।

সুভাষের প্রীতির কথা মনে হল। সেদিন কি বার ছিল সে মনে করতে পারছেনা এখন। প্রীতি কি কারণে এসেছিল! তখন অনুর সঙ্গে মন কষাকষি মাত্র আরম্ভ হয়েছে। বান্ধবী প্রীতি কি কারণে খোঁজ নিতে এসে দেখেছিল, সুভাষ সারাসকাল কিছু না খেয়ে আছে। কোন হোটেলে খেয়ে নেবে এই ঠিক ছিল। তারপর প্রীতি, অঃ এতক্ষণে মনে পড়ছে, প্রীতি ভুল করে স্টেথিস্কোপ ফেলে গিয়েছিল। একদিন, দুদিন গেল, দু সপ্তাহ গেল, প্রীতি এলনা, সুভাষ বাসায় ফিরেই রামচরণকে বলত, প্রীতি ফোন করেছে কিনা, প্রীতির কোন ফোন নেই জেনে, সেই কেমন অধৈর্য হয়ে ফোন করে বসল। তারপরই প্রীতি চলে এল। যেন এক সংসারে আগুন লেগেছে, এই সংসার আর সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবেনা, সংসার ভেঙে যাচ্ছিল, প্রীতি দেখেই টের পেয়েছে সুভাষের মুখ শুকনো, মানুষটা অভিমান করে মরে যাবে। সে রামচরণকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। সে নিজে কোথাও খেয়ে নেবে। প্রীতির এ-সব ভাল লাগেনি। সে নিজেই বাজার করিয়ে আনিয়ে কি সুন্দর করে গরম খিচুরি, ঘি এবং ডিম ভাজা এবং আরও কি সব যেন, সে একটু অন্যমনস্ক হলেই কেবল প্রীতিকে মনে করতে পারে। সেই সব প্রীতির স্মৃতি এবং কলকাতার জীবন ফেলে সে এখন একটা অজ পাড়াগাঁতে এসে যেন কতদিন পর প্রীতির মত একটি মেয়ে পেয়ে গেছে। যেন এই মেয়ে ওর জন্য এখানে বসে প্রতীক্ষায় ছিল। ওর চুল কি ঘন। সাদা পোশাক পরতে ভালবাসে সতী। একগাছা করে সোনার চুড়ি। পাতলা ষ্ট্র্যাপের স্যাণ্ডেল। মেয়ের মুখে সব সময় এক রহস্যময় হাসি। সুভাষ মাঝে মাঝে কেমন বিব্রত বোধ করে। এই যে মেয়ের পরিচর্যা, সবসময় একটা সংকোচ ভাব, 'বুঝি এই সেবায় ত্রুটি ঘটে গেল—' কি যেন এক কুণ্ঠা মেয়ের সব সময়,

সুভাষের এখন মনে হয় মেয়ের এই কুণ্ঠা এই জগত জীবনের পক্ষে উপযোগী। কেবল স্যার স্যার ডাকা। তার এ-সব ভাল লাগে না। অথচ কি বলবে, স্যার বাদে আর কি নামে ডাকা যায়। সব স্কুলটা ওর অধীনে। ক্রমাসেই সুভাষ স্কুলের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। সে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। পাশে নারকেল গাছ এবং পাতা-বাহারের গাছ, দূর থেকে দেখলে মনে হবে এক তপোবন। সারাদিনের ভিতর সুভাষ কেমন এতটুকু ফুরসত পায় না। স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে সে হৈ চৈ করে সব মাঠ চষে ফেলেছে। নতুন ঘাসের বীজ লাগিয়েছে। মোয়ার আনিয়ে সমতল করে ফেলেছে মাঠ। খেলার মাঠ আলাদা করে দিয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের ছেলে বুড়োরা হাওয়া খেতে চলে আসে। হেমন্তের এক রাতে কি জ্যোৎস্না উঠেছিল! ছেলেপুলেরা, বৃদ্ধ-সকল, সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মাঠে পাতাবাহারের গাছের নীচে, এবং কৃষ্ণচূড়া অথবা যে সব কদম ফুলের গাছ আছে সেখানে ওরা প্রায় যেন পার্ক সমতুল্য জায়গায় বেড়িয়ে গেছে।

দু চারদিন ঘন বৃষ্টি হয়েছে। এ-সময় বৃষ্টি হলে খারাপ। ফসল কাটার সময়। শীত আসার আগে তিতির বিলের জলা জমিতে উড়ে যাবে—এসময়টা জলা জমির পাশে দলবেঁধে চলাফেরা করবে। রাতে অধিক আলো জ্বলে উঠলে পথ দেখতে পায় না। বেশীদূর উড়াল দিতে পারে না। গ্রামের মানুষেরা তখন পাখি শিকারে যায়। হাতে লণ্ঠন থাকে, মাথায় জাল থাকে, বাঁ হাতে একটা কাঁসি, কেউ ঘণ্টা বাজায়। দূর বিলের জলে আগুনের রঙ জ্বলতে থাকে। পাখিরা তখন ছোটে। কাঁসির শব্দে, ঘণ্টার শব্দে পাখিরা ছুটতে ছুটতে সহসা ভয়ে থমকে দাঁড়ায়। তখন মাথার জাল, খেপলা মেরে ফেলে দেওয়া। বলাইবাবু আজ নিশ্চয়ই দুটো তিতির ধরে আনবে। তিতিরের মাংস খেতে সুস্বাদু।

ক্রমে এটা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সুভাষের আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই। ছুটি ছাটাতে সে কোথাও যায় না। এখানে এসে সুভাষ এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপাত করতে থাকল। মাঝে মাঝে একাকি যখন জ্যোৎস্নায় সে স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকত, সন্ন্যাসী প্রায় দেখতে, সে উঁচু লম্বা মানুষ, মুখে তার পাদ্রি সুলভ চেহারা; বিদ্যালয়কে প্রাণের চেয়ে বেশী না ভালবাসলে এমন হয় না। শুধু রবিবারটা সে সকলের কাছ থেকেই ছুটি নেয়। এমন কি সেদিন বলাইবাবু পর্যন্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন কাজ কর্ম নিয়ে আসতে সাহস পায় না। অন্যদিন সে কিছু গরীব ছাত্রের দেখা শোনা করে। নিজে সে তাদের পাঠ নেয়। উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের স্কুল ছুটি হলে কোচ দেয়। একটা পরিবর্তন এনেছে। এবং এই বিদ্যায়তনের সামনে দাঁড়ালে মন্দির সদৃশ মনে হয়। কুটো গাছটা পড়ে থাকবার জো নেই। আগে যে সব ফুলের গাছ অবিন্যস্ত ভাবে ছড়ানো ছিল, সুভাষ এই সব গাছের নীচে বেদি করে, তা সাজিয়ে রেখেছে। বিদ্যালয়কে এত সুন্দর এবং সুশ্রী করে তুলেছে যে পথিকেরা এই স্কুলকে দেখলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায়। যেন এক সজীব স্পর্শ রয়েছে, চারিদিকে শস্য ক্ষেত্র, মাঝে সাদা লম্বা পাকা বাড়ি, ডানদিকে বাংলো সদৃশ কোয়ার্টার। দশটা বাজলে প্রার্থনা। প্রার্থনার পর সুভাষ আধ ঘণ্টার মত ছাত্রদের নিয়ে সারা স্কুলে কোথায় কুটো গাছটা পড়ে থাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনে। এমন করে এই স্কুলের যখন সে প্রায় প্রাণের মত তখন একদিন বলাই বাবু শহর থেকে খবর নিয়ে এল, স্যার সেই যে সহর থেকে রাস্তাটা আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার কথা আছে, ওটার কাজ দেখলাম আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুভাষ কিছু উত্তর করল না। ওকে বিষণ্ন দেখাল। এমন একটা

খবরে উৎসাহিত হবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য মানুষটার এতটুকু আনন্দের প্রকাশ নেই। কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমাদের রিফুজি গ্রাণ্ট যেটা পাবার কথা ছিল, তার কতদূর দেখলেন।

—তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব। জেলা অফিস থেকে রেকমেণ্ড করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

—রিটার্ণে কোন ভুল আছে? সুভাষ একটা অন্য রকমের প্রশ্ন করল।

—কোন রিটার্ণের কথা বলছেন স্যার।

—এনুয়েল রিটার্ণ।

—স্যার আপনি দেখেছেন, আমি এত চেক করে দিলাম, ভুল থাকার তো কথা নয়।

—আমার কিন্তু কেন জানি কেবল মনে হয়, ওখানে একটা ভুল আছে।

বস্তুত সুভাষ সহসা এই ধরণের একটা প্রশ্ন করে বলাইবাবুকে রাস্তা সম্পর্কে অনুৎসাহী করে তুলল। বড় রাস্তাটার কথা মনে হলেই ওর বুকটা কাঁপে। শহরের সঙ্গে এই অঞ্চলের কোন সংযোগ এখনও গড়ে ওঠেনি। এটা বোধহয় আশীর্বাদের মত। ওর কাছে ভয়াবহ, কেন জানি এই সড়ক ওকে আবার অন্য কোথাও নিয়ে যাবে, এই সড়ক শেষ হলে মনে হয় শহর থেকে সেই মানুষটা আবার চলে আসবে, নেড়া মাথা ছিন্ন জামা গায়ে, পিঠে একটা মই বেঁধে সেই মানুষটা সিনেমার বিজ্ঞাপন মেরে মেরে চলে যাবে। সে বলাইবাবুকে বলল, আপনাকে কাল আবার ডি, আই অফিসে যেতে হবে।

—কেন বলুনতো স্যার।

—এনুয়েল রিটার্ণটা চেয়ে নেবেন। আমি চিঠি দিয়ে দেব। চিঠি দেখালেই কান্তি বাবু আপনাকে ওটা দেখতে দেবে। আপনি ভাল করে আর একবার চেক করে দেবেন।

বলাইবাবুর এটা একটা কাজ হয়ে গেছে। অন্য সময়ে যারাই প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছিল, তারা নিজেরা কাজে কর্মে শহরে গেছে। সঙ্গে বলাইবাবু গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই মানুষ শহরে যেতেই চায় না। শহরের নামে এই মানুষ কেমন ভয় পায়। একজন অপরাধীর মুখ ভেসে উঠতে চায়। বলাইবাবু বললেন, স্যার চলুন আপনিও। এখানে এসে সেই যে আস্তানা গাড়লেন আর কোথাও নড়লেন না।

কি কারণে বলাইবাবু সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। সতী একা একা জেগে ছিল। বলাইবাবু শহরে গেলেই মোটা মোটা বই নিয়ে আসে সুভাষের জন্য। যা কিছু আয়, সুভাষ এখন সেই আয় দিয়ে বই সংগ্রহ করছে। সুভাষের ব্যবহারে এমন এক আত্মীয় সুলভ প্রকাশ যে সতীর সব সংকোচ কেটে গেছে। যদিও 'স্যার' এই বলেই সে ডাকে, তবু কথায় বার্তায় প্রায় ঘরের মানুষের মতো। সুতরাং এখন সতীর কাজ হয়েছে রাত জেগে বসে থাকা। পাড়াগাঁয়ের দশটা অনেক রাত, সে একা একা চলে আসে বারান্দায়। এবং চেয়ারেতে বসে থাকে—মানুষটা কি করছে দেখে। নিবিষ্ট মনে ঘরের ভিতর লণ্ঠনের আলোতে যে কি এত পড়ে মানুষটা! সে মাঝে মাঝে দুটো একটা বই নেড়ে চেড়ে দেখেছে—কি সব বই। নাটক সম্পর্কেই প্রায় বই, এবং কিছু কিছু বই আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে। মাঝে মাঝে সতী প্রশ্ন করলে কোন সঠিক উত্তর পায়নি। হেসে বলেছে, একা মানুষ কি আর করি। সময়টাতো কাটাতে হবে।

এভাবেই একদিন সুভাষ বলেছে, সতী তুমি চুপচাপ বসে না থেকে পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে পার।

—কে দেখাবে বলুন।

—কেন, আমি দেখাব। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না।

—পারব না কেন ?

—তবে ?

আমার কাছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারটা বড় নয়। সময় অসময়টা বড়। আপনার সময় নাও হতে পারে।

—তার মানে !

—মানে, আপনি সময় করে নাও উঠতে পারেন।

—বেশ কথা শিখে গেছ।

—কথা মেয়েদের স্যার শিখতে হয় না। কথাটাই ওদের সম্বল।

—তুমি ভুল বললে।

—কি ভুল।

—কথাটা তোমাদের সম্বল হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না বলুন। স্ত্রী-স্বামীকে আর কি দিয়ে সুখী রাখতে পারে।

—সেবা দিয়ে।

—শুধু সেবা দিয়ে হয় না। চুপচাপ সেবা করলে দাসী বাঁদি মনে করে।

সুভাষ লণ্ঠনের আলোটা আরও উসকে দিল। মুখ দেখল মেয়ের। কি যেন বলতে চাইছে এসব কথায়। এতদিন সে এখানে আছে, সকলে জানে সে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সৎ মানুষ। ওর আচরণে এমন কোথাও কোন চিহ্ন থাকে না যা মানুষকে ব্যথিত করে। কি এক সরল সহজ প্রাণ। অন্যান্য শিক্ষকেরা পর্যন্ত কি কারণে ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। এই স্কুলে সে মোটামুটি 'সবে মিলি করি কাজ' এমন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। সতী শিক্ষয়িত্রী। সতীকে আরও বেশী কাজের ভার দিয়েছে। প্রাথমিক সেকশনে আরও দুজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, সুভাষ তাঁদের ডেকে নানারকম উপদেশ দিয়েছে ; যেন কত বড় সে এক মানুষ এসেছে শহর থেকে, এই গ্রাম বাংলায়, যেখানে নদীর জলে নির্মল বাতাস, বনে নানা

রকমের পাখি, সূর্যাস্তে লাল রঙ গাছগাছালির ওপর, আর হেমন্তের সেই বড় মাঠে পাখি ধরবার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র—এই সব মিলেই এই গ্রাম। সুভাষ কোনদিন সতী অথবা অন্য কাউকে প্রশ্ন করে সতীর জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চায় নি। অদম্য কৌতূহল ওর আছে। তবু বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে এইসব ঔৎসুক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে ভেবেছিল, বলাইবাবু একদিন না একদিন এই মেয়ের সম্পর্কে বলবেন। কিন্তু তিনি এতদিন কিছু বলেন নি। ওর কিছু বলার ইচ্ছা হল এ-সময়। লণ্ঠনের আলোটা খুব বাড়িয়ে দিলে ঘরটা সহসা কেমন বড় বেশী আলোকিত হয়ে উঠল। বলল, সতী তোমার এখন বয়েস কত ?

—কত হবে আপনার মনে হয়। সতী মুখে কাপড় দিয়ে হাসল।

—তুমি হাসছ কেন ?

—আপনি আমার বয়স জানতে চেয়েছেন।

—কেন জানলে তোমার অসুবিধা হবে ?

—মেয়েদের দুটো জিনিস স্যার জানতে নেই।

—কি জিনিস বলতো ?

—এক বয়স। দুই ওরা কবে কোথায় প্রেম করেছে।

—কেন বলতো ?

—এ-সম্পর্কে মেয়েরা কোনদিন সত্য কথা বলে না।

—তার মানে ?

—মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। রাত অনেক হয়েছে, এবারে খেতে চলুন।

—সতী আমার কিন্তু অদ্ভুত লাগছে। তুমি যে সেই প্রথম দিন থেকেই একটা নিঃসঙ্কোচ ভাব নিয়ে এ-ঘরে আসতে আরম্ভ করেছ, তোমার ভয় করে না !

—কিসের ভয়।

—সমাজের ভয়।

—সমাজ কি আর আছে !

—নেই বলছ ?

—থাকলে আমি আসতে পারতাম !

—তুমি এটা ঠিক বলছ না সতী। এড়িয়ে যাচ্ছ।

এবার সতী কেন জানি ভাল করে আঁচল দিয়ে শরীর ঢেকে দিল। ওর শীত শীত করছে। এখনও হেমন্তকাল। এখন শীত পড়ার কথা নয়। সে বলল, এখন উঠুন তো, এবারে খাবেন। আমি বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।

—কোথায় জানাবে ?

—বাড়িতে।

—তুমি সতী একেবারে আহাম্মক।

—আপনার যা খুশি বলতে পারেন।

—আমি ছুটি ছাটায় কোথাও যাই !

—সে অভিমান হতে পারে।

—আমার কে আছে বলো !

—আমি কি করে জানব আপনার কে আছে।

—সত্যি বলছি. আমার কেউ নেই। এখানেই চিরদিন থেকে যাব ভাবছিলাম।

—আপনি শহরের মানুষ, এখানে আপনার মন টিকছে কি করে ভাবতে অবাক লাগে।

—জানিনা কি করে টিকছে। একটা সত্যি কথা বলব ?

—বলুন।

—আমার সত্যি জায়গাটা ভাল লাগছে। আর কোথাও হয়ত যেতে পারব না। বলে, আজ প্রথম সুভাষ মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। সিঁথিতে সে সিঁদুরের চিহ্ন দেখতে পেল। তার আর বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সে কি তবে ভুল দেখেছে। তিন চার মাসের ওপর এই অঞ্চলে সে চলে এসেছে। প্রতিদিন কাজে

অকাজে সতীর সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। সে কোনদিন সিঁথিতে সিঁদুর দেখেনি। না কি সে লক্ষ্য করেনি। সে কি মুহ্যমান ছিল। স্ত্রী অনুকে পরিত্যাগ করে এবং প্রীতির ভালবাসা ফেলে এই যে বনবাসে চলে আসা. এই যে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া, ভিতরে ভিতরে সে কি এতদিন আবেগে অন্ধ ছিল! পুরুষ মানুষের এমন স্বভাব হবে কেন! যুবতী মেয়ের কপালে সিঁদুর নেই, সিঁথিতে এমন সামান্য সিঁদুরের চিহ্ন যে ধরা যায় না হয়ত। অথবা এও হতে পারে, সতী সুভাষের দুর্বলতা ধরে ফেলেছিল, বাঙালী মেয়ের যা হয়, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য এমন মনে হয়ে যাওয়ায় সতী আজকাল মোটা করে সিঁথিতে সিঁদুর পরছে।

সুভাষ বলল, সতী তোমার মানুষটির খবর তো কোনদিন দাওনি।

—খবর দেবার মত তিনি এমন কেউ নন।

—তুমি এখানে থাক, তিনি রাগ করেন না।

সতী হাসল।

—আচ্ছা সতী আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

—কি বুঝতে পারছেন না!

—এই যে এতদিন থাকলাম. মনেই হয়না তোমার বিয়ে হয়েছে!

—মনে হতে দিইনি।

—তার মানে।

—মানে কি মেয়েরা সব খুলে বলতে পারে!

—তা পারেনা কেন!

—আচ্ছা স্যার আপনাকে কিন্তু খুব বুদ্ধিমান মনে হয় অথচ এমন সব প্রশ্ন করেন……

সুভাষ চুপ করে গেল। বাইরে অন্ধকার এখন। নারকেল গাছের পাতা হাওয়ায় নড়ছে। ভিতরে লণ্ঠন এবং লণ্ঠনের আলোতে উভয়ের মুখ কেমন নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। সুভাষ আবার বই নিয়ে বসেছে।

সে যে এখন খেতে যাবে, সতী যে খাবারের জন্য ডাকছে। এ সব যেন সে ভুলেই গেছে।

সতী বলল, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন স্যার?

—আরে না না। রাগ করব কেন? সব কি সকলকে বলা যায়, না বলতে আছে।

সতী বলল, না এটাও আপনার রাগের কথা হল।

—এইরে তুমি দেখছি আমাকে রাগ করিয়ে ছাড়বে।

সতী বলল, উঠুন। অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার লোকে দেখলে সত্যি সন্দেহ করবে। আদিনাথের আসার সময় হয়ে গেল।

— এস না! সতী প্রায় টানতে টানতে মানুষটাকে বারান্দায় তুলে আনল।

সুভাষ স্কুল ছুটির পর হাত মুখ ধুয়ে মাত্র জানালায় দাঁড়িয়েছে তখনই দেখল সতী খুব খুশী খুশী মুখ নিয়ে উঠে আসছে। সুভাষ বুঝল সতী যে এ-কদিন একটু অন্যমনস্ক ছিল এই কারণে। বোধহয় প্রবাসে তার মানুষ থাকে, দীর্ঘদিন পর পর ছুটি, ছুটি পেলেই চলে আসে, আসার আগে চিঠি, আমি যাচ্ছি বৌ, আরও কত কথা লেখা থাকে হয়ত, এ-সময় মনে মনে এ-সব ভেবে সুভাষ হাসল। সতী স্বামী আসছে শুনেই বড় বড় করে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, প্রায় যেন সূর্য ওঠার মত ব্যাপার। শরৎ শেষ হবার মুখে সে একদিন খুব সকালে উঠে সূর্যোদয় দেখেছিল। তার আগে ক'দিন কি বৃষ্টি। তারপর রাতে আকাশ পাতলা হয়ে গেল। মেঘ তার বৃষ্টি নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে চলে গেল। সামনে সেই মাঠ—ফুলগাছগুলো এখন একেবারে এত সবুজ অথবা সবুজ বলা যায় না যেন, নীল গভীর নীল, এবং কখনও কালো রঙের মনে হলে, কি যে রঙ ধরা

যায় না, সূর্য উঠলে রঙের তারতম্য ঘটে, সকালে এক রঙ মাঠের, দুপুরে একরঙ এবং বিকালে অথবা জ্যোৎস্নারাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ নিয়ে মাঠ এই অঞ্চলে সেজেগুজে থাকে। সকালে উঠেই সুভাষ সূর্যোদয় দেখে প্রায় কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে মাঠ, ঝোপ জঙ্গল, বিচিত্র বর্ণের পাখিদের ভিতর সূর্যোদয় হচ্ছে। ধরণী কি শান্ত, মনে হয় স্থির হয়ে আছে, তারপর পাখিদের কলরবে মনে হয় এই এক্ষুনি ঘাগরা পরে নাচতে সুরু করবে। সূর্যোদয় মাঠে সোনার রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সে এতবড় সূর্য যেন কোনদিন আকাশে ওঠে জানত না। সে দেখে বিস্ময় মেনেছিল। ঠিক এই সতীর কপালে, এখন এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা প্রায় যেন সূর্য ওঠার মত। সে বলল, এস। মানুষটার দিকে মুখ তুলে বলল, আসুন। সতীকে এখন শরৎকালের মাঠ অথবা পাখির মত লাগছে।

সতী বলল, এইমাত্র এল।

—আর আসার সঙ্গে সঙ্গে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এলে!

—এলাম স্যার। আপনার পাশের ঘরটায় ও থাকবে।

সুভাষ ঠিক বুঝতে পারল না। এটা ওর কোয়ার্টার। দুটো শোবার ঘর, কিচেন এবং বাথরুম, সামনে বারান্দা। সে একটা ঘর ব্যবহার করে না এটা ঠিক। কিন্তু বিস্ময় লাগছে সতী খুব সহজ গলায় কথাটা বলছে।

সতী বলল, পাশের ঘরটাতে ও এলেই থাকে। আমাদের তো একটা ঘর।

সুভাষ নিজেই কেমন লজ্জা পেল। ওর সংশয় ছিল মনে। সতী যেন সুভাষের মুখ দেখেই টের পেয়েছে। সতী এই মানুষ সামনে থাকায় আরও অকপট হয়ে গেছে। সে একটা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিল মুখে।

—আপনার কোন অসুবিধা ঘটাব না স্যার। আমার মানুষটি খুব নিরীহ। দু চারদিন থাকবেন।

সুভাষের যেন এতক্ষণে মনে পড়ল, সতীদের একখানাই ঘর। এক ঘরেই সকলে থাকে। এই কোয়ার্টারে আগে কেউ থাকত না। ফাঁকা থাকত। বলাইবাবু প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। সুভাষ এবার খুব যেন, সে আর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নয়, সতীর সে বন্ধুস্থানীয়, আর এই মনোরম বিকেলে সতীর স্বামীকে দেখে কেন জানি খুব ভাল লেগে গেল। সে দু-একটা রসিকতা করেও ফেলল। কিন্তু স্যার আপনার নামটা তো জানা হল না।

—কি সতী তুমি আমার নামটা বললে না! ওনার নামটা বল। কতদিন আছি, টেরই পাইনি এই মেয়ের এক বর আছে, বিদেশে থাকে।

মানুষটা খুব কাচুমাচু গলায় বলল, এটা বলবেন না স্যার। আমি বিদেশে থাকি। আমার বাড়ি আছে। আপনি কি নলহাটি গেছেন?

সুভাষ বলল, না।

—নলহাটিতে নেমে যেতে হয়—রায়পুর।

সুভাষের এবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হল সতীকে, অথবা এই মানুষকে, সতী এখানে কেন, আপনি কদাচিৎ আসেন কেন, সতী শ্বশুরালয়ে যায় না কেন, আপনি না থাকলে সতী প্রায় যুবতী মেয়ে যেন অনূঢ়া, বিয়ে হয়নি, সাজ পোশাকে কেমন সন্ন্যাসিনী, এসব হয় কেন। অথবা বলার ইচ্ছা এই যে সতী এই মাঠের সব পাখির খবর রাখে, পাখিদের নাম বলে দিতে পারে, অথচ নিজের ঘরে কে আছে, ঘর বর চিনে নিতে যার এত কষ্ট, যে কেবল এই মধুপুর গ্রামে স্কুলের দিদিমণি সেজে আর কোথাও যেতে চায় না, নাকি এই মাটিতে ভালবাসার টান আছে। এসব ফেলে কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই সতীর—সতী কি যে চায় চোখ দেখে টের পাওয়া যায় না। আপনি কি মশাই জ্যোৎস্না রাতে সতীকে একা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, দেখলে হলপ করে বলতে পারি আপনি ওকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে দু দণ্ড থাকতে পারবেন না।

সতী বলল, স্যার আপনি এমন চুপচাপ।

—না মানে, অনেকটা পথ স্টেশন থেকে।

সতী বুঝল এই মানুষ এখন ভিতরে ভিতরে এত বেশী অন্যমনস্ক, এত বেশী ডুবে আছে, তা ছাড়া এখন চা দেবার সময়, এই সময়ে এই মানুষের কে আর আছে—সে বলল, তাহলে ওর মালপত্র বিছানা ও ঘরটায় রেখে যাচ্ছি।

সুভাষ কথা বলল না। শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সতীকে দেখে মনে হয় ঘাড়টুকু না নাড়লেও পাশের ঘরে সব মালপত্র তুলে দিত! হেসে বলত, স্যার আমরা এঘরে আছি। আপনার ঘুম না পেলে ডাকবেন, গল্প করে যাব, জলতেষ্টা পেলে ডাকবেন, জল দিয়ে যাব। আমরা সব সময় আপনার সেবায় হাজির।

সতী ওর মানুষকে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল! পাল্লাটা একটু ভেজিয়ে দিল। সুভাষের শরীরে কেমন শীত শীত ঠাণ্ডা ভাব। সুভাষের চোখ মুখ কেন জানি সহসা জ্বালা করতে থাকল।

ও-ঘরটা যথার্থই চুপচাপ। সতী এবং তার মানুষ পাশের ঘরে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ সময় নিচ্ছে। এতক্ষণ লাগে না মালপত্র রেখে বের হয়ে আসতে, একটা সুটকেস এবং বেডিং। সুভাষ উঠে পড়ল। দরজার বাইরে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওর কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। দরজা বন্ধ করা, না ভেজানো! সে মনে মনে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই অস্থিরতা জাগলে আর স্থির থাকা যায় না! সে হাঁটতে আরম্ভ করে। যেমন এই সেদিন সে অসীমকে হত্যা করার জন্য—কিনা করেছে। এমন এক ইচ্ছা তার, কি যেন হারিয়ে গেল জীবন থেকে। অনু অসীমের সঙ্গে অভিনয়ের পর যেমন মুখ করে থাকে, বোধহয় সুভাষ ঘর থেকে বের হবার মুখে সতীকে দেখে তেমন চোখে মুখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সে পাগল প্রায় বের হয়ে এসেছে। মনে হয়

এই সতী এক পরপুরুষের সঙ্গে তার পাশের ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে গেল। সে এবার ভাবল, না আর কিছু ভাববে না, ভাবলেই কেবল অনুর মুখ ভেসে আসে, অসীমের মুখ ভেসে আসে, কাঞ্চন ফুলগাছটার কথা মনে হয়! সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। এবার দ্রুত পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকল! গ্রাম পার হয়ে গেল। এবং নদী পার হতেই দেখল, একটা কাক জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কোন মরা জীব-জন্তু হবে হয়ত, দূরে, প্রায় মাঝ নদীতে একটা মানুষ কি জীবজন্তু বোঝা দায়, ভেসে যাচ্ছে, তার ওপর একটা কাক গলিত জীবের মুখ, চোখ ঠুকরে খাচ্ছে। এসব দেখে ওর অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল।

এখন নদীতে ভয়ঙ্কর স্রোত। জল বেগে নেমে যাচ্ছে। মাঘ ফাল্গুনে জল থাকে না। লম্বা এক নদীর চর থাকে শুধু। তখন ফুটি, তরমুজ অথবা একটু উঁচু জমি পেলে পটলের লতা, আর কি সব শস্য ফলিয়ে গ্রামের মানুষেরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায়। সুভাষ একটা বড় গাছ, বোধ হয় দেবদারুই হবে, তার নীচে দাঁড়িয়ে নদীর জল দেখতে দেখতে ওপারের বনে কোন কাঠুরে কাঠ কাটছে এমন শব্দ শুনতে পেল। কাঠ কাটার এমন শব্দ হয়! সে কেমন মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়ে কাঠ কাটার শব্দ শুনতে পেল। ঐ যে বন, কতদিন এখানে আসার পর থেকে বনে কি কি আছে, শোনা যায় কবে কুঠি ছিল একটা, যুবতী মেম ঘোড়া ছুটিয়ে দূরের শহরে যেত, গঞ্জে যেত। এখানে ছোট্ট এক বন্দর ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার ছিল বেনহার সাহেব। এখন কেউ কেউ এই জঙ্গলকে বেণু সাবের জঙ্গল বলে। সুভাষ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভাবল বেণু সাবের জঙ্গলে যেতে পারলে বেশ মনোরম হত। কেন সে জানে না, যেমন সে সব ফেলে ছুটে এসেছে, এই নির্জন নিঃসঙ্গ নিবাসে প্রায় বনবাসের মতো চলে এসেছে তেমনি সে ওপারের বনে যেতে চায়—সে নির্জনতা চায়, আর কিছু তার যেন এখন চাইবার

নেই। কাঠ .কাটার শব্দ ক্রমে কমে আসছিল। তারপর এক সময় একেবারে নিঃশেষে সব বন্ধ হয়ে গেল—কি ভয়ঙ্কর শব্দহীন বায়ুহীন মাঠ। সে দেবদারু গাছটার নীচে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দেবদারু গাছের কথা মনে হলেই, ওর সামনে সেই গাছ, নীল লাল কাগজের ফুল অথবা হলুদ রঙের রিবণ বাঁধা বালিকার মুখ, ওদের ফ্ল্যাটের সামনের পার্কে, দেবদারু গাছের নীচে বিকাল হলেই সব বালকবালিকার ভীড়, কোলাহল—সে যেন নদীর এই পাড়ে দাঁড়িয়ে এখন সব দেখতে পাচ্ছে। বড় বড় মাঠে সব বালকবালিকা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, কেবল এক ছোট বালিকা পিছনে পড়ে থাকছে। সে ছুটতে পারছে না। সুভাষের ইচ্ছা হচ্ছে কোলে তুলে নিতে। সে এবার নদীর ওপারে উঠে যাবার জন্য একটা ছোট্ট নৌকা খুঁজতে থাকল। বোধ হয় জেলেদেরই হবে, কিছু ছাত্র দূরের পথে যেতে যেতে দেখল, ·হেডমাষ্টারমশাই নদীর পাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা বলল, স্যার, পারে যাবেন। জেলেদের নৌকায় আমরা পারে যাব।

—তোমরা আমাকে নিয়ে যাবে?

—ওপারে এই বন পার হয়ে গেলে আমাদের গ্রাম।

—বনের ভিতরে পথ আছে?

—খুব সরু পায়ে হাঁটা পথ। শুকনোর দিনে গরুর গাড়ি নেমে আসে।

—এখন আসে না?

—বৃষ্টি হলে এত আগাছা যে কেউ তখন বন পার হয়ে নদীর পারে আসতে পারে না।

—তোমরা তবে যাবে কি করে?

—আমরা ঘুরে যাব। বাড়ি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

—চল আমিও যাব পারে। বলে সে ওদের নৌকায় চড়ে বসল।

—কোনাকোনি পাড়ি দিতে হবে!

—সে তোমরা যে-ভাবে পার আমাকে নিয়ে চল। কেমন ছেলে মানুষের মত মুখ নিয়ে সুভাষ এইসব তরুণদের সঙ্গে মিলে নানা রকমের গল্পে মেতে গেল। সে যে এখানে চলে এসেছে একমাত্র এখন সতীর জন্য, সতী স্বামীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে কি সব করছিল—কি যে করছিল বোঝা দায়। এই নদীর জল, শান্ত পরিবেশ এবং নানা রঙের বাবলা অথবা ধনে গাছ, তুত গাছের জঙ্গল নদীর ও-পারে এসব মিলে সে অন্য এক রহস্যের ভিতর ডুবে গেল। সতী এবং তার স্বামীর কথা মনে থাকল না। শীত শীত পর্যন্ত করছে না!, জলের ঘূর্ণিতে সে মুখ দেখার চেষ্টা করল। ঘোলা জল বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে দূরের দিকে তাকল—এবারে দূরে সে দেখলে সেই কাকটা যা এতক্ষণ একটা মৃত জীব জন্তুর চোখ মুখ ঠুকরে খাচ্ছিল, সে পর্যন্ত উড়তে আরম্ভ করেছে। সেও বোধ হয় সুভাষের মত—ওপারের জঙ্গলে যাবে। বনের সবুজে হারিয়ে যাবে। এই কাকেরও বুঝি সুভাষের মত মাঝে মাঝে এক শান্ত নদীর কথা মনে হয়, নির্জনতার কথা মনে হয়। তখন কেবল সবুজ দেশে হারিয়ে যাবার ইচ্ছা। সুভাষ নদীর পারে নেমে বনের ভিতর ঢুকে গেল।

সতী দরজা খুলে উঠোনে নামলে দেখল, পাশের ঘরে স্যার নেই। দরজা বন্ধ। কোথায় গেল। নদীর পারে। অথবা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। চায়ের সময় এখন। এ-সময় তিনি চা না খেয়ে কোথায় বের হলেন! সে কি ঘরে ঢুকে দেরি করে ফেলেছে! তা যা মানুষ, এতদিন পর, চলে এসেছে, কি যে মানুষটার ভিতর কাজ করে, দাদার সংসারে থাকে, যাত্রা পার্টিতে বিবেকের গান গায়,

নেশা ভাঙের সামান্য অভ্যাস আছে। বিয়ের সময় বাবা এ-সব জানতেন না। তখন এ-অঞ্চলে ময়ূরাক্ষির ক্যানেল হচ্ছে। ক্যানেল কনট্রাক্টর বোসবাবুর তাঁবুতে মানুষটা কাজ করত। কুলি খাটানো, মাপজোক করা, কুলিদের দেখাশুনা করা, আদায় পত্র সব এই মানুষের হাতে। মানুষটা ভাল বাঁশি বাজাত। তাঁবুর ভিতর বসে, যখন রাত হয়ে যেত, যখন এই বিলে অথবা সামনের মাঠে এবং গাছ-গাছালির ভিতর শুধু জোনাকি পোকা জ্বলত, তখন এই শঙ্কর এমন এক বাঁশির স্বরে এই মাঠের ভিতরে ডুবে থাকত যে সতীর বুকটা ঘরে ঢিব ঢিব করত। টেরি কেটে পান চিবোতে চিবোতে আসত ওদের বাড়ি। বলাইবাবুর অভাবের সংসার। শঙ্কর সতীকে মেলায় নিয়ে যেত, একবার শহরে নিয়ে গিয়েছিল এবং শঙ্করই প্রথম একটা বই কি যেন বইটা---বুঝি 'রামের সুমতি' এই বই দেখে সতী গ্রামের মেয়ে মুহ্যমান হয়ে গেছিল। তারপর যা হয়, সংসারের তালগাছটি বড় হয়, কাক এসে বাসা বাঁধে এবং দুপুর বেলায় কা কা শব্দ। ক্যানেলের কাজ শেষ হলে, বোসবাবু অন্য কাজে, অন্য কনট্রাক্ট পেয়ে দুর্গাপুরের ওদিকে, বোধহয় সাইথিয়া রঘুনাথগঞ্জ এবং অন্য কোথাও হবে শঙ্করকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁবুতে বাস। চারিদিকে পাহাড় অথবা মাঠ। রেল লাইন অনেক দূরে। পথ ঘাট নির্জন। সতীর কটা দিন বেশ ভাল কেটেছিল। কিন্তু বোসবাবু খোস মেজাজি লোক। জিপে করে চলে আসতেন তাঁবুতে। একটু রঙ্গরসের অছিলা। অন্ধকারে মাতাল বোসবাবুর কাণ্ড-কারখানাই অন্য রকমের। শঙ্কর চাকরি ছেড়ে দাদার সংসারে উঠে গেল। এই সংসার যেন কেমন, সতী যে সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখেছিল ক্রমে তা ভেঙ্গে এলে, বচসা, মারধোর। বলাইবাবু অনটনের সংসারে সতীকে নিয়ে এসে নতুনভাবে গড়তে গিয়ে দেখলেন, শঙ্কর বাবা-শঙ্কর হয়ে বোম ভোলা সেজে বসে আছে। যাত্রায় পার্ট করে, বিবেকের গান গায়, নেশা ভাঙ করে। মাসে ছমাসে চলে

আসে। এখন সতীর কাছে ওর শুধু এক কাজের জন্য আসা। টাকার জন্য। সতী দুটো চারটা টাকা মানুষটার জন্য সঞ্চয় করে রাখে, এলেই দিয়ে দেয়। যা সে করতে ভালবাসে করুক। এই যে কদিন দয়া করে ওর কাছে থেকে গেল, এবং বেশ এক রোমাঞ্চ—আর সতী এই মানুষ চলে গেলেই উদাসীন হয়ে যায়। তখন সিঁথির কথা মনে থাকে না। কেমন যেন মাঠের ভিতর দুটো তিত্তিরের চোখ কেবল চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ওর সিঁথি তখন শূন্য দেখায়। সূর্য ওঠেনা জীবনে। সতী পাগলিনী প্রায় এই মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে।

সতী ভাবল, এই স্কুলের মাঠে এবং কাছাকাছি কোথাও তিনি আছেন। সে চা করল। শসা কেটে নিল, মুড়ি তেলে মেখে কাঁচা পেঁয়াজ কেটে রাখল। স্বামী ওর আহারে পটু। দু চার মাস বাদে অথবা ছমাসে নমাসে এখানে এলেই খাব খাব করে। ভাল খাওয়া চাই। বলাইবাবু, মেয়ের প্রাণে কষ্ট হতে পারে ভেবে দুধ এনে পায়েস পিঠে এবং যে দিনের যা সব এনে জামাইয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। কারণ এই মেয়ে এখন রোজগার করে। মারধোর খেয়ে, অনাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ মেয়ে কেমন বাপের বাড়ি ফিরেই জেদী হয়ে গেল। পড়ে পাশ করল। এখন সংসারে সতী প্রায় ছেলের মত। সুতরাং সতীর স্বামী যা খেতে ভালবাসে, যে করে হোক দুদিন যেন ধরে রাখা। কেমন চোখ মুখ তার, গেরুয়া পোশাক। বাঁশিটা তেমনি যত্নের সঙ্গে কাছে কাছে রাখে। এবং লম্বা কম্বে আর যা কিছু প্রয়োজন, মস্ত মানুষের মত পোটলা পোটলি করে আনে। মানুষটা একসময় সতীর ওপর অত্যাচার করেছে মুখ দেখলে মনেই হয় না।

সতী বাইরে এসে মাঠেও দেখল, স্যার নেই। সে চা এবং জল খাবার করে এনেছে। স্বামী ওদের ঘরটায় বসে আছে। সতীর ছোট বোন উমার সঙ্গে এখন মানুষটা কষ্টি নষ্টি করবে। সে যতক্ষণ

পারে এই মানুষকে চোখের ওপর রাখে। কিন্তু স্যার গেলেন কোথায়। ওর মেজ ভাই ধ্রুবকে নদীর পারে পাঠালে, খবর এল সেখানেও নেই। না খেয়ে, বিকেলের জলখাবার না খেয়ে স্যার তো কোথাও যায় না। সতী তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গেল। কারণ দূর দেশ থেকে এলেই পরিশ্রান্ত চোখ মুখ—নাকি সতী এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল, দরজা ভেজানো ছিল, স্যার সব টের পেয়েছিল—টের পেয়ে কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এমন ভেবে সেই বনের ভিতর ঢুকে বসে আছেন—ক্লান্ত চোখ মুখ মানুষটার টের পেয়েছিল সতী। সে অনেকক্ষণ ঘরের ভিতর দেরি করে ফেলেছে। খাব খাব করে আসে, এসেই নিরিবিলি ঘর চায়, নির্জন বনভূমি হলে তো কথাই নেই, ঠেলে ঠুলে ঘরে নিয়ে যেতে হয়—আগে এই কোয়ার্টারে কেউ ছিল না বলে, এসেই মানুষটা বাড়ি না উঠে এই কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে হাঁক পাড়ত। বলাইবাবু থাকলে ছেলে মেয়েদের বলতেন, জামাইবাবুকে যন্ত্রনা ক'র না। তোমরা এদিকে এস। অর্থাৎ বলাইবাবু সব জানতেন, এবার সতী ওকে নিয়ে এল সঙ্গে। স্যারকে সকলেই ভয় পায়। কেবল সতী যেন কোথায় স্যার যে বড় দুর্বল মানুষ ধরে ফেলেছে। এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে মানুষটার ওপর জুলুম করছে।

আর এই প্রথম সতী তার মানুষের ওপর কেমন সামান্য বিরক্ত হল। এসেই ঘরে ঢুকে খাব খাব না করলে এত দেরি হত না। বস্তুত সতী চা জলখাবার দিতে দেরি করে ফেলেছে। সে ওর ঘরের দিকে ফিরে গেল। এখন হেমন্তের দিন বলে সূর্য বেশীক্ষণ আকাশে থাকে না। একবার ঢলে পড়লেই সন্ধ্যা। সে ঘরে ফিরে দেখল, সেই ঘরে এখনও আলো জ্বালা হয় নি। আলো না জ্বাললে ঘরের অন্ধকারটা মরেনা। জানালা নেই বললেই হয়। সূর্য ডুবতে ডুবতেই ঘর অন্ধকার হয়ে ওঠে। বিলের জল নেমে যাচ্ছে, সতী ঘরে ঢোকার মুখে সেই শব্দ শুনতে পেল। কোথায় তার স্বামী,

উমা কোথায়? বাবা কি কাজে গ্রামের দিকে বের হয়ে গেছেন। কেবল সবার ছোট বোনটা খালি গায়ে বসে পুতুলের ঘরে পুতুল সাজাচ্ছে।

সতী চা, জলখাবার রেখে দিল। হয়ত ওরা রেল পুল পার হয়ে গেছে। উমাকে এবার ধমক দেবে। গতবারও এই মানুষ এসে উমাকে তু-তুবার রেল ধারে নিয়ে গেছে। কি দেখাতে নিয়ে যায়! এখন এমন মুখ করে রাখে যেন তুদিন বাদেই সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে এবং হিমালয়ে চলে যাবে। বিবেকের গান গায় বলে, গেরুয়া পরতে হয়। এখন সেই পোশাক সব সময়ই গায়ে লেপ্টে রাখে। বৈরাগি বাউলের মত কাঠ কাঠ চেহারা করে ফেলেছে। গলায় কণ্ঠি। হাতে একতারা থাকলে বাউল-প্রায় মানুষ। মুখে তার নানা রকমের উদাসী গান। সে কি এখন লাইনে বসে উদাসী গান গাইছে। 'বন্দরে আর কতকাল পড়ে থাকবি কালাচাঁদ। নৌকা ভাসা, সাত সাগরে দিবি পার।' ওর সাত সাগর কোন খানে! এই যে মানুষ, যার বউকে বোসবাবু জোর জুলুম করে উপভোগ করেছিল, এবং দূর সম্পর্কের দাদা যার ওপর অপবাদ দিয়ে উপভোগ করার সুযোগ করে নিত, এখন এই মানুষের ওপর সে সব ভাবলে ঘৃণা হওয়া উচিত। শঙ্কর কোনদিন তেড়ে যায়নি। যেন জীবনে এ সব তার প্রাপ্য। নাকি ভাঁতুগোছের মানুষ। চুরি-চামারি করে খাওয়ার স্বভাব।

সতী সন্ধ্যায় যেমন রোজ ধূপ ধুনো দেয় তুলসী মঞ্চে, প্রদীপ রাখে আজ তেমনি রাখল। ডানপাশে একটু দূরে খালের ধারে ইরিগেসনের ছোট্ট এক বাংলো। শহর থেকে অফিসার এলে এখানে থাকে। বাংলোটা এখন খালি। কেউ থাকে না। গ্রামের চৌকিদার হেমন্ত এসে মাঝে মাঝে তদারক করে। সেই বাংলোতে বড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, গাছের মাথায় সাদা বক, আজ কি কেউ আসবে? হেমন্তের গলা পাওয়া যাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দ অথবা অন্য

কিছু হবে যার জন্য গাছের মাথায় সাদা বক উড়ে উড়ে কোথায় চলে গেল এবং রাত হলে ওরা আবার ফিরে আসবে। কারণ সতী জানে চারিদিকে এই সময় জল নামতে থাকে। নানা রকমের বক এবং পাখিরা জলজ ঘাসের পোকা-মাকর খেতে চলে আসে। সাঁঝ লাগলেই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। বিলের পাশে এই সব গাঁয়ে নানা-রকমের ঝোপঝাড় এবং গাছপালা তার ডালে অথবা পাতার ভিতর সারারাত লুকিয়ে থাকে। নিশুতি রাতে সতীর ঘুম না এলে সে পাখিদের শব্দ শুনে টের পায় রাত পোহাতে আর কত দেরী। সে এবার মুখ তুলে চারিদিকটা দেখল। নীল আকাশ—সেই মানুষটা এখন কোথায় একা একা হাঁটছে। আকাশের নিচে ঠিক দিগন্তে মনে হয় বড় একটা নক্ষত্র জ্বলছে। তিনি কি কোন নদীর পারে দাঁড়িয়ে এই উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছেন! সতীর ভিতরটা কেমন ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে গেল। মানুষটা শহরের মানুষ, অথচ এখানে এসে আর কোথাও গেল না। কি যেন রাজ্যের অভিমান মানুষটার ভিতরে জমা হয়ে আছে। কিছু বলে না, অথচ মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। দু দুটো ছুটিতে এখানেই পড়ে থাকল। কোন চিঠিপত্র নেই। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবহীন মানুষ যেন। না কি তিনি নিরুদ্দেশে চলে এসেছেন! মাঝে মাঝে ওর এক প্রশ্ন, সতী তোমাদের রাস্তাটা কবে শহর থেকে চলে আসবে। অথবা বাবাকে তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে থাকেন, আচ্ছা বলাইবাবু আপনার কি মনে হয় শহর থেকে যে রাস্তাটা আসছে, সেটা এ-মাসেই শেষ হবে।

—তার আগেও হতে পারে স্যার। আবার পরেও হতে পারে। সব সরকারের মর্জি। তবে যতদূর শুনেছি রাস্তার কাজ খুব দ্রুত শেষ করা হচ্ছে। হয়ত দেখবেন নদীর ধারে এসে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। পারাপারের পুল আর উঠল না।

সতী দেখেছে বাবাকে যখন সুভাষ রাস্তার কথা প্রশ্ন করেন তখন কেমন একটা বিষণ্ণ চোখ তাঁর। তিনি যেন এই রাস্তার কত কি

দেখতে পান। কারা যেন সেই রাস্তা ধরে, ছুটে এসে ওঁকে ধরে নিয়ে যাবে। তিনি কি সেই মানুষ, কোথাও কি কোন তাঁর হত্যা অথবা অপরাধ ঘটিত কারণ আছে যা তিনি বলেন না, বর্ণনা করেন না। কিন্তু সতী জানে—না এমন মানুষ হয় না, এ-মানুষ প্রায় এক ঈশ্বর সামিল—এই পাড়াগাঁয়ে তিনি এ-কমাসেই স্কুলের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। গ্রামের মানুষ তাঁকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করছে। স্কুল-অন্ত প্রাণ। যেন তিনি এই স্কুলকে সন্তান-স্নেহে বড় করে তুলেছেন। সতী সাঁঝের প্রদীপ দেখাবার সময় এ-সব ভাবল।

তারপর দেখল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রেলপুল থেকে ওরা এখনও ফিরছে না। ধ্রুবকে একবার নদীতীরে পাঠিয়েছিল, এবারে সে ওকে রেলপুলে পাঠাল ওদের ডেকে আনার জন্য।

বলাইবাবু এলে সতী বলল, স্যার কোথায় গেছে জানো?

—নদীর ও-পারে গেছে।

—হঠাৎ নদীর ও-পারে?

—সেই নীলকুঠি সাহেবের বন দেখতে গেছে।

—একা!

—একাই গেছে বোধ হয়। মনি বলল ওরা দেখেছে স্যার বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছেন।

—সাপ খোপের ভয় আছে। তিনি কি পাগল!

—পাগল না হলে এমন একটা গ্রামে শহরের মানুষ দিনের পর দিন পড়ে থাকতে পারে!

—আমার কিন্তু ভাল লাগছে না ব্যাপারটা।

—সে কি আমারও লাগছে!

—তুমি একবার যাও। ওকে সঙ্গে নিতে পার।

—কার কথা বলছিস?

—তোমার জামাইয়ের কথা।

—সে কোথায়?

—রেলপুলে গেছে। ধ্রুব ডেকে আনছে। আমি হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যাও। জঙ্গলের ভিতর ঠিক পথ হারিয়ে ফেলবেন তিনি।

—কিন্তু তিনি কি খুব ছেলেমানুষ সতী? বলাইবাবুর, সতীর এই তাড়াহুড়া ভাল লাগল না।—আর একটু সময় দেখলে হত না!

—অন্ধকারে তিনি কোথাও যান না। আজ হঠাৎ নদীর ও-পারে বনের ভিতর ঢুকে গেলেন!

—ঠিক চলে আসবেন। বলে বলাইবাবু বারান্দায় উঠে গেল। এমন সময় শঙ্কর এল। উমা এল। বলাইবাবুর বলার ইচ্ছা—এই রাতে তোমরা থাক কোথায়।

উমা বলল, দিদি হিজলের বিলে ডাঙ্গা জাগতে আরম্ভ করেছে। যাবি দিদি।

সতী উত্তর করল না। খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। যেন সে কি ভাবছে। বাবার এখন হ্যারিকেন নিয়ে যেতে ইচ্ছা নেই। শঙ্করের মুখ দেখে বুঝল সে যতটা গায়—বন্দরে আর কতকাল পড়ে থাকবি কালাচাঁদ, নৌকা ভাসা, সাত সাগরে দিবি পার—মনে মনে সে ততটা ভণ্ড। বস্তুত এই শঙ্করের চোখে মুখে নানা রকমের ইচ্ছা অনিচ্ছার খেলা। সে মুখ তুলে একবার শঙ্করের মুখ দেখল, তারপর স্কুলের মাঠে চোখ রাখল অথবা কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করল, যদি দরজা খোলার শব্দ হয়—তিনি যদি ফিরে আসেন। একবার আদিনাথকে পাঠালে হয়। সে যা মানুষ, হয়ত নদীর পারে ঘুরে এসে বলবে কৈ পেলাম না ত।

উমা, দিদির এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে ফের বলল, হিজলে আবার ডাঙ্গা জাগতে সুরু করেছে।

অর্থাৎ সতী জানে উমার সেই ইচ্ছা চোখে মুখে। কারণ কচ্ছপেরা উঠে আসবে, ডিম পাড়বে। যে সব ডাঙ্গা জমি থাকবে, খুব সকাল সকাল তাদের ডোঙা নিয়ে ভেসে গেলে—চারিদিকে জল, আর মাঝে

মধ্যে ডাঙ্গা এবং ডাঙ্গাতে কচ্ছপ। ডোঙার শব্দ পেলেই ঝুপ-ঝাপ জলে ভেসে যাবে কচ্ছপ। একটু চোখ দিয়ে তাকালে টের পাওয়া যাবে—মাটির নীচে, ঝুড়ঝুড়ে মাটির নীচে সেই কচ্ছপের ডিম। দিদি মাটি দেখলেই চিনতে পারে—কোথায় কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেছে।

ওর মনটা ভাল ছিল না। বিদেশ বিভুঁইয়ে এই মানুষ বনের ভিতর ঢুকে গেছে—সে কি করবে এখন, সে বলল, তুমি যাও না।

সে শঙ্করকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল।

শঙ্কর বলল, কোথায় ?

—স্যার নদীর ও-পারে নীলকুঠির বনে উঠে গেছেন। উনি তো জানেন না যে সে বনে অনেকেই পথ হারিয়ে ফেলে।

শঙ্কর মাঠের দিকে তাকাল। জ্যোৎস্না উঠে গেছে।—এমন জ্যোৎস্নায় কেউ পথ হারায় না সতী।

সতীর বলার ইচ্ছা হল, কেউ কেউ হারায়। কিন্তু সে কিছু বলল না। বাবার ওপর রাগ বাড়তে থাকল। এই বাবা, এক মানুষ তিনি, কোথায় কি আছে, সব স্যার আসতে না আসতেই বলে দিয়েছেন। নীলকুঠির বনে বাবাই একদিন নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। এমন বনের ভিতর সব মানুষেরই একদিন না একদিন হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। বিশেষ করে যদি আকাশ এমন নীল থাকে। এই জ্যোৎস্না দেখে সেও স্থির থাকতে পারছে না। ওরও বুঝি এই জ্যোৎস্নায় নদীর ও-পারে বনের ভিতর ঢুকে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। যেন তার সেই শৈশব ফিরে এসেছে। সে এই মাঠে গাঁয়ে কোথাও যদি চাঁদ উঠত, যেন এক খেলা সতীর চাঁদের সঙ্গে খেলবে, এই মাঠে ঘাটে চাঁদ উঠলে সতী সেই শৈশবের মত এখনও স্থির থাকতে পারে না। সতী বলল, তোমরা না গেলে আমি যাব।

শঙ্কর বলল, যাও। আমি যেতে পারব না।

বলাইবাবু বলল, তবে চল। তোমরা শঙ্কর দেরি দেখলে

খেয়ে নিও। যা বন, মেয়েও আমার মেয়ে নয়, তোমরা ওকে বনদেবী করে ফেলেছ।

বলাইবাবুর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। মেয়েকে সে কিছু বলতে পারে না। কারণ এই সতীর অনেক দুঃখ কষ্টে দিন কেটেছে। শরীরে এখনও সেই সব প্রহারের দাগ, বোস বাবুর অত্যাচার এবং শঙ্করের আত্মীয় সম্পর্কে দাদাটির কুকীর্তির কাহিনী সতীর মুখ দেখলেই পড়া যায়—সতী এখন প্রায় ভুবনমোহিনী রূপে আলোকিত বন্যার মত ছুটে চলেছে, বলাইবাবু কোন হ্যাঁ বা না বলতে পারল না। সে হ্যারিকেন হাতে সতীকে অনুসরণ করল মাত্র।

সতী প্রথমে মাঠের দিকে গেল। অনেকদিন স্যার এখানে, একা মাঠে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অথবা পায়চারি করেন। কিছু নারকেল গাছ চারপাশে। তার ছায়া লম্বা হয়ে মাঠের ওপর পড়েছে। সতী মাঠের চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করল। তিনি যদি এতক্ষণে ফিরে আসেন—এই ভেবে প্রথম সতী বারান্দা, ঘর, মাঠ তারপর বলাইবাবুর সঙ্গে নদীর পারে খোঁজাখুঁজি করে যখন পেল না, তখন এই মানুষ নির্ঘাত নদীর ও-পারে সেই বনটার ভিতর এখন বসে রয়েছে।

কি যে হয় মানুষের! সতী এটা দেখেছে, দুপুর রাত্রি, একটা কাক-পক্ষী জেগে নেই, মানুষটা জানলায় বসে আছে আলো জ্বেলে। কোন কোনদিন সে প্রশ্ন করেছে, রাতে স্যার আপনার চোখে ঘুম থাকে না।

সুভাষ হাসত।—কেন এমন কথা বলছ?

—কাল দেখলাম চুপচাপ বসে আছেন জানালায়।

—বড্ড গরম। ঘুম আসছিল না। জানালায় বসে মাঠের জোনাকি দেখছিলাম।

কেউ না থাকলে সতীকে সে এতসব বলতে পারে। অন্য সময় সতীর দিকে তাকালে সুভাষের চোখ কেমন কঠিন। সব শিক্ষকদের সঙ্গে সুভাষের যেমন ব্যবহার সতীর প্রতি তার চেয়ে সামান্য তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব বেশী। সতী প্রথম প্রথম টের পেত না মানুষটার এই রকমের ব্যবহার কেন। এখন যেন সতী সব ধরে ফেলেছে। ওঁকে দেখলেই মনে হয় কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। তিনি এখন সেই অনুসন্ধানে এতদূর চলে এসেছেন।

সতী বলল, বাবা, স্যার মাঝে মাঝে সেই রাস্তাটার কথা বলে থাকেন।

ওরা এখন নৌকার ওপর। প্রবল স্রোত বলে সোজা পার হতে পারছে না। একটু তেরছা করে নৌকা নদী পার হচ্ছে। এখন রাত বেশী নয়। যারা ও-পারের হাটে গেছে অথবা দূরের গঞ্জে গেছে তারা দু একজন নদীর ঘাটে দাঁড়িয়েছিল। এবং ওদের ভিতরও কেউ কেউ ছিল যারা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে উঠে যাচ্ছে। সতীর কথা, সেজন্য হতে পারে কারণ বলাইবাবু ওদের সঙ্গে জিনিষপত্রের দামদরের কথা, কচু, কলা পাওয়া যাচ্ছে, বিলে এবার বেশী পাখি পড়ছেনা এ-সব কথা বলতে বলতে নদীর জল দেখছিল। সেজন্য হয়ত হবে, বা ইচ্ছা করেও হতে পারে, কারণ এই পথের কথা উঠলেই, সুভাষবাবুর কথা উঠবে, এবং ওরা যে বনের ভিতর সুভাষবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছে—এই কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে। জানাজানি হলে একটু হাসি-ঠাট্টা অথবা বিদ্রূপ এবং কি কারণ থাকতে পারে বাপ মেয়েতে মিলে একটা জোয়ান লোক বনের ভিতর কি করে বেড়াচ্ছে দেখতে যাচ্ছে, অথবা এমন কি মানুষ তিনি যাকে খুঁজে আনতে হয়। নাবালক হলে ভয়ের ছিল—মানুষটাকে সবাই নাবালক ভেবে ফেলবে, অথবা এটা বাড়াবাড়ি সতী এবং বলাইবাবুর, সুতরাং সে জন্যও হতে পারে বলাইবাবু রাস্তাটা সম্পর্কে নৌকার ওপর কিছু বলল না। যেন এখন বলাইবাবু গরু বাছুর কার কটা আছে, কটা

মোষ এবার ও-গ্রামে চাষের জন্য আনা হয়েছিল, কটা মরে গেছে, ধান কার গোলায় কত উঠেছে এবং ও পারে যে সামান্য জমি আছে বলাইবাবু মেয়েকে নিয়ে তার খোঁজ খবর করতে যাচ্ছেন।—এই নদীতে এবং নৌকায় সতীর মুখ দেখলে কেন জানি কেবল তাকে খুব সরল মনে হয়। সতী বাপের দিকে তাকাল না। ছুটো একটা জেলে নৌকা পার হয়ে গেল। কি মাছ হলরে! বলাইবাবু নৌকায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন।—কোথায় যাবেন কর্তা। এমন ছুটো একটা প্রশ্ন। বলাইবাবু একটু কায়দা করে বলল, দলুয়া যাব। কালি-বাড়িতে মানত আছে।

—আজই ফিরবেন!

—হয়ে গেলে ফিরে আসবো।

—তা রাত করে রওনা দিলেন!

—জ্যোৎস্না রাত আছে। পা-চালিয়ে হাঁটলে কতক্ষণ।

—তা বটে, পা চালিয়ে হাঁটলে কতক্ষণ। ওরা বনের ভিতর ঢুকে যাবার মুখে ফের সতী বলল, বাবা রাস্তাটার আর কতদূর!

—বনের ও-পারেই এসে গেছে।

—আমার মনে হয় তিনি সেটাই দেখতে গেছেন।

—সেটা দেখতে যাবার কি হল!

তবু হাঁটা যাক। কারণ বন পার হলেই সেই পথ। ছোট বন। এই মাইল খানেকের মত হবে, উত্তর দিকে কিছু আদিবাসী আছে, ওরা পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এ-সময় নেমে আসে। বন থেকে খরগোস টিয়া এবং কাঠবিড়াল, উদবেড়াল যা যখন পায় মেরে খায়। দিনের বেলা ওরা জমিতে কাজ করে। এই সময় ধান ঘরে উঠবে। ওরা চাষাবাদের জন্য চলে আসে। ধান রুয়ে দেয়। জলা জমিতে নেমে দাম ঘাস সব বেছে দেয়। এবং বিকাল হলে বনের ভিতর নানা রঙের পাখি শিকারের জন্য তীর ধনুক নিয়ে ঘোরা ফেরা করে। বনের ভিতর ঢুকলেই ওরা দূরে একটা লণ্ঠনের আলো

দেখতে পেল। বোধহয় ওরা উত্তর দিকের বনে ঢুকে গেছে। ওদের একবার জিজ্ঞাসা করলে হত, এখানে এই সন্ধ্যার দিকে একটা মানুষ ঢুকে গেছে কিনা! কিন্তু অতটা হাঁটার আগে চারিদিকে তাকানো ভালো। কি সব বড় বড় গাছ, শাল গাছ, গাছের বড় বড় পাতা হাতির কানের মত মনে হচ্ছে। সামান্য বাতাস ছিল বলে পাতা নড়ছে। কীট পতঙ্গ ডাকছে এবং জেলেদের দুটো একটা লণ্ঠন প্রায় তারার মত জলে কাঁপছে। আর আকাশ, নীল রঙের আকাশ, কিছু নক্ষত্র এবং জ্যোৎস্না। কিছু শাল গাছ আর কিছু লাল বর্ণের পাখি। পাখির নাম সতী দিনের বেলা হলে বলতে পারত। রাত বলে সব পাখির এক রঙ। সে গাছের শাখা প্রশাখায় যা সব পাখি দেখল, সব একরঙ বলে চিনতে পারল না। বলাইবাবু ডাকলেন, স্যার আছেন! সাপখোপ আছে এখানে। এখানে তো আমি আপনাকে নিয়ে আসব বলেছিলাম। এখানে এলে আর কেউ যেতে চায় না। আদিবাসী যে আদিবাসী, ওরা পর্যন্ত এখানে এলে আর ফিরতে চায় না। এই বন ওদের কাছে দেবতার মত। যা চাই, কি চাও, ফল ফুল পাখি সব আছে। আপনি একা এসেছেন, একা এলে আর কি দেখতে পাবেন। সেই বেনহার সায়েবের নীলকুঠি, সেত এদিকে নয়, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, আপনাকে আমি নিজে নিয়ে যাব। আমারও এমন জ্যোৎস্না রাতে এই বনের ভিতর কেন জানি ঘুরতে ইচ্ছা হয়।

ওরা লতাপাতা সরিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লণ্ঠন তুলে দেখছিল—একটু সাদা মত জায়গা, দূর্বা ঘাস আছে আর মনে হয় কারা যেন কুঞ্জ বনের মত করে রেখেছে জায়গাটাকে। একটা বড় শালগাছ, নীচে কোন আগাছা নেই, শুধু দূর্বা ঘাস এবং সবুজ গালিচার মত মাঠ। এখানে তিনি থাকতে পারেন। ওরা গাছটার গুঁড়ি পর্যন্ত গেল। না তিনি নেই। বলাইবাবু ডাকল, স্যার এখানে আছেন। আপনি যে কেন স্যার এই নিরুদ্দেশে চলে এসেছেন

বুঝি না, কেন এতদূর এসে এইসব ফুল পাখি ভালবেসে ফেললেন বুঝি না।

সতী বলল, বাবা সুজনিয়াদের ঘরে গেলে হত।

—কেন! ওরা কি এখন ঠিক আছে?

—কেন ঠিক নেই বাবা।

—পাখির মাংস আর হাঁড়িয়া। তুই এই বনের ভিতর কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছিস না।

এতক্ষণে মনে হল সতীর যেন এই বনের ভিতর পাখির মাংস রান্না হলে কেমন একটা গন্ধ ম ম করতে থাকে সারা বনে, তেমন গন্ধ।

বলাইবাবু বলল, ওরা পাখির মাংস রান্না করেছে।

—কি পাখির মাংস!

—মনে হয় হরিয়াল।

—হরিয়াল পাখি! এইটুকু বলে সতী, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এখন তো হরিয়াল পাখিরা ডিম পাড়বে। এ-অবস্থায় পাখির মাংসের তেমন স্বাদ থাকে না।

—আরে বেটাদের কথা বাদ দে।

ডিম পাড়বে। সতীর কেমন কষ্ট হতে থাকল পাখিদের জন্য। হরিয়াল পাখি দুটো-চারটে এক সঙ্গে কি তারও বেশী, একবার সে এক ঝাঁক হরিয়াল পাখি দেখেছিল মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সে পাখির ঝাঁক দেখলেই যেমন শস্যদানা ছিটিয়ে দেয় তেমনি সেবারেও সে শস্য-দানা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আশ্চর্য হরিয়ালের ঝাঁক ওর কদম গাছটায় এসে বসেছিল, কিন্তু শস্য-দানা খুঁটে খায় নি। আদিনাথকে প্রশ্নটা করলে সে বলেছিল, এখন দিদিমণি ওদের ডিম পাড়ার সময়। বড় কষ্ট এ-সময়ে। ওরা পাখির ছানা পালন করবে বলে বাসা তৈরির অন্বেষণে আছে। গাছের নীচে ওদের খড়কুটোর দিকে বেশী ঝোঁক। ওরা খেতে আসে নি। ওরা তোমার এই গাছে আশ্রয় নেবে। এবং সে বছর সেই এক ঝাঁক পাখি

ওর কদম গাছটায় থেকে আরও এক ঝাঁক পাখি তৈরি করে চলে গেল। বলাইবাবু মাঝে মাঝে লোভ সংবরণ করতে পারত না। জাল তৈরি করতে বসত। সতীর ভাল লাগত না। সে বাবাকে হরিয়াল পাখি ধরতে বারণ করত। বলাইবাবুর হরিয়ালের নরম মাংস খেতে খুব পছন্দ।

বলাইবাবু বলল, চল রাস্তাটা পর্যন্ত দেখে আসি।

—তার আগে ওদের ওখানে চল।

—সুজনিয়াদের ওখানে!

সতী আর উত্তর করল না। সে আবার বনের বাইরে চলে এল। সে প্রথম সুজনিয়াদের ওখানে যাবে। যেন সুজনিয়া এবং তার বাপ তুক তাক করে স্যারকে নিয়ে গেছেন। আর এতক্ষণে মনে হল সতীর, সে যে ভয়টা করছিল, সেই ভয়টা এই বনের জন্য নয়, গাছপালা পাখির জন্য নয়, অথচ পথ হারিয়ে ফেলবে এমন ভয়ও নয়। এই সুজনিয়া এক আদিবাসীর মেয়ে, ওদের স্কুলে কতবার কাজ করে এসেছে। স্যার সুজনিয়াকে বার বার বলেছেন, তোরা কোথায় থাকিস, সে বলেছে—হুই বনের ওধারে! নদীর পারে। একবার যাবেক না! মেয়েটার বুকের ভিতর অথবা চোখের ভিতর কি যেন আছে! এবং মানুষটা যে সুজনিয়ার কাছে চলে গেছে সে যেন নদীর পারে এসে স্পষ্ট এমন অনুভব করতে পারল। অথচ এতক্ষণ কি আশ্চর্য, সতী একবারও কিন্তু স্পষ্ট এমন একটা দৃশ্য ভাবতে পারে নি। মনের ভিতর ওর একটা কি ভয় ছিল শুধু। সে এই নদীর পারে এসে বুঝতে পারল ভয়টা সেই আদিবাসী মেয়ের। মেয়েটা যেন স্যারকে তুক তাক করে এসেছে। অথচ সে কতবার এই মেয়েকে দেখেছে, শস্য-দানা মাঠ থেকে তুলে নিয়ে গেছে, বাবুদের বাড়ি বাপ মেয়ে কাজ করতে এসে আস্ত একটা দামাল মোষকে তাড়া করে বাড়ি নিয়ে গেছে—এখন যেন সেই মোষটা এই মানুষটাকে

তাড়া করে এই বনের ধারে নিয়ে এসেছে। সতী বলল, বাবা তাড়াতাড়ি এস।

বলাইবাবু বলল, কোনদিকে যাচ্ছিস!

—সুজনিয়াদের ওখানে।

—সেখানে গিয়ে কি হবে!

—কিছু হবে না, বাবা। তবু আমাদের যেতে হবে।

—আমার কিন্তু এটা ঠিক মনে হচ্ছে না। ওরা এ-সময় মাতাল থাকে। তুই যাবি!

সতী বাপের জন্য প্রতীক্ষা করল না। সে মেলায় অথবা পূজা দিতে এই পথে দলুয়া কতবার গেছে। বনটাকে সে জানে, তার চেয়ে যেন বেশী জানে এই পুরুষ মানুষের মন। সে অনর্থক এতক্ষণ বনের ভিতর বাপকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে।

বলাইবাবু অগত্যা মেয়েকে অনুসরণ করল। নির্জন পথ। নদীর ধারে ধারে বাঁধ। বাঁধের ওপর দিয়ে ওরা হাঁটছিল! মাঝে মাঝে বন থেকে পশু পাখির ডাক ভেসে আসছে। শেয়ালের চিৎকার ভেসে আসছে। মাংসের ঝাঁজ আর নেই। এবং এক প্রশান্ত হাওয়া নদীর এই সব গাছপালার ভিতর। ওদের কোন হল্লা শোনা যাচ্ছে না। অন্যদিন এই সব বন্য স্বভাবের মানুষের ভিতর হল্লা শোনা যায়। রাতে ওরা কেমন নেশা করে পাগল হয়ে নদীর চর ধরে ছুটতে থাকে। স্রোত এখন নদীতে তেমন নেই। ক্রমে স্রোত কমে এলে সুজনিয়াদের দলবল এখান থেকে চলে যাবে।

প্রথম ওরা খড়ের চাল দেখতে পেল। আট দশটা ছোট চালা ঘর। বন থেকে বাঁশ কেটে, তালপাতা কেটে ওরা ঘর তৈরি করেছে। তারপর কিছু খড় বিচালি বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে আনলেই এই ছোট ছোট ঘর হয়ে যায়। ঘরের ভিতর কেউ বড় থাকে না। মসৃণ ঘাস চারপাশে, আর কিছু বড় বড় গাছ, শাল শিমুল বট। এই

বট অথবা শিমুলের নিচে প্রায় দিনের বেলাতে আশ্রমের মত ঘর, কেবল কিছু মুরগি ঘুরে বেড়ায়। পোষা এই মুরগি এবং কুকুর দেখলেই বোঝা যায় সুজনিয়ারা এসে গেছে। সুজনিয়ার বাবা সর্দার মানুষ। মেয়ের বিয়ে হয়েছে দেবতার সঙ্গে, সে নদী এবং বনের দেবতা! মেয়ের সন্তান হবে না কোনকালে। উৎসর্গীকৃত প্রাণ হলে এই হয়। সতীর বাঁধ থেকে নেমে যাবার সময় বুকটা কাঁপছিল।

বলাই বাবু নীচে এসে ডাকল, আকালু আছিস!

—কোন জবাব এল না। শুধু কুকুরগুলো চিৎকার করতে থাকল।

—কিরে আকালু নেই!

—কে বাবু! সুজনিয়ার গলা। মাতাল মেয়ে কেমন ওক দিতে দিতে উঠোন থেকে নেমে এল।

—আমি বলাইবাবু।

—আমি সতী!

—মা ঠাক্রুণ! ও মা গড় হই। হেঁই মা লক্ষ্মী এইসে গেছে। বাপ ছ্যাখ, কে এইসে গ্যাছে।

সতী বলল, হ্যাঁরে সুজনিয়া আমাদের স্যার নদীর পারে এসে বাড়ি আর যাননি। তুই ওঁকে কোথাও দেখেছিস!

—সুজনিয়া জিভ কাটল। ওমা কি যে বলে! আমি দেখব কুথি! বলাইবাবু বুঝল, বেঁহুস আকালু। তাকে আর ডাকাডাকি না করে বাঁধের ওপর উঠতেই মনে হল জ্যোৎস্নায় এক লম্বা কালো মানুষ হেঁটে যায়। নীরবে নিভৃতে সেই বনের ভিতর এতক্ষণ সে সেই পথটার অনুসন্ধানে ছিল। পথটা বনের ধারে এসে গেছে। ওর ভেতর পাগলপ্রায় এক জীবন—যেন তাড়া করে ওকে এখনও অন্য কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

সতী চিৎকার করে ডাকল, স্যার।

বলাইবাবু চিৎকার করে উঠল, স্যার।

সুভাষের মনে হল পেছনে ওকে কে ডাকছে। কারা ডাকছে। সে এবার ঘাড় ফেরাল। বাঁধের ওপর দিয়ে কারা ছুটে আসছে। সতী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন স্যার।

সুভাষ যেমন হাসে তেমনি হাসল। বলল, সেই পথটার অনুসন্ধানে গেছিলাম। শহর থেকে যে আসবে। তোমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে চলে যাবে। শহর থেকে একটা লোক মই নিয়ে আসবে, আর বিজ্ঞাপন উড়তে থাকবে গ্রামে মাঠে। বাকিটুকু সে বলল না। যেন বললে এমন শোনাত, আমি পাগল হয়ে যাব সতী। আমার অনু এখন দড়ির ওপর রিঙের খেলা দেখাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের মানুষটা সেই একটা ছবি, একটা নয়, তুটো নয় হাজার হাজার ছবি গাছে, দেয়ালে, এবং যেখানে যেখানে যা পাবে সেঁটে দিয়ে চলে যাবে। আমি ফের নিরুদ্দেশে চলে যাব।

সতী আলো তুলে মুখ দেখতেই মনে হল, মানুষটা অসুস্থ। চোখ ঘোলা ঘোলা। প্রায় টলছে। সে হাত দিতেই মনে হল গা পুড়ে যাচ্ছে। ভীষণ জ্বরে মানুষটা আবোল তাবোল বকছে। সতী আর পারল না। মায়া মমতায় এই মানুষের জন্য চোখে জল চলে এল। এই মানুষ পিছনে কিছু ফেলে এসেছে। সতী অনেক চেষ্টা করেও সে রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি।

রাতে সতী লণ্ঠন জ্বেলে মানুষটার শিয়রে বসে ছিল। ভালবাসার হাত রেখেছিল কপালে। ওর স্বামী বৈরাগী বাউল মানুষ, মাঠে সারারাত বাঁশি বাজিয়েছে। বলাইবাবু নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। সতীর ছোট বোনটা কেবল বিছানায় জেগেছিল এবং খালি ছটফট করছিল।

অত্যধিক জ্বরে বেঁহুস সুভাষ। মাঝে মাঝে ওর কণ্ঠে কেবল

একটা কথাই শোনা যাচ্ছে, শহর থেকে রাস্তাটা তবে সত্যি সত্যি চলে আসছে!

সতী উত্তর দিতে পারেনি। জানালা দিয়ে সে কেবল দূরের মাঠ দেখেছে। মাঠে এখন জ্যোৎস্না নেই। শুধু অন্ধকার। দুটো একটা জোনাকি অন্ধকারের ভিতর জ্বলে জ্বলে আলোর এক রহস্য আছে, এমন কিছু প্রকাশ করতে চাইছে। জীবনের এক নিভৃত রহস্য আছে এমন কথা বলতে চাইছে।

সতী ঘরে ঢুকে সব জানালা খুলে দিল। সকালের রোদ এসে বারান্দায় নেমেছে। কিছু শস্য দানা পড়েছিল বারান্দায়। বোধহয় গতকাল আকালু এসেছিল রাতে। পুরানো চাল সংগ্রহ করে দিয়ে গেছে। সুজনিয়া এসেছিল বাপের সঙ্গে। সুভাষের অসুখ হবার পর প্রতিদিন বাপ মেয়ে সুভাষকে দেখে গেছে। গতকাল এসেছিল পুরানো চাল নিয়ে। পথ্যের জন্য এই চাল ওরা নতুন ফসলের সময় সংগ্রহ করেছে। বোধহয় অন্ধকারে চাল নেবার সময় সতী লক্ষ্য করেনি, ওর অলক্ষ্যে কিছু নীচে পড়েছে এবং পাখিরা, পাখি বলতে, ময়না টিয়া নয়, পাখি বলতে কাক শালিখ কিছু এবং দুটো একটা চড়াই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওর শরীর দুর্বল। সে গতকাল ভাত পথ্য করেছে। সুজনিয়া বন থেকে গন্ধ পাঁদালের পাতা সংগ্রহ করে দিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে বড় কৈ মাছ। এ-সময় যখন মাছের আকাল তখন সুজনিয়া সেই যেদিন ওরা খবর নিতে এসেছিল অর্থাৎ সুভাষ যেদিন নদী পার হয়ে নীল কুঠির বন দেখতে গিয়ে ফিরে আসেনি এবং সুজনিয়াদের ঘরে খুঁজতে গিয়েছিল সতী, সতী সুজনিয়াকে বলে এসেছে, স্যারকে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় গেল? তার পরদিনই ওরা এসেছে খোঁজ নিতে, খোঁজ নিতে এসে দেখে স্যার

জ্বরে বেহুঁস। শিয়রে সতী দিদিমণি বসে আছে। দরজায় বলাইবাবু। ডাক্তার দেখে গেছেন এবং সেই থেকে সারাদিন কাজের পর ওরা চলে আসে। এখন তো ওদের ফসল তোলার কথা, ফসল তোলা হয়ে গেলে—ওরা যে দলটার সঙ্গে এসেছে তাদের সঙ্গে চলে যাবে, ওরা নেমে এসেছে সেই পুরুলিয়া অঞ্চল থেকে, বস্তুত ওদের কোন স্থায়ী আবাস নেই, তবু পাহাড় জঙ্গলই ওদের কাছে প্রিয়—কারণ যখন কোথাও কোন ফসল থাকে না, শস্যদানা থাকে না এবং বাবুদের বাড়ি গৃহস্থের বাড়ি কাজ কমে যায় তখন থাকে শুধু বনের ফল, মূল, পেস্তা, আলু এবং ঘাসের বীজ। আর বনের পশু পাখি শিকার করা। আর ওরা নিজেরাই জানে মহুয়া থেকে মদ তৈরী করতে, এ-অঞ্চলে নেমে আসার সময় হাঁড়িতে করে কিছু মদ পর্যন্ত নিয়ে আসে—সেই যে দলটা যারা নদীর পারে বসবাস করে গৃহস্থ মানুষের ফসল তুলে দিচ্ছে, এবং যার সর্দার আকালু, যার মেয়ে এই সুজনিয়া, সুভাষ যাদের দিয়ে স্কুলবাড়ির পাশে যে মাঠ আছে, সেই মাঠে মাটি ফেলেছিল, এবং কি আন্তরিক ব্যবহার সুভাষের, সুজনিয়া সেই থেকে এই মানুষের ব্যবহারে মুগ্ধ। যেমন একবার সুজনিয়ার চট্টরাজদের বড় মোষটা মাঠ থেকে তুলে আনতে গিয়ে দড়িতে পা আটকে গিয়েছিল, এবং মোষটা ছুটছে, মোষটার দড়ি গলায়, সুজনিয়ার পায়ে দড়ি, মাথার ওপর নির্মল আকাশ, ভয়ঙ্কর খরা রোদে চষা জমির ওপর দিয়ে ছোটার সময় সুজনিয়া মরেই যেত—সুভাষ ছিল রেল-লাইনের ধারে, হিজলের বিল থেকে সে উঠে এসে স্কুলবাড়ির দিকে নেমে যাবে—তখন চিৎকারে হুঁস আসে, রেলপুলের নীচে মোষটা ছুটছে এবং সুজনিয়াকে পায়ে বাঁধা মুরগির মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটাকে মেরেই ফেলত, সুভাষ সেই পুল থেকে জীবন বিপন্ন করে লাফিয়ে পড়ল পিঠে। ভয়ঙ্কর ভাবে সেদিন সে দামাল মোষটাকে আটকে ছিল। সুজনিয়া উঠে, কারণ ওর বেশবাস ঠিক ছিল না, সুজনিয়ার শাড়ি খুলে গেছিল। সুজনিয়ার পুষ্ট বাহু, কালো পাথরের

মত শক্ত কঠিন দেহ এবং যৌবন প্রায় মাঠের মত লাবণ্যে ভরা। সুজনিয়া কাছে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে নি। সে বাবুর ব্যবহারে কেমন ভাল মানুষের উত্তাপ পেয়ে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি।

সুতরাং সূর্য অস্ত গেলে, সুজনিয়া বেনহার সাহেবের বন পার হয়ে বাপের সঙ্গে চলে আসে। যতদিন বাবু অসুখে ছিল, প্রতিদিন এসে খবর নিয়ে গেছে। কি এক উদ্বিগ্ন ভাব চোখে মুখে। এবং যখন জ্বরটা কমে আসছিল, জানালা খোলা, সুভাষ চোখ খুলতেই দেখল মেয়েটা খুব জড়সড় হয়ে বারান্দার এক কোণে বসে আছে। সে খুব দুর্বল, কথা বলতে কষ্ট, হাত পা শীর্ণ হয়ে গেছে। সে আঠারো দিন ক্রমান্বয়ে জ্বরে ভুগে এত দুর্বল যে কথা বলতে পারে নি। অথচ সূর্যাস্তের রোদ মাথায় ওর। এবং সুজনিয়ার পায়ের কাছে রোদ। মুখটা নীচু করা। সুভাষের হেসে বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, হ্যাঁরে তুই কেমন আছিস। সুভাষের মাঝে মাঝে সেই রুগ্ন শরীর বিস্বাদ লাগলে একমাত্র এই মেয়েটা, যে এক সর্দারের মেয়ে, যার যৌবন বিফলে যাচ্ছে, এবং যে সর্দারের মেয়ে বলেই বনদেবতার সঙ্গে, এই যেমন বন অথবা মাঠের দেবতার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে, সামান্য মানুষ যে জন্য তার স্বামী নয়। রুগ্ন শরীরে সুজনিয়ার মুখ দেখলে সুভাষের কেন জানি আজকাল কষ্ট হয়। মায়া হয়।

সেই মেয়েটা গতকাল সতীকে পুরানো চাল দিয়ে গেছে। আগে সতী পয়সা দিতে গেলে নিত না, কিন্তু সুভাষ মোটামুটি ভাত পথ্য করে যেই না সামান্য সুস্থ হয়েছে. এবং যেই না শুনেছে, ওরা পয়সা নিতে চায় না, আকালুকে কিছু বললেই বলবে, বাবুত বহুত পয়সা কামিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ আকালু বিদ্যালয়ের অনেক কাজ করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছে, অন্য কোথাও হলে আকালুকে নানাভাবে পয়সার ভাগ দিতে হত, ভাগ দিলে কিছু আর থাকে না, কিন্তু এ-বাবু এক পয়সা নিত না, হকের পয়সার ভাগ খায়নি, সে বড় বাবু, সুতরাং

আকালু সামান্য মাছ অথবা গন্ধপাঁদালের লতা এবং পুরানো চাল সবই সে এমনি দিয়ে যাচ্ছে, হকদার মানুষকে সামান্য সেবা শুশ্রূষা করে পুণ্য সঞ্চয় করা, এমন একটা মুখ নিয়ে বসে থাকলে সুভাষ কিছুই স্পর্শ করবে না এমন ভয় দেখালে মাথা নীচু করে সুজনিয়া পয়সা গুণে নিত।

সেই মেয়েটা গতকাল চাল দেবার সময় কিছু চাল এই বারান্দায় ফেলেছিল। এখন এই সকালে রোদ উঠলে সেগুলি পাখিরা খুঁটে খুঁটে খেতে এসেছে। সুভাষ একটা চাদর গায়ে তক্তপোষে বসেছিল। সতী জানালা খুলে দিয়েছে সব। চারপাশে পাখিদের কলরব। সে হিজলে নেমে যাবার রাস্তায় বড় বড় বড় ষাঁড় গরু দেখতে পেল। লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে কেউ। সুজনিয়ারা এবার চলে যাবে। ফসল কাটা হয়ে গেলেই চলে যাবে। সুভাষের চাদরটা একটু আলগা ভাবে নীচে পড়েছিল, সতী সেই চাদর তুলে দিল গলায়। এবং ধমকের স্বরে বলল, স্যার চাদরটা ফেলে দিলে বুকে আবার ঠাণ্ডা লাগবে।

—না লাগবে না সতী, এমন বলার ইচ্ছা সুভাষের। ওর আজ প্রথম মনে হল সতীর স্বামী এসেছিল। সে অসুখে এতদিন এই ঘরে আবদ্ধ এবং সবসময় সতীকে দেখেছে শিয়রে বসে রয়েছে। কি স্নেহ এবং মায়া মমতায় সতী তাকে সুস্থ করে তুলেছে! অথচ একদিনও সে সতীকে প্রশ্ন করেনি অথবা একেবারে ভুলে গেছে, শঙ্কর এসেছিল, সে কোথায়, সে তাকে দেখছে না কেন। পরে সে সাত আট দিন বেহুঁস ছিল এবং পরে একটু একটু জ্ঞান ফিরে এলে টের পেল যেন, শঙ্কর নেই অথচ এমন একটা অবস্থা সুভাষের যে সে কিছুই বুঝতে পারে না, কেন সে এই বিছানায়, সে এখানে এতদূরে চলে এসেছে কেন, তার কি করণীয় ছিল, সে এই যে নিরিবিলি নির্জন জায়গায় এসে গেল—কার জন্য, সে যদি না আসত, যদি কলকাতার প্রাচুর্য ছেড়ে না আসত, তার তো কোন অভাব ছিল না, এমন একটা জায়গায়

—যেখানে সূর্য উঠলে অঙ্ক করা যায় না, যেখানে বৃষ্টি পড়লে মাঠে নামা যায় না এবং যেখানে শুধু মাইলের পর মাইল হিজলের বিল, দূরে পাহাড়ের ছায়া অথবা নদী পার হলে বেনহার সাহেবের জঙ্গল —এবং একটা রাস্তা চলে আসছে শহর থেকে, সেই রাস্তাটা বেনহার সাহেবের জঙ্গল পার হলে কতদূর, রাস্তাটা কবে এই গ্রামের ওপর দিয়ে আসবে, অথবা আর কতদূর আসতে বাকি, সে রাস্তাটা আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখল—বেনহার সাহেবের জঙ্গল শেষ হচ্ছে না, জঙ্গল শেষ হলে সেই খড়ের চাল এবং অস্থায়ী বাস আকালুদের, পুরানো মহুয়া মদের গন্ধ, আর সেই মেয়েটা—সুজনিয়া একটা কুপি জ্বেলে বসে আছে, সেও সামান্য মদ খেয়েছে। খোটায় বাঁধা ভেড়া ছাগল, শূয়োর আর মুরগি। সে অন্ধকারে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখছিল সব। কারণ ওরা সবাই, পাখির মাংস আর চাটের মত করে রান্না—বড় বড় শালপাতায় ঢেলে গোল হয়ে বসে চাট খেতে খেতে মাটির গেলাসে মদ খাচ্ছিল। হাঁড়িয়া খাচ্ছিল। দূর থেকে সেই চাটের গন্ধ, শালপাতার গন্ধ এবং ওদের মাথার ওপর সব গাছ গাছালি। আর কিছুক্ষণ বাদেই চাঁদ উঠবে, চাঁদ না উঠলেই কি! এমন নদীর পাড়, বেনহার সাহেবের জঙ্গলের গাছ গাছালি এবং ছোট ছোট অস্থায়ী বাস মানুষের, ছোট ছোট সব লম্ফ জ্বলছে ঘরে, গোল গোল হয়ে বসে আছে সবাই, শালপাতা থেকে তুলে জিভে একটু চাট মিশিয়ে দিচ্ছে, জিভ যখন মেরে আসছে তখন এই মাংস এবং মদ আর সুজনিয়ার মুখ চোখ, কি দীর্ঘ চোখ সুজনিয়ার! কুপির অস্পষ্ট আলোতে ওর মুখ কি রহস্যময়! যেন সুজনিয়া সেই মাতালের মত এক চটানে বসে সামনের অন্ধকার গিলছে। অন্ধকার গিলতে গিলতে ওর চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে। যারা মদ খাচ্ছিল পুরুষ যুবা অথবা যুবতী এবং সর্দার আকালু ওর ভাই নিমালু অথবা সব আত্মীয় স্বজন, যে যার মত যুবতী বিবিকে নিয়ে বনের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ

হল্লা করছে। হল্লা করতে করতে চটানের ওপর গড়িয়ে পড়ছে—কেবল সুজনিয়া চুপচাপ একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে আছে এবং একটা ভেড়ার পিঠে মাথা রেখে নদীর চরে যে বড় শিরিষ গাছটা আছে তাই দেখছে। সুভাষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এই সব দেখতে দেখতে মেয়েটার মায়ায় কেমন জড়িয়ে গেল। ওর বড় বড় চোখ থেকে যেন মুক্তো-বিন্দুর মত কি ঝরে পড়ছে। সে অস্পষ্ট আলোর আভা থেকে সব টের করতে পারছে না—কিন্তু এমনই কিছু একটা মনে হচ্ছে। সে দেখল সুজনিয়া শিরিষ গাছটার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সর্দারের মেয়ে সে। সে বনের দেবীর মত। বনের দেবতা তার স্বামী। সে এই সব মানুষের, যারা আকালু সর্দারের অধীনে দলবল বেঁধে আছে তাদের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত। সুভাষের কেমন কষ্ট হতে থাকল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ওর চোখ জ্বালা করছে। শীত শীত করছে। ভিতরে ভিতরে ওর জ্বর আসছিল। এমন একটা দৃশ্য দেখে—ওই মেয়ে কতকাল, যেন চিরকাল—সে কুমারী থাকবে। কোন বনের দেবতা এসে ওর হাত না ধরলে কোনদিন সে পুত্র সন্তান লাভ করবে না! এমন ভাবতেই সুভাষের ভিতরটা কেঁপে উঠল। সে আর দাঁড়াতে পারল না। ওর হাত পা কাঁপছে। সে ছুটে যেতে চেয়েছিল মেয়েটার কাছে, আর তখনই দেখল কারা যেন বাঁধের ওপর দিয়ে সুজনিয়াদের আবাসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে লণ্ঠন। ওরা কাছে আসতেই সুভাষ বুঝল, বলাইবাবু এবং সতী তাকে খুঁজতে বের হয়েছে। সুভাষ বেনহার সাহেবের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারে—এই ভয়ে এ-অঞ্চলে ওরা আলো নিয়ে ছুটে এসেছে। সুভাষ তাড়াতাড়ি বাঁধের ওপর উঠে হাঁটতে থাকল। সে পায়ে শক্তি পাচ্ছিল না। হাত পা কেন জানি অসাড় হয়ে আসছে। সে ভেবেছিল দ্রুত হেঁটে যাবে, কিন্তু পারছিল না। সতী এসে ওকে ধরে ফেলল। স্যার আপনি এই বাঁধে? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

সুভাষ যেমন হেসে থাকে তেমনি হেসেছিল। বলেছিল, আমি সেই পথটার অনুসন্ধানে গেছিলাম। সে যে সুজনিয়াকে এতক্ষণ একটা বনের ভিতর গাছের আড়ালে দেখে এক অখণ্ড বিস্ময় অথবা প্রবল আকর্ষণবোধ করেছে, ওর ভিতরে ভিতরে প্রবল জোয়ার আসছে, সুজনিয়াকে বনের অন্তরালে অথবা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে এই যেমন কোথাও এক শ্যামলা বনভূমি থাকবে. নদী থাকবে, বনের ভিতর এক হ্রদ থাকবে, নানারকমের গাছ-পালা পাখি থাকবে, রোদ থাকবে এবং বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি, ঝড়ের দিনে ঝড়, সে ঝড় বৃষ্টির দিনে সুজনিয়াকে নিয়ে এক পাহাড়ের মাথায় ঘর বানিয়ে বসে থাকবে। এবং এই মেয়ে সুজনিয়া বন থেকে ফল-মূল সংগ্রহ করে আনবে আর সে সারাদিন কোথাও পাখি শিকার করে বেড়াবে। তারপর রাতে মহুয়ার মদ, পাখির মাংস এবং নির্জন রাত্রি আর কিছু থাকবে না। ভুবনময় সে এবং সুজনিয়া। এমন একটা স্বপ্নের ভিতর, অন্ধকার যে স্বপ্নের আঁধার সেই স্বপ্নে ডুবে থাকতে গিয়ে সে অনুভব করতে পারল ভিতরে তার প্রবল জ্বর আসছে। আর গাছে গাছে কারা বিজ্ঞাপন মারতে থাকবে। সেই বিজ্ঞাপনে অনুর ছবি দেখলে আমি পাগল হয়ে যাব সতী।

অথচ ঘরে যে ক'দিন সুভাষ বেহুঁস হয়েছিল সে-কদিন সে একবারও অনুর মুখ মনে করতে পারেনি। এতদিনে যদি অনুর গর্ভের সন্তান নষ্ট না হয়ে যায় তবে সে জননী হয়েছে। সুভাষ জনক হয়েছে। অন্ততঃ সে একবার জনক জননীর ছবি অর্থাৎ সে এবং অনু ওর সন্তানের হাত ধরে কোন পার্কে অথবা বড় ময়দানে হাঁটছে এমন একটা ছবি পর্যন্ত দেখা উচিত ছিল। কিন্তু সে কিছুই দেখেনি। কেবল যা দেখেছে সে এই মুখ, সুজনিয়ার মুখ চোখ এবং অন্ধকারে কুপি জ্বলছে, পাশে একটা বড় ভেড়া, ভেড়ার পিঠে সুজনিয়ার মাথা— সে অন্ধকারে ভেড়ার পিঠে মুখ রেখে কেবল একটা অন্ধকার গিলছে।

তেমন ছুই বড় চোখ, সাদা ডিমের মত ছুই বড় চোখ দেখে আনমনা হয়ে গেছে সুভাষ।

সতী দরজায় দাঁড়াল। সে এখন তুধ গরম করে আনবে। তার এখন অনেক কাজ। এই সব পরিষ্কার করা, বিছানার চাদর পাল্টে দেওয়া, পথ্য তৈরি করা। তবু যাহোক বিদ্যালয় ছুটি বলে সতীর এখন একটু এইসব কাজের পরেও বিশ্রাম আছে। নতুবা তার প্রথম ক'দিন কি কষ্ট গেছে। প্রাথমিক সেকশানের বিধুবাবু ছুটিতে আসেন। হাই স্কুলের যিনি প্রধান, যার নাম সুভাষ এবং যে একা এই বিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে থাকে, বলাইবাবু যাকে সব সময় কাজের ভিতর যেতে এখন দিচ্ছেন না, বলাইবাবু নিজে সব কাজ দেখে শুনে করে নিচ্ছেন, সেই মানুষ সুভাষ এসেই বিদ্যালয়ের জন্য একটা লেবরেটারি চাই—বিদ্যালয় অন্ত প্রাণ, তাকে একটু দেখে শুনে, তার কাজের ভার হালকা না করে রাখলে চলবে কেন।

বস্তুত সুভাষের এখন এই সতীই একমাত্র আশ্রয়স্থল। অথচ সে যে কেন সেদিন, এই প্রথম যেদিন সে দেখল এবং জানতে পারল সতীর স্বামী আছে, জেনেই সে কেন জানি নদীর ও-পারে চলে যেতে চাইল—অথবা সেই বেনহার সাহেবের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে চাইল। অথচ সে তো এ-জন্য এ অঞ্চলে চাকুরি নিয়ে চলে আসেনি। সে এসেছে—তার স্ত্রী, ভালবাসার অনু এখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সিনেমায় অভিনয় করছে। তার অভিমান প্রচণ্ড। তার অহমিকা প্রচণ্ড। সে যে এক সরোবর চেয়েছে, যেখানে কেবল সুভাষেরই প্রতিবিম্ব ভাসবে। অনু তার ভালবাসার স্ত্রী। কতদিন সে অনুকে দেখেনি। প্রীতি অনুর বান্ধবী, অনু সুভাষকে ছেড়ে গেলে এই প্রীতি তাকে ভালবাসায় নিত্যদিনের আস্বাদ চাখতে দিয়েছিল—কিন্তু সুভাষ তো জানে না মনের ভিতর তার এক গোপন অহঙ্কার আছে, এই অহঙ্কার

তাকে বড় করুণ করে রেখেছে। সে ভয় পায়। সে সেই বিজ্ঞাপনকে ভয় পায়। তার স্ত্রী অনুর সেই লাস্যময়ী মুখ অথবা প্রায় বেশবাসহীন শরীর কখনও কোন পাহাড় শীর্ষে অথবা বালিয়াড়িতে ভেসে উঠলেই সে ভয় পায়। সেই শরীরের ভিতর এক সোনার ঈগল উড়তে থাকলে সে স্থির থাকতে পারে না। সে হন্যে হয়ে রাজপথে ঘুরতে থাকে। সেই রাজপথ একদিন তাকে বড় অবহেলার চোখে দেখবে, তুমি এক মানুষ, তোমার স্ত্রী এক সুন্দরী রমণী, তুমি তাকে ভালবাসায় বেঁধে রাখতে পারলে না, উচ্চাশা তাকে পাগল করে দিয়েছে।

বস্তুত সুভাষ এখন ভেবে পায় না এই অসুখের সময় একবারও কেন, সে অনুর মুখ দেখতে পেল না। অনুর প্রতি ভালবাসা কি ক্রমে তার মরে যাচ্ছে!

সে কি আর সেই ভালবাসার উত্তাপ অনুর শরীরে খুঁজে পায় না! সে কি প্রায় সতীর মত, অর্থাৎ সতী বলাইবাবুর মেয়ে এটাই বড় হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। ওর যে স্বামী আছে, শঙ্কর যার নাম এবং যে প্রায় শঙ্করের মতই মাঝে মাঝে এখানে শঙ্করীর খোঁজে চলে আসে, শঙ্কর কোন কোনদিন কি সুন্দর মুর্শিদা গান গাইত। প্রায় আউল বাউলের বেশে সে চলে এসেছিল—আর চলে এলেই মনে হল সুভাষের, সতীর স্বামী সতীকে এবার লোপাট করে খাবে।

সতী এসে সুভাষের সামনে বলল, আমি যাচ্ছি। আপনি চৌকি থেকে নামবেন না। যা লাগবে ডেকে বলবেন। যেন কতকটা শাসনের সুরে বলে গেল। সতী চলে গেলেই সুভাষের মনে হল, এই সতীই তাকে সেদিন নদীর পারে বেনহার সাহেবের জঙ্গলে যেতে প্রভোক করেছিল। সুভাষ ইংরাজী শব্দেই কথাটা ভাবল। প্রভোকের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে এ-সময় সে তা মনে করতে পারল না। সতী শঙ্করকে নিয়ে ওর সামনেই অন্য একটা ঘরে ঢুকে

গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। ওর স্বামী, কতদিন পর স্বামী এসেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এই দাড়িতে এখন সতী হাত রাখবে, ঠোঁট রাখবে। এবং এমন ভাবতেই ওর শরীরটা রি রি করে উঠল। এতক্ষণে সুভাষের মনে হল, জ্বরটা তখন থেকেই ওর রক্তে চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এবং সারা বিকাল সতীর মত এমন লাবণ্যময় মুখে একটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গাল এবং চোয়াড়ে মুখ লেপ্টে থাকবে ভাবতেই সুভাষ স্থির থাকতে পারেনি, সে বেনহার সাহেবের জঙ্গলে নদী পার হয়ে রাস্তা খুঁজতে চলে গেছে। কারণ তার ভয় রাস্তাটা শহর থেকে এই সুদূর গ্রামে এলেই সেই বিজ্ঞাপনওলা মানুষটা এসে অনুর বিজ্ঞাপন মেরে যাবে। অনুর শরীর সোনার ঈগলের মত সেই বিজ্ঞাপনে উড়তে থাকবে।

সে বসে যথার্থ কি কারণ জ্বর আসার এবং কতদিন সে বিছানায় বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকল তা মনে করতে পারছে না। একবার মনে হয়েছে, নির্মল আকাশ এবং সামান্য ঠাণ্ডা এ-জন্য দায়ী, একবার মনে হয়েছে সুজনিয়ার সাদা ডিমের মত চোখ অন্ধকারে ভেড়ার পিঠে জ্বলছিল তা দেখে সে কি ভয় পেয়েছিল, ভয় পেলে জ্বর আসে, না কি সেই রাস্তাটা আবিষ্কারর জন্য সে এলোপাথারি অধিক পথ হেঁটেছে রোদে অথবা রাতের নির্জন মাঠের ঠাণ্ডা—অধিক পরিশ্রমে ঘাম জমে গেছে, যা হয় ওর, বোধহয় তাই হয়েছিল।

সে এবার দেখল যে পাখিগুলো বারান্দায় শস্যদানা খাচ্ছিল তারা প্রায় সকলেই উড়ে গেছে। শুধু দুটো চড়াই পাখি ওর জানালায় বসে বসে লাফাচ্ছিল। কিছু করণীয় নেই। কোন প্রবন্ধমূলক বই পড়তে এসময় তার ভাল লাগছে না। একটা বই এসেছে তার কাছে—লেখাটা জেমস্ বলডুইনের—নিগ্রো সমস্যা সম্পর্কে, বইটার কিছুটা সে পড়েছে বাকিটা পড়ার খুব উৎসাহ। একবার ভাবল বালিশের নিচ থেকে সেই বইটা বের করে পড়ে, কিন্তু জানালায় রোদ, রোদে বসে দুই চড়াই পাখি—নিশ্চয়ই ওরা স্বামী-স্ত্রী এবং পরস্পরের

প্রতি উভয়ে একটা বিশ্বাস বজায় রেখে চলেছে। অন্নুর কাছে ওর এইটুকু প্রত্যাশা ছিল। অন্নু কি অসতী! সে কি যথার্থই এখন অসীমের সঙ্গে আছে। সে তো কিছু সঠিক জানে না। একটা অন্ধ অবিশ্বাস ক্রমে তাকে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। সে সেখান থেকে অন্নুর স্পষ্ট চেহারাটা আর দেখতে পাচ্ছে না।

তাছাড়া মাঝে মাঝে ওর মনে হয় সে নিজেকে নিয়ে খুব বেশী ভাবে। এই যে সতী, যার স্বামী যাত্রাপার্টিতে বিবেকের গান গায়, এবং যে কিছুতেই বন্ধন মানে না, যখন রক্তের ভেতর খেয়ালটা চাপে তখন সে সব ফেলে দুস্তর মরু মাঠ ভেঙে রাতে বিরাতে চলে আসে এবং নেশাটা ছুটে গেলেই অমল ধবল পাল তোলা নৌকার মত নদীর মোহনায় হারিয়ে যায়, সতীর দুঃখ সে বোঝে না। এক যুবতী মেয়ে রেলপোলের ওপর সাদা জ্যোৎস্না উঠলে যে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কোন রাতে তার চোখে ঘুম আসে না, সেই আউল বাউল মানুষটা তা বোঝে না। সতীর মুখ দেখলে সুভাষ তা ধরতে পারে।

সতী কিছুক্ষণের ভিতরই এল। হাতে ওর একবাটি গরম দুধ। বলাইবাবুর সকাল বেলাতে টিউশানি থাকে। এখন সতী একা এবং সব ভাইবোনেরা পড়ছে। সতীকে দেখলে এখন জননীর মত লাগে। এবং এই যে সতী জানালার কাছে একটা টিপয়ে গরম দুধ এবং দুটো বিস্কুট রাখছে, একটু মিষ্টি আর ওর নরম কোমল শরীরে সকালের রোদ, দেখে মনেই হয় না এই মেয়ে এ'কদিন স্বামী বিহনে তার শিয়রে বসে রয়েছে। সতীর জন্যও ওর ভিতরে একটা কষ্ট। এটা কেন হয় সে বোঝে না। সব মেয়ে, যেখানে যত যুবতী মেয়ে আছে, তাদের ব্যবহার ওকে মুগ্ধ করে—কেবল অন্নুর সব কিছুই ওর কাছে সন্দেহজনক।

সে সতীকে যে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন জিজ্ঞাসা না করায় নিজেকে খুব স্বার্থপর অথবা ছোট মনে হচ্ছিল যার জন্য সেই

কথাটা সে খোলাখুলি বলে ফেলল, আচ্ছা সতী শঙ্করকে দেখছি না। সে কি চলে গেছে ?

সতী প্রথম কিছু জবাব দিতে চাইল না। দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নেবার জন্য জল, টুথব্রাস সব এনে রেখেছে। দেরি করলে দুধটা ফের গরম করতে হবে। সে সেজন্য বুঝি কথার জবাব দেওয়ার চেয়ে কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে চাইল। সে বলল, এই জল আপনার। হাতমুখ তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিন। দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, তুমি আমার কথাটার জবাব কিন্তু দিলে না।

—কি দেব বলুন। কেমন ওকে একটু বিরক্ত দেখাল।

সতী ওর অধীনে কাজ করে। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক সেকসানের সে-ই সব কিছু। সুভাষের মনে কোথায় যেন খচ করে বাজল। এই প্রথম যেন সতী ওর ওপর একটু বিরক্ত হয়েছে। সে তো এখানে কতদিন থেকে আছে। ওর ব্যবহারে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যার জন্য সতী ওকে অসহ্য মনে করতে পারে বরং সতীকে খুব অসুবিধা সত্ত্বেও কাজে কর্মে উৎফুল্ল থাকতে দেখেছে। সব দুঃখটা ঢেকে রাখার স্বভাব সতীর, সব সময় সুভাষকে সমীহ করে চলে এসেছে। সুভাষই চেষ্টা করছে বার বার যে সতীর এতটা সমীহ না করলেও চলবে। কারণ এই বিদেশ বিভুঁইয়ে, অথবা নির্জন পরিত্যক্ত অঞ্চলে—বলাইবাবু এবং তার এই মেয়ে সতী ওর সব কিছু। সুখে দুঃখে ওরাই সব তার। সতী নানা কারণে বিরক্ত থাকতে পারে, একটা মানুষ চারিদিক সামলাচ্ছে, সুতরাং ওর কিছু অসুবিধা থাকতে পারে— যার জন্য সুভাষের জবাব সে এড়িয়ে গেল।

সুভাষ মুখ ধুল ভাল করে। সতী শুকনো তোয়ালে দিল মুখ মুছতে। তারপর টেবিলে গরম দুধ, কটা বিস্কুট এবং এ-সময় বেশী কিছু আর দেওয়া হবে না—সে তাও বলে দিল। অসুখ থেকে উঠে ওর খিদেটা যেন ক্রমে বাড়ছে। কেবল খাই খাই একটা স্বভাব

হয়েছে। বড় কইমাছ সংগ্রহ করেছে সুজনিয়ার বাপ আকালুকে দিয়ে এবং অসময়ের কই, এতবড় কই এখন কোথাও পাওয়া ভার—তবু পথ্যের দিনে সতী বলেছে, কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

সুভাষ বলেছিল, যা তুমি দেবে তাই খাব।

—সে তো আপনাকে যাই দেব তাই খাবেন। তবু একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে না!

সুভাষ জবাব দেয়নি।

—মাগুর মাছের ঝোল করে দিচ্ছি। হাটে আদিনাথকে মাছ আনতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মাগুর অথবা শিঙ মাছ সুভাষ খেতে পারে না। কেমন একটা মেটে মেটে স্বাদ, সে ছেলেবেলা থেকেই, যখন সে পূর্ববঙ্গে ছিল, শীতকালে কাকামশাই নৌকা ডুবিয়ে রাখতেন পুকুরে। খড়-কুটো ডালপালা দিয়ে ছোট নৌকা ডোবানো থাকতো পুকুরে। শীতের দিনে, এই খুব সকালে ছ'সাতদিন অন্তর অন্তর নৌকা টেনে তুললে নানা রকমের মাছ উঠত—বড় বড় ফলিমাছ, শিঙ মাগুর বেশী উঠত, আর উঠত পুটি মাছ ম্যানা মাছ এবং সব মাছের ভিতর যে মাছ স্বাদের—কই মাছ সেটা উঠত কম, সে সেই মাছ খেতে ভালবাসত বলে ওর জন্য কই মাছ রোজ একটা করে রান্না হত। সুভাষ, আদিনাথ হাটে যাচ্ছে মাছ আনতে শুনে বলেছিল যদি কই মাছ পায় তবে যেন তাই আনে। সে শিঙ মাগুর খেতে পারে না।

এখন এ অঞ্চলে শিঙ মাগুরই পাওয়া যায় না তার ওপর কই মাছ! তবু আদিনাথকে বলেছে হাটে না পেলে পরিচিত জেলেদের যেন বলে রাখা হয়—কই মাছ পেলেই হেডমাষ্টার বাবুর জন্য যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি সতী, কিছু ছাত্র, যারা নদী নালার পার থেকে উঠে আসে তাদের বলে রেখেছিল। কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি। সুজনিয়া বিকাল বেলা দেখতে এলে বলেছিল সতী, বাবুর তো কিছুই মুখে রোচে না। ভাত খায়না এমনিতে। শিঙ

মাগুর খাচ্ছে না। কই মাছ খাব খাব করছে। কই মাছ দিয়ে ঝোল শুকতোনির মত করে দিলে যদি দুটো বেশী খায়। তোরা যদি পাস কই মাছ…!

অসুখ থেকে উঠে সুভাষ কেমন যেন ছেলে মানুষের মত হয়ে গেছে। এই যে সতী ওর কথার জবাব দিল না, অথবা যেটুকু দিল, অনিচ্ছা সত্ত্বে দিল এবং বিরক্তি এক ভাব মুখে, এটা কি ওর এই অসুর্খ থেকে ওঠার দরুন ভিতরে একটা সরল অভিমান কাজ করছে। একটুতেই ভিতরে খচ করে বাজছে। সে যে খুব ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে ওর কিছু ব্যবহার তার সাক্ষ্য। সুজনিয়া কলার খোল চৌপাট করে, বাপ আকালু সর্দারকে দিয়ে সেই কোথা এক নাবাল দেশ থেকে এক কুড়ি পাঁচটা বড় বড় কই মাছ এনে দিয়েছে। সুভাষ ছেলেমানুষের মত বলেছিল, আর কাউকে দেবে না সতী, আমি একা খাব।

সতী চোখ তুলে দেখেছিল সুভাষের মুখ। সে মনে মনে হেসেছিল। সতী ওর কেউ নয়। সতীর বাবা এই মানুষের ক্লার্ক। বাবাকে, তিনি শুধু আদেশ করার মালিক। এই যে মানুষটা সামান্য কই মাছ নিয়ে ছেলেমানুষি করে বসল, সতী যেন কিছুতেই আর একটা দুটো কই মাছ ওর ভাইদের বোনদের রেঁধে দিতে পারছেনা। নিষেধ করলেন তিনি। কিন্তু পর মুহূর্তেই কি মনে হতে সুভাষ সতীকে ডেকে বলেছিল—আমি অতসব বুঝি না। অসুখ থেকে উঠে আমার মাথায় যেন কি হয়েছে। তোমরা সবাই খাবে।

সতী বলেছিল, সেটা আমি বুঝব কি করতে হবে না হবে। এখন দয়া করে এ'কটা ভাত খেয়ে উঠুন।

প্রথম দিকে ওর মুখে বড্ড অরুচি। এখন ওর সেই অরুচিটা কেটে গেছে। সুজনিয়া প্রতিদিন গন্ধপাঁদাল এনে দিয়েছে। এটা খেলে মুখের অরুচি নষ্ট হয়ে যায়। সুজনিয়া কত বন জঙ্গল ঝোপ ভেঙে সংগ্রহ করে আনে। সকলেই ওর জন্য করছে। সে কিছু

তেমন করতে পারছে না। সতী যদি কিছু বিরক্ত হয় হোক, এমন খচ করে বাজলে চলে না। ওর সব দিকটা না দেখে সে এখন রাগ করতে পারে না।

এই হয় মানুষের। সে ভেবেছিল সতীর ওপর রাগ করবে না। কিন্তু যখন সতী ওর দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে সাবধান করে দিচ্ছে, তখন সুভাষের মুখ দেখলে মনে হবে, হচ্ছে তো হোক। আমি ঠাণ্ডা দুধই খাব। সতী সেই মুখ দেখে টের পায় স্যার আবার রাগ করেছেন, অসুখ থেকে উঠে একেবারে বালকের মত মান অপমান। একটুতেই মুখ ভার হয়ে আসে। সে এই রাগের কারণ বোঝে। সে এবার খুশি করার জন্য স্যারকে বলল আমার কি হাত আছে বলুন! আপনার এমন অসুখ! আপনার পাশে একটা মানুষ না থাকলে চলে। কেন আপনার পাশে বসছি সেই রাগ! বাবু রাগ করে মামার বাড়ি চলে গেলেন। বলে সতী ছেলেমানুষের মত নিজেও হাসল।

সুভাষ আর রাগ করে থাকতে পারল না। সে এক চুমুকে দুধটুকু সব খেয়ে ফেলল। অনুর প্রতি, কি সে এমন একটা অন্যায় করে এসেছে। সে ওর ভাল লাগা মন্দ লাগাকে প্রশ্রয় দেয়নি বলে ওদের ভিতর এমন একটা বিচ্ছেদ ক্রমে দানা বাঁধছে। ওর কেন জানি আজ ইচ্ছা করল প্রীতিকে একটা চিঠি লেখে। লিখে জানায় প্রীতি তুমি কেমন আছ, 'আমি এখানে বেশ ভাল আছি। এই নিরিবিলি নির্জন গ্রাম মাঠ, হিজলের বিল, রেলপুল এবং তিতিরের মাংস আমার খুব ভাল লাগছে। তারপরই সতী যখন আসে, এই স্কুলের দৃশ্য যখন মনে পড়ে এবং বিকেল বেলায় সুজনিয়া যখন আসে নানা রকমের সব্জি নিয়ে তখন আর সে চিঠি লেখার কথা মনে করতে পারে না। সুজনিয়া এলে, বলে, হ্যাঁরে সুজনিয়া তোরা যাচ্ছিস কবে।

—ঠিক নাই বাবু। কবে কুথা যাচ্ছি ঠিক নাই।

—আকালু কিছু বলে না।

—বুলে। বুলে সেই পাহাড়ে চলে যাবেক।

—কোন পাহাড়ে ?

—যেখানে আবাস আছে মোদের সিখানে।

—আমাকে নিয়ে যাবি তোদের সঙ্গে !

—হেই বাবু কি বুলে !

—আমার কিছু ভাল লাগে না জানিস।

—হেই বাবু কি বুলে।

—হেই বাবু কি বুলে ! সুভাষ মাঝে মাঝে বিছানায় বসে হাহা করে হাসতে চায়। অথবা ওর কথায় ওকে বিদ্রূপ করতে চায়। সে দুর্বল, পারে না। ওর বলতে ইচ্ছে হয়—আমি যাব। ঠিক তোর সঙ্গে চলে যাব।

—সতী এলেই সুজনিয়া বলে, বাবু কি বুলে ?

—কি বলে।

—বুলে আমাদের সাথ চলে যাবেক।

- বাবুর মাথা খারাপ। সতী যতটা সহজে কথাটা বলে, মনের ভিতর তত সহজে সে কথাটাকে মেনে নিতে পারে না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এ যা মেয়ে, যুবতী, কয়লার মত রঙ, ডিমের মত সাদা চোখ এবং কি যেন সুজনিয়া অধরে ধরে রেখেছে, শরীরে বেঁধে রেখেছে। সাত সমুদ্র তের নদী অথবা তেপান্তরের মাঠ বড় বেশী বন্য উর্বরা এবং সুজলা সুফলা। হাত দিলেই সুজনিয়ার শরীর বৃষ্টির মত অঝোরে ভালবাসা বর্ষণ করবে। এই যে মানুষ এসেছেন এখানে, কোথাও আর যাবার নাম করছেন না। আত্মীয় স্বজন বিহীন, উদবাস্তু মানুষ কখন এই মেয়ের সঙ্গে সহজেই আউল বাউলের মত বের হয়ে যেতে পারে।

সুভাষ সতীকে কোন প্রশ্ন করে না। সুজনিয়াকেই প্রশ্ন করে সে জেনে নিতে চায় সতী কি বলেছে। সবটা সে শুনতে পায় নি। খারাপ, এই কথাটা সে কেবল শুনেছে। সুতরাং সে ফের বলল, তোর দিদিমণি কি বলল রে।

বারান্দায় সতী। পাশে সুজনিয়া বসে। একটা ধামার ভিতর কিছু মুরগির আণ্ডা এবং বাচ্চা। সে বাবুর জন্য নিয়ে এসেছে। বাবুর প্রতি সে যে একটু দুর্বলতা পোষণ করে এবং সতী দিদিমণি যে টের পায়, সুজনিয়া চোখ তুলে দিদিমণির দিকে তাকালেই তা ধরতে পারে। সুজনিয়া বলবে কি বলবে না এমন চোখ নিয়ে সতী দিদিমণির দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুভাষ একবার সতীর দিকে তাকাল অন্যবার সুজনিয়ার দিকে। সে এখন একটু সময়ে সময়ে ঘর থেকে বের হয়। বারান্দায় এবং মাঠে পায়চারি করে। সুজনিয়া মুরগির বাচ্চা খাইয়ে বাবুকে নীরোগ করে তুলছে। আগের মত শক্ত মানুষ করে তুলছে। কিন্তু সুজনিয়া যেন বুঝে ফেলেছে, বাবু, সতী দিদিমণিকে ভয় পায়। ভয় পায় বলেই, দিদিমণি কি এখন বলছে, কি তাকে নির্দেশ দেবে সেই আশায় অপলক তাকিয়ে আছে।

সতী বলল, আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিলেন কেন ?

সুভাষ চেয়ারের পাশে ডান হাতটা ঝুলিয়ে দেবার সময় বলল, তুমি আদেশ দিলে সুজনিয়া বলবে।

—সুজনিয়া কি বলবে, আমিই বরং বলছি।

—বল তবে।

—বলেছি, বাবুর মাথা খারাপ।

—ঠিকই ত বলেছ।

—সুজনিয়ার সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

এখন ফসল কাটার সময়। চারিদিকে তাকালে সোনালি ধানের মাঠ। মাঠ থেকে গাড়ি করে ধান আসছে। কোথাও বা মাঠে ধানের মাড়াই এবং ধান ঝেড়ে আনা হচ্ছে। এখনই যা সময় আকালুদের পয়সা ঘরে তোলবার। গৃহস্থ মানুষের বাড়ি বাড়ি আর

ওদের এখন ঘুরতে হয় না। বরং এই সময়টাতেই ওদের চাহিদা বেশী। ঘরে বসবার সময় নেই। পাখি শিকারের সময় নেই। জমি চুক্তিমতে কাজ। অনেকদিন সুজনিয়াকে নিয়ে ঘরে ফিরতে আকালুর রাত হয়।

বিদ্যালয়ের এখন পরীক্ষার সময়। সুভাষ অসুস্থ ছিল বলে ছাত্রদের যে পড়ার ক্ষতি হয়েছে, এখন সুভাষ বেশী ক্লাস নিয়ে সেটা পুষিয়ে দিচ্ছে। যারা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সুভাষের সন্ধ্যা এবং রাতের অধিক সময় ওদের সঙ্গেই কেটে যায়। সতী যে ওর পাশের বাড়িতেই আছে, ওর এখন তা যেন মনে হয় না। দু'বার খাবার সময় দেখা হলে মনে হয় এই সতী ওর অপেক্ষায় বসে থাকে। অধিক রাত করে ফেললে সতীর কষ্ট হয় জেগে থাকতে। সুভাষের যা কাজ বিদ্যালয়ের, সতীর দায়িত্বে প্রায় তেমনি কাজ। মেয়েটা সব কিছু দেখে, ভাইবোনদের খাইয়ে রাত জেগে পরীক্ষার খাতা দেখছে। সুতরাং ওকে আগে ছেড়ে না দিলে সতীর কষ্ট হবার কথা। কিন্তু সুভাষের এসব মনে থাকে না। কাজ পাগল মানুষ। ওর এখন সুজনিয়ার কথাও মনে আসে না। শঙ্কর এলেই বুঝি সুভাষ আবার সুজনিয়ার সন্ধানে চলে যাবে।

এর ভিতর একদিন সুভাষের কেন জানি মনে হল, জীবন বড় এক ঘেয়ে ঠেকছে। রাস্তাটা এসেছে কিনা, নদী পার হয়ে রাস্তা আসতে আর কত দেরি এই সব সে আবার জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। পরীক্ষা হয়ে গেল বলে কাজের কোন চাপ নেই। সে সকালে উঠে সতীর মুখ দেখতে পায়। খাবার দিয়ে যায় যখন সতী তখন একবার, এবং বিদ্যালয়ের ক্লাশে সতীকে সুভাষ দেখতে পায়। দেখতে পেলে মনে হয়—ওর সন্তানের কি নাম হবে, ছেলে না মেয়ে, সে একবার প্রীতিকে লিখবে নাকি, প্রীতি তুমি দয়া করে জানাও অনুর সন্তান মেয়ে না ছেলে। কি নাম রাখা হয়েছে, দেখতে কেমন! ছেলে হলে নিশ্চয়ই আমার মত হবে, মেয়ে হলে অনুর মত।

আমার বড় ইচ্ছা হয় ওকে দেখি। সে বিকেলবেলা, তখন ছেলেরা মাঠে খেলা করছে, ওদের চিৎকার ভেসে আসছিল, সে নিজের ঘরের জানালা খুলে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে কিভাবে চিঠিটা আরম্ভ করা যায় ভাবছিল—তখনই এল সুজনিয়া। এসে বলল, বাবু আমরা কাল চলে যাবেক। বলেই সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুভাষকে মেয়েটা যেন আরও কিছু বলতে এসেছে। এ মেয়ের ঘর বর সব, গাছপালা এবং নদীর সঙ্গে অথবা বনদেবতার সঙ্গে বাঁধা। সুভাষের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সে বনদেবতা হয়ে যাবে—আর এই মেয়ে বনদেবীর মত বনের ছায়ায় ঘুরে বেড়াবে।

সুভাষের মনে হল অনেকদিন পর মেয়েটি এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সে বলল, সুজনিয়া তোর বিয়ে হবে না?

সুজনিয়া ফিক করে হাসতে গিয়ে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—তোর একটা মানুষ থাকুক এমন ইচ্ছা হয় না? প্রশ্নটা সে কেমন বোকার মত করে ফেলল।

সুজনিয়া বলল, লাগে বাবু। আমার কত কিছু ইচ্ছা হয়। আমার ভাল লাগে একটা আমার বেটা থাকবে, বেটি থাকবে। ওরা আমার সাথ খেলবে বাবু, ঘর করবে। আমার মানুষ জমি থেকে খেটে পয়সা আনবেক। কত খোয়াব আছে। সে কেমন সরল বালিকার মত বলে গেল। ওর ইচ্ছার কথা বলে গেল। একবার চোখ তুলে তাকাল না। সেই দিন থেকে, যবে সে মোষের পাল্লায় পড়ে মাঠের ভিতর একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেছিল, বাবু তাকে রক্ষা করেছে—সেই থেকে সে কেমন এই মানুষের কাছে ইজ্জত বাঁধা দিয়ে গেছে।

সুজনিয়া লক্ষ্য রাখছিল, সতী কোনদিকে, সতী আসছে কিনা। যতটা পারছে পালিয়ে পালিয়ে কথা বলছে।

সুভাষ ওকে বলল, তুই পালিয়ে যেতে পারিস না?

—কে পালাবে হামার সাথ বাবু ?

—কেন তেমন জোয়ান মরদ তোদের দলে নেই ?

—ওয়াকে কুপিয়ে কাটবেক বাবু। ভয়ে কেউ হামার সাথ লড়ে না।

—তুই যাবি আমার সঙ্গে।

—কুথি বাবু ?

—যেদিকে দু চোখ যায় !

—বাবু যে কি বুলছে !

—সত্যি বলছি। আমায় কিছু ভাল লাগছে না রে। আমি যে কি এখন চাই নিজেও বুঝতে পারছি না। সেই রাস্তাটা নদী পার হয়ে চলে এসেছে। একটা বিজ্ঞাপনের মানুষ আসবে। এলেই আমার যে ভয়, সেই ভয়ে আমি মরে যাব।

সুজনিয়া বলল, বাবু তু পাগল আছিস।

—ঠিক পাগল হতে পারলে ভাল হত সুজনিয়া। তোকে আমি সব বলতে পারি। তোকে বললে আমার কোন ক্ষতি হবে না। পাগল হওয়া থেকে তুই কেবল আমাকে রক্ষা করতে পারিস।

এই আশ্রমের মত বিদ্যালয়ে এখন শীতের রোদে ভেসে যাচ্ছে। সুভাষ রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-অঞ্চলের ধান তোলা শেষ। সুতরাং ওরা চলে যাবে।

সুভাষ বলল, আবার তোরা কবে নেমে আসবি ?

—বর্ষা নামলে নেমে আসব আমরা।

—তখন হয়ত তুই আর আমাকে এখানে দেখতে পাবি না। সুভাষ এমন একটা কথা বলেই মাঠের দিকে তাকাল। সে শহর ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। সে একটা বড় চাকরি করত সওদাগরি অফিসে—এখন সেটা ওর কাছে স্বপ্নের বত মনে হয়। মাশুদি সাবের কথা মনে হয়—সুভাষের বৌ যে ওকে ছেড়ে দিয়ে সিনেমায় নেমেছে, সে যে এখন পরিচিত মানুষ জন দেখলে ভয় পায়—বড় বড়

হোর্ডিংএ বিজ্ঞাপন। কোন সমুদ্রতীরে অথবা হ্রদের পারে সুভাষের অনু বেশবাসহীন ভাবে ছুটছে। সামনে এক যুবা। তার প্রেমে পর্দায় সে পাগল—সুভাষ সামান্য মানুষ, সুতরাং সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারে না—সে পাগলের মত শহরের ঐশ্বর্য, গাড়ি এবং বড় চাকুরি ছেড়ে দিতে চাইলে মাশুদি সাব সুভাষের দুঃখটা কোথায় ধরতে পারতেন। মদের টেবিলে বসে বলতেন, চ্যাটার্জী জীবনকে ভোগ করে নাও। বৌ চলে গিয়ে তোমায় মুক্ত পুরুষ করে দিয়ে গেল। তারপর সুভাষ প্রীতিকে নিয়ে মুক্তপুরুষ সাজতে গিয়ে দেখল সেখানেও শান্তি নেই। ছোট হ্যাণ্ডবিলের মত হাজার লক্ষ প্যাম্পলেট ওর মাথার ওপর কারা যেন ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে, সেইসব প্যাম্প-লেটের ভিতর ডুবে গেলে দুই হাত তুলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে এবং ভয়ে সে পালাতে চায়—কেবল সেই সব বিজ্ঞাপনে অনুর লজ্জাজনক ছবি। ওর ভালবাসার অনুকে সে কেন জানি বিজ্ঞাপনে একেবারেই চিনতে পারে না—কেবল একটা বেশ্যার মত চোখ মুখ পাছা সব সময় যেন অনু উঁচু করে রেখেছে। এই যুবতীকে ওর স্ত্রী ভাবতে কষ্ট হয়—অথবা নিজেকে মনে হয় কাপুরুষ। সে তার ঘরের বৌকে বেঁধে রাখতে পারল না।

—এ-কথা তু বলছিস কেনে বাবু?

সুভাষ বলতে পারত, যে মানুষের বৌ পালায়, সিনেমায় রঙ মেখে মুখ পাছা দেখায় সে মানুষের মরণ ভাল সুজনিয়া। আমি এখানে এসেছিলাম এই নির্জনে, যেখানে শহর থেকে কোন বাস-ট্রাক আসেনা, যেখানে মানুষগুলি পায়ে হেঁটে হাটে গঞ্জে যায় এবং শহরের সেইসব বিজ্ঞাপন কেউ বয়ে আনবে না এমন একটা জায়গা যখন এটা, তখন কিনা এসেই শুনতে পেলাম বড় রাস্তাটা নদী পার হয়ে শহর থেকে চলে আসবে। চলে এসেই একটা মানুষ আসবে, পিঠে সেই বিজ্ঞাপনে থাকবে অনুর রঙমাখা মুখ, যা দেখলে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমি আর একবার হয়ত আত্মহত্যার চেষ্টা করব।

সুভাষ বলল, এই এমনি। তারপর সে সুজনিয়ার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকল। অন্ধকারের সেই চোখ—ডিমের মত চোখ, শালপাতায় পাখির মাংসের চাট, হাঁড়ি ভর্তি মদ, ঠিক সেই ওর জিরো জিরো সেভেনের মত। সে একদিন ম্যাড-হাউজে মাংসের চাট দিয়ে মদ খেতে খেতে বমি করে দিয়েছিল। কোন কোন দিন সে পার্কস্ট্রিটের ব্লু ফক্সে যেত। অন্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে রাগে দুঃখে অথবা নিজের বশে কতটা জাহান্নমে যাওয়া যায় পরখ করতে গিয়ে দেখেছে মাংসের চাট এই যেমন ফ্রাইড চিলি চিকেন এক প্লেট এবং পাতলা কাঁচের গ্লাসে সোনালি রঙের মদ, একেবারে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ। জীভ মেরে এলে লঙ্কা জিভে ঘসে নিলে, কিছুক্ষণের জন্য যেন স্বাদটা ফিরে আসে—আর সেই বনের ভিতর, এক যুবতী মেয়ে পাথরের মত খোদাই শরীরের ভাঁজ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উরুবিল্ব নগরীর মত প্রাচীন গন্ধ, সেই গন্ধ মনে এলেই সে আবার নদী পার হয়ে যেতে চায়, আমায় নিয়ে যা সুজনিয়া। আমাকে নিয়ে যা। আমার এই অস্থায়ী সাধু সন্ন্যাসীর জীবন আমি জোর করে ধরে রেখেছি।

সুজনিয়া এখন বাবুর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। বাবু যেন ওর শরীর গিলে খাচ্ছে। সুজনিয়ার শরীর কাঁপছিল উত্তাপে, এবং এক তাড়না ভিতরে, সুভাষ যেন সিংহের মত প্রায়—এখন কেবল ভোগের নিমিত্ত দু' থাবায় তুলে নেওয়া সুজনিয়াকে।

সুজনিয়া বলল, বাবু যাই।

সুজনিয়ার কি এক প্রচণ্ড আকর্ষণ, ঠিক প্রীতির মত—অথবা প্রীতির চেয়েও বেশী।

—তুই রাতে খুব মদ খাস।

—খুব খাই না বাবু।

—কেন খাস না? সেদিন রাতে দেখলাম তোদের সবাই মদ

খেয়ে বেহুঁস, কেবল তুই ভেড়ার পিঠে মুখ রেখে অন্ধকার আগলাচ্ছিস। তুই বেশী খাসনা কেন ?

—আমি খেলে পাহারায় থাকবে কে ? আমাকে ওয়ারা কম দেয়। বেশী দিতে নাই। ভগবান জেগে না থাকলে চলবেক কেন !

—আজ তোরা খাবি না !

—আজ ত বাবু তুকে কি বুলবে ! তারপর সুজনিয়া যা বলল তার অর্থ দু'টো বড় চকাচকি মারা হয়েছে, একটা মুরগি। তিনটা পাখির মাংস রান্না হবে। বড় হাঁড়িতে রান্না। মোটা চালের ভাত। আর নদীর পার থেকে সাহাবাবুদের ভাটি থেকে পচাই হাঁড়ি ভর্তি। যে যত পারে খাবে। কাজ থেকে সকলের ছুটি।

সুভাষ বলল, তোদের একটা ভোজ হচ্ছে।

—হ্যাঁ বাবু। সবাই চলে যাবেক। সর্দার একটা ভোজ দিয়ে দিবে এবারে।

—আমাকে খেতে বুললি না !

—আয় না বাবু। খেয়ে লিবি। মাংস ভাত খাবি।

সুজনিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। চারপাশে ক্রমে অন্ধকারটা ঘন হয়ে এল। আদিনাথ আলো দিয়ে গেছে ঘরে। জানালাটা খোলা। সে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় কদম ফুলের গাছ। শীতকাল বলে দুটো একটা পাতা খসে পড়েছে। দুটো একটা পাখি উড়ে এসেছে বিল থেকে। এখন সব পাখিরা গাছে আশ্রয় নেবে। এবং অন্ধকারে পাখিরা পরস্পর ঠোঁট স্পর্শ করে পৃথিবীর ঘরে ঘরে কত দুঃখী মানুষের বাস যেন এ-সব তারা অনুভব করতে পারে। সুভাষ গাছটার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মনের ভিতর সে অদ্ভুত চাঞ্চল্য বোধ করছে। কোথাও নিবিড় বন থাকবে, অরণ্যের মত আর এই যুবতী। কারণ সে জানে সুজনিয়া পৃথিবীর একটি মাত্র মানুষকেই তার উলঙ্গ পাথরে খোদাই

এক প্রাচীন ভাস্কর্যের রূপ দেখিয়ে পাগল করে দিয়েছে। বুঝি সুজনিয়া নিজেও ভালবাসার জন্য পাগল হয়ে গেছে। অন্ধকারে সুভাষ তা টের পেল। সুজনিয়ার চোখ থেকে সে এটা পড়তে পেরেছে।

সুভাষ বেশী সময় এই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল না। শীতের রাত। হিম-ঠাণ্ডা। সে ঘরে ঢুকে দেখল সতী তার রাতের খাবার ঢেকে রাখছে। সতী কথা বলল না। অন্যদিন সতী খাবার দিতে এসে একটু সময় নিয়ে গল্প করে। আদিনাথের আসতে রাত হয়। বলাইবাবু টিউশনি ছেড়ে বাসায় ফিরতে রাত করে ফেলেন। ভাই বোনেদের পড়া দেখিয়ে দিয়ে সতী খাবার দিতে আসে। এবং ওদের কেউ ডাকতে না এলে প্রায় কোনদিনই সতী চলে যায় না।

আজ সতী খাবার ঢাকা দিয়ে দরজা পার হয়ে নেমে গেল। সতী কি টের পেয়েছে! টের পেলেই ক্ষতির কি। সতী তুমি তো সম্পর্কে আমার কেউ নও। তবু আমার প্রতি তোমার এত শাসন কেন। তুমি অনেক করে জানতে চেয়েছ আমার কে আছে, আমি কি কারণে এই নির্জনে বনবাসী, আমি যে এখানে বেশী দিন থাকতে পারছি না, আমার পিছু টান আছে এসব আন্দাজ করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমি বুঝি, সতী তুমি সুজনিয়াকে পছন্দ কর না। তুমি যে সেদিন বাঁধের পারে আমায় খুঁজতে গিয়েছিলে সে আমার জন্য নয়, সুজনিয়াকে তোমার সন্দেহ, আমি তার টানে ওদের চটানে চলে যেতে পারি। এই সব ভেবে মনে মনে হাসল সুভাষ। খাবার ঢাকাই থাকবে, সে খাচ্ছে না। কারণ পাখির মাংস অথবা সেই মদ, শালপাতায় মাংস, ভাঁড়ে পানীয়—যেন সেই এক শহরের মত বিলাস নিয়ে সুজনিয়া গাছতলায় তার জন্য অপেক্ষা করবে। সে দরজা পার হয়ে এবার নেমে এল এবং আমলকি গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল, সতী।

সতী ওদের ঘরের নীচে নেমে বলল, আমায় ডাকছেন।

—একটা কথা ছিল।

—এদিকে আসুন না। সতী যেন উঠোনে সহসা নেমে যেতে সংকোচ বোধ করল। যেন মনে মনে আন্দাজ করতে পারছে। মানুষটা আর সেই আন্তরিক মানুষ নেই, কিছু একটা মনে মনে ভাবছে।

সুভাষ গাছের নীচ থেকে নড়ল না। বলল, একটু নেমে এস।

যেন অনেক গোপন কথা আছে। সুভাষ এখন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সতীর জন্য প্রতীক্ষা করছে। সতী গাছের নীচে নেমে এলে বলল, আমি রাতে খাব না সতী।

—কেন খাবেন না! সেই কখন খেয়েছেন।

—আমি একটু ও-পারে যাব।

সতীর বুকটা কেমন আঁৎকে উঠল।

সুভাষ বলল, এই যাব আর আসব।

—এই রাতে আপনার ও-পারে কি আছে! যাই থাকুক, না খাবার কি আছে!

—সুজনিয়া খেতে বলে গেছে। ওর বাপ পাঠিয়েছিল। ওরা পাখির মাংস আর ভাত করেছে।

সতী বলল, আপনি পাগল না মাথা খারাপ। ওরা আদিবাসী, রান্না-বান্না যা করে আপনি মুখে দিতে পারবেন!

আমি সব পারি সতী। তুমি আমার শুধু এই স্কুলজীবন দেখেছ, আমি যে এক মানুষ, সন্ধ্যা হলেই প্রীতিকে নিয়ে কত রাতে গড়ের মাঠ দেখতে বের হয়ে গেছি, কত রাতে শুধু মদ আর মাংস, হ্যাঁ আর ছিল প্রীতি, প্রীতির জন্য আমি অন্থর দুঃখ ভুলে ছিলাম। তারপর বিশ্বাস কর কেন জানি প্রীতিকে আমার ভাল লাগল না। সব ফেলে এখানে চলে এলাম। এসেই দেখি তুমি। তোমাকে ভাল লাগল, কিন্তু প্রীতির মত ব্যবহার করতে পারলাম না। একেবারে অন্য জীবন, বিদ্যালয় অন্ত প্রাণ আমার। যেন সুভাষবাবু

ভাত খুটে খেতে জানে না। সুভাষ বলল, খাই না খাই একবার যাওয়া উচিত।

সত্তী জানে না, সুভাষবাবু অতীতে মদের ওপর বেশী নির্ভর করতেন। এই শীতকাল বড় মনোরম। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কোথাও রেকর্ড প্লেয়ারে 'আই নো দাই হার্ট' এমন সঙ্গীত, অথবা সেই মেয়েটা যে ম্যাড-হাউসে কেমন হিফ্ হিফ্ শব্দ তুলে গান গায়। যে মেয়েটার কি গভীর চোখ, কালো কাজল মাখা ভুরু আর গালগুলোর রঙ পাকা আপেলের মত এবং হাত পা কৃশকায় তরুণীদের মত হতে পারে কিংবা যা উঁচু পাছা থাকে মেয়েদের, মেয়েদের উঁচু পাছা নিয়ে সুভাষ রাতের পর রাত, মাইকের সামনে, কখনও কখনও লাল নীল অথবা হলুদ রঙের আলো চারপাশে, আলোটা ঘুরে ঘুরে পড়ছে, নেশায় মানুষগুলো বুঁদ হয়ে আছে এবং টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে সেই মেয়েটা যার শরীরে প্রায় পোশাক নেই বললেই হয়, বরং উলঙ্গ থাকলে ভাল ছিল সেই মেয়েটার তেমন শরীরের ভিতর সুভাষ ডুবে থাকত।

এখন এই গাছের নীচে সেই সুভাষকে চেনাই যায় না। একেবারে সন্ন্যাসীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

বস্তুতঃ সুভাষ সেইদিন থেকেই মনের ভিতর ক্ষিপ্ত ছিল। যেদিন সে পালিয়ে দেখেছে সুজনিয়া লম্ফ জেলে ভেড়ার পিঠে মুখ রেখে উদার আকাশের নীচে বনঝোপের ছায়ায় বসে রয়েছে! আর দলের অন্য সকলে নেশায় উন্মত্ত। কারও বসন ভূষণ ঠিক নেই।

সুভাষ যেন এতদিন সব ভুলে নির্জনে সন্ন্যাসী-প্রায় জীবন যাপন করেছে। সতীর স্বামী শঙ্কর এসেই তার সব কেমন গণ্ডগোল করে দিল। সুভাষের শক্ত বাহু, বলিষ্ঠ শরীর। এবং প্রায় সিংহের মত সবল দীর্ঘ চেহারা বনের ভিতর কিংবা পাহাড়ের উপত্যকায় নেংটি পরে ঘুরে বেড়ালে আদিবাসীদের সর্দার মনে হবে। এই মানুষ নিমেষে বনের ভিতর হারিয়ে গেলে সেই সুজনিয়া বলে

মেয়েটির সর্দার হয়ে যেতে পারে সে। সতী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তা টের পাচ্ছে।

সতী এবার বলল, আমাকে কথা দিন কিছু খাবেন না।

—আরে না না। আমি খাব কেন। না গেলে খারাপ দেখায় তাই যাব।

সুভাষ ফের বলল, আদিনাথকে বল শুয়ে পড়তে। আমার জন্য জেগে না থাকলেও চলবে। আমার রাত হতে পারে। যদি জানতে চায় আমি কোথায় গেছি, বলবে চট্টরাজ মশাইদের বাড়ি। নদীর ও পারে এই শীতের রাতে গেছি জানলে সম্মান থাকবে না। বলে সে একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কেন জানি হাসতে পারল না। এই সতীর সে স্বামী নয়, কিন্তু সে প্রায় তার চেয়েও বেশী আপন হয়ে গেছে। এক গোপন ভালবাসার ফল্গু নদী মাঝে মাঝে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে, সে টের পায়।

আর সেজন্যই সুভাষ সতীকে সব বলতে পারে। বলতে পারে, মেয়ে, পুরুষ মানুষ এ-ভাবে দীর্ঘদিন অনাহারে থাকতে পারে না। বড় শহরে গেলে আমার আহার আছে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, অহর্নিশি ভেতরে-জ্বালা। আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া, সুভাষ প্রায় যাত্রাপার্টির মত ফ্লুট বাজাতে চাইল গানের সুরে—তার এখন আর তর সইছে না। সে যাবার সময় বলল, বলাইবাবুকে বলবে আমি চট্টরাজ মশাইদের বাড়ি গেছি।

সতী জবাব দিল না। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। সে একটা চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্যার কোথায় যাচ্ছেন, কিসের আকর্ষণে চলে যাচ্ছেন, সব সে বুঝতে পারছে। বস্তুত তার কিছু করার ছিল না। সে ভেবেছিল অন্তত এই মানুষ তার প্রতি আগ্রহ নিয়ে দীর্ঘদিন এই বিত্থালয়ের কোয়ার্টারে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এখন তার মনে হল সুজনিয়ার চোখ, সুঠাম শরীর এই মানুষটাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলেছে। সে দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সে সকলকে ডেকে বলতে পারছে না — ছিঃ ছিঃ এই মানুষ বিদ্যালয়ের প্রধান, এই মানুষকে আপনারা এত সম্মান দিয়েছেন, উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভেবেছেন। এখন এই মানুষ সামান্য এক আদিবাসী যুবতীর আকর্ষণে চলে যাচ্ছে। তার মহত্ত্ব যা কিছু সব সে বিসর্জন দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার নামে চুরি করে নদীর চরে ঘুরে বেড়াবে। মেয়েটা নেমে আসবে চটান থেকে। যারা অন্যসব রয়েছে দলে, শিশু বালক কেউ নেই, সবই কর্মক্ষম মানুষ, নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকবে। সুজনিয়া মদ খাবে না। বাবুর ভোগে সুজনিয়া মধু হয়ে ঝরে পড়বে।

সতীর একবার ইচ্ছা হল চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেয়। আপনারা সবাই চলে আসুন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপনে নদীর পারে চলে যাচ্ছে, কুৎসিৎ জঘন্য একটা কাজ করতে যাচ্ছে— কিন্তু সে বলতে পারল না। তবে এই মানুষকে আবার অন্য কোথাও চলে যেতে হবে, সে আর জীবনে এই মানুষের সাহচর্য পাবে না। সুজনিয়ারা কাল চলে যাবে। সুতরাং সে দীর্ঘশ্বাস চেপে ঘরে ঢুকে গেল।

বলাইবাবু ফিরে দেখলেন, মেয়ে চুপচাপ হ্যারিকেনের আলো সামনে নিয়ে বসে আছে। কোন কথা বলছে না। দূরে, বোধ হয় হিজলের মাঠে একটা তিতির পাখি অবিরল ডাকছে। বলাই বাবুর মনে হল, তিতির পাখির পুরুষ পাখিটা কেউ ধরে নিয়ে গেছে। রাতে একা থাকতে হবে মাঠে। ভয়ে পাখিটা কি বেদনায় কাঁদছে!

তখন সুভাষ নদী পার হচ্ছিল। শীতকাল বলে নদীতে জল অল্প। খেয়া নেই ঘাটে। বাজারের দিকটাতে কিছু লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে। আর ও-পারের বন অন্ধকারে ডুবে আছে। জ্যোৎস্না উঠবে একটু বাদে। এবং চাঁদ বনের মাথায় উঁকি দিতে পারে ভেবে সুভাষ জলে নেমে একবার সেই বেনহার সাহেবের নীল কুঠির মাথায় চাঁদ উঠেছে কিনা দেখার জন্য মাথা উঁচু করে ও-পারটা দেখল। সামনে শুধু বালিয়াড়ি। এই জমিতে নানারকমের গাছ লতা পাতা। সুভাষ

সোজা উঠে গেলে দেরি হবে ভেবে একেবারে জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকল। ওর ভিতরটাতে অসহ্য উত্তাপ। ওর চোখ মুখ জ্বালা করছে। সুজনিয়ার চোখ দেখে সে টের পেয়েছে আজ চুরি করে সুজনিয়া যাবার আগে মহোৎসবের ভাগ ওকে দিয়ে যাবে।

এখনও চাঁদ ওঠেনি। অন্ধকারটা আবছা আবছা। পরিচিত মাঠ ঘাট নয়—কোথায় কি ফসল আছে জমিনে অথবা কি লতাপাতা এবং ঘাস পায়ে লাগছে সে টের করতে পারছে না। এই সব ঘাস লতা পাতা, মটর শাক, কি সরষে গাছ কি ফুটি তরমুজের লতা সে টের করতে পারছে না। বস্তুত সে যাচ্ছে। দূরের বনে লণ্ঠনের আলো দেখে উঠে যাচ্ছে। এবং এক যুবতী আদিবাসী, যার চোখ মুখ দেখে মনে হয়—কেউ তার সরোবরে অবগাহন করেনি, নির্মল জল নিয়ে সে বসে রয়েছে। এখন এই যে সুভাষ যাচ্ছে, যার বৌ পর্দায় বসন ভূষণ খুলে নৃত্য করছে, যে বৌ-এর জন্য নিজের সরোবর চেয়েছে, পদ্মফুলের মত ফুটে থাকার সৌরভ চেয়েছে, সেই বৌ তার সরোবরে অন্য মানুষের ছায়া নিয়ে যদি খেলা করতে পারে তবে সে কি তা পারে না! বস্তুত সুভাষ সবই পারে। সে এক মানুষ, সভ্যতা তাকে প্রদীপ হাতে পথ চলতে বলত। এই অন্ধকারে সে কোনদিন নেমে আসেনি। কিন্তু অন্ধকারে নেমে মনে হয়েছে এই অন্ধকারের শক্তি বড় প্রবল। মাদকতা আছে। কেমন এক রোমাঞ্চ আছে। সে নিজের ভিতরই নিজে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে যত এগিয়ে যাচ্ছে—যত সেই চটান কাছে চলে আসছে তত সে পাগল প্রায় এবং অস্থির এক যুবকের মত সে ছুটে যাচ্ছে। সে জানে না সুজনিয়া তার জন্য কোথায় প্রতীক্ষা করবে। সুজনিয়া তাকে কিছু বলে আসেনি। তবু তার বিশ্বাস সুজনিয়া বাঁধের পারে এসে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং হাত ধরে যেমন ওদের কেউ কেউ জোড়ায় জোড়ায় মদের পাত্র নিয়ে বনের ভিতর হারিয়ে যায় সে তেমনি বনের ভিতর সুজনিয়াকে নিয়ে হারিয়ে যাবে। এবং রাত্রি

যখন শেষ হয়ে আসবে, সুজনিয়া তার চটানে চলে যাবে, সে তার কোয়ার্টারে।

হিম ঠাণ্ডা তেমন প্রচণ্ড মনে হচ্ছে না। সে উত্তেজনায় ভিতরে ঘেমে গেছে। শীতকাল এটা সে এখন কেন জানি বিশ্বাস করতে পারছে না। তার শরীরে উত্তাপ এবং জ্বালা, চোখ জ্বালা করছে, যেন সে খালি গায়ে খালি পায়ে চরের ওপর দিয়ে এখন সুজনিয়ার হাত ধরে ছুটতে পারলে বাঁচে।

সে কেন জানি বিশ্বাসই করতে পারছেনা নিজেকে। সে যে কি ভাবে দীর্ঘদিন কোন সরোবরে অবগাহন না করে আছে—সে সতীকে বলতে পারত, আমি ডুব দেব তোমার সরোবরে, সাঁতার কাটব, ভাসব, ভেসে ভেসে আকাশের পাখি ওড়া দেখব--কিন্তু সে বলতে পারেনি, কেমন এক আদর্শবান শিক্ষক, বিদ্যালয় অন্ত প্রাণ হয়ে গিয়ে সে নিজের এই শরীরের ঐশ্বর্যের কথা ভুলে গিয়েছিল। সুভাষ নিজেকেই বলল, তুমিত এত ভাল মানুষ নও। তুমি ইচ্ছা করলে এতদূরে ছুটে না এলেও পারতে। ঘরে তোমার যে লণ্ঠন জ্বেলে দেয়, খাবার রেখে যায়, প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে তৃষ্ণার জল চাইলে তোমার কি ক্ষতি ছিল!

যত উঠে যাচ্ছে তত সতীর কথা তার মনের ভিতর নাচানাচি করছে। যেন এতদূরে এসে সহসা মনে হয়েছে সে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলল। সে জীবনের বিনিময়ে এমন একটা ঘটনা চাইছে। সে এক আশ্চর্য লালসায় ডুবে যাচ্ছে! সুভাষ সতীর পবিত্র মুখের কথাও ভুলে গেল।

বাঁধে উঠে যাবার মুখে তার মনে হল কেউ যেন একটা গাছের নিচে বসে কাঁদছে। বাঁধের নিচেই বন। বনের শেষে চটান। দক্ষিণ দিকে বেনহার সাহেবের নীলকুঠি। ভাঙা পাঁচিল এবং তরুলতা, তার পাশ দিয়ে পথ। বড় রাস্তা যেটা সহর থেকে আসছে, কথা আছে বেনহার সাহেবের কুঠির পাশ দিয়ে আসবে। ওর মনে

হল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, রাস্তাটা কুঠির পাশে এসে গেছে। রোড মেট এবং রোড কুলিদের দলটা দূরে দক্ষিণ দিকে তাঁবুর নীচে বসে আগুন পোহাচ্ছে। সে সেই কান্নাটা অনুসরণ করতে গিয়ে দেখল ওটা গাছ নয় অথবা নিচে কেউ বসেও নেই—এটা পাখি, সেই তিতির পাখি হবে বোধ হয়, ঝোপের ভিতর ডাকছে। সুভাষ আর দেরি করল না। সে এবার ছুটতে থাকল। অদম্য উৎসাহে সে চটানের পাশে ঠিক পাশে নয়, কারণ পিছনের দিকটাতে কিছু শিরিষ গাছ আছে, প্রকাণ্ড সব শিরিষ গাছের ছায়া ওদের এই চটানকে ওপরের নির্মল আকাশ থেকে রক্ষা করছে। গাছের নিচে শুকনো লতা, ওর জুতোর তলায় লেগে খস খস করতেই সে একটু সাবধান হয়ে গেল। ছোট ছোট তালপাতা অথবা খড়কুটো দিয়ে ছাউনি করা ঘর। কালই চলে যাবে, যাবার আগে ঘরগুলি জ্বেলে দেবে ওরা এবং বহ্নি উৎসবে বাসি মাংস ভাত খেতে বসবে।

চটানের সেইসব ছোট ছোট ঘরগুলোর মুখে মুখে কুপি জ্বলছে। মুরগি অথবা ভেড়ার পাল উঠোনের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শালপাতায় মাংস রেখে কেউ কেউ খাচ্ছে। মেয়ে মরদ সবাই মিলে খাচ্ছে। মাঝখানে একটা কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বলছে। চার পাঁচটা পচাই-এর হাঁড়ি তার চারপাশে। হাঁড়িগুলি শূন্য। কোন কোন হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা লোক ঘরের ভিতর থেকে দুটো হাঁড়ি টেনে বের করল। ওরা এগুলোও খেয়ে ফেলবে। সুভাষ শিরিষ গাছের নীচ থেকে বুঝতে পারল না ওরা খাচ্ছে না ঢুলছে। সে আর একটু কাছে গেল। সে প্রায় চুরি করে দেখছে এমন ভাবে দেখতে থাকল। এবং একসময় বুঝতে পারছে, ওদের সবাই বেহুঁস হয়ে আছে। ওরা খাচ্ছে না। এবার ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবে অথবা যে যার ঘরে মাগি মরদ মিলে ঢুকে যাবে। আকালুকে দেখা যাচ্ছে না। সুজনিয়া কোথায়? সে এখন আকালুকে খুঁজছে। সে সর্দার। সর্দার যদি জেগে থাকে, এবং সুজনিয়া যদি পালিয়ে আসে

বাঁধের মুখে তবে তার আর রক্ষা থাকবে না। তারপর একসময় মনে হল কেউ আগুনটা উসকে দিচ্ছে। উসকে দিতেই আলো জ্বলে উঠল। মনে হল অনেকগুলো ঘাসপাতা সেই আগুনে দপ করে জ্বলে উঠেছে। গাছের আড়াল থেকে সে দেখল, সুজনিয়া ঘাসপাতা, যেখানে যা কিছু শুকনো আছে সব এনে এই অগ্নিকুণ্ডে ঢেলে দিচ্ছে। এমন উষ্ণতায় ওদের চোখে ঘুম চলে আসছে। অথবা সুজনিয়া আগুন জ্বেলে সমস্ত চটানে কথায় কে কি-ভাবে রয়েছে সুভাষকে দেখাতে চাইছে। সুজনিয়া কি টের পেয়েছে সুভাষ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেখুক এই হচ্ছে চটান, এই হচ্ছে সব খুপড়ি ঘর এবং এরা কে কে কতটা বেহুঁস সব দেখুক। আর সেই আলোতেই কি দেখাল, আকালুকে সুজনিয়া টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকালু কখন বেহুঁস হয়ে পড়ে গেছে সে টের পায়নি। সুজনিয়া বাপকে টানতে টানতে সেই খুপড়িতে নিয়ে গেল। এবং কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে দিল। সে শুধু আকালুর খুপড়িতে গেল না। সে সবার খুপড়িতে ঢুকে সবাইকে কম্বলে ঢেকে দিল অর্থাৎ এই রাতের মত আর কোথাও এই চটানে কোন কোলাহল উঠবে না, একেবারে শান্ত হয়ে থাকবে সব, শুধু নির্জন রাতে দুটো একটা পাখির ডাক শোনা যাবে।

আশ্চর্য সুজনিয়া বিন্দুমাত্র পচাই খায়নি যেন। ধীর এবং সংযত। সে চারিদিকে নজর রাখছে। সে আগুনটা খুঁচিয়ে দিচ্ছে। এবং ক্রমে আগুনটা মরে এলে সে এই রাত্রির অন্ধকারে একা একা বনদেবীর মত বাঁধের পাড়ে এসে দাঁড়াল। কেউ যদি আসে ওর কাছে। ওর মনটা কেন জানি বলছে সে আসবে। তাকে আসতেই হবে।

সুভাষ এবার অন্ধকার থেকে ফিস ফিস করে ডাকল, সুজনিয়া।

সুজনিয়ার ভিতরটা মুহূর্তে নেচে উঠল। সুজনিয়া হরিণীর মত চঞ্চল চোখ তুলে অন্ধকারে কোন গাছের অন্তরাল থেকে কে তাকে

ডাকছে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলে কেউ নেই। মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে। সে তবু ফিস ফিস করে বলল, বাবু আমি এখানে। তুর লেগে বাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি।

সুভাষের বুঝতে অসুবিধা হলনা সুজনিয়া ওর প্রতীক্ষাতেই এখন নদীর বাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরের ভয়টা বাড়ছে, সর্দার আকালুর ভয়, জেগে গেলে কেলেঙ্কারি হবে এই ভয় এবং ধরা পড়ে গেলে রাতের আঁধারে চরের মাটিতে খুন খারাপি হবে এমন ভয় তাকে কাবু করার চেষ্টা করছিল। এখন সুজনিয়ার এই শরীর এবং প্রতীক্ষা সব ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখছে। অথবা এমন আকর্ষণ সুজনিয়ার শরীরে যে সুভাষ বিন্দুমাত্র আর দেরি করতে পারল না। সে বাঁধের ওপর উঠে সন্তর্পণে হেঁটে গেলে মনে হল ছায়ামূর্তিটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

সে বলল, নীচে নেমে আয় সুজনিয়া।

সুজনিয়া কোন কথা বলল না। ওর হাত পা এবং শরীর কাঁপছে। সে বাবুর কথামত তাকে অনুসরণ করছে।

—আমরা এখানে বসবনা। হেঁটে হেঁটে যেখানে বেনহার সাহেবের নীলকুঠি আছে সেখানে নেমে যাব। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। টের পাবে না।

সুজনিয়া বলল, বাবু বেশীদূর যাবি না। মুই ফিরে আসবনি!

—তুই বেনহার সাহেবের নীলকুঠি তো চিনিস।

—তা চিনি বাবু।

—তোরা কাল চলে যাবি। আমার কথা মনে থাকবে!

— থাকবেক বাবু।

—আবার কবে আসবি।

—ঢল নামলে চলে আসবেক বাবু।

সুভাষ বলতে পারত, তুই থাকবিনা, চলে যাবি আমার বড় খারাপ লাগবে। তুই আগে আমাকে আসতে বললিনা কেন। এত

দেরি করে, এখন তোরা চলে যাবি! কিন্তু এসব না বলে সে বলল, আমাকে পাখির মাংস খাওয়াবি বললি। তোদের সঙ্গে পচাই খাব ভাবলাম। শালপাতায় পাখির মাংস আর হাড়িয়া।

—তু দাঁড়া। আমি তবে নিয়ে আসছি।

এখন জ্যোৎস্না উঠেছে। সুজনিয়া ছোট্ট হাঁড়ি এনেছে। শালপাতায় পাখির মাংস এনেছে। আর পাশাপাশি বড় বড় শালগাছ। বড় বড় পাতা। নিভৃতে বসে সুজনিয়া পরিমিত হাড়িয়া দিল। পাখির মাংস দিল। বেনহার সাহেবের পুরানো কুঠিতে সাপের ভয় নিদারুণ। সুজনিয়া তার বাপের কাছ থেকে সাপের বিষহরি পেয়েছে। এবং কোমরে সেই বিষহরির দণ্ড গোঁজা আছে। ওর ভয় ছিল না। চুপচাপ জ্যোৎস্না রাত, ভাঙা নীল কুঠির বারান্দায় শালগাছের নীচে নানারকম জোনাকি পোকা অথবা কীট পতঙ্গ তখন ডাকছিল। ওদের ভিতর সেই যেন জোয়ার এসেছে, মাংসের চাট, সামান্য মদ এবং এই জ্যোৎস্না রাত আর সুজনিয়ার শাড়ি, নীল ডুরে শাড়ি থেকে কি যেন পাতার গন্ধ, মাথায় তার পালক গোঁজা হরিয়াল পাখির, চোখের সেই উজ্জ্বল রঙ এখন আগুনের মত জ্বলছে —সুভাষ কত দীর্ঘকাল পর, যেন সে এই প্রথম অথবা শেষ অথবা সুভাষ যে কি করছে এই আদিবাসী যুবতীটিকে নিয়ে, দুই পাশে বনরাজি, নীল নীলিমা আর সাদা জ্যোৎস্না গাছের মাথায়—হিমঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না। উষ্ণ প্রবাহে নিশ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে বইছে। কখনও ছুটে, কখনও বসে কখনও লুকোচুরি খেলার মত যুবতী সুভাষকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল। চারপাশের নির্জন রাত্রি, ঘাস এবং তরুলতার ভিতর ওরা যখন ছুটোছুটি করতে করতে একটা গাছের কাণ্ডে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল অনেক দূরে অনেক মশাল জ্বলে উঠেছে। ওরা যেমন পালে বাঘ পড়লে ছুটে যায় তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে আসছে। সুভাষের হাত শিথিল হয়ে এল। নদীর চরে মানুষজন জেগে গেছে। বাজারের

দিকে আলো জ্বলে উঠেছে। গ্রামের মানুষের যে সন্দেহ ছিল এই আদিবাসী যুবতীকে নিয়ে, আজ সকলে যেন টের পেয়ে গেছে।

সুভাষ কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, সুজনিয়া আমাকে তোর বাপ মেরে ফেলবে।

সুজনিয়া বলল, বাপ মোরে ঠিক খুন করবে।

সুভাষ, চোখ থেকে সেই আজন্ম কুমারীর বেদনায় জল টস টস করে ঝরে পড়তে দেখল। জীবনের সেই অসামান্য স্বাদ পাবার মুখেই সুজনিয়া নদীর চরে মশাল জ্বলে উঠতে দেখল। সুভাষ আর কোন কথা বলল না। সে এবার জোরে মেয়েটার হাত চেপে ধরল। বলল, আমার সঙ্গে আয়।

সে বলল, বাবু তু মোরে কুথা লিয়ে যাবি!

— যেদিকে দু' চোখ যায়। যেন বলার ইচ্ছা শহরে গঞ্জে অসুবিধা হলে তোকে নিয়ে আমি কোন পাহাড়ের উপত্যকায় ঘর বাঁধব। আমার কিছু এখন জ্ঞান গম্যি নেই। আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই, বাসনা নেই। একমাত্র তোর এই শরীরের প্রতি অক্ষয় অমর অভিলাষ আমার। সেই অভিলাষ আমাকে দরকার হলে বনে পাহাড়ে চলে যেতে বলছে।

সুজনিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষ বলল, তুইত এখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

সুজনিয়া ঠিক বুঝতে পারল না। সে অসহায় চোখ তুলে তাকাল।

—তুইত বলবি, কোনদিকে গেলে এই গভীর বন পার হয়ে আমরা বড় সড়কে উঠে যেতে পারব। সেখানে উঠে গেলে, আমার যা আছে এখন আপাতত তোকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারব। ওরা আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না।

সুজনিয়া বিশ্বাস করতে পারল না। একটা অবিশ্বাস ওর মাথায় চাড়া দিয়ে উঠছে। কোথাও নিয়ে যদি ওকে ছেড়ে দেয়।

সুভাষ বলল, তোর ভয় হচ্ছে।

—বাবু তু আমাকে ফেলে কোথাও যাবি না বল।

—না।

—কোন দিন যাবি না।

—কোন দিন যাব না।

—আমার মাথায় হাত রেখে তু বল।

—তোর মাথায় হাত রেখে বললাম।

—তুর বিবি বছু।

—আমার কেউ নেই। পিছুটান আমার কিছু নেই।

—ঠিক বুলছিস।

—ঠিক। এখন তুই আমাকে যেখানে চলে যেতে বলবি আমি সেখানেই চলে যাব।

কিছুদিন সুভাষের কিছু হুঁস ছিল না। প্রায় বন্যজীবের মত সে সুজনিয়াকে কোন গঞ্জে অথবা গ্রীষ্মাবাসে ব্যবহার করেছে। সে ক্রমে দেখল এই সুজনিয়া তাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। সুজনিয়ার ডিমের মত চোখ, শক্ত শরীরে আদিম ইচ্ছা। সুভাষ এমনই আদিমতা চেয়েছিল। সে অনুর মত কোমল মেয়ে নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে না। প্রীতির মত অথবা এই যুবতীর মত মেয়ের ভালবাসা তার দরকার। তার যেন এখন যথার্থই আর কোন আপশোষ নেই, সে যে অভিমান করে অথবা প্রতিশোধ নেবে বলে নিরুদ্দেশে চলে এসেছিল, এখন তা তার মনে পড়ছে না। সে বরং বলা যায় সুজনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার নিমিত্ত মাণ্ডদি সাবকে একটা চিঠি লিখে বসল। ওর সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে আসছে। তাকে আজ কাল কোথাও না কোথাও একটা কিছু চাকুরি নিয়ে চলে যেতে হবে।

এ-সময় সুভাষকে যা সবচেয়ে বেশী চিন্তিত করছিল, যা তাকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে সে হচ্ছে সুজনিয়ার ভিতরে সেই ভয়টা কিছুতেই মরছে না। একদিন সুভাষ এই গঞ্জের মত জায়গায় ভাল একটা ঘরের অনুসন্ধানে বের হয়েছিল, একটু দেরি হয়ে গেছে সে ফিরে এসে দেখলে সুজনিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই সে জানালা থেকে সরে আসছে না। সে পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, সুজনিয়া। কোন শব্দ নেই। যেন ভয় পেয়ে সুজনিয়া অপলক অনেক দূরে একটা গাছের নীচে কি যেন চোখ তুলে দেখছে।

সুভাষ কাঁধের ওপর ঝুঁকে বলল, এই সুজনিয়া তুই কি দেখছিসরে! দূরে কি দেখছিস!

সুজনিয়া কেমন ভয়ে ভয়ে আঙুল তুলে বলল, হুই বাবু! তুই দেখছিস না! বাবা দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষ বুঝতে পারল বাপের ভয় সুজনিয়াকে এক রহস্যজনক অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রাতে মাঝে মাঝে জনা, সুভাষ সুজনিয়াকে এখন এই নামে ডাকে। দেবীর মতো মুখ জনার, ভয়ে সেই মুখ রাতে বড় কাতর দেখায়—রাতে জনা ঘুমতে পারে না। সে দুঃস্বপ্ন দেখে। সুভাষ এই মেয়ের প্রতি এক উদ্দাম ভালোবাসার জন্য পাগল। কি ভাবে যে কি করা যায়। আজ এই দিনের বেলাতে পর্যন্ত সেই গাছটার নীচে সে তাকিয়ে আছে! কারণ জনার বিশ্বাস বাপ তার অনেক তুকতাক জানে। অনেক তন্ত্র মন্ত্র জানে। সে কোথায় আছে বাপ টের পায়। এবং সময়ে সময়ে গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে বড় একটা খাঁড়া। যেন ওকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাবে এবং বনদেবীর পূজায় তাকে উৎসর্গ করে যেমন কোন উৎসবের দিনে অথবা মহামারী লাগলে, দুঃসময় এলে, দুর্বৎসর এলে মুরগি, ভেড়া বলি দেয়, বাবা দেবতার সামনে তেমনি তাকে বলি দেবে দেবতার নামে।

সুভাষ বলল, কোথায়? কোথায় তোর বাপ দাঁড়িয়ে আছে।

—ছুই দেখছিস না ! কেমন লম্বা। লিকলিকে মানুষটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ওয়ার বড় একটা খাঁড়া। কত লম্বা দেখ্। গাছটার মত উচা হয়ে গেল।

সুভাষ বলল, এদিকে আয়। সে হাত ধরে টেনে নিল। বলল, তুই অমন করলে কোথায় যাই বলত !

জনা হাসল।—তু আমাকে লিয়ে কোথাও পালাতে পারবি না ঠিক বাবা টের পেয়ে যাবে।

সুভাষ এবার জোরে ধমক দিল, কি আজে বাজে বকছিস? তোর বাপ টের পাবে কি করে। আমরা কতদূর চলে এসেছি। ছ' মাস হয়ে গেল ! কই তোর বাবা টের পেয়েছে ?

—ঠিক পেয়েছে বাবু।

—তা হলে আমি দেখতাম না।

—গাছটার নীচে কিছু নেই। এই ছাখ। বলে সুভাষ, সেই গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। হাত তুলে বলল, কোথায়, কোনদিকে !

—এখন নেই বাবু।

—তাহলে চলে গেছে।

—হ্যাঁ বাবু।

সুভাষ এবার মাঠ পার হয়ে চলে এল। ঘরে ঢুকে বলল, শোন জনা, তুই এমন করলে দেখবি আমি কোথায় চলে যাব। সুভাষ জনাকে ভয় দেখাতে চাইল।

এটা একটা গঞ্জের মত জায়গা। ছু'টো রেললাইন এখানে এসে মিশেছে। সুভাষ এই অপরিচিত জায়গা, যেখানে গঞ্জ শেষ হয়ে গেছে, এবং রেলকোয়ার্টার পার হলে যে বড় কাঁচা রাস্তা আছে, এবং কচিৎ কখনও ছু'টো একটা ট্রাক যায় যে রাস্তায়, শীতের দিনে লাল মাটির ধুলো উড়ে, তার পাশে ছোট্ট এক বাংলোর মত আবাস সুভাষের। এখন তার স্ত্রী অনুর কথা মনে হয় না। একেবারেই সে তার শহর জীবনের কথা ভুলে যাচ্ছে। এই জন্য, সুভাষ অন্ত

প্রাণ। বাবুর ভালবাসার কাঙালিনী। তার আকাশে কোন উচ্চাশার পাখি ওড়ে না। সে নিরিবিলি এক মানুষের সেবায় জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে।

সুভাষও কেমন যেন এক পরিবর্তনশীল জগতের ভিতর ডুবে গিয়ে নূতন জীবনের আস্বাদ পায়। তার কিছু আর চাইবার নেই। ছোট্ট ঘর, এবং এই জনা, ওর দুই কাতর চোখ অবলা জীবের মত সুভাষকে পৃথিবীর অন্য কোথাও কেবল টেনে নিয়ে যেতে চায়। এই আদিবাসী রমণীর সারল্য অকপট ভালবাসা, তাকে দিন দিন মুগ্ধ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে জনার কি হয়। সে রাত্রে ঘুমোতে পারে না। বাপের তুক-তাকে তন্ত্র-মন্ত্রের ক্ষমতা জনাকে ভয় দেখায়।

সুভাষ বলল, তোর ভয় লাগলে এখান থেকে উঠে চলে যাব।

—কুথি যাবি বাবু।

—তুই যেখানে বলবি।

—চল আমরা বনে পাহাড়ে চলে যাই।

—খাবি কি !

—কেনে পাখি ধরে আনব, মধু পেড়ে আনব।

সুভাষ হাসল, বলল, হাঁস মুরগি পালবি। মাঠে মোষ চরাবি।

জনা বলল, তুর এটা ভাল লাগে না ?

সুভাষ বলল, তোর যা ভাল লাগবে, আমারও তাই। সুভাষ বস্তুত চায় এই মেয়ে তার ওপর নির্ভর করতে শিখুক। বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না। জনাকে সে সুখে রাখতে চাইছে, সে কিছুদিন জনাকে নিয়ে একটা ছোট্ট ছবির মত শহরে বসবাস করেছে—সেখানে জনা স্বস্তি পাচ্ছে না। সে এই গঞ্জে চলে এসেছে, জনা এখানেও স্বস্তি পাচ্ছে না। হয় বাপের ভয়, নয় মানুষের ভয়—এই মেয়েকে ভীতু করে রাখছে। ঠিক যেন সুভাষ একটা বনের টিয়া-পাখি জোর করে পুষে রেখেছে।

সুভাষ বলল, তোর যদি আমাকে ভাল না লাগে, চল তোর বাপের কাছে। তোকে দিয়ে আসব। বলব জনার কোন দোষ নেই। ওকে আমি তুলে নিয়ে গেছি। তোরা যখন মদ খেয়ে বেহুঁস তখন তুলে নিয়ে গেছি। যা করতে হয় তুই আমাকে কর, জনাকে কিছু করবি না। ওর কোন দোষ নেই!

জনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। খোঁপায় তার জবা ফুল। নীল রঙের শাড়ি, সুঠাম দেহ এবং নিবিড় এক যুবতী গড়ন শরীরে, যা স্পর্শ করলে সব কিছু খুব মসৃণ লাগে। সুভাষ ওর অন্তরঙ্গ হয়ে বলে, বল তুই যা করতে বলবি, আমি তাই করব।

জনা কিছু বলে না। এমন একটা বড় মানুষ, বাবু মানুষ তাকে নিয়ে শিশুর মত খেলা করছে, অথবা ছোট এক পায়রার মত সারাদিন বক-বকম করছে, সে ভাল রাঁধতে জানে না। সুভাষ ওকে হাতে ধরে রান্না শিখিয়েছে, সুভাষ ওকে ঘর সাজাতে শিখিয়েছে। ফুল তুলে এনে টেবিল সাজাতে শিখিয়েছে, সুভাষ ওকে নিজের মত গড়ে তুলেছে, কেবল বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারছে না। বল, বল তোর জন্য আমি আর কি করতে পারি। বনে পাহাড়ে যেতে চাস আমি সেখানে চলে যাব। আমি তো এমন চেয়েছি, যে শুধু আমার জন্য থাকবে, যে আমার হয়ে কথা বলবে, আমি যা ভালবাসব না সে কোনদিন তা করবে না। আমার জন্য সে নদীর জলে নেমে যাবে, মরুভূমি পার হবে। আমি ত সারাজীবন এমন চেয়েছি। ছোট এক গৃহকোণ, বাজে গ্রামোফোন। —বল, আমি তোর জন্য আর কি করতে পারি।

জনা বলল, বাবু আমার ডর লাগে। তু আমাকে নিয়ে চল। আমি এধার থাকব না।

সুভাষ বুঝতে পারে—জনার ভয়টা এখানে থাকলে বাড়বে। সে শহরে যেতে চায় না। তার শহর ভাল লাগে না। শহর জনারও ভাল লাগে না। জনা বনে পাহাড়ে মানুষ। নদীর জল, ফসলের

মাঠ এবং বনের পাখি জনার ভালবাসার বস্তু। জনাকে নিয়ে সে এমন একটা জায়গায় চলে যেতে চায়, যেখানে জনার বাপের ভয় থাকবে না—অথচ নদী-পাহাড় থাকবে অথবা উপত্যকা। এবং সেইসব উপত্যকায় হাজার হাজার পলাশ-গাছ থাকবে। শীতে পলাশ ফুল অথবা বসন্তে শিমুল ফুল উপত্যকায় ফুটে থাকবে, সুভাষ জনার হাত ধরে তেমন উপত্যকায় ছুটতে ভালবাসবে।

নানা দিক ভেবেই সুভাষ তার পুরোনো মনিবকে একটা চিঠি লিখে তাজ্জব করে দিল। মাগুদি সাহেবের বড় বিশ্বস্ত জন ছিল সুভাষ। কোম্পানি বড় হবার মূলে সুভাষ। ওর বিচক্ষণ বুদ্ধি, মাগুদি এণ্ড কোম্পানির বড় এসেট ছিল। সেই সুভাষ কথা নেই বার্তা নেই পাগলের মত শহর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সুভাষের অনিয়ম আসা-যাওয়া এবং অফিস কামাই, তারপর দীর্ঘ ছুটি, এবং তার রেজিগ্‌নেশন সম্পর্কিত ভাবনা মাগুদি সাবকে সুভাষের চিঠি পড়তে পড়তে পেয়ে বসল। সুভাষ লিখেছে আপনারা আমাকে একটা ডেয়ারী ফার্ম-এ রেখে দিতে চেয়েছিলেন। তখন শুনেছিলাম ফার্মটা দাক্ষিণাত্যের কোথাও। এবং নিরিবিলি জায়গা। যদি তারা আমার সম্পর্কে এখনও ইণ্টারেষ্ট বজায় রাখে তবে আমি যেতে রাজী আছি। আপাতত আমি কিছু করছি না। কিন্তু কিছু না করলে চলবে না—তাই এই চিঠি। দয়া করে আমার খবর কাউকে জানাবেন না।

মাগুদি সাব খামটা দেখলেন। খামের ওপর ঠিকানাটাও দেখলেন। ওর স্ত্রীর মুখ মনে পড়ল। সুভাষবাবুর স্ত্রী এখন পর্দায় অভিনয় করেন। একটা ছবিতে যে নক্কারজনক দৃশ্য আছে, কোন পাহাড়ের ওপর তোলা ছবি, নায়ক, নায়িকার পিছনে ছুটছে, কি স্বল্প বাস যা প্রায় উলঙ্গ বলা চলে, অন্ধকারে কিছু বনের দৃশ্য, কিছু কাটা গাছ এবং নীচে এক যুবতী, প্রায় জংঘা পর্যন্ত খালি, এমন দৃশ্য দেখলে সুভাষ যে স্থির থাকতে পারত না, আত্মহত্যা করে বসত, এবং এই

সব দৃশ্যই বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্প বলে চালানো হচ্ছে, সুভাষ যে সুভাষ, যার আবেগধর্মীতা প্রবল, যে সারাজীবন সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছে জীবনে, সেই মানুষের স্ত্রী এমন দৃশ্যে নাচলে গাইলে ভালবাসার প্রাণ বাঁচে না। মাশুদি সাব সুভাষের নিরুদ্দেশে যাবার কারণটা ধরতে পারছিলেন। সুভাষকে তাঁর প্রয়োজন। অথচ তিনি জানেন সুভাষকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা যাবে না।
—এখন কিছু করছে না, লিখছে। ওর এক পেট, আর কি কেউ আছে। এক পেটের জন্য সুভাষবাবুর ভাবনা থাকার কথা নয়। তবু চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়ে দিলেন। লিখলেন, তুমি হয়তো জানোনা চ্যাটার্জী আমরা একটা প্যাকিং প্ল্যাণ্ট বানিয়েছি। হাজারিবাগের কাছে। কয়েক'শ একর জমির ওপর ফার্মিং। ডেয়ারি ফার্মিং এর জন্য একজন ভাল লোক খুঁজছিলাম। তুমি যদি সেই প্যাকিং প্ল্যাণ্টের ভার নাও, তবে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকবে না। হাজারিবাগে যেতে একটা ছোট ষ্টেশনে তোমাকে নামতে হবে। জিপে প্রায় পঞ্চাশ মাইল গেলে ছোট পাহাড়, পাহাড়ের ওপর আমাদের বাংলো। সেখানেই তুমি থাকবে। এমন জায়গা যে শুনেছি অনেক ফিল্ম পরিচালক সেখানকার ছবি ধরে রাখার জন্য সেই বাংলোতে গিয়ে আউটডোর শুটিংও করে থাকেন। লিখেই মাশুদি সাব ভাবলেন, এটা লেখা ঠিক হল না। সুভাষ যদি জানে, ওখানে কোন ফিল্ম ডিরেক্টরের আনাগোনা আছে তবে আর সে যেতে চাইবে না। সেজন্য মাশুদি সাব লাইন কটা কেটে দিলেন! খুব ভাল করে কেটে দিলেন কথাগুলো। যেন সুভাষ ধরতে না পারে—তিনি এইসব লিখেছেন। পরে লিখলেন, নির্জন জায়গা। জিপে যেখানে প্ল্যাণ্ট বসানো হয়েছে সেখানে যাবে! তোমার বাংলো থেকে প্রায় দশ মাইল দূর। ফার্ম থেকে দুধ আসবে। শুকনো দুধ, ঘি এবং মাখন প্যাকিং হবে। তার তদারকের ভার যদি তুমি নাও চ্যাটার্জী তবে আমার আনন্দের শেষ থাকবে না।

সুভাষ চিঠিটা পেয়েই জনার কাছে গেল। জনাকে আদর করে কাছে ডাকল। প্রায় শাবকের মত জনা সুভাষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল।—এই ছাখ মেয়ে চিঠি। আমরা এখানে আর থাকছি না, তোকে নিয়ে একটা জায়গায় চলে যাব। সেখানে আমার একটা পাহাড়ের ওপর বাংলো থাকবে। বলে চিঠিতে যা যা লিখেছে সব ওকে পড়ে শোনাল। তারপর কপালে আদরের চুমু খেতে খেতে বলল, তুই আমাকে ফেলে চলে যাবি না বল!

এই আদর পেলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় জনা। এত ভাল মানুষ, এই মানুষের জন্য সতী দিদিমণি ছিল, দিদিমণির স্বামী এসেই কেমন যেন বাবুকে আনমনা করে দিল। বাবুর কে আছে? কেন বাবু মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েন জনা ধরতে পারে না! যেন তার জীবনে কি হারিয়ে গেছে। একবার বাপ তার বন থেকে একটা ছোট্ট খরগোসের বাচ্চা ধরে এনে দিয়েছিল। ছোট বয়সে সর্দারের মেয়ে এই জনা সুন্দর করে ফুলের মালা গলায় দিয়ে খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে বেড়াত। তাকে কত আদর যত্নে প্রতিপালন করেছিল। তারপর একদিন বড় হলে সে দেখল বনের খরগোস বনে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে জনা কতদিন দুঃখীমুখ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বনের ভিতর ঢুকে তার প্রিয় বাচ্চাটাকে খুঁজেছে। পায়নি। কোথায় যে সে চলে গেল। তখনই সে আয়নায় দেখেছে, যদি কোন কারণে সে আয়নায় মুখ দেখত তখন দেখেছে ওর চোখ মুখ ভারি। ঝরা পাতার মতো গাছের ছায়া মাথার ওপরে।

ঠিক এমনি একটা চেহারা অথবা চোখ মুখ যেন বাবুর চোখে মুখে। সে নানাভাবে বাবুকে, কতভাবে বলা যায়, ওরা যবে চলে এল, সেই ছোট্ট পাহাড়ে, মনে হল বাবু তার কাছে দিনের শেষে ফিরে আসে, সে তৃষ্ণার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পাহাড়ের উপরে উঠলে দেখা যায় দূরে সেই কারখানা, কারখানার চিমনি এবং

বিকেলে জনা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়, খোঁপায় তার লাল ফুল গোঁজা, পরনে লাল রঙের শাড়ি এবং সূর্য অস্ত যায় মাঠের পশ্চিমে। ফসলের ক্ষেত পার হলে, কাঁচা সড়কে সেই জিপ গাড়িটা পাহাড়ের মাথায় ক্রমে স্পষ্ট হয়, বাবু তার ফিরে আসছে, বিন্দুবৎ থেকে বড় হতে হতে ক্রমে আরো বড় হয়ে যায়। ক্রমে গাড়ির শব্দ কানে আসে, জিপের ভিতর দেখা যায় চুরুট টানছে বাবু। এবং হাত-তুলে জনাকে দেখাচ্ছে, সে ফিরে আসছে। সে যে অনেক দূর থেকেই দেখেছে জনাকে, পাহাড়ের মাথায় যেখানে বিশ্বনাথের মন্দির আছে একটা, এবং যেখানে অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা রাতে ঠাকুর শিবা ভোগ দিতে আসে দেহাত থেকে, তার পাশে জনা একটা সমতল ভূমির ওপর ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরণে লাল শাড়ি থাকে। সে ইচ্ছা করেই বিকেল বেলা লাল রঙের শাড়ি পরে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। লাল রঙটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সুভাষ দেখতে পায় পাহাড়ের মাথায় যেন একটা পাথরের মূর্তিকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বলছে। তার আর কিছু তখন মনে থাকে না। কতক্ষণে সে ছুটে যাবে তার কাছে। বড় দ্রুত সে যেতে পারে। ধূলো উড়িয়ে, চারিপাশের বন কাঁপিয়ে সুভাষ পাহাড় অথবা উপত্যকার উঁচু জমি ফেলে পাগলের মতো ছুটে আসে। পাহাড়ের নিচে যে দারোয়ানদের ঘর আছে সেখানে গাড়িটা ফেলে সে হাত তুলে দেয়।—জনা !

জনা সেই পাহাড়ের উপর থেকে হাঁকে –বাবু।

যেন দুই বনের পাখি কতকাল পর উত্তর দক্ষিণ থেকে এসে একটা গাছে বসেছে। বনের পাখি সূর্যের মত আঁখি তুলে দেখে নেয় পরস্পরকে। তারপর সেই পাহাড়ের উঁচু টিলায় উঠে মাঝে মাঝে ওরা সূর্যাস্ত দেখে। জনা বলে, বাবু ঘরে চল।

সুভাষ তার এই তিন কামরার ঘরে আসার জন্য সুন্দর এক পথ নির্মাণ করেছে। নীচে দারোয়ানদের ঘর। এমন জায়গায়

দারোয়ানদের ঘরটা যে এখান থেকে দেখা যায় না। বিচিত্র এই পাহাড় অথবা টিলা বলা চলে। এর তিনটা দিকই খাড়া। কালো পাথর—ঠিক দেওয়ালের মত একেবারে খাড়া ওপরে, অনেক ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে আসার একটি মাত্র পথ। সেই পথে তিন দারোয়ান, ওরা বড় বিশ্বাসী বাবুর, আর কিছু কোম্পানির ষ্টক জমা আছে, দুটো বড় বড় শেডে, তার পাহারায় ওরা আছে—কেউ এ-পাহাড়ে উঠে আসে অন্য পথে সাধ্য কি! সুভাষ ঘরে ঢুকে গেলে কত তাড়াতাড়ি জনা ষ্টোভে চা করে আনে, ডিম ভেজে দেয়! আর সন্ধ্যা হলে জনা বাবুর জন্য বড় মায়ায় এবং ভালবাসায় দুটো ভাত রান্না করে দেয়। সুভাষের সেই স্বপ্ন—এই যে পাহাড় আছে, বন মাঠ আছে এবং বনে মাঠে একটু মহুয়া খেয়ে পাগলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো—সে সব তার এখন আর ইচ্ছা হয় না। সুস্থ জীবন। এমন কি তার এখন অনু অথবা প্রীতির কথা একেবারেই মনে হয় না। বরং ওদের কথা ভাবলে তার ভয় হয়। ওরা এসে তার এই শান্তি নষ্ট করে দেবে। একবার মাশুদি সাব এসেছিলেন, সে বার বার বলে দিয়েছে অনু খোঁজ খবর নিলে যেন তার কথা কিছু না বলা হয়, যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে সে আবার কোথাও চলে যাবে। অনু সম্পর্কে সুভাষ নিজেও প্রশ্ন করেনি।

সুভাষকে মাশুদি সাব অনেক কিছু বলতে পারত। তাছাড়া মাশুদি সাব ভেবে পায় না সুভাষ কি তার স্ত্রীর কোন খবরই এখন রাখে না। তার মেয়ে হয়েছে, সে অনেক বড় হয়েছে, মাশুদি সাব একটা সিনেমার কাগজে মা এবং মেয়ের ছবি দেখেছে। কে জনক এই মেয়ের এমন একটা প্রশ্ন কেউ করেছে মাশুদি সাবকে। মাশুদি সাব জানেন, এই মেয়ে সুভাষের। সে একবার ভেবেছিল —সেই সিনেমার কাগজটা সঙ্গে আনবে— কিন্তু পরে বার বার মনে হয়েছে সুভাষ এক আদিবাসী যুবতীকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে—

এইসব জানাজানি হলে আবার ঝড় উঠবে। এমন কি কোম্পানির কারো কাছে মাশুদি সাব সুভাষের বিগত জীবনের পরিচয় দেয়নি। এই সুভাষ হচ্ছে, বিখ্যাত অভিনেত্রী অনিমার স্বামী, ওর এক কন্যা আছে, যে এখন বালিকা বলা চলে, অনুর চোখে-মুখে বিষণ্ণতা—ফলে সব অভিনয়ে এমন করে সে মানুষের মন কেড়ে নিতে পারে এবং ভিতরে এই মেয়ের জন্য তার বাবার জন্য অনিমা এক বেদনা বয়ে বেড়ায়—তাই অভিনয়ে অনিমা দেবীর এমন বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। মাশুদি সাব সমালোচনায় কত কিছু পড়েন। সিনেমা কাগজগুলো আজকাল একমাত্র এই নায়িকা বাংলাদেশে অথবা ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার যে কত ঘরে তুলে আনছে, অথবা কেউ কেউ ভারতবর্ষের মেরেলিন মনরো এই আখ্যা দিচ্ছে। মাশুদি সাব সুভাষের কথাবার্তায় তার পুরোনো স্ত্রী সম্পর্কে সে যে খুবই উদাসীন তিনি তা ধরতে পেরেছেন। এবং এজন্য তিনি কোন কথাই বলেন নি অনিমা সম্পর্কে। বরং জায়গাটা কেমন লাগছে কি কি অসুবিধা হচ্ছে এসব জানতে চেয়েছেন।

সুভাষ যে পথটা দিয়ে তার উঁচু টিলার ওপর নিবাসে ফিরে আসে সেই পথটার আঁকা-বাঁকা মোড়ে নানারকম পাথর এনে হাজির করেছে। সে তার অবসর সময় এই পাথরে হাতুড়ি বাটালি চালায়। সে মাঝে মাঝে হাতুড়ি বাটালি চালাতে চালাতে ক্লান্ত হলে জনা এসে পাশে দাঁড়ায়। হাতে তার কফি অথবা চা থাকে। সে একটা পাথরে তীক্ষ্ণ নাসিকা এবং মুখের ছবি আঁকতে চাইছে। ছুটির দিনগুলো সুভাষের এইভাবে কাটে। জনা একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে থাকে, সুভাষ পাথরে হাতুড়ি চালায়। বাটালি দিয়ে পাথর কাটে! সে ভাস্কর্যের কিছু বোঝে না। কিছু বই পড়েছে। সে ভাল হাতুড়ি চালাতে জানে না! কতদিন তার হাতে এসে হাতুড়ি লেগেছে। জনা তখন যে কি করবে ভেবে পায় না। বাবুর

জন্য সে হাঁক ডাক করে দারোয়ানদের ডেকে আনে। বড় অবুঝ বড় সরল। বড় সহজে হাসে। বড় সহজে অভিমান করে ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং যখন রাত হয়, এই পাহাড়ের ওপর নিরিবিলি জ্যোৎস্নায় সুভাষ এই যুবতীকে নিয়ে জীবনের সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আকণ্ঠ পান করে। এই সুন্দর আর কবিতার মত ভালবাসা সুভাষ যেন আজীবন অনুসন্ধান করে এসেছে।

সুভাষের অনভ্যস্ত হাত ঠিক মত পাথরে ঘা দিতে পারে না। মাঝে মাঝে পাথর চৌপাট্টা হয়ে যায়। ভেঙে যায়। চটা উঠে যায়। নাকটা সে কিছুতেই করতে পারে না। ঠোঁট ভারি হয়ে যায়। গাল মসৃন হয় না। জনার এই বসে থাকা ভাল লাগে না। চঞ্চল মেয়ে, সে কেবল পাহাড়ে পাহাড়ে বনমুরগির ফাঁদ পেতে বেড়াতে পারলে বাঁচে। সে কৈশোরে অথবা যুবতী যখন হব হব ভাব তার তখন দুটো বনমুরগির ওম্ ভালবাসা কেমন তাকে আনমনা করে দিয়েছিল। এই এখানে চলে এসে সে বাবুর কাছে সেই ওম্ ভালবাসা ফিরে পেয়েছে। এখন সে চায়, সে দুই বনমুরগি ধরে এনে এই পাহাড়ে পুষে রাখবে। বলবে, দ্যাখ তোরা আমার কি সুখ। এই সুখ দেখে তাদেরও হিংসে হবে।

জনা ভাল কথা বলতে পারে না। ফলে ওদের কথাবার্তা চোখে মুখে। সুভাষ যখন অফিস যায় জিপে ধুলো উড়িয়ে তখন জনা এসে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই চোখ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না জনার চোখে মুখে কত কথা ভেসে থাকে। এই সময়টা জনা একা। বাবু ওর জন্য লোক রাখতে চেয়েছে। জনা রাগ করেছে। দু' জনের কাজ, সে একাই যথেষ্ট। সে তো কত পরিশ্রম করে এত বড় হয়েছে! বাবু অফিস চলে গেলেই, দু'টো একটা বই এনে দিয়েছে বাবু, জনা বাবুর কাছ থেকে লিখতে পড়তে শিখেছে। জনা যখন রাতে উনুনে মাংস অথবা মাছ রাঁধে কিংবা কখনও ডিমের ঝোল, তখন বাবু তার পড়া ধরে; সুতরাং বাবু চলে গেলেই

জনা সেই বই, বড় গোটা গোটা অক্ষরগুলো সুর করে পড়ে। রাতে যখন পড়া নেয়, তখন কোন কোনদিন জনা উত্তর দিতে পারে না। এত করে শিখেও সে ভুলে যায়। সে বাবুর মত ভালভাবে কথা বলার চেষ্টা করে। সে বলে, বাবু ভুলে গেছি।

সুভাষ বলত, তুই বাবু বাবু আর বলিস না।

—তবে কি বলে ডাকব?

—অন্য কিছু।

—আমার কিন্তু তুকে বাবু বলতে ভাল লাগে।

—তবে তাই ডাক।

সেই থেকে সুভাষ যে বাবু হয়ে গেল জনার কাছে আজ পর্যন্ত বাবুই রয়ে গেল। যেন সে তার বাবু, আপনজন, প্রায় দেবদূতের সামিল তার কাছে। সে বলল, ভুলে গেলে চলবে কেন।

—আমি পড়েছি।

—পড়লে মনে থাকে না!

—মনে থাকে না বাবু।

—বল অরণ্য বানান কি।

জনা বলল, অ র নয়ন।

—তোর মাথা।

জনা রেগে যায়। বাবু তাকে অবহেলা করছে। সুভাষ হয়ত, বানানটা বলে দিয়ে বলল কাল থেকে পড়া না শিখলে তোর রাতে ভাত বন্ধ।

আর সত্যি সুভাষ পরদিন দেখেছে জনা রাতে নিজের জন্য ভাত রাঁধেনি। ওর জন্য খাবার তৈরি করেনি। সে খেতে বসে দেখে একটা থালায় শুধু তার জন্য ভাত। সে এবং জনা এক সঙ্গে খায়। সে বলল, কিরে তুই খাবি না।

—তুই যে বললি বাবু পড়া না পারলে আমার ভাত বন্ধ থাকবে।

—পড়াত এখন ধরিনি।

—ধরলে বাবু ঠিক ভুল হত। আমার বাবু মনে থাকে না।

—মনে থাকে না কেন। আমি চলে গেলে সারাটা দিন তুই পড়ার সময় পাস। আমার মনে হয় তুই মন দিতে পারিস না।

—তা বাবু পারি না।

—কেন বাপের কথা মনে হয়?

জনা এবার অভিমানের চোখ নিয়ে তাকাল।

—তবে?

—তুই কখন ফিরবি, ভাবলে মনে হয় বাবু তুই চলে গেলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমার কিছু ভাল লাগে না। পড়তে বসলে তুর মুখটা ভাসে।

—আর কিছু তোর মনে হয় না।

—না বাবু।

—এই যে বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের ভালবাসা ছেড়ে এলি।

—না বাবু। আমার আর কিছু মনে হয় না। সুভাষ জনার মুখ দেখে বুঝল, সত্যি এ মেয়ের আর কিছু মনে হয় না। সুভাষ ভিন্ন এ মেয়ের আর কিছু অস্তিত্ব নেই। জনা সে জন্য সুভাষ যা ভালবাসে তাই করে। সুভাষ এবার বলল, আমি যা ভালবাসি তুই তাই ভালবাসিস?

—হাঁ বাবু।

—তুই একটু লেখাপড়া শেখ এটা আমি চাই। এটা আমি ভালবাসি। আদব কায়দা, কারণ একবার ভাবি তোকে নিয়ে শহরে যাব। তুই আমার বউ। লোকে বলবে, সুভাষ বাবুর বৌটা সহবৎ জানে না। কেবল হা হা করে হাসে। রেগে গেলে কাঁদে। লেখাপড়া শিখলে দেখবি হাসি পেলে হাসতে পারবি না। কান্না পেলে বুকে চেপে থাকবি।

—মানুষে এর লাগি বাবু লিখা পড়া শিখে!

—মনে হয় তাই।

—তবে এটা ভাল না বাবু।

—ভাল না বললে চলবে কেন। এটাই সব। সুভাষ যেন ওকে আরও কিছু বলতে পারত। বললে বড় বড় কথা শোনাত, সে জন্য বলল না—লেখাপড়া শিখলেই মানুষের সোনার ঈগল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আকাশে সে দেখতে পায় তার একটা ঈগলপাখি উড়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলোতে, ঈগলের ডানায় সোনার রোদ্দুর। সহরে থাকলে, জনা, সে রোদ্দুরে আঁচ টের পাওয়া যায়। সুভাষ সে সব কিছু না বলে বলল, তোকে আর এমন কথা বলব না।

—কি কথা বাবু?

—এই যে বলেছিলাম তোর ভাত বন্ধ। তুই না খেলে আমি খাব এটা ভাবলি কি করে।

আর সুভাষ হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে দেখল, মেয়েটার চোখ থেকে আবেগে ভালবাসার জল অশ্রুপাতের মত টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। সুভাষ স্থির থাকতে পারল না। সে জনার কাছে গেল। ওর হাত দু'টো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। জনা সুভাষের বুকে মাথা রেখে কি যেন এক নিশ্চিন্ত নির্ভর পেয়ে স্থির হয়ে আছে। জানালা খোলা। গরমের দিনে দক্ষিণের বাতাসে নরম সবুজ চুল উড়ছে জনার। সুভাষ সেই চুলের ভিতর, স্নেহ বলা যায়, ভালবাসা বলা যায় এমন এক হাত ঢুকিয়ে মুখ তুলে ধরে ধীরে ধীরে চুমু খেল। মেয়েটার শরীরে যে একটা অদ্ভুত বনের গন্ধ ছিল তা মরে যাচ্ছে। সে চুমু খেতে গিয়ে তা আজ টের পেল। সুভাষের ভিতর এখন সেই আদিম লাবণ্য। নীল উপত্যকার মতো আশ্রয়ের ডানা জনার শরীরের ওপর। বসন্তের পলাশ ফুটেছে। টুনি ফুলের মতো ভালবাসায় পরস্পর ওরা এখন নিবিড় হয়ে আসছে।

সাদা জ্যোৎস্না পাহাড়ের উপর। গাছপালা পাখি জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে। কোথাও কিছু অপরিচিত পাখি ডাকছিল, দূরের

পাহাড়ে কোন বন্য জন্তু আর্তনাদ করছে। আর মনে হল নদীর স্রোতে নৌকা ভেসে যায়। সাদা ধবধবে বিছানায় সুভাষ আর জনা। ওদের শরীর অনাবৃত। ওরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ। যেন পৃথিবীতে আর কোন অস্তিত্ব নেই, দুই যুবক যুবতী এখন শুধু স্বর্গের সুষমা তৈরী করছে।

সুভাষ আর সেই থেকে মেয়েটাকে বলত না, পড়া না শিখলে ভাত বন্ধ। বরং সুভাষ চাইল জনা নিজের ইচ্ছামত জীবন গড়ে তুলুক। এতদিন জনার বড় কষ্টের জীবন ছিল, কৈশোর পার হয়ে এলেই সে বনের দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত হয়ে গেল—সেই মেয়েকে চুরি করে নিয়ে চলে এসেছে! জনার মনে যে ভয়টা ছিল, সে যে দেখতে পেত গাছের নিচে তার বাপ একটা খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে—এই পাহাড়ি অঞ্চলে এসে সে এখন আর তা দেখতে পায় না। মাইল ছ' সাত দূরে এখানকার হাট। পঞ্চাশ মাইল দূরে এখানকার রেলওয়ে ষ্টেশন। জনা এই পাহাড় থেকে নিচে নামে না। বাইরের লোক বলতে সেই একজন মাত্র দেহাতী মানুষ অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমার রাতে আসে। দেবতার নামে ঘণ্টা বাজায়। পাহাড়ের গর্তে যে সব ধূর্ত শেয়াল থাকে তাদের শিবাভোগ দিয়ে চলে যায়। কে এই দেবতার মালিক জনা জানে না। সেই দেহাতী পুরোহিত বাদে কেউ আর আসে না। দারোয়ানদের কেউ কেউ বাজার হাট করে কখনও এক গণ্ডা মুরগী, কখনো দুকুড়ি ডিম, দুধ মাছ যখন যা প্রয়োজন দিয়ে যায়। বাবুর খুব বাধ্য লোক। আর কোন অপরিচিত লোককে এই টিলাতে উঠতে দেওয়া হয় না।

পাহাড়টার উপর কোন বড় গাছ নেই। কিছু পিপুলগাছ, পাহাড়ি লতা এবং নানা বর্ণের ফার্ণ জাতীয় গাছ। অধিকাংশ জায়গায় কোন মাটি নেই। লাল নীল নুড়ি পাথর। বড় বড় পাথর আছে সাদা রঙের। আর কালো পাথর যেন এই পাহাড়কে ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে যখন কোন কাজ থাকে না তখন সবচেয়ে নীল

এবং সবচেয়ে দামি পাথরের খোঁজে এই পাহাড়ের চারপাশে জনা ঘুরে বেড়ায়। সে ভাবে বাবুকে নীল রঙের পাথর দিয়ে অবাক করে দেবে। নীলা অথবা চুন্নি, পান্নাও হতে পারে—জনার এমন সব বিচিত্র রঙের পাথর দেখে মনে হয় কোথাও কোন পাহাড়ের খাঁজে অথবা ঝোপের ভিতর অমূল্য সব রতন লুকানো আছে। সে পাথর চেনে না। তার বাপ পাথর চিনত। পাথরের কি নাম বলে দিতে পারত।

অথবা কোন কোন দিন সুভাষ যখন থাকতনা তখন যেদিকে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নীচে সমতলভূমি আদিগন্ত বিস্তৃত। চাষী মানুষেরা হাল বলদ নিয়ে আসত। বীজ বপন করত। এই বীজ বপন এবং ফসল ফলানো দেখতে ওর ভাল লাগত। আখের চাষই বেশী। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সে একা একা চাষী মানুষের ফসল ফলানো দেখত। কোনদিন বৃষ্টি এলে সে একা দাঁড়িয়ে গাছের নীচে ভিজত। কারণ তার সারাদিন ঘর ভাল লাগত না। ছটফট করত মন। কাঠবেড়ালির মত সে এ টিলা থেকে ও টিলায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটত। মাঝে মাঝে সুভাষ যখন পাথরে জনার অবয়ব আঁকতে ব্যস্ত তখন দেখতে পেত, দূরের টিলায় একা দাঁড়িয়ে বাবুকে ইসারা করছে হাতে। সুভাষ এই ইসারা পেলে পাগলের মত ছুটে যেত। কারণ সুভাষ জানে, পাথরের পাশে বসে এখন তাকে নিয়ে নির্জনে খোলা আকাশের নীচে খেলা করবে।

দশ মাইল জিপে গেলে সেই মাগুদি এণ্ড কোং। তার প্লান্ট। দুটো বড় বড় শেড। লাল ইটের দেয়াল। এ্যাজবেষ্টাসের ছাদ। কাঁচ দিয়ে দেয়ালের ওপরের অংশে আলো আসার পথ করা হয়েছে। শেডের ভিতর ঢুকলে প্রথমেই এসে মুখের ওপর স্কাই লাইটের আলো পড়ে। ডানদিকের শেডে লম্বা ঘর। প্রথমে টুলরুম। দুটো লেদ,

একটা সেপিং মেসিন এবং একটা ড্রিল। লেদের চক ভেঙে গেছে বলে বড় লেদ মেসিনটা গতকাল থেকে বন্ধ। প্রথমেই জিপ থেকে নেমে চকটা ক্র্যাক করল কি করে জানার জন্য অনন্তকে ডেকে পাঠাল।

অনন্ত কিছু বলতে গেলেই সুভাষ ধমকে উঠল, সেদিন তিনটে চক এল, ছমাস যেতে না যেতেই সাফ করে দিলি।

অনন্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এবারেও সে বলল, চক নেই আগে রিপোর্ট করিসনি কেন?

অনন্ত এবার জবাব দিতে পারল না।

—এই যে একদিন লেদ বন্ধ গেল, রিপেয়ারিং-এর জবগুলো পড়ে থাকল, তুই বসে থাকলি, কোম্পানির এই যে ক্ষতিটা হল, তার জন্য কে দায়ী হবে?

তারপর সে ষ্টক ডিপার্টমেণ্টের অনিলবাবুকে ডেকে পাঠাল।

অনিলবাবু এলে বলল, আপনারা কি করতে আছেন। খান দান ঘুমোন, কিছু দেখেন না।

অনিলবাবু কিছু ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ত্রুটি হয়েছে যে জন্য তলব করেছেন। তিনি আমতা আমতা করতে থাকলে সুভাষ বললে ষ্টক পজিশন্ নিল অথচ আনার নাম নেই।

অনিলবাবু কিছু ধরতে পারছেন না। সুভাষ বলল, চক নেই একটা, লেদ বন্ধ আপনি তা জানেন?

—জানি স্যার।

—আগে থেকে আনিয়ে রাখেননি কেন?

—ভুল হয়েছে স্যার।

—এমন ভুল হলেত চলবে না। আপনারা কোম্পানীর খাবেন, অথচ ক্ষতিটা দেখবেন না, এটাত বেশিদিন চলে না।

অনিলবাবু আর জবাব দিলেন না। সুভাষ ওঁকে যেতে বললে তিনি চলে গেলেন।

এই হচ্ছে সুভাষের কাজ। শুধু কোথায় কি বন্ধ আছে কার গাফিলতি, বিল হতে দেরি হচ্ছে কেন, কোন টিন কারখানা ঘুষ দিয়ে খারাপ ছাপা টিন চালাবার চেষ্টা করছে, কে কোথায় কবে ত্রুটি করছে তার জন্য কোম্পানির ক্ষতির বহর কি রকম, এবং কিছু বিল বা ভাউচারে সই, চিঠির মুসাবিদা করা, একবার কি দু'বার সপগুলোর ভিতর ঘুরে দেখা, সিমিং মেসিন আরও দুটো একটা বসাতে হবে কিনা, কি রকমের হবে, সেমি অটোমেটিক, না অটোমেটিক এবং কোনো কোনো ইনজিনিয়ারকে ডেকে মাঝে মাঝে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়া —বস্তুত এই সব কাজের ভিতরই সুভাষের এ সময়টা কাটে। মাঝে মাঝে ওর কাজের ফাঁকে জনার মুখ উঁকি দিলেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার জন্য মনটা তার কেমন করে। অথচ কথায় কিংবা আচরণে সে কোন দিন প্রকাশ করে না। বরং সে ডেকে ডেকে সকলকে কাজের জন্য শাসন করে। সে সকলকে ভালও বাসে। কারণ সে নিজের জন্য কিছু করে না। ইচ্ছা করলেই সে প্ল্যাণ্টের পাশে বড় পাকা রাস্তায় বাংলো বানিয়ে নিতে পারে। সে তা নেয় না। জিপ নিয়ে দূর থেকে আসে! সে দূরে থাকে বলে সকলের সঙ্গে অফিসের সময়ই দেখা হয়। সুভাষ যে অফিসের বাইরে একটা অন্য জীবন যাপন করে, সে যে এমন কঠিন মানুষ নয়, সে যে মাঝে মাঝে জনাকে নিয়ে বড্ড ছেলেমানুষী করতে ভালবাসে, ছুটতে ভালবাসে, চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতে ভালবাসে, হাত ধরাধরি করে কখনও পাহাড় শীর্ষে উঠে যায়, চারপাশে পাহাড়, উপত্যকা, দূরের নদী, এবং গাছে গাছে বিচিত্র বর্ণের ফুল দেখতে দেখতে এই পৃথিবীর মায়ায় কখনও ডুবে যায়—এরা কেউ তা জানে না।

সুভাষ এই যে অনিলবাবুকে একটু ধমকে দিল, না দিলে এরা ঠিক মত কাজ করে না, এইটুকুর জন্যেই সকলের ওকে ভয়। স্যারের কড়া নজর চারিদিকে, অথচ সুভাষ মনে মনে জানে সে নিজের কাছে

নিজে বড় ছোট হয়ে যায়। এই গাফিলতি, সে থাকলে তারও হত। কিন্তু এর নাম এডমিনিষ্ট্রেশন। তোমার ফাঁকিটুকু তারা ধরতে পারবে না, অথচ তুমি তাদের ফাঁকি ধরতে পারছ। সুভাষ কখনও কখনও নিজের চেম্বারে চুপচাপ বসে থাকে। ওর সেই পাথরের হাফ ফিনিস মূর্তিগুলির পাশে বোধহয় জনা এসে এখন ফিরে যাচ্ছে। আকাশের প্রান্তে এখন পাখিদের ওড়ার সময়। কিছু ডাহুক পাখি জনার জানালার নীচে যে ঝোপটা আছে সেখান থেকে এখন বের হয়ে আসবে। জনাও আসতে পারে। জনা কাল আবার চিৎকার করে উঠেছিল রাতে, কারা যেন তাকে তুলে নিয়ে যাবে বলে এসেছে। সুভাষ ফিরলে বলেছিল, ওরা পাহাড়টার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা আবার টের পেয়েছে।

সুভাষের মনটা ভারি। সে যে ঠিকমত আজ কাজ করতে পারবে না এটা ওর মুখ দেখলেই টের পাওয়া যাচ্ছে। সুভাষের ধারণা জনার এটা রোগ। ওর বাপের খেয়ে দেয়ে দায় নেই, সারা পৃথিবীময় ওকে অনুসন্ধান করে মরছে। সুভাষ ভাবল, সে একজন বড় মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করবে। সব খুলে বলবে, এখনত তার খুলে বলতে কিছু লজ্জা নেই। জনা তার কাছে এখন স্ত্রীর চেয়ে বেশী, সন্তানের চেয়েও স্নেহের এবং মায়ের চেয়েও বেশী আপনার। সে আদিবাসী রমণীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে বলে সত্যিই তার কোন লজ্জা নেই। সে যেন গৌরব করে বলতে পারে, আমি এক বনের দেবী ঘরে বেঁধে রেখেছি। ওর শরীরে ফুল লতাপাতার গন্ধ আছে। এই গন্ধ আমাকে বড় আকুল করে।

সেদিন সুভাষ সকাল সকাল বের হয়ে পড়ল। জিপ ধুলো উড়িয়ে ছুটছে। চার পাশের বনগুলো যেন কাঁপছে। বসন্তের দিন বলে পাতা ঝরছে চারপাশে। সে সেই সব পাতা ঝরা বনের ভিতর দিয়ে একা একা ফিরে এসে মাঠের মধ্যে পড়তেই দেখল, অন্যদিনের

মত তার পাহাড়ের মাথায় সেই লাল আগুনটা জ্বলছে না। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। সে কি অভিমান করেছে? কোন কোনদিন রাগ করে অথবা ভয় পাইয়ে দেবার জন্য জনা সেখানে দাঁড়ায় না। কোন পাথরের পাশে লুকিয়ে থাকে। সুভাষ বুকের ভিতর কিছু বিচিত্র শব্দ শুনতে পেল। একটা কাঠ ঠোকরা পাখি যেমন গাছের কাণ্ডে ঠোকরায় তেমনি মনে হল ওর হৃদয়ের ভিতর কে যেন ক্রমান্বয়ে আঘাত করছে। এটা হত না যদি না জনা গতকাল চিৎকার করে উঠত, দূরে ঠিক পাহাড়টা যেখানে সমতল ভূমিতে মিশে গেছে, যেখানে জারুল গাছের বন আছে, তার ছায়ায় সে তার বাপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। এবার জনা বলেছে, বাবা একা নয়, সঙ্গে চার পাঁচ জন। ওরা বনের ভিতর লুকিয়ে থাকে। রাত হলে আগুন জ্বালে। এবং পাখির মাংস খায়। পাখির পোড়া মাংসের গন্ধে জনা টের পেয়েছে, বাপ হরিয়াল পাখির মাংস এই গরমের দিনে পুড়িয়ে খাচ্ছে। জনার ঘ্রাণ শক্তি এত প্রবল যে, হরিয়ালের পোড়া গন্ধ এটা, অন্য কোন পাখির গন্ধ নয়, সে তাও বুকের কাছে ছোট শিশুটির মত মুখ লুকিয়ে বলেছে।
--আমার কি হবে।

—তুই যে কি বলিস না জনা!

—তুই নাক টেনে ছাখ বাবু।

সুভাষ কেমন ভয়ে ভয়ে উঠে প্রথম আলো জ্বেলেছিল। তারপর নাক টেনে বলেছে, যা কোন গন্ধ পাচ্ছি না।

—আমি ভয় পাব বলে বলছিস না।

সুভাষের যেন এবার কিছু আর বলার সাহস হল না। ওর মনে হল, ঠিক মাংসের পোড়া গন্ধ। পাখির না অন্য কিছুর তা সে টের করতে পারছে না। একটা চামসে গন্ধ আসছে। পাহাড়ময় এই অন্ধকার রাতে ছড়িয়ে পড়ছে গন্ধটা সে সেটা টের পাচ্ছিল! সে তবু বলল, তুই ঘুম যাতো। আমি দেখি। বলে দরজা খুলতে গেলে জনা

এসে শক্ত হাতে চেপে ধরল। বলল, দোহাই বাবু, তুর পায়ে পড়ি। এখন দরজা খুলবি না।

সুভাষ বলল, তোর ভয় নেই। এই ছ্যাখ। এই বলে সে হাতে একটা চকচকে কিছু দেখাল। বলল, কেউ এখানে আসতে সাহস পাবে না। সে দুম করে জানালা খুলে একটা গুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল। যেন তার কাছে এখন এমন বস্তু রয়েছে, ইচ্ছা করলে দশ পনের জন, পনের জনই বা কেন, সে অনেককে এখান থেকে হটিয়ে দিতে পারে।

জনা বাবুর মুখ দেখে কেমন সাহস পেল। সে আর আগলে রাখল না। দরজা খুলে সুভাষ বের হল। তারপর টর্চ জ্বেলে সে পাহাড়ের চারপাশটা দেখল। যে নীচে পাহারা দিচ্ছিল, সে যে জেগে আছে, হেঁকে তার প্রমাণ দিল। রাতটা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, সুতরাং এমন ঘন অন্ধকার চারপাশে যে সে ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য হেঁকে উঠল, শিউপূজন তুই কিছু গন্ধ পাচ্ছিস! অন্ধকার রাত, ছায়ার মত সামনে দূরের সব পাহাড়, পিছনে সমতলভূমি। আখের জমিগুলোতে এখন সার দেয়ার জন্য আখের ছিবড়া, আখের পাতায় আগুন জ্বালানো হচ্ছে। পা টিপে টিপে জনা বাবুকে ধরে নীচে নেমে আসছে।

শিউপূজন হেঁকে বলেছিল—হাঁ হুজুর। কাঁহা ভি কুছ হোতা হ্যায়। বলে শিউপূজনও তার চার ব্যাটারির টর্চ মেরে চারপাশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছিল। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। দু'টো একটা ধূর্ত শেয়াল রাস্তা পার হতে আলো চোখে পড়ায় থমকে গিয়েছিল।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল ওদের। ওরা কিছুই টের পেল না। সুভাষ তবু সাহস সঞ্চয়ের জন্য জনাকে বলেছিল, একদঙ্গল সাঁওতাল এ অঞ্চলে আখ কাটতে এসেছিল। এমন অন্ধকার রাত দেখে ওরা হয়ত কোন বনের ভিতর মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে। এত বছর পরে কেউ বদলা নিতে আসে না।

অফিসে যাবার সময় দারোয়ানদের বলেছে, আজ যেন এ-পাহাড়ে কেউ উঠে না আসে। এমন কি যে পুরোহিত আসে তাকেও উঠতে দেওয়া হবে না। এ-জন্য যা হয় হবে।

শিউপূজন সেলাম ঠুকে বলেছে, যো হুকুম সাব। শিউপূজন যেন বড় একটা কাজ পেয়ে গেছে। সে অন্য কিছুই জানে না। এ মেয়েকে কেউ হরণ করে নিয়ে যেতে পারে, তার বিশ্বাসই হয় না। বরং সুভাষকে ওর ক্ষ্যাপাবাবু বলতে অথবা ভাবতে ভাল লাগে। ওর ওপরে ওঠার হুকুম নেই। তবু সে বনের ভিতর থেকে, ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছে। কোন কোন দিন বাবু নিজ হাতে সুজনিয়াকে সাজিয়েছে। ফুল খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে। বড় বাগানের সবচেয়ে লাল টক টকে ফুলটা তুলে এনেছে ওর জন্য। তারপর হাতুড়ি বাটালি নিয়ে বসেছে। সঙ্গে ছোলা ভাজা, মুড়ি চা। 'এই তুই নড়বিনা। ঠিক আছে! নাকটা হচ্ছে এখন। চুপ করে বসে থাক।' সুজনিয়া কেন বসে থাকবে। সে সারা পাহাড়ময় পাখির মত কলরব করতে পারলে বাঁচে।

সুভাষ জিপ থেকে লাফিয়ে নামল। সে শিউপূজনকে কিছু বলল না। সোজা সিঁড়ি ভাঙার মত লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে থাকল। শরীর অসুস্থ হলে শুয়ে থাকতে পারে। দিনের বেলা জনা যাবে কোথায়। আর এই পাহারা ভেঙ্গে কার সাহস ওপরে উঠে আসে। কেউ জোর করে উঠে এলে সে গুলি করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে গেছে। কোন কিছু ঘটলে শিউপূজন নিশ্চয়ই গেটের মুখেই খবর দিত। সুভাষ গ্যারেজের চাবি দেবার সময় ওর মুখ লক্ষ্য করেছে। সেই সহজ সরল মুখ। তবুও সুভাষ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে, পাথরের পর পাথর ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে। সে কিছুদূর উঠেই ডাকল, জনা। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। সে একটা পাথরের পাশে উঁকি দিয়ে দেখল, কারণ জনা এখানে অনেকদিন একা একা বসে থেকেছে। সামনে সমতল মাঠ, মাঠে ফসলের চাষ, সে বসে বসে চাষী মানুষদের চাষ

আবাদ দেখেছে। সেখানেও জনা নেই। সে এবার ছুটে গেল ঘরের দিকে। দরজা খোলা। যেন এইমাত্র জনা দরজা খুলে এই টিলায় কোন গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে অথবা যেখানটায় ওদের খড়কুটো দিয়ে ঘেরা, আকাশের নীচে ছাদ বিহীন বাথরুম, যেখানে স্নান করে জনা কাপড় ছাড়ে, সেখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গোপনে বাবুর মুখ দেখছে। বাবুর বিষণ্ণ মুখে ভয়ঙ্কর চিন্তার রেখা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে এক্ষুনি যেন খিল খিল করে হেসে উঠবে। সুভাষ এমন ভাবছিল আর ক্রমে মুখ শুকিয়ে আসছে। ওর শুকনো মুখ দেখে কেউ কোথাও থেকে খিল খিল করে হেসে উঠছে না। সেই বাথরুমের পাশে ছুটে গেল। না নেই। সে টিলা থেকে টিলায় লাফিয়ে পড়ল। ডাকল—জনা! জনা! কোন সাড়াশব্দ নেই। পাহাড়ের জন্য এই শব্দ শুধু প্রতিধ্বনি তুলল। জনা, জনা—পাহাড়ে পাহাড়ে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনি হতে থাকল কেবল। সুভাষ, যে টিলায় দাঁড়িয়ে থাকে জনা, যে টিলা থেকে বাবু ফিরছে জিপে দেখতে পায়—সেখানে ছুটে গেল। দুধারে বন ঝোপ ভেঙ্গে সে একটা চিতাবাঘের মত ছুটে বের হয়ে গেল। আর গিয়েই দেখল, নিশ্চল নিথর জনা। হাঁটু মুড়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে। যেন প্রাণ আছে শরীরে। চোখগুলি তেমনি তাজা। এখনও রক্ত টপ টপ করে ঝরছে। পিঠের ঠিক মেরুদণ্ড বরাবর একটা তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে আছে।

সুভাষ পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, জনা। তারপর সেও দু' হাঁটু মুড়ে পাশে এক অবোধ বালকের মত বসে পড়ল।—জনা আমি কেন তোকে নিয়ে এলাম।—জনা। শিশুর মত সে সেই সবুজ ঘাসের ওপর জনার পিঠে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকল।

দারোয়ানরা সবাই ছুটে এসেছিল। ওরা ছোটাছুটি করল চারপাশে। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। শুধু মনে হল দূরের পাহাড়ে একটা গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি ওপরে উঠে দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে। যেন সেই পাখিদের কেউ পেছন থেকে তাড়া করছে।

সুভাষ কোলের ওপর টেনে নিতেই দেখল, হাত পা শক্ত। ওর দিকে অপলক মরা খরগোসের বাচ্চার মত তাকিয়ে আছে জনা। সুভাষ এবার জনাকে কাঁধে তুলে নিল। পুলিশের হাঙ্গামা সে চাইল না। সে বুঝতে পারল এখন তার কাঁদার সময় নয়। জনার মৃতদেহ নিয়ে সে তার ঘরের দিকে ফিরে চলল।

এ-ভাবে এক জনা, আদিবাসী মেয়ে সুভাষের জীবনের সব বিদ্বেষ মুছে দিয়ে চলে গেল। সে এখন আর তার স্ত্রীর ওপর অভিমান করে বসে থাকে না। সে জনার জন্য একটি সমাধি গড়ে দিয়েছে। কত বিচিত্র বর্ণের ফুলের গাছ লাগিয়েছে সমাধির চারপাশে। সে একা জ্যোস্না রাতে সমাধির পাশে বসে থাকে। গাছে গাছে ফুল ফোটা দেখে। তার কাছে এই পাহাড় বনভূমি, জন্মভূমির চেয়েও প্রিয়। এখন আর তার মনে হয় না কেউ মই নিয়ে আসবে, এবং গাছে গাছে বিজ্ঞাপন মেরে চলে যাবে। বরং মনে হয় এই ঈশ্বরের জগতে সে এবং জনা আছে। আছে পাথরের কিছু মূর্তি—যা সে জনার মত করে তৈরি করতে চেয়েছে। সে এই পাহাড়ে, টিলায় টিলায় অবসর সময়ে কেবল কি করে ফুল ফোটাবে ভাবে। সে আর কোথাও যেতে পারবে না। যেন জনাকে ফেলে চলে গেলে সে এই পাহাড়ে একা থাকবে, কেউ তার পাশে না থাকলে ভীতু মেয়েটা ভয় পাবে।

মাশুদি সাব বলেছিলেন, সুভাষ তুমি এবার সহরে চলে এস।

সুভাষ বলল, আর কোথাও যাবনা স্যার।

মাশুদি সাব বললেন, এখানে তুমি একা পড়ে থাকবে? কে তোমাকে দেখাশোনা করবে!

সুভাষ চুপ করে থাকল। সে বলতে পারত, আমি তো একা নই স্যার। এখানে যতদিন আমি আছি ততদিন জনা আছে। এই

—বলুন।

—একটা ব্যাপার না জানালে মনে হয় আমার দিক থেকে কিছু ত্রুটি থেকে যাবে।

—বলুন।

—আমাদের যেখানে কারখানা ছিল, সেটা উঠে যাচ্ছে। আপনি জানেন কিনা জানিনা, সেটা একটা এমন জায়গা যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এমনিতেই কোন লোকালয় নেই। তার ওপর সুভাষ আবার আরও বনের ভিতর এক পাহাড়ে থাকত। সেখান থেকে সে কারখানায় জিপে যাওয়া আসা করত।

—এসব বলে কি হবে।

মাগুদি বললেন, না বললে আপনি জানবেন কি করে।

—আমিতো সব জানি।

—বোধ হয় শেষটুকু জানেন না। বলে মাগুদি সাব ঢোক গিললেন। কথা বলতে তিনি সত্যি বিরক্তবোধ করছেন। এতটুকু আগ্রহ নেই সুভাষ সম্পর্কে। তিনি তবু কেমন বেহায়ার মত বললেন, আমাদের কোম্পানি উঠে গেলে সে সেখানে একা পড়ে যাবে। তাকে দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না। সে খাবে কি, বাঁচবে কি করে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ওটাতো সুভ বুঝবে। আপনি ওর জন্য ভেবে কি করবেন।

—সে পাহাড়ে একা। কিছু আখের চাষ আছে, কিন্তু জলে ভেসে গেলে তারাও চলে যাবে। তাছাড়া আমার মনে হয় আপনাকে একটা কথা বলার দরকার। খুব রূঢ় শোনালেও, না বললে এ-সময় চ্যাটার্জীর পক্ষে খারাপ হবে। সোজা কথা, পাগল না হলে কেউ এ-ভাবে থাকে না। আপনি গেলে ওর সব অভিমান ভেঙ্গে যাবে।

অঞ্জু এবার সোজাসুজি বলল, সে তো ওখানে একটা আদিবাসী মেয়েকে নিয়ে থাকে! তার তো দুঃখ থাকার কথা নয়।

—মেয়েটা মরে গেছে। ঠিক মরে গেছে বললে ভুল হবে, কেউ

মেরে ফেলেছে। সুভাষ খুব সুন্দর করে ওর একটা সমাধি গড়েছে। সারাদিন কেবল ওটার পাশেই বসে থাকে। বসে বসে পাথরে হাতুড়ি বাটালি চালায়। নানারকম সে পাথরের মূর্তি গড়ছে। ওর চোখমুখ দেখলেই টের পাই ও বড় ভালবাসার কাঙ্গাল। সে কেমন ধীরে ধীরে বনের মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

তারপরই কি করে কি সব হয়ে যায়। একজন পরিত্যক্ত মানুষের জন্য আকাঙ্খা বেড়ে যায়। সারা জীবন সুভ একটা ছেলেমানুষের মত আবেগের বশে সব করে গেল। কোন কারণেই সে একটু বিবেচক মানুষ হল না, এবং এ-সব ভাবলেই কোন কোন স্মৃতি তোলপাড় করতে থাকে। এক অঘটন ঘটে যায়—মনে হয় জীবনের সব একাকীত্ব —সে চলে গিয়ে তাকে দিয়ে গেল। চারপাশে নানারকমের বর্ণাঢ্য সমারোহ অথচ কোথায় যেন সে একা, এত বেশী একা যে কখনও মনে হয় সে একটা অশোক বনে সীতা হয়ে গেছে। কে একজন পাশে না থাকলে নিজেকে সব সময় অসহায় লাগে। বড় ফাঁকা লাগে।

অনু বলল, ওঁর কাছে একা যেতে আমার ভয় লাগছে!

—আমরা থাকব।

আর তখনই মনে হল অনুর, সে এই যে সারাজীবন, ঠিক সারাজীবন নয়, সুভাষ চলে যাবার পর জীবনে তার একাকীত্ব ভয়ঙ্কর এবং এক অভিমান, অবোধ শিশুর মত অভিমান ক্রমে একটা বড় আকাশের নীচে নিয়ে গেল তাকে, সেখানে দৃষ্টির বাইরে থাকত সুভাষ, এতদিন পর মনে হয়েছে—এটা ঠিক না। সুভাষ, সেই ছেলেবেলার সুভ, যাকে বার বার হাত ধরে নিয়ে আসতে হয়েছে, এখনও যেন সেটা তার শেষ হয়ে যায়নি। ওর ভিতরটা সুভাষের জন্য, ওর সেই অভিমানে বনবাসী হয়ে থাকার জন্য ভীষণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। এবং গভীরে থাকে এক অন্তর্জলী যাত্রা, যা মানুষকে বড় বেশী অসহায় করে রাখে—অনু কেমন অধীর হয়ে আবার ফোন করল, প্রীতি তুই আমাকে সাহায্য করবি!

—কে আপনি! প্রীতি সহসা কার ফোন ধরতে পারল না।

—আমি অনু।

এতদিন পর অনুর ফোন পেয়ে প্রীতি কি করবে বুঝতে পারল না। সে বলল, তুই অনু আমাকে এখনও মনে রেখেছিস!

—প্রীতি, তোর কাছে এটাই আমার শেষ অনুরোধ।

—কি বলবি তো।

—আমার সঙ্গে যাবি! আমার খুব ভয় লাগছে।

—কোথায়!

—সুভকে আনতে। ওকে আমরা আনতে যাচ্ছি।

—সত্যি!

—সত্যি।

॥ সমাপ্ত ॥